বাঁশের কেল্লা

(উপন্যাস)

[রচনাকাল—১৯৪৮]

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

সুহৃদ্বরেষু

ডুম-ডুম-ডুম-ডুম—

ঢোল বাজাচ্ছে প্রফুল্লর লোক। জানিয়ে দিচ্ছে, ইতিহাসে জ্বল-জ্বল করবে আজকার তারিখ—১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭। কত সংগ্রামের পর এই দিনে পৌঁছলাম! পথেব শেষ নয়—নূতন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে আরও দুস্তর পথে যাত্রা।

উৎসব-সভায় লোক হচ্ছে না? হবে, হবে বই কি! কত কষ্ট করে শহর থেকে তোমরা এসেছ, লোক না হলে ছাড়বে প্রফুল্ল? ব্যস্ত হোয়ো না, অনেক দেবি এখনো। ইস্কুলের মাঠে পাকুড়তলায় সভাব জায়গা। হায়-বে, পোড়া ইস্কুল-ঘবে আবাব লোক গিসগিস কবছে! তোমাদেব মতো নামজাদা মানুষরাও থাকবে তাব মধ্যে। চল, এগুনো যাক পাযে পায়ে।

মেলা দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন শহবে। এই যে স্বাধীন হয়েছি, এব পূর্বাপর ইতিহাস ছবি দিযে গেঁথে বেখেছিল মেলাব এক ঘবেব মধ্যে। তুমি লেখক-মানুষ নিশিকান্ত—ভেবেচিন্তে দেখো তো আমাদেব জয়রামপুব নিযে কিছু লেখা চলে কিনা। কত মিথ্যে কথাই বসিয়ে বাড়িয়ে লিখে থাক, এখানকার সত্যি মানুষদের নিযে লেখ না একবাব। তোমার কলমেব জোবে তারা বেঁচে উঠুক স্বাধীন ভাগ্যবান দেশবাসীব মর্মে।

মস্তবড় গ্রাম আমাদেব। নূতন মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে। শুনছি শিগগিরই কৃষ্ণপক্ষে কয়েকটা বাস্তাব মোড়ে কেবোসিনের আলো জ্বলবে। ছ'টা বড় বড় পাড়া। দস্তবমতো কৌলীন্য আছে এই জয়বামপুবের—সাহেব-ঘেঁসা আমরা চিবকাল। সাদা সাহেবেব এ অঞ্চলে যাতায়াত সুদূর অতীত-কাল থেকে। একটা পাড়াব নামই আছে সাহেব-পাড়া। বাঁশবনটা ছাড়িয়ে পডব সেখানে। পাকা বাস্তা শেষ হযেছে সেখানে গিযে। সাহেববাই নিজেদের গরজে তৈরি কবেছিল এ বাস্তা। এখন আবও কয়েকটা হয়েছে, কিন্তু এইটে আদিতম। এই সেদিন অবধি বাঘে-গরুতে জল খেত সাহেবদের প্রতাপে। বড় বড় বাংলো তৈবি কবে বাজাব হালে তাবা থাকত। আজকে শামুক-ভাঙা কেউটের আস্তানা সে-জায়গায়।

বহুবিস্তৃত বাঁশবন। ঝাড়ের যেন অন্ত নেই, মাইলখানেক জায়গা জুড়ে আছে। একটা দিনের কথা বলি, বারো-তেরো বছর বয়স হবে আমার। ঘোর হয়ে গেছে, গরু আসে নি গোয়ালে। দুধাল গরু—ঠাকুরমা ঘর-বার করছেন। তখন বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই গরু খুঁজে আনবার মতো। আমি বললাম, ব্যস্ত হোয়ো না ঠাকুরমা, প্রফুল্লদের গরুর সঙ্গে চরতে দেখেছি, তাদের খামার-বাড়ি হয়তো ঢুকে পড়েছে। দেখে আসি।

ঐ যে ডানদিকে ফাঁকা জায়গাটা নিশিকান্ত, ক'টা ছেলে হুন-দাড়ি খেলা করছে—ঐখানে ছিল প্রফুল্লদের খামার-বাড়ি। এখন প্রফুল্ল ন্যাপলার মা'র বাড়ির আমবাগান কাটিয়ে বিশাল অট্টালিকা তুলেছে। পথের ধারেই পড়বে, দেখাব তোমায়।

ভর সন্ধ্যেবেলা গরুর খোঁজে দুটো পাড়া অতিক্রম করে এই এত দূর এলাম। এসে শুনি—শুঁটকি আমাদের সত্যিই খামারে ঢুকে পোয়াল-গাদা থেকে পোয়াল টেনে টেনে খাচ্ছিল, ওরা দেখতে পেয়ে বেহদ্দ পিটুনি দিয়ে দিয়েছে। তারপর বাঁশতলার এদিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছি, মনে হল—ঐ তো সাদা মতো··· শুঁটকিই। বড্ড রাগ হল, শিঙে একবার দড়ি পরাতে পারলে হয়। ঘুরে ঘুরে আমরা হয়রান হচ্ছি, আর হতভাগা গরু শুয়ে পড়ে দিব্যি জাবর কাটছে ওখানে।

জায়গাটায় এসে দেখি, কিছু নয়—ঝাড়ের ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে, সেইটে গরুর মত মনে হচ্ছে দূর থেকে। ডাকছি, শুঁটকি-ই-ই। সামনের দিকে কি-একটা নড়ে উঠল—শুঁটকি না হয়ে যায় না ছায়া দেখে দেখে এমনি অনেকটা এগিয়ে গেছি নিশিকান্ত, হঠাৎ জোরে বাতাস এল, ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ উঠল বাঁশঝাড়ে। সর্বাঙ্গ শিব-শিব করে উঠল। ছেলেমানুষ পেয়ে যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অশরীরী বহু জন, চেপে ধরবে বুঝি বাঁশের আগা দিয়ে। রাস্তার দিকে দৌড় দিই। ঝাড়ে ঝাড়ে যেন ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে, বাঁশ নুয়ে নুয়ে পড়ছে আমার পথ আটকে—এই একবার মাটি ছোঁবার উপক্রম, পরক্ষণে আবার সটান উপরে উঠে যাচ্ছে। চাবুকের মতো সপাৎ করে কঞ্চির বাড়ি লাগল মুখের উপর। বাঁশপাতা ঝরছে, মুঠো মুঠো বাঁশপাতা যেন আমার গায়ে ছুঁড়ে মারছে।

রাস্তায় পড়েও ছুটছি। বাঁশবনের আওয়াজ কানে আসে। এক ঠাকুর ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের গল্প শুনেছিলাম, তারাই শাসাচ্ছে যেন আমায়। ঠাকুরমাকে দেখতে পেয়ে সুস্থির হলাম, লণ্ঠন নিয়ে আমার খোঁজে আসছিলেন। বললেন, শুঁটকি এসে গেছে রে। হুড়কোর ধারে এসে শিং নাড়ছিল, তাকে গোয়ালে তুলে তোকে ডাকতে বেরিয়েছি।

রাতে শুয়ে পড়ে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রামজয় ঠাকুরকে দেখেছ তুমি—সেই যিনি বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন ?

কিন্তু ঠাকুরমা কেন—তাঁর শ্বশুর অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ শশিকান্ত নাকি হামাগুড়ি দিতেন সেই সময়। অথচ গল্পটা ঠাকুরমা এমন গড়-গড় করে বলে যান, যেন আগাগোড়া চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন তিনি।

নিশিকান্ত, যাবে নাকি বাঁশবনের ভিতর খানিকটা এগিয়ে, রামজয় ঠাকুরের আসন দেখতে? এই সুঁড়িপথের ছায়ায় ছায়ায় স্বচ্ছন্দে নদীর-ধারে হাটখোলা অবধি চলে যেতে পার। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এই দিক দিয়ে, পথ অনেক কম—কিন্তু গ্রামের মানুষ নিতান্ত দায়ে না পড়লে বাঁশবনে ঢোকে না। রাত-বিরেতে সহজে মাড়াতে চায় না এদিককার পথ।

পঞ্চবটীতলা—এখন একটা নিমগাছ মাত্র। ভারি জাগ্রত স্থান ছিল এটা, দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসত। দেখ, বাঁশঝাড় চারিদিকে চেপে ধরেছে নিমগাছটাকে—আসল গাছ অনেকদিন মরে গেছে, খান-দুই ডাল বেঁচে রয়েছে কোন প্রকারে, আর ক-বছর পরে চিহ্ন থাকবে না এ গাছের। ঠাকুরমার গল্পে শুনেছি, রামজয় ঠাকুর স্নান-আহ্নিক সেরে দেড়প্রহর রাত্রে এই গাছতলায় এসে বসতেন, শিষ্য-সেবকেরা সেই সময় চারিদিকে ঘিরে এসে বসত।

কোম্পানির তখন প্রথম আমল। ঠাকুর তো আস্তানা গেড়ে নিশ্চিন্ত আছেন। বাঁশবাগান নয় এটা তখন, ভদ্রার প্রান্ত জুড়ে বিস্তীর্ণ মাঠ। দো-চালা খোড়ো-ঘর বেঁধে সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা হল সকলের আগে। তার চারিদিকে সংখ্যাতীত কুড়ে উঠল আশ্রমবাসী ও অতিথি-অভ্যাগত সাধুসজ্জনের থাকার জন্য। মাঠের মাঝখানে গ্রাম গড়ে উঠল দেখতে দেখতে। তালুকদার এল একটা নিরিখ সাব্যস্ত করে বন্দোবস্ত দিতে, পঞ্চায়েত-চৌকিদার ট্যাক্সর তাগাদায় এল। ঠাকুর বলে দিলেন, রাজাব প্রজা নই, সাধুরও খাতক নই। দেবীর কিঙ্কর—খসে পড় বাপধনেরা।

গ্রাম আরও জেঁকে উঠছে, নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ঘর বাঁধছে। ঢেঁকি-ঢেঁকিশাল তাঁত চরকা হাপর-নেহাই—যা কিছু মানুষের দরকারে পড়ে। জয়রামপুরের বিলের মধ্যে বিস্তীর্ণ ধানবনের বোশর ভাগই সে-আমলে কাবকিত করত ঠাকুরের লোকজন। এক খোলাটে ধান এনে তুলত, ঝেড়ে উড়িয়ে তুলে দিত ধর্মগোলায়। ট্যাক্স-খাজনার ধার ধারত না, দিব্যি ছিল।

আগরহাটি সবে তখন চৌকি বসেছে। সে এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূর, দুর্গম পথ-ঘাট। এক বিকালে ঘোড়ায় চেপে দারোগা এল। পাকা রাস্তা না হওয়া অবধি ও-অঞ্চল থেকে আসা-যাওয়া বড় কষ্টকর ছিল। রাত থাকতে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে, তা-ও প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল পৌঁছতে। গাঙে-খালে তিনটে পারাপার—ঘাটে এসে হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হয়। মানুষ পার হলেও ঘোড়া পার করে আনা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে।

দারোগা এসে গড় হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। ঠাকুর পূজার নির্মাল্য জবাফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পাথরের বাটিতে ঘোল আর রেকাবিতে

করে খানকয়েক বাতাসা দিয়ে গেল একজন। খেয়ে দারোগা ঠাণ্ডা হল। তারপর বলে, ট্যাক্স চাইতে এসেছিল, আপনি হাঁকিয়ে দিয়েছেন। কোম্পানির রাজ্য জানেন এটা ?

না বাবা, সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর রাজ্য। কারো তিনি ইজারা দিয়ে দেন নি পৃথিবীর জায়গা-জমি। বাজে কথা রাখ, অতিথি এসেছ—খাও-দাও থাক, দু-চার দিন—মায়ের নাম কর, আরাম পাবে। আমরা কারো তোয়াক্কা রাখিনে, কারো সঙ্গে গোলমাল করতে যাই নে। আমাদের কেন এসে জ্বালাতন করছ বাবা ?

দারোগা দিন পাঁচ-ছয় রইল সেখানে। ঠাকুরমা বলেন, চর্বচোষ্য খেয়ে দিব্যি মজায় ছিল। গিয়ে কিন্তু সদরে রিপোর্ট পাঠাল, জবরদস্তি করে আটকে রেখেছিল তাকে। গ্রামে এদিকে সোরগোল পড়েছে, চওড়া পরিখা কাটা হচ্ছে চারদিক ঘিরে। আস্ত বাঁশ পুঁতে পুঁতে প্রাচীর তৈরি হল—পর পর তিনটে প্রাচীর—দস্তুরমতো এক কেল্লা। আর ওদিকে অনিবার্য ভাবে যা ঘটবার কথা—এক দল গোরা সৈন্য এসে পড়ল।

লম্বা-চওড়া ইয়া দশাসই জোয়ান, রক্তাম্বর-পরা—এই নাকি ছিল ঠাকুরের চেহারা। বুক ফুলিয়ে খালি গায়ে সৈন্যদের বন্দুকের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। তারা অবাক হল। ঠাকুর বলেন, কেন গণ্ডগোল করতে এসেছিস ? ঘরের ছেলেরা ঘরে চলে যা। আমরা তো বাছা থুতু ফেলতেও যাই নে তোদের দেশে-ঘরে।

কিন্তু ফিরে যেতে আসে নি তারা। বন্দুক ছোঁড়ে—ফাঁকা আওয়াজ, ভয় দেখাবার জন্য। ফলে উল্টা-উৎপত্তি হল। প্রথমটা সকলের ভয় হয়েছিল—ভেবেছিল, ঠাকুর মরে পড়ে আছেন বুঝি নূতন-কাটা পরিখার ভিতর। কিন্তু হাসতে হাসতে ঠাকুর কেল্লায় এসে ঢুকলেন। লোহার গুলি তাঁর গায়ে লেগে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে। হবে না কেন—ধর্ম সহায়, কারও উপর অন্যায় করতে যান না তো তাঁরা—নিজের জায়গায় চুপচাপ নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে থাকেন।

বাঁশের কেল্লা দেখে খুব হাসছে গোরা-সৈন্যরা। এগিয়ে এসে ধাক্কাধাক্কি করে তারা প্রাচীরের খান কয়েক বাঁশ খুলে ফেলল। সেই সময় এক কাণ্ড—পাকা মন্দির হবে, তার জন্য পাঁজা ভেঙে ইট স্তূপীকৃত করে রেখেছে, ঠাকুরের লোক আক্রোশে দমাদম সেই ইট-বৃষ্টি করতে লাগল সৈন্যদের উপর। মাথায় লেগে মুখ থুবড়ে পড়ল একটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

পরবর্তী ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঠাকুর মরলেন বন্দুকের গুলিতে, আরও

ষাট-সত্তর জন মারা গেল। কেল্লায় আগুন দিল, দাউ দাউ করে সারা দিনরাত জ্বলল, ফট-ফট করে বাঁশের গিরা ফুটতে লাগল। বিয়াল্লিশ সনে ইস্কুল-বাড়ি জ্বলতে দেখেছি নিশিকান্ত। তার আগেও একবার জ্বলেছে নোনাখোলায় ভলণ্টিয়ারদের আস্তানা। এসব থেকে সেকালের ছবিটা আন্দাজ করে নিই। একই ইতিহাসের রকমফের শুধু। ঠাকুরের অত দিনের অত আয়োজন নিশ্চিহ্ন হল দেখতে দেখতে। একটুখানি কেবল স্মৃতি আছে—এই বাঁশবন। কেল্লার প্রাচীরে কতকগুলো যে গোড়ার বাঁশ পোঁতা ছিল, তাই থেকে নূতন নূতন বাঁশ জন্মেছে শতাব্দীকাল ধরে। কসাড় বাঁশবন এখন এই জায়গায়।

ঠাকুরের অসমাপ্ত মন্দিরের কিন্তু এতটুকু চিহ্ন নেই বাঁশবনে অথবা গ্রামের অন্য কোথাও। নাটার ঝোপে আচ্ছন্ন ইটের স্তূপ—মন্দির নয়, সাহেবপাড়া ঐ সামনে—নীলকুঠির ফটক ছিল ওটা। ক'দিনের বা ব্যাপার—আমার ঠাকুরমা নূতনবউ হয়ে এলেন, তখন হেলি সাহেবের দাপটে ইতর-ভদ্র সকলে তটস্থ। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। হেলি বলে নয়, সব সাহেবকে ক্রমশ বিদায় নিতে হয়েছে জাহাজ ভাসিয়ে। নীলকর সাহেবদের উড়িয়ে দেবার উপায় নেই, কিন্তু বাঁশের কেল্লার কথায় প্রবীণজনেরা ঘাড় নেড়ে বলেন, গাঁজাখুরি গল্প—এই কি হতে পারে, কোম্পানির বিরুদ্ধে বাঁশ আর ইটের টুকরোয় লড়াই? সামান্য একটু গ্রাম্য ঘটনা লোকের মুখে মুখে এই রকমটা দাঁড়িয়ে গেছে। আচ্ছা নিশিকান্ত, রামজয় ঠাকুরের কথা এতই কি অবিশ্বাস্য পরবর্তী ঘটনাগুলোর তুলনায়? জয়রামপুরের এক এক ফোঁটা ছেলে—আমাদের কানু-বাসু অবধি কী তাজ্জব দেখিয়ে গেল! পুরানো কাহিনী আমিও হয়তো বিশ্বাস করতাম না এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে না দেখলে।

প্রবীণেরা যা-ই বলুন, ঠাকুরমার মুখে শোনা প্রতিটি কথা আমার শিশু-মনে গেঁথে গিয়েছিল। রামজয় ঠাকুরের মন্দিরের ইট রয়েছে নিশ্চয় বাঁশবনে কোনখানে চাপা পড়ে, সেই সব মড়ার হাড়-পাজরা ধুলো হয়ে বাতাসে উড়ে মিশে আছে মাটির সঙ্গে। অহরহ বাঁশবনে কটর-কট আওয়াজ ওঠে—ছেলেবেলা আমার মনে হত, রামজয় ঠাকুরের রক্তাক্ত সেই শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বাঁশের আগায় আগায় পা ফেলে শূন্যমার্গে চলাচল করছেন। শুধু তাঁরাই নন—বিদেশি নীলকর পরিবারের প্রেতাত্মাগুলিও। বুড়ি মেমের কুঠির পিছনে ভদ্রার কূলে বাউইলতায় ঢাকা কবরখানা রয়েছে, আতঙ্ক সেই জন্য আরও বেড়েছিল।

ছেলেমানুষ বলে নয়—বুড়োরাও নিতান্ত দরকার ছাড়া ঢুকতে চায় না বাঁশবনে। কেউ আসে না নিশিকান্ত। দিনদুপুরে শিয়াল চরে বেড়ায়,

খরগোস ছোটে দু-কান উঁচু করে, বাদুড় ঘুমোয় নিচেমুখো মাথা ঝুলিয়ে। তলায় এখানে-ওখানে উলুঘাস, ন্যাড়াসেজি ও শেয়াকুলের ঝোপ। কে আসতে যাচ্ছে বল এদিকে, কার দায় পড়েছে!

দায় পড়েছিল আমাদের—মুশকিলে পড়েছিলাম সেবার বিয়াল্লিশ সনের শেষাশেষি সময়টায়। ঘরে ঘরে পুলিশের দল হানা দিচ্ছিল, পাড়ার মধ্যে থাকা অসম্ভব হয়েছিল শেষের মাসকয়েক। আজকে নিশিকান্ত, ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি—সেদিন ঐ সব ঝোপঝাপের আড়ালে পাকা বাঁশপাতার উপর আমাদের কায়েমি বিছানা হয়েছিল। শান্তি-বউদি তাকিয়া দিচ্ছিল মাথায় দেবার জন্য। তাকিয়ার বদলে একটা পাশ-বালিশ নিয়ে এলাম—ঐ এক পাশ-বালিসে এদিক-ওদিক মাথা রেখে অনেক লোকের শোওয়া চলে। ছিলাম মন্দ নয় নিশিকান্ত। রাতদুপুরে শিয়াল ডেকে ডেকে চুপ করত, তখনই উৎসব পড়ে যেত ঘরে ঘরে। আলো নিভিয়ে দিয়ে উৎসব। ছায়ার মতো এক এক জন আমরা ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, দুয়োর খুলে তাড়াতাড়ি আপনজনেরা বেরিয়ে আসছে। ফিসফিস কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া—আমার ত বছরের খুকি মাস তিনেকের মধ্যে কোনদিন আমায় দেখতে পায় নি—চারু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে নিয়ে আসত, আমি দু-চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে একটু আদর করে চলে যেতাম। সকাল হবার অনেক আগেই ঢুকতাম আবার বাঁশবনে। বরাবরই যে এখানে ছিলাম, তা নয়। সময় সময় ছোট-লাইন ধরে দূরের কোন স্টেশনে গিয়ে গাড়ি চাপতাম, আবার ফিরে আসতাম। এদিককার কাজের ভার আমাদের উপর, অঞ্চল ছেড়ে পালাবার জো ছিল না। রোজই যে ঘরে এসে খেয়ে যেতে পারতাম, তা নয়। এক-একদিন অচেনা মানুষ দেখা যেত গ্রামে, শাঁখ বেজে উঠত এবাড়ি-ওবাড়ি। শঙ্খ বাজানো ছিল সঙ্কেত। সে রাতে নিরম্বু উপোস যেত। কাছাকাছি খেজুরবনে ভাঁড় পেতেছে, কিন্তু বেরিয়ে এসে খেজুর-রস খেয়ে যাব, তাতেও বড্ড কড়া রকমের মানা ছিল।

নীলকুঠির অনেক গল্প ঠাকুরমা বলতেন। বউমানুষ নিজে কী-ই বা দেখেছেন—তাঁরও অন্যের মুখে শোনা। একটা তার মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে আছে মনে। অপরূপ নাটকীয়তার জন্যই সম্ভবত।

ভদ্রা নদী দেখছ, নিশিকান্ত। স্রোতোহীন নদীর আজকে এমন অবস্থা যে কেউটেফণার ঝাড়গুলোকেও ভাসিয়ে নিতে পারছে না, পাড়ের কাছে বছরের পর বছর জমে এঁটে একশা হয়েছে—দেখলে মনে হবে, উর্বর মাঠের উপর সতেজ সবুজ ফসল ফলে আছে। পাড়ার মধ্যে মাঝে মাঝে ঘাট তৈরি

করে নিয়েছে। শেওলা-পচা পাঁক, পা দিলে হাঁটু অবধি ডুবে যায়, পা তোলা মুশকিল হয় তারপর। তাই বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে তার উপর বাখারির চালি ফেলা হয়েছে নদী-বিস্তারের প্রায় সিকি অবধি। বউ-ঝিরা ঐ অতদূরে গিয়ে চালির প্রান্তে বসে বাসন মাজে, কলসি ভরে জল নিয়ে যায়। স্নানের সময় ছেলেরা লাফিয়ে পড়ে ওখান থেকে নদীর গর্ভে।

আজকের এই মজা নদী অতি-দুর্দান্ত ছিল সে-আমলে। শীতকালটা ছাড়া ভদ্রার ভদ্র চেহারা দেখা যেত না। নদীর কূলে বিস্তর নীলকুঠি। আউশ ধানের চাষ না করে চাষীরা ক্ষেতে নীলের বীজ ছড়াত। নীলগাছ কেটে নৌকো বোঝাই করে নানা গাঙ-খালের পথে অবশেষে ভদ্রায় এসে পড়ত। সারি সারি দাঁড় বেয়ে অথবা বাদামি রঙের পাল খাটিয়ে যেত নীলখোলার দিকে। পাথরঘাটার ঘাটে এসে তারা নোঙর করত।

পাথর এ অঞ্চলে কোনখানে নেই, ঘাটের নাম তবু পাথরঘাটা। এগিয়ে চল নিশিকান্ত, বাঁকের মুখে কেয়ার ঘন জঙ্গল দেখতে পাবে। পাথরঘাটা বলে জায়গাটাকে। এখন ঘাট নেই, পাথর তো নেই-ই। সে-আমলে নাকি চাটগাঁ-থেকে-আনা পাথর পুঁতে ঘাট চিহ্নিত করা ছিল, দেশবিদেশের ভরা এসে লাগত। এখন গালগল্প বলে মনে হয়।

ঐ সাদা দালান—বুড়ি-মেমের কুঠি ওর পুরাণো নাম। আগে খড়ের চালে ঢাকা ছিল। পুরাণো চাল পচে নষ্ট হয়ে যায়। দরজা-জানলা এবং দেয়ালের কোন কোন অংশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মেজেয় হাঁটুভর উলুঘাস জন্মেছিল। তারপর দরজা-জানলা পালটে কড়ি-বরগা বসিয়ে পাকা ছাত হল। বাবলার পিটানি দিয়ে দশ-বারো জনে ছাত পেটাল মাসখানেক ধরে, নদী থেকে শেওলা এনে ঢেকে দিল। এই তো বছর চারেক আগেকার কথা। প্রফুল্লর টাকায় হয়েছে এসব। ঘর মেরামত করে এখানে সে ছোটখাট এক হাসপাতাল করে দিয়েছে। প্রফুল্লর বিধবা বোন হাসি সকাল-বিকাল এসে দেখাশুনা করে। তার সতর্ক পাহারায় ভাল চলছে হাসপাতালের কাজকর্ম—মফঃস্বলের আর-দশটা হাসপাতালের মতো নয়। মোটা থপথপে চেহারা, গলায় সরু হার—হাসিকে দেখতে পাবে আজকের সভায়। হয়তো সভারম্ভে গান গাইতে হবে তাকে। ভাল মেয়ে—বড্ড কোমল মন। দশের কাজে সব সময় সে অগ্রবর্তী।

কত রকম নক্সা খোদাই করা ছিল বুড়ি-মেয়ের কুঠির কবাটে! ময়ূরে সাপ ধরেছে, পালকি চড়ে চলেছে বর, ঘন জঙ্গলে হাতীর পিঠে বন্দুক হাতে শিকারি যাচ্ছে বাঘ মারতে। এ হেন শৌখিন ঘরের উপরে বাঁশের চাল,

বেতের বাঁধন, উলুখড়ে ছাওয়া। চালের আড়া-বাউনিতেই বা কত মূর্তি, বেতের বাঁধনগুলোয় কত রঙের বাহার! পাকা ছাদের অন্তত দশগুণ খরচ হয়েছিল এই চাল বাঁধতে। টুইডির স্ত্রীর ইচ্ছাক্রমেই এই রকম হয়েছিল—স্বামী আর একমাত্র মেয়ে নিয়ে এই ঘরে তিনি সংসার পেতেছিলেন। টুইডিকে তিনি বলেছিলেন, উলুর ছাউনি দেখতে ভাল আর বেশ ঠাণ্ডা থাকে চোত-বোশেখের দিনেও। গাঁয়ের লোকদের মতো খোড়ো-ঘরে আমরা থাকব।

দালানের পিছনে পাশাপাশি দুটো জামরুলগাছের নিচে সেকেলে কবর-খানা। বুড়ি-মেম অর্থাৎ মিসেস টুইডির কবর ভেঙেচুরে প্রায় নিশ্চিহ্ন। ফেলিসিয়ার কবর কিন্তু অবিকৃত আছে, মর্মর-ফলকের উপর লেখাগুলি সুস্পষ্ট পড়া যায়। টুইডি-দম্পতির বুড়া বয়সের একমাত্র সন্তান ফেলিসিয়া আঠার বছর বয়সে মারা যায়। নীলকমল মাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিককার এই নির্জন নদীর ধারে এককালে অনেক ঘুরেছি। তখন কাঁচা বয়স—কবরের লেখা পড়তে পড়তে মন কেমন করে উঠত নিশিকান্ত। সমুদ্র-পারের আনীল-নয়না স্বর্ণকেশী এক কিশোরী মায়ের কোলের কাছে শান্ত জামরুল-ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। কত সংঘর্ষের ঢেউ বয়ে গেল বারংবার, ইংরেজের ভুবন-জোড়া সাম্রাজ্য চুরমার হল, ফেলিসিয়া কিন্তু গ্রামপ্রান্তে তেমনি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে বাংলার নীলের খ্যাতি। সাত-সমুদ্র পার হয়ে এক এক দল আসে, নীলের কারবারে ক' বছরের মধ্যে লাল হয়ে যায়। দেখে শুনে সমুদ্র-পারের দেশে দেশে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মধুলোভী মৌমাছির মতো জাহাজের পর জাহাজ আসছে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে কুঠি বসতে লাগল।

বাণ্ডিলের দাম চড়ল, চাষীরা দু-পয়সা পাচ্ছে। বীজ সংগ্রহের জন্য কুঠিতে কুঠিতে ঘুরে নিজের গরজেই তারা নীল বোনে। গাছ কাটা হলে গরুর গাড়ি বা নৌকা যোগে নীলখোলায় মাল পৌঁছে দেয়। তৈরি আছে ওজনদার—শিকলে বেঁধে পাল্লায় তুলে সঙ্গে সঙ্গে ওজন হয়ে যায়। মুটেরা নীল বয়ে বয়ে বড় চৌবাচ্চায় ফেলে, কপিকলে কলসি কলসি নদীর জল তুলে গাছ পচান দেয়। নগদ টাকা বাজিয়ে নিয়ে বড়-সাহেব দেওয়ান-গোমস্তা আমিন-তাইদগির সকলকে যথাযোগ্য সেলাম ও প্রণাম করে হাসিমুখে চাষী বাড়ি ফিরে যায় আগামী মরশুমে আবার দেখা হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

তারপর কুঠিয়ালদের টনক নড়ল। পেটে-ভাতে থাকবার জন্য কি এতদূর এসেছে তারা? আইন পাশ করবার কথা হল—একটা কুঠি যেখানে আছে, তার দশ মাইলের মধ্যে নূতন কুঠি বসবে না প্রতিযোগিতার অভাবে তা

হলে বাণ্ডিলের দর পড়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যত কুঠি বসে গেছে? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যেদিকে খুশি গিয়ে দেখগে নিশিকান্ত, কত কনসারনের ধ্বংসচিহ্ন। অক্টোপাশের মতো একদা ওরা শতপাকে জড়িয়ে ধরেছিল এ অঞ্চলের গ্রামগুলি।

সব কুঠিয়াল মিলে ঠিক করল, বাণ্ডিল প্রতি চার আনার বেশি দেওয়া হবে না কোন ক্রমে। চাষীরা বিগড়ে গেল তখন—লাভ পড়ে মরুক, এ দরে পড়তা পোষায় না। নীল আর বুনবে না কেউ ক্ষেতে। লাঙল-গরু নিয়ে তারা ধান ও পাটের কারকিতে লেগে যায়। সাদা রং ও রাজার গোষ্ঠী বলে ভয় পায় না। মোরা নীল বুনব না—এই রব সর্বত্র।

এই গণ্ডগোলের মুখে টুইডি সাহেব আমাদের জয়রামপুর কবলা করে নিলেন নামখানার চৌধুরিদের কাছ থেকে। রেজেষ্ট্রি-দলিল আমি নিজেব চোখে দেখেছি। হাসপাতাল স্থাপনাব সময় কুঠিবাড়ির দখল নিয়ে প্রফুল্লর সঙ্গে চৌধুরিদের মামলা বাধবার উপক্রম হয়েছিল, তখন লারমোর সাহেবের পুরোণো কর্মচারী নকুলেশ্বর গুঁই অনেক খুঁজেপেতে মূল-দলিল বেব করে দিয়েছিলেন। সেকেলে গোটা গোটা বাংলা হরফে লেখা—পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ভোগদখল করবার স্বত্ব টুইডি সাহেবের। কোথায় সেই টুইডির দল আজকে! বিদায় নেবার দিনে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলের জন্য জমি তাঁরা ইংলণ্ডে তুলে নিয়ে যেতে পারেন নি, যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে, ভাঁট আশশ্যাওড়া আব কালকাসুন্দেব জঙ্গলে ঢেকে গেছে। সেই মূল্যবান দলিল এখন মহারাণীব মুখাঙ্কিত কাগজের উপর কতকগুলি দুর্বোধ্য অক্ষরের সমাবেশ মাত্র—নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন, ঐতিহাসিকের হয়তো কিছু কাজে লাগবে স্বাধীন-ভারতের ইতিহাস লিখবাব সময়।

গ্রামের মালিক হবার সঙ্গে সঙ্গে টুইডি আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। একেবারে মাটির মানুষ। চাষীদের বলেন, জমাজমি নিয়ে বসত করছি এখন তোমাদের সঙ্গে, তোমরা যে আমিও সেই। আলাদা করে ফেলে রেখো না বাপু সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপারে। যে ঝড় আসন্ন হয়েছিল, আপাতত তা স্থগিদ হল এইভাবে। গ্রামের কোন বাড়ি বিয়ে-থাওয়া বা ঐ রকম কোন অনুষ্ঠান হলে গৃহকর্তা টুইডির কুঠিতে এসে নিমন্ত্রণ করে যেত। সাহেব বুড়ি-মেমকে নিয়ে বিয়েবাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে আসতেন, জোলাদের তাঁতে-বোনা শাড়ি আর ফেনি-বাতাসা সাজিয়ে আইবুড়োভাত পাঠাতেন। রথের বাজারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কুমোরের গড়া হাঁড়িবাঁশী কিনে উপহার দিতেন। কোন বাড়ি যাত্রা হলে আসরে উবু হয়ে বসে গান শুনতেন।

গোঁফ-কামানো পরচুল ও ঘাঘরা-পরা সখী নাচতে নাচতে শ্রোতাদের ডিঙিয়ে এসে নাচত সাহেবের সামনে। ঘুরে ঘুরে নাচত, বেহালাদার এগিয়ে আসত সখীর পিছু পিছু। নাছোড়বান্দা। টুইডি মুখ ফেরাতেন হাসতে হাসতে, সখী ঘুরপাক দিয়ে আবার গিয়ে সামনে দাঁড়াত। বেহালায় বোল উঠছে, স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়—

দাও পয়সা, দাও পয়সা, পয়সা দাও—

টুইডি পয়সা নয়—ঝনাৎ করে আধুলি ফেলে দিতেন মাটিতে। সখী নাচের ভঙ্গিতে তুলি নিত, ঘুরে গিয়ে সেলাম দিত সাহেবকে। সারা রাত্রি জেগে সাহেব যাত্রা শুনতেন, সকালবেলা চোখ লাল করে উঠে যেতেন আসর থেকে।

দয়াবান ছিলেন সাহেব। কেউ কোন মুশকিলে পড়েছে শুনলে ছুটে যেতেন তার বাড়ি। সদরে সাহেব-ডাক্তার ছিল—জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি এবং এ অঞ্চলের গোটা পনেব কনসারনের সাহেব-মেমদের তিনি চিকিৎসা করতেন। ঘোড়ার পিঠে এবং কখন কখন পালকিতে ডাক্তারকে দূর-দরান্তর যেতে হত চিকিৎসা-ব্যাপারে। পাগলা টুইডির কাণ্ড—কতবার তিনি চিঠি লিখে চাষাভূষোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সাহেব-ডাক্তারের কাছে। ডাক্তাব ঔষধ-পত্র দিতেন, টুইডিব নামে হিসাব লেখা থাকত। চৈত্রমাসে সালতামামির মুখে টুইডি নিজে গিয়ে সমস্ত হিসাব মিটিয়ে আসতেন।

ফেলিসিয়া বুড়া বয়সের তুলালী। দু-তিনটা ছেলেমেয়ে শৈশব অবস্থায় মারা গিয়েছিল—ফেলিসিয়াকে তাঁরা তাই চোখে হারাতেন। এই পাড়াগাঁয়েব মধ্যেও মেয়ের গান-বাজনা লেখাপড়া ঘোড়ায়-চড়া—কোন ব্যবস্থাব ত্রুটি রাখেন নি। বাংলা পড়াবার জন্য আগরহাটি থানার দাবোগাব সুপাবিশক্রমে পীতাম্বর চাটুজ্জেকে নিযুক্ত করলেন। পীতাম্বর পাঠশালার পণ্ডিতি করতেন, বুড়া হয়ে আর পেরে উঠছিলেন না, এমনি সময়ে অভাবিত ভাবে নীলকুঠির কাজটা পেয়ে গেলেন। পণ্ডিতের সহজ সারল্যে টুইডি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন চাটুজ্জে পরিবারের উৎকট ব্রাহ্মণ্য সত্ত্বেও। মেয়েও কতকটা বাপ-মায়ের স্বভাব পেয়েছিল, গ্রামের লোকের সঙ্গে যেচে আলাপ-পরিচয় করত। প্রায়ই সে চাটুজ্জে-বাড়ি বেড়াতে যেত, পীতাম্বরের ছোট মেয়ে দুর্গার সঙ্গে তার বড় ভাব। শাড়ি পরে খালি পায়ে যথাসম্ভব দেশী সাজসজ্জা করে বেরুত সে এই সময়টা। পীতাম্বরের বউ সারদা সাগ্রহে তাকে আহ্বান করতেন। তবু ফেলিসিয়া দালানে উঠত না, উঠানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকত। দুর্গা ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে দু-জনে ঢেঁকিশালে কিংবা পুকুর-ঘাটে গিয়ে গল্প-গুজব করত। ফেলিসিয়া বাংলা বুঝত, বলতেও

শিখেছিল মোটামুটি। এমনি সারদার এত বাছবিচার, কিন্তু ফেলিসিয়ার সম্পর্কে কড়াকড়ি ছিল না। বলতেন, আর-জন্মে ফেলিসিয়া ভাল বামুনের মেয়ে ছিল, কপাল-দোষে ম্লেচ্ছ-ঘরে জন্মালেও আচারে-বিচারে পূর্বজন্মের ছাপ রয়ে গেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ ও নরম তবিবৎ দেখেই তাঁব এই ধারণা জন্মেছিল। কিন্তু লোকে বলাবলি করত, ভাত জুটছে টুইডির দয়ায—তাঁর মেয়েব ম্লেচ্ছদোষ খণ্ডে যাবে, এ আর বেশি কথা কি।

দুর্গা ফেলিসিয়াব চেয়ে তিন বছবের বড। সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে এটি, পীতাম্বব শখ করে কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছেন, শুভঙ্করী এবং সমগ্র পাটিগণিতখানা শেষ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিয়ের কোন উপায় কবা যাচ্ছে না। বড় দু'টিকে অনেক কষ্টে পাব করা গেছে, এখন এইটিতে এসে ঠেকেছে। নৈকষ্যকুলীন বংশ—পালটি ঘব খুঁজে পাত্রস্থ কবা সোজা নয়। সে রকম সঙ্গতি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। এব উপব আব-এক উপসর্গ—মা হয়ে সারদাই অসুবিধা ঘটাচ্ছেন সব চেয়ে বেশি। অতবড মেয়ে আইবুড অবস্থায় ঘুরে বেডাচ্ছে—পীতাম্বরের মুখেব হাসি চোখের ঘুম ঘুচে যাবাব উপক্রম, কিন্তু সাবদা ধনুকভাঙা পণ করে আছেন, যে-সে ঘবে তিনি মেয়ে দিতে দেবেন না।

একটা পাত্র হাতেব কাছে আছে—উত্তবপাড়াব কেশব। কুলশীল গাঁইগোত্র মেলপ্রবর খুঁটিয়ে দেখতে গেলে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হয়তো নয়, কিন্তু একটা বড সুবিধা এই যে মাথাব উপব অভিভাবক না থাকায় টাকা-পয়সা নিয়ে দরদস্তুর হবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে, এবই উপব ভবসা কবে পীতাম্বর আগে তেমন চাড কবেন নি। স্বচ্ছন্দে মেয়ে এত বড হয়েছে। ছেলেবয়সে কেশব তাঁব পাঠশালায় পড়েছে। একটা ক্ষমতা ছিল—সে বিষম মার খেতে পাবত। পীতাম্বর হবদম পিটাতেন। বেতের চোটে কালসিটে পডে গিয়েছিল, নিবিখ কবে দেখলে এত কাল পবেও অস্পষ্ট দাগ মিলতে পাবে। পিঠ কেটে চৌচির হয়ে যেত, তবু দশমিক ভগ্নাংশ কিছুতে তাব মাথায় ঢুকত না। কায়ক্লেশে বছর তিন-চার কাটিযে অবশেষে পীতাম্বরেব দাপটেই পডাশুনায তাকে ইস্তফা দিতে হল।

তবু কেশব সুশীল ছেলে—এত মার খাওয়া সত্ত্বেও পীতাম্বরকে সে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বয়সের সঙ্গে ভক্তি বেড়েছে আরও। নানা কাজকর্মে পীতাম্বরের বাড়ি আসে। সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে পীতাম্বর সুপ্রাচীন দোতলার জীর্ণ ঝুল-বারান্দার প্রান্তে মাদুর পেতে গড়িয়ে পড়েন, ঘরের ভিতর মিটি-মিটি রেড়ির তেলেব দীপ জ্বলে। প্রদীপ উসকে দিয়ে কেশব অভিনিবিষ্ট হয়ে শ্লেটের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্ক কষে। মাঝে মাঝে পীতাম্বরের কাছে জিজ্ঞাস করে নেয়। তন্দ্রার ঘোরে

পীতাম্বর যা-হোক এক রকম জবাব দিয়ে যান। এ নিয়েও কথা উঠেছে পাড়ার মধ্যে।

হেঁ-হে, আসে কি আর পীতাম্বর পণ্ডিতের কাছে?

সারদা বিরক্ত। বলেন, কি জন্য আসে যখন-তখন? মেয়ে বড় হয়েছে, মানা করে দিও।

পীতাম্বর বলেন, দশমিক ভগ্নাংশ বুঝে নিতে আসে। এদ্দিনে মনে ঘেন্না হয়েছে। দুগ্‌গার সঙ্গে দশমিক নিয়ে আলোচনা করে, লক্ষ্য করে দেখেছি।

সারদা বলেন, থাক তো তুমি চোখ বুজে। কি করে দেখ?

পীতাম্বর তিলমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেন, চোখে না দেখি, কান আমার খাড়া থাকে। যা ওরা বলাবলি করে, সমস্ত কেবল পাটীগণিতের কথা।

অবশেষে একদিন মনের অভিপ্রায় সসঙ্কোচে তিনি সারদার কাছে ব্যক্ত করলেন।

কি রকম হয় তা হলে?

সারদা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ওর সঙ্গে? বরং অমি মেয়ের হাত-পা বেঁধে ভদ্রার জলে ফেলে দেব। গাঁজা-গুলি খেয়ে বেড়ায়—ঠাউরেছ চমৎকার!

কেশব গাঁজাগুলি খায়, এর কোন প্রমাণ নেই। তামাকটা অবশ্য খায় খুব। কিন্তু গুরু স্থানীয়দের বিশেষ সমীহ করে, পীতাম্বর বা সারদা এতটুকু বেচাল কোন দিন দেখতে পান নি। বর্ষার সময় একদিন সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি-বাদলা বড় চেপে পড়ল। চাটুজ্জে-বাড়ি থেকে উত্তরপাড়া ক্রোশখানেক হবে। পীতাম্বর প্রস্তাব করলেন, কি হবে বাবা এই ভন্নার মধ্যে বাড়ি গিয়ে? খিচুড়ি খেয়ে বৈঠকখানার ফরাসে আমার পাশে পড়ে থাক। তোর মাকে বল দুগ্‌গা, চাদর পেতে ছোট মশারিটা খাটিয়ে দিতে যেত।

কেশবের ইচ্ছা নয়, পণ্ডিতমশায়ের পাশে ঐ ভাবে টনটনে হয়ে পড়ে থাকা। কিন্তু উপায় নেই তা ছাড়া। অবিশ্রান্ত জল হচ্ছে।

পীতাম্বরে ঘন ঘন তামাক খাওয়া অভ্যাস! গন্ধকের কাঠি আর আগুনের মালসা সাজানো থাকে তাঁর শয্যার পাশে—অনেক রাত্রে উঠে প্রদীপ ধরিয়ে তিনি তামাকে সাজাতে বসলেন। আলো চোখে পড়ে কেশবেরও ঘুম ভেঙেছে। মশারির ভিতর থেকে লোলুপ চোখে দেখছে, পরম আরামে পীতাম্বর মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ধুম উদ্গীরণ করে চলেছেন। দেখে সে আর স্থির থাকতে পারে না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে।

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন, মশা ঢুকেছে নাকি বাবা?

আজ্ঞে না।

বাঁ-হাতের থাবা দিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি আলো নিভিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেশব অনুভব করল, হুঁকো তার গায়ে ঠেকেছে। বিবেচনা আছে পণ্ডিত-মশায়ের। আলো নিভিয়ে ইজ্জত অক্ষুণ্ণ রেখে মশারি উঁচু করে ছাত্রের দিকে হুঁকো এগিয়ে ধরেছেন। কেশবের বড় ইচ্ছা করে, অন্ধকারে তখনই একবার পীতাম্বরের পায়ের ধুলো নেয়।

রাতের মধ্যে আরও তিন-চার বার এই রকম চলল। প্রত্যেক বারই পণ্ডিত মশায়ের প্রসাদী তামাক নির্ঝঞ্ঝাটে মুখের কাছে এসে পৌঁচেছে।

সকালবেলা সারদা বিছানা তুলতে এসে দেখলেন, নূতন মশারির তিন-চার জায়গায় পুড়ে গোলাকার ছিদ্র হয়েছে। আয়েস করে টানতে টানতে জ্বলন্ত টিকের কুচি পড়ে গেছে, ঘুমের ঘোরে কেশব টের পায় নি। পীতাম্বরের উপর তিনি আগুন হয়ে উঠলেন, খবরদার বলছি—কখনো তুমি আস্কারা দেবে না, গেঁজেল ছোঁড়াটাকে। কোন দিন সে যেন আর এ বাড়িমুখো না হয়।

গ্রহ এমনি, একটু পরেই কেশব মুখোমুখি পড়ে গেল। সারদা বললেন, দুর্গা ছোটটি নেই—কেন বাছা তুমি এত আসা-যাওয়া কর? আর এস না —খবরদার।

সারদা বেঁকে বসেছেন, পাহাড় নড়ে তো তাঁকে নাড়ানো যাবে না। অগত্যা কেশবের আশা ছেড়ে দিয়ে পীতাম্বর একদিন মহিষখোলায় সম্বন্ধ দেখতে গেলেন।

নীলখোলায় বড় ভিড়। প্রজারা দরবার করতে এসেছে। ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে কেশবও ঐ দলের মধ্যে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, বিষম গরম। খালি-গা টুইডি সাহেব ডাবের জল খেতে খেতে যে যা বলছে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। বাণ্ডিলের দাম বাড়িয়ে দেবার কথায় আঁতকে উঠলেন তিনি। সর্বনাশ, জাত-ভায়েরা তা হলে একঘরে করবে আমাকে। এমনই কত কি বলাবলি করে! দর বাড়ানো একলা আমার ইচ্ছেয় হবে না। যেখানে যত কুঠি আছে সকলকে নিয়ে টান পড়বে, সকলের মত দরকার।

ব্যাপার তাই বটে। দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। নীল-চাষে রায়তদের বিতৃষ্ণা। কুঠিয়ালেরা কৌশল ও জবরদস্তি করে নীল বুনতে বাধ্য করাচ্ছে, তার ফলে কয়েক জায়গায় দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়ে গেছে। জয়রামপুর এলাকায় কোন গোলযোগ ঘটে নি। পাগলা বলে টুইডির সম্পর্কে প্লাণ্টার-সমাজের অবজ্ঞা আছে, দেশি লোকের সঙ্গে এত মেলামেশা সাহেবরা ভাল চোখে

পীতাম্বর আকাশ থেকে পড়লেন।

হল কি হঠাৎ?

সারদা বললেন, ঐ যদি ছোটভাই হয়, পাত্রের বয়স তবে তো তোমার কাছাকাছি হবে। বুড়োর সঙ্গে দুগ্‌গার বিয়ে দেব না।

পীতাম্বর বোঝাবার চেষ্টা করেন, বড়মানুষ—টাকার আণ্ডিলের উপর বসে রয়েছে, দেদার খাচ্ছে, তাই ঐ রকম মুটিয়ে গিয়েছে। দূর থেকে দেখেছ, বয়সের আন্দাজ করতে পার নি!

সারদা ঘাড় নেড়ে আরও প্রবল কণ্ঠে বলেন, কালোর গুষ্টি ওরা। ভাইকে দেখলাম, খুড়োকেও দেখলাম। হাতির মতো মোটা, হাঁড়ির তলার মতো কালো—মেয়ে আমার ভয়েই মারা পড়বে ওদের বাড়ি গেলে।

ভবতারিণী পীতাম্বরের জ্ঞাতি সম্পর্কীয় বোন—এই বাড়িরই লাগোয়া ভাইপোর সংসারে থাকেন। তিনি এসেছেন। সারদার কথায় তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

এ কি আধিক্যেতা বউ? মেয়ে যতক্ষণ ঘাড়ের উপর, অমন কথা কখনো মুখে আনবি নে, খবরদার! একটু গায়ে-গতরে হবে না তো কি পাকাটির মতো জামাই করতে চাস? রং কালো তো বয়ে গেল—ছেলে কালো আর ধান কালো!

বাড়িসুদ্ধ সবাই বিপক্ষে, প্রাণপণে বোঝাতে চাচ্ছে। তখন সারদা মেয়ে নিয়ে দোতলার কুঠুরিতে খিল এঁটে দিলেন।

পীতাম্বর ব্যাকুল হয়ে দুয়োর ঝাঁকাঝাঁকি করছেন।

কী পাগলামি করছ, ভদ্রলোকেরা কি মনে করবেন বল তো? বিয়ে ওখানে না দিতে চাও, মেয়ে দেখতে দিলে ক্ষতিটা কি?

অনুরোধ ঝগড়াঝাটি—কোন রকমে দরজা খোলানো গেল না? বিষম একগুঁয়ে সারদা—কেউ তাঁকে বাগ মানাতে পারে না। পীতাম্বর তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বৈঠকখানায় এসে বললেন, মেয়ে হঠাৎ কেন জানি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, জল ঢালাঢালি হচ্ছে, কখন সেরে উঠবে ঠিক নেই। নিজ-গুণে মাপ করে নেবেন আপনারা।

ভদ্রলোকদের সামনে ঠাস-ঠাস করে পণ্ডিত নিজের গাল চড়াতে লাগলেন।

নৌকা যাচ্ছে ভাঁটার টানে মন্থরগতিতে। একখানা একেবারে ঘাটের কাছে এসে পড়েছে, ছপ-ছপ করে বোঠে বাইছে—বোঠের জলের ছিটে

লাগল দুর্গার গায়ে। পিছন ফিরে কুটুম্বদের এঁটো-বাসন মাজছিল, রাগ করে সে মুখ ঘোরাল। তখন আর রাগ রইল না, হাসির আভা মুখের উপর। ডিঙির মাথায় কেশব মাঝি হয়ে বসেছে, নীলের ভরা নিয়ে যাচ্ছে।

দশমিক ছেড়ে হাল হাতে নিয়েছ? ঠিক হয়েছে, যাকে যা মানায়!

কেশব হেসে বলে, পণ্ডিতমশায় বরাবর বলতেন, গোবর-পোরা মাথা—চাষার ঘরে জন্মালি নে কেন হতভাগা? গুরুজনের ইচ্ছে—বামুনের ঘরে জন্মেও শেষ পর্যন্ত সেই চাষা হতে হল।

ভ্রূ কুঁচকে দুর্গা বলে, ধরলে কিনা নীলের চাষ!

কেশব বলে, হাঙ্গামা কম, খদ্দেরের জন্য ভাবতে হয় না। দুটো পেট আমাদের—বেশ চলে যায়। দরবার করে ফল হয়েছে, বাণ্ডিলের দর বেড়ে যাবে শুনছি টুইডির চেষ্টায়।

তারপর দুর্গার মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে সহসা জিজ্ঞাসা করল, তুই যে এখানে! ছেড়ে দিল এর মধ্যে?

প্রশ্ন কানে না নিয়ে দুর্গা বলল, নীলখোলায় যাচ্ছ—তা উজান বেয়ে মরছ কেন এদ্দূর উল্‌টো এসে?

কেশব বলে, যাচ্ছি—ধীরেসুস্থে গিয়ে পৌঁছব। এই ক'টি মাল মোটে—সন্ধ্যের মধ্যে গিয়ে ওজন ধরিয়ে দিলেই হল। কাজ চাই তো একটা—কি করি বসে বসে সমস্ত বিকালবেলা! বোঠে বেয়ে বেয়ে হাতের সুখ করে নিচ্ছি।

আবার প্রশ্ন করে, কুটুম্বরা চলে গেছে? সাজগোজ করিস নি, চুল বাঁধিস নি, কপালে সিঁদুরের টিপও দিস নি—

মুখ টিপে হেসে দুর্গা বলে, সাজগোজের দরকার হল না। এমনিতেই পছন্দ করে গেছে।

বলিস কি?

চারিদিক দেখে নিয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুর্গা বলল, তাই তো বলল। খু—উ—ব পছন্দ ওদের।

বকিস নে। দুর্গার মুখের উপর আবার একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে কেশব বলল, কি আছে তোর চেহারায় পছন্দ করবার?

আচ্ছা, দেখতে পাবে এই শ্রাবণে—

আশ্চর্য হয়ে কেশব বলে, আমার মতো গাধা আরও আছে তা হলে দুনিয়ায়?

গাধা নয়, মহিষ। বলতে বলতে দুর্গা হেসে ফেলল। বলে, মা বলছিল, মহিষখোলা থেকে একদল মহিষ নেমন্তন্ন করে এনেছেন বাবা। কালো কুঁদ আর এই মোটা—

মুখভঙ্গি করে দু-হাতে দুর্গা স্থূলত্বের যে পরিমাণ দেখাল, তাতে হো-হো করে হেসে ওঠে কেশব। বলে, তাই—আসবে দেখিস ঐ রকম সব দু-পেয়ে জন্তু-জানোয়ার। এ জন্মে কলাতলায় তোকে যেতে হবে না, এই একটা কথা বলে দিলাম।

আবার বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, মশারি পুড়িয়ে দিয়েছি—ভাল মুখে বললেই হত, একখানার জায়গায় দু-খানা আমি কিনে দিতাম। তা নয়—বাড়ি ঢুকতে মানা হয়ে গেল। মনে বড্ড দাগা দিয়েছেন সত্যি তোর মা।

পরদিন পীতাম্বর কুঠিতে গেলে টুইডি সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে কেমন আছে পণ্ডিত? সামান্য উত্তেজনার কারণ ঘটলে ঐ রকম ফিট হয়ে পড়া ভাল কথা নয়। আমি বরং চিঠি লিখে দিচ্ছি ডাক্তার টমসনের কাছে, মেয়েকে একদিন সদরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনো।

একটু ইতস্তত করে অবশেষে পীতাম্বর সমস্ত খুলে বললেন। দুঃখিত স্বরে বললেন, আমি দেখছি সাহেব, বিয়ে দুর্গার অদৃষ্টে নেই। সর্বাংশে সুন্দর পাত্র আমাদের মতো অবস্থার লোকে কেমন করে যোগাড় করবে?

টুইডি হেসে আকুল। সরল প্রাণখোলা হাসি। বলেন, ফরশা ছেলে না হলে পছন্দ নয় তোমার স্ত্রীর? আমাদের হেলির সঙ্গে হয় তো বল। বরকর্তা হয়ে জাঁকিয়ে বসে একদিন ভালমন্দ খেয়ে আসি। আমার গায়ের রং দেখে নিশ্চয় দুয়োরে খিল এঁটে দেবেন না তোমার স্ত্রী।

একটুখানি থেমে বলেন, সে তো হবার জো নেই। তোমাদের পালটি ঘর নয়—রং পছন্দ হলেও কুলে শীলে মিলবে না যে!

ডেনিস হেলি টুইডির ভাগিনেয় সম্পর্কীয়। ছোকরা মানুষ—ভারি তুখড়, আগরহাটি কনসারনের ম্যানেজার। প্রতি রবিবার সকালবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসে জয়রামপুরের গির্জায় প্রার্থনা করতে। সমস্ত দিন থেকে সন্ধ্যায় ফিরে যায়। মাছ-ধরার শখ আছে, ছিপ নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসে। ফেলিসিয়া উপকরণ যোগাড় করে দেয়, ফাইফরমাশ খাটে, তারপর এক সময়ে ছায়ার মতো বসে পড়ে তার পাশটিতে। চারের মাছ পালিয়ে যাবে সেজন্য কথাবার্তা বলবার উপায় নেই। একবার সজোরে ছিপে টান দিয়ে ব্যর্থতার লজ্জায় হেলি যখন ফেলিসার দিকে তাকাত, ফেলিসিয়া তখনও একটা কথা বলত না, দেখা যেত তার চোখ দুটো হাসছে শুধু। শীতকালের দুপুরে মাছ ধরতে না বসে কখন কখন তারা দু-জনে দুই বন্দুক নিয়ে ভদ্রার কূলে কূলে পাখি শিকার করে বেড়াত। গ্রামের মধ্যে গিয়ে পীতাম্বর পণ্ডিতের হুড়কোর ধারে গিয়ে দাঁড়াত হয়তো কোন দিন। পীতাম্বর সসম্ভ্রমে ডেকে বসাতেন, ভাব

আর খেজুর-চিনি খেতে দিতেন। এমনি করে হেলির সঙ্গেও পীতাম্বর-পরিবারের জানাশোনা হয়েছিল।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এই সময়ে এক বিপর্যয় ঘটল, নিশিকান্ত। ওলাউঠায় ফেলিসিয়া মারা গেল। টুইডি এর পর বেঁচে রইলেন বটে—কিন্তু কাজকর্ম দেখেন না, ঘর থেকে বেরোনই না মোটে। ষাট বৎসর বয়স দেহ এতটুকু বাঁকাতে পারে নি, কুঠিবাড়ির ঐ প্রাচীন দেবদারুগাছটির মতোই বরাবর তিনি খাড়া ছিলেন। দুর্ঘটনার পর সেই মানুষ রাতারাতি অথর্ব বুড়ো হয়ে পড়লেন।

আগরহাটি থেকে হেলিকে নিয়ে এসে টুইডি জয়রামপুরের সদর-কুঠিতে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। আর কিছুদিন পরে এদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি জাহাজে চড়লেন, ছায়াচ্ছন্ন জামরুল-তলায় ভদ্রার কূলে আদরের মেয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা দুটো করে ক্রমশ সকল নীলকুঠির এলাকায় গোলযোগ প্রবল হয়ে উঠল। অশান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে জয়রামপুরেও। টুইডি তাঁর সহৃদয়তার বাঁধ দিয়ে একদিন আন্দোলন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, তিনি চলে যাবার পর হেলির পক্ষে সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠল। বয়স কম হেলির—কিন্তু দোর্দণ্ড প্রতাপ। টুইডির আমলের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে আগাগোড়া উলটে গেছে। কতকটা কোম্পানির ইচ্ছায়, কতকটা হেলির নিজের বুদ্ধিতে। বুড়ো টুইডির যে-কোন ব্যবস্থা ইণ্ডিগো-কোম্পানি চোখ বুজে অনুমোদন করত, হেলির আমলে সেটা আর সম্ভব নয়। প্রজারা হাত পাতলেই আর টাকা পায় না। অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়, নায়েব-গোমস্তার তোয়াজ করতে হয়, বাজে-খরচও করতে হয় প্রচুর। আর দেখা গেল, টুইডি সাহেব যত সদাশয়ই হোন, যাকে যা দিয়েছেন সমস্ত পাকা-খাতায় লেখা রয়েছে, সিকি পয়সার হেরফের হয় নি।

হেলি ক্ষুরমুখি হয়ে বলে, কোম্পানির টাকা দাদন নিয়ে বসে আছে—চালাকি নাকি? না পোষায় টাকাকড়ি শোধ করে জায়গা-জমি ইস্তফা দিয়ে গ্রাম ছেড়ে সব চলে যাক। নিজে-আবাদি চাষ করব, ওদের ভিটের উপর নীল বুনব আমি।

পীতাম্বরের সম্পর্কে অনুগ্রহ পূর্বাবর বজায় আছে। টুইডি কিছু বলে গিয়েছিলেন কিনা কে জানে—হেলি একদিন কুঠির তাইদগিরকে দিয়ে পণ্ডিতকে ডেকে পাঠাল।

দেখতে পাওয়া যায় না পণ্ডিতমশায়কে। কেনই বা আসবেন—যাকে পড়াতে আসতেন, সেই যখন চলে গেল।
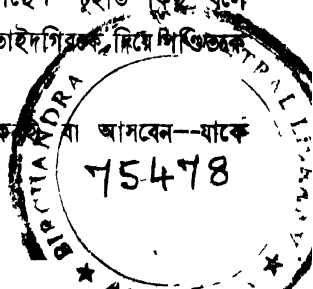
হেলির গলার স্বর ভারি। কি লিখছিল—মিনিটখানেক খস-খস-করে লিখে চলল। তারপর মুখ তুলে পীতাম্বরের দিকে চেয়ে বলল, ফেলিসিয়ার শিক্ষক আপনি। আজকের প্রতিশ্রুতি আমি বর্ণে বর্ণে পালন করব। মেয়ের বিয়ের যোগাড়ে লেগে যান, কোন রকম ভাবনা করবেন না।

পীতাম্বর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে কুঠি থেকে ফিরলেন। এমন সদাশয় আশ্রিত-প্রতিপালকদের বিরুদ্ধে লোকে জোট বাঁধছে! ভদ্রসন্তানরাও নাকি জুটছে পিছনে। একটিকে তো দেখেছেন তিনি—কেশব টুইডির কাছে দরবার করতে এসেছিল সে চাষাভুষোর সঙ্গে। এরাই সব পরামর্শ দেয়, খবরের কাগজে চিঠি ছাপায়। এদের আশকারা পেয়েই তো সাহেবের চোখরাঙানিতে ভয় পায় না আর রায়তেরা। শোনা যাচ্ছে, সদরে অনেক দরখাস্ত পড়েছে কুঠিয়ালদের নামে। কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করবে, আবার জলেও বাস করবে—দুটো একসঙ্গে কি করে চলবে, সে ঐ মন্ত্রণাদাতা বুদ্ধিমন্তর দল জানে।

হেলির কাছ থেকে স্পষ্ট ভরসা পেয়ে পীতাম্বর আবার নব উদ্যমে পাত্র খুঁজতে লাগলেন! নিশ্চেষ্ট কোন দিনই ছিলেন না! এখন সাবদা গত হয়েছেন—যে সম্বন্ধই আসুন, তা নিয়ে খুঁত-খুঁত করবার মানুষ নেই। অনেক দেখে শুনে বড়-আশা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের সংস্থান আছে, এমনি যেমন-তেমন একটা পাত্র জুটলেই কন্যাদায়ের পাথর গলা থেকে নামিয়ে রেহাই পান। কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না। আগে হয় নি সারদার জন্য, এখন যে কার জন্য—কে এমন সজাগ সতর্ক থেকে শত্রুতা সাধছে, সঠিক সেটা ধরা যাচ্ছে না। ধরতে পারলে পীতাম্বর পণ্ডিত তার কাঁচা মুণ্ডু চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন।

প্রায়ই কুটুম্ব আসছে দুর্গাকে দেখতে। এসে খেয়েদেয়ে রকমারি ভদ্রতার কথা বলে চলে যায়। এর জন্য এতদিনে যা খরচপত্র হল, তাতে বোধকরি তিন-চারটে মেয়ে পার হতে পারে। ঘুরে ফিরে কেশবের কথাও উঠেছিল, কিন্তু এখন পীতাম্বরই সভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন। আগরহাটি থানার দারোগা মধুসূদন সরকার—পীতাম্বরের পুরুষানুক্রমিক শিষ্য। বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন তিনি পীতাম্বরকে। কুঠিয়ালদের সঙ্গে মধুসূদনের খুব দহরম-মহরম, কাজের গরজেই পরস্পর খাতির জমেছে। তিনি অনেক গুপ্তকথা প্রকাশ করলেন কেশবের সম্বন্ধে। অত্যন্ত ভয়ানক কথা, লাঠি-সোঁটা ঢাল-শড়কির ব্যাপার। শুনে পীতাম্বর শতহস্ত পিছিয়ে এলেন। সে যাক গে—যে পাতে খাওয়া হবে না, তা কুকুরে চাটুক। মোটের উপর আরও তিন বছরের অবিরত চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও কিছু সুবিধা হচ্ছে না। এক হতে পারে, বয়স বেড়ে যাওয়ার দরুন

দুর্গার চেহারায় লালিত্য নষ্ট হয়েছে। অন্য কারণও আছে বলে পীতাম্বরের প্রবল সন্দেহ। কিন্তু সেটার ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যাচ্ছে না কোন রকমে।

দুধপুকুরের রায়-বাড়িতে কথাবার্তা চলছে। ঘনশ্যাম রায় মেয়ে দেখতে রওনা হবেন, এমনি সময় উড়োচিঠি এসে উপস্থিত। অচেনা কে-একজন হাটুরে মানুষের হাতে এই চিঠি দিয়ে রায়বাড়ি পৌঁছে দিতে বলেছে। লিখেছে —ভাল মেয়ে নয়। কুঠির সাহেব অঢেল টাকা খরচ করতে রাজি এই মেয়ের বিয়েয়—তবু যে বিয়ে হচ্ছে না, ভিতরে 'কিন্তু' আছে বলেই।

চিঠিটা হাতে করে ঘনশ্যাম স্ত্রীর কাছে এলেন।

কাণ্ড দেখ। কত রকমের শত্রুতা মানুষ যে করে।

গিন্নি বললেন, সত্যিও তো হতে পারে? আমাদের অত কি মাথাব্যথা—মেয়ের কিছু মন্বন্তর হয় নি। বেরুচ্ছ—বেশ তো, ওখানে না গিয়ে কাশিমপুরে পাকাপাকি করে এসোগে।

দিন চার-পাঁচের মধ্যেও ঘনশ্যামের সাড়াশব্দ মিলল না, তখন পীতাম্বর নিজে চলে এলেন ভাইপো সুখময়কে সঙ্গে নিয়ে।

খবর কি রায়মশায়?

বড় লজ্জিত আছি ভায়া। কাশিমপুরের ওঁরা এসে পড়েছিলেন। আর গিন্নিরও একান্ত ইচ্ছে—ওঁর মামার বাড়ির সম্বন্ধের মধ্যে পড়ে যায় কিনা! ঐখানে দিনক্ষণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

রাস্তায় এসে পীতাম্বর বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

ছোটলোক—পাজির পা-ঝাড়া। বাঁদর নাচাচ্ছে যেন বেটারা আমায় নিয়ে এই তিন বচ্ছর। বুড়োমানুষ বলে দয়ামায়া নেই। কথাবার্তা ঠিকঠাক—তার মধ্যে কাশিমপুর হঠাৎ এসে পড়ল কি করে?

সুখময় একটু ভেবে বলে, কেউ ভাংচি দিয়েছে কিনা দেখুন।

হুঁ—আমিও ছাড়ছি নে। চল থানায়।

সুখময় বিস্মিত হয়ে বলে, থানায় কি হবে?

মধুসূদনের কাছে—

সুখময় বলে, এই দেখুন—মশা মারতে কামান দাগা বলে একে। দারোগা-পুলিস না করে গাঁয়ের দশজনের সামনে আচ্ছা করে দুটো দাবড়ি দিয়ে দিন যার উপর আপনার সন্দেহ হয়।

সন্দেহ কাকে করি, কেউ আমার শত্রু নয়—

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর অশ্রুতে ভিজে ওঠে। বললেন, কারো কোন ক্ষতি করি নি জীবনে—কেন যে লোকে পিছনে লাগে! থানায় যাচ্ছি বাবা এজাহার

দিতে নয়। মরে গেলেও ওসব তালে যাব না। খুব এক ভাল সম্বন্ধ—কাল মধুসূদন খবর দিয়ে পাঠিয়েছে।

সম্বন্ধ আগরহাটি কনসারনের নায়েব পশুপতি চক্রবর্তীর সঙ্গে। পদবী নায়েব বটে, আসলে ম্যানেজার সে-ই। বুদ্ধিমান কর্মঠ যুবা, হেলির অত্যন্ত প্রিয়। জয়রামপুরে চলে আসবার সময় হেলি তারই উপর ওখানকার ভার দিয়ে এসেছে। ইণ্ডিগো-কোম্পানির ডিরেক্টররা এখনো ইতস্তত করছেন দেশি লোককে পুরোপুরি ম্যানেজারের পদে বসাতে। সেইজন্য নায়েব নামে সে বহাল হয়েছে। কিন্তু দিন দিন অবস্থা যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে সাহেবরা এ-ও ভাবছেন অতঃপর নিজেরা পিছনে থেকে দেশি লোকদের কর্তা করে সামনে বসাবেন কি না। গণ্ডগোল বাধে তো ওরা নিজের মাথা ফাটাফাটি করে মরবে, কুঠিয়ালের গায়ে আঁচড় পড়বে না। এই রকম নানা বিবেচনায় হেলির জায়গায় নূতন কাউকে আনা হয় নি, পশুপতিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নিখুঁত ভাবে চালাচ্ছে —হেলির চেয়ে ভাল বই মন্দ নয়।

সাহেবসুবোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পশুপতির চেহারাও খুলেছে প্রায় তাদের মতো। সুখময়ের তো চোখে পলক পড়ে না। বলে, আর ঘোরাঘুরি নয় খুড়োমশায়, এইখানেই লাগাতে হবে। জোর কপাল দুর্গার, এদ্দিন তাই তার বিয়ে হয়ে যায় নি। লাখে একটা মেলে না এমন পাত্র।

রূপ ও স্বাস্থ্য শুধু নয়—বিদ্যাও অগাধ। সাহেবদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে অনর্গল ইংরেজি বলে যেতে পারে। মধুসূদন দারোগা শতকণ্ঠে সেই সব গল্প করতে লাগলেন। বললেন, ওদের বাসায় চলুন ঠাকুরমশায়, জুত করে আলাপ-সালাপ করবেন। তখন বুঝবেন, বাড়িয়ে বলেছি কিনা আমি। বুদ্ধির আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখ-মুখ দিয়ে। আপনাকে কষ্ট দিয়ে এতদূর কি অমনি অমনি নিয়ে এলাম।

বাসায় গিয়ে চাক্ষুষ পরিচয়ের পর পীতাম্বর কোন ক্রমে আর ভরসা রাখতে পারেন না। সুখময়কে বলেন, কত হেঁকে বসবে তার ঠিক কি! হেলি সাহায্য করবে বলেছে—কিন্তু আমি তো আকাশের চাঁদ ধরে দিতে বলতে পারি নে তাকে। তোর সমবয়সি আছে—হাসি-মস্করার ভিতর দিয়ে দেখ দিকি ছোকরাকে একটুখানি বাজিয়ে।

পশুপতির সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে তিনি বাইরে গিয়ে বসলেন। বসে স্থির থাকতে পারেন না, চোখ ইসারায় সুখময়কে ডেকে আবার বলে দিলেন, চেষ্টা করে দেখ তুই। না হয় ঘরবাড়ি জায়গা-জমি যা কিছু আছে, বিক্রি করে দেব। দুর্গার বিয়ে হয়ে গেলে আর আমার দায়টা কিসের? এমন ছেলের জন্য দু-পাঁচ-শ বেশি যদি যায়, সে টাকা জলে পড়বে না।

ঘরের ভিতর সুখময় পশুপতির সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। পীতাম্বর বারাণ্ডায় বসে স্বভাবের শোভা দেখছেন, আর উৎকর্ণ হয়ে আছেন ওদের প্রতিটি কথা শোনবার জন্য।

সুখময় পশুপতির হাত জড়িয়ে ধরল। পশুপতি রাঙা হয়ে ওঠে।

ছিঃ-ছিঃ! অমন করে বলছেন কেন? এক সময় টোল ছিল আমাদের দেশের বাড়িতে, আমার বড়-ঠাকুরদা সারাজীবন টোলে পড়িয়ে গেছেন, শিক্ষা-ব্রতীর সম্মান আমরা জানি। বড়লোকের বাবু-মেয়ের চেয়ে শিক্ষকের হাতে-গড়া মেয়ে সংসারে বেশ সুখশান্তি আনবে। বুঝিয়ে বলতে হবে না আমায় কিছু।

মেয়ের রং একটু চাপা শুনে পশুপতি জবাব দিল, আহা সোজাসুজি বলুন না কেন—কালো মেয়ে। তাতে সঙ্কোচের কি আছে? কালো মেয়ের বিয়ে হবে না—পড়ে থাকে নাকি? আমার মতো রাঙা-মুলোগুলোই বুঝি কেবল মানুষ—রং ময়লা হলে মানুষ বলবেন না তাদের? দারোগাবাবুর কাছে সমস্ত শুনেছি—আমায় কিছু বলতে হবে না। মাকে আপনারা ভাল করে বলুন। তা হলে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

তারপর খুড়ো-ভাইপোয় আবার যুক্তি-পরামর্শ হল। সুখময় এদিক-ওদিক তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, আমার মনে হচ্ছে খুড়ো মশায়, হেলির টিপ রয়েছে পিছনে। মধু-দারোগাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন তো। নইলে একেবারে গঙ্গাজল—কথা না পড়তে হাঁ-হাঁ করে উঠছে—পিছনের চাপাচাপি না থাকলে এমনটা হয় না।

পীতাম্বর অতিমাত্রায় চটে উঠলেন।

তোদের পাপ-মন—সব জিনিসের পিছনে উদ্দেশ্য খুঁজিস।

পশুপতির মা'র কাছে গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে তিনি একেবারে বেহান বলে ডেকে বসলেন। বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা—তবু ঠিক সামনে এলেন না, কপাটের অড়াল থেকে কথাবার্তা চলতে লাগল। পীতাম্বর বললেন, মেয়েটার মা নেই, মেয়ে বলে আপনাকে নিতেই হবে বেহান ঠাকরুন—

হেসে রসিকতার ভাবে আবার বললেন, পাদপদ্মে এনে রেখে যাব। কেমন তুলে না নেন দেখব।

বেহান কিন্তু ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হলেন না, সকল রকম খবর নিলেন। নীলকুঠির সঙ্গে পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন। শুনে একটুখানি কি ভাবলেন। বললেন মেয়ের জন্য আটকাবে না। পশুপতি আমার

ফরশা আছে, ছেলেপিলে হতকুচ্ছিৎ হবে না। গহনা-বরশয্যাও যা আপনার সাধ্যে কুলোয় দেবেন—

আনন্দে পীতাম্বরের বাকরোধ হয়ে আসছে। সত্যযুগের মানুষদের সামনে এসে পড়েছেন নাকি দৈবাৎ?

একটুখানি কিন্তু গোলযোগ আছে পণ্ডিতমশায়, আগে ভাগে খুলে বলা উচিত। আমরা শ্রোত্রিয়, আপনার কুল ভেঙে যাবে। রাজি আছেন? সাত পাক ঘুরে গেলে চৌদ্দ পাকেও আর তা খুলবে না। ভাল করে ভেবে-চিন্তে দেখুন বাড়ি গিয়ে। আমাদেরও তো শুধু দারোগাবাবুর মুখে শোনা—আর কিছু খবরাখবর নিই।

প্রচুর আদর-আপ্যায়ন হল। গুরুভোজনের পর বিছানায় গড়াতে গড়াতে সুখময় বলল, কি ঠিক করলেন খুড়োমশায়?

তাই ভাবছি বাবা।

আর যা ভাবুন, কিন্তু ছেলে নেই—কুলের ভাবনা ভাবতে যাবেন কার জন্য? মেয়ে ভাল থাকবে, তা হলেই হল। এমন পাত্র কদাচ হাতছাড়া হতে দেবেন না।

বটেই তো! বলে পীতাম্বর চুপ করলেন। আবার বললেন, বুঝলি সুখময়, বাড়ি গিয়ে বউমাকে লাগাতে হবে, তিনি যেন দুগ্‌গার সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা বলেন। মেয়ে সেয়ানা হয়েছে—তার ইচ্ছেটাও শোনা উচিত। বিয়ে নিয়ে ওর মায়ের খুঁতখুঁতানি ছিল। সে নেই—এখন একলা আমি ঝাঁ করে কিছু করে বসতে ভরসা পাই নে। বউমাকে বলবি, বেশ কায়দা করে যেন জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

যাবার মুখে ঝি আর-এক দফা পান এনে দিল। ঘরের ভিতর থেকে পশুপতির মা বললেন, মা-লক্ষ্মীকে এইখানে এনে দেখিয়ে যেতে হবে। মেয়েমানুষ আমি—আপনাদের ওখানে যেতে পারব না তো!

পীতাম্বর বিরক্ত হলেন এ প্রস্তাবে। তবু মেয়ের বাবা। হাসিমুখে মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, মা-লক্ষ্মীও তো মেয়ে বেহানঠাকরুন। এদ্দুর তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসা কি ঠিক হবে?

পশুপতির মা দৃঢ়কণ্ঠে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করলেন, মেয়ে চোখে না দেখা পর্যন্ত পাকা-কথা দেওয়া যাচ্ছে না। মাঘ মাসে কাজ করতে চান তো দু-দশ দিনের মধ্যে মেয়ে-দেখানোর ব্যবস্থা করুন।

সুখময় বকবক করে পাত্রের গুণপনা এবং পাত্রপক্ষের আপ্যায়নের প্রশংসা করছে, পীতাম্বর চুপচাপ আগে আগে চলেছেন। বরাবর সদররাস্তা ধরে যাবার

কথা—তা নয় ডাইনে বেঁকে নদীর ঘাটে এসে তিনি মাঝির সঙ্গে দরদস্তুর করতে লাগলেন।

সুখময় বলে, আবার কোথা ?

চিনেটোলায় একটা খবর আছে।

এটার কি হল ?

নিরাসক্তভাবে পীতাম্বর বললেন, এটা তো রয়েছেই—

সুখময় বিরক্ত হয়ে বলে, একনাগাড় পাত্র ঠিক করে বেড়াচ্ছেন—মেয়ে সাকুল্যে একটা।

পীতাম্বর বললেন, আজ অবধি যত পাত্র দেখেছি—একুন করলে দেড় কুড়ি পৌনে-দু'কুড়ি পৌঁছয়। ক'টা তার মধ্যে গেঁথেছে বল দিকি বাবা ? পোড়া অদৃষ্টে শেষ অবধি সমস্ত ফসকে যায়। সাধ করে কি এদেশ-ওদেশ ঘোড়দৌড় করে মরি ?

একটু থেমে আবার বললেন, শ্রোত্রিয়ের ঘরে না-হয় কাজ করলাম, কিন্তু আবদার শুনলে তো, মেয়ে তুলে এনে ওঁদের দেখিয়ে যেতে হবে। দুগ্‌গাও তার মায়ের মতো—শুনে যদি একবার বেঁকে বসে, খুন করে ফেললেও এক পা নড়ানো যাবে না। মুশকিল আমার সকল দিকে।

চিনেটোলায় পৌঁছতে রাত্রি হয়ে গেল। পাত্রের বাপের তালুক আছে, সাতশ' সাতান্ন টাকা সেস দেয়। বাড়ি-ঘরদোরও ভাল। কিন্তু ছেলে কাজকর্ম কিছু করে না। একেবারে কিছু করে না, তা নয়—তবলা বাজায়, আর এক টাট্টু ঘোড়া আছে, তার খেদমত করে। ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায় এগ্রাম-সেগ্রাম।

পীতাম্বর সুখময়কে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন বে ?

ভালই তো মনে হয়—

যা দেখিস, সবই তোর কাছে ভাল। শুনলি তো, ছেলে কিছু করে না—

সুখময় বলে, করে বই কি ! ঘোড়া ছুটায়, তবলায় তেহাই দেয়। আর কিছু করতে যাবে কোন দুঃখে ? আমাদের বাপের তালুক থাকলে আমরাও করতাম না ওর বেশি কিছু।

পীতাম্বর তবু ইতস্তত করছেন দেখে বলল, চোখ বুঁজে পাকা-কথা ফেলে বাড়ি চলুন। এরাও কিছু কম যায় না—মেয়ে দেখে পছন্দ করলে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দেবেন। বেশি খুঁতখুঁত করেই তো মুশকিল বাধাচ্ছেন। বেশি যে বাছে, তার শাকে পোকা বেরোয়।

দু-দু জায়গায় কথাবার্তা বলে অনেকটা সুস্থির হয়ে পীতাম্বর বাড়ি ফিরলেন। সুখময়কে পই-পই করে সামাল করে দেন, কোন রকম উচ্চবাচ্য না হয় এ নিয়ে।

চিনেটোলায় কুটুম্বরা আসছেন, বিশেষ রকম হাট-বাজার করবার দরকার। সন্ধ্যার পর হাট যে সময় ভাঙো-ভাঙো, পাড়ার সকলের চোখ বাঁচিয়ে খুড়ো-ভাইপো চুপিচুপি হাটে চললেন।

কুটুম্বরা দু-জন আসছেন। অন্ধকারে পথের আন্দাজ পাচ্ছেন না—ডেকে সাড়া নিচ্ছেন, পীতাম্বর চাটুজ্জে মশায়ের বাড়িটা কোন দিকে?

কাঁঠালতলার দিকে থেকে দ্রুতপদে একজন চলে এল। খাতির করে বলে, পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি যাবেন? চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

যেতে যেতে বলে, মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন বুঝি? তা এদ্দূর এসেছেন যখন দেখে যাবেন বই কি! নিশ্চয় দেখবেন।

পাত্রের বাপ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন? কেন?

গ্রামের কুমারী মেয়ে—বলা আমার উচিত হবে না। পণ্ডিতমশায় আহ্বান করে এনেছেন, ধরতে গেলে গ্রামেরই অতিথি আপনারা।

বউ করে ঘরে তুলতে যাচ্ছি, খবরাখবর জানব না? বলতেই হবে মশায়।

অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে লোকটি বলল, মেয়ের গায়ে শ্বেতি আছে। তা আবার আপনারা দেখতেও পাবেন না, হাঁটুর উপরটায় কিনা। গ্রামের মেয়ে বলে ছোটবেলা থেকে আমরা জানি। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া?

প্রবীণ ভদ্রলোকটি এবারে তার হাত জড়িয়ে ধরলেন। থামবেন না মশায়, সমস্ত খুলে বলতে হবে।

শেষ পর্যন্ত বলতেই হল। দুর্গার মাখামাখি আছে গ্রামের কেশব নামক এক ছোকরার সঙ্গে।

শুনে ভদ্রলোকেরা থমকে দাঁড়ালেন। লাল-ভেরেণ্ডার বেড়ায় ঘেরা বাড়ি সামনে। লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, চলে যান—ঐ যে আলো জ্বলছে।

চলেই যাব। অনেক ঘুর-পথে এসেছি। পাথরঘাটা পৌঁছবার সোজা রাস্তাটা দেখিয়ে দেন যদি দয়া করে—

সে কি, রাত্তিরবেলা যাবেন কোথা? গ্রামের অপমান যে তা হলে। পণ্ডিতমশায়ের মনে কি রকমটা হবে, ভাবুন দিকি?

খুড়ো-ভাইপো ঠিক সেই সময়টা হাটবেসাতি করে ফিরছেন।

কারা?

ভদ্রলোকেরা উত্তর দিলেন, বিদেশি মানুষ। পাথরঘাটায় যাব, আমাদের পানসি আছে সেখানে।

পীতাম্বর কাছে এসে দেখে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন। আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়। ওরে সুখময়, দৌড়ে আলো এনে হুড়কোর কাছে ধর্—

মাপ করবেন। এই জোয়ারে ফিরে যেতে হবে।

স্তম্ভিত পীতম্বর প্রশ্ন করলেন, কেন? করজোড় তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ালেন। দোষটা কি হয়েছে বলে যেতে হবে।

জোচ্চুরি করে শ্বেতিওয়ালা মেয়ে গছার্তে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু পাত্রের বাপ প্রবীণ ভদ্রলোকটি ধমক দিয়ে মুখফোঁড় সহগামীর কথা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, কিছু নয় চাটুজ্জেমশায়। কুমারী মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলে আমরা কি জন্য নিমিত্তের ভাগী হতে যাব? আপনাদের গ্রামের লোক উনিই বললেন—

পিছন ফিরে দেখলেন, লোকটি ইতিমধ্যে সরে পড়েছে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। রাত দুপুরেব মতো নির্জন নিস্তব্ধ গ্রাম। কেশব সেই সময় চাষা-পাড়া থেকে বাড়ি ফিরল। পুকুর-ঘাটে খেজুর-গুড়িতে পা ঘষে ঘষে কাদা ধুল। উঠানে এসে হাঁক পাড়ল, পিশিমা—

দূর-সম্পর্কীয় এক পিশি তার বাড়ি থাকেন। তিনি রাঁধাবাড়া করে দেন। তেলের ভাঁড় নিয়ে পিশি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। কেশব বলে. ভাত বেড়ে ফেল পিশিমা।

খানিকটা তেল মাথায় থাবড়ে গামছা ও খড়মজোড়া নিয়ে আবার পুকুরে গেল। গোটা কয়েক ডুব দিয়ে গা মুছে গামছা পরে পরনের কাপড়টা কেচে নিয়ে খড়ম পায়ে দিতে যাচ্ছে, দুর্গা কোন্ দিক দিয়ে ঝড়ের মতো এসে পায়ের আঘাতে খড়ম একগাছা ছুঁড়ে দিল ঘাটের দিকে।

কেশব মুহূর্তকাল স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকে।

খড়ম ফেললে কেন?

মারা উচিত ছিল। সেটা যে পেরে উঠলাম না।

বলতে বলতে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল দুর্গার কপাল বেয়ে। কেশবের যে রাগ হয়েছিল তা ঐ সঙ্গে জল হয়ে গেল।

ব্যাপার কি?

জান না?

আয়ত চোখের স্থির দৃষ্টিতে দুর্গা তার দিকে তাকাল। কেশব চঞ্চল হয়ে ওঠে, দৃষ্টি যেন দগ্ধ করছে তাকে।

আমি জানি। তাই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিতে এসেছি, ওসব করে লাভ কিছু হবে না।

কেশবের কণ্ঠস্বর সহসা কাতর হয়ে উঠল।

কিসে লাভ হবে, সেটাও বলে যাও তা হলে।

এ জন্মে হবে না। শত্রুতায় হবে না, কেঁদে-ককিয়েও হবে না। মিথ্যুক-শঠ কোথাকার! ঘেন্না করি তোমাকে। বাবাকে এখনো বলিনি, বললে তোমায় খুন করে ফেলবেন।

এত গালিগালাজ কেশবের কানেই যাচ্ছে না যেন। বরঞ্চ হাসির আভা মুখে। বলে, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। কে মিথ্যে করে আমার নামে কি বলেছে।

কেউ বলে নি, জানবে কে? সাক্ষি রেখে করবার মতো কাঁচা লোক কি তুমি?

কেশব হেসে বলে, সেইটে মনে রেখো—কাঁচা লোক আমি নই। যা করছি আব যা করব, একজনও তার সাক্ষি থাকবে না।

কেমন এক রহস্যপূর্ণ ভাবে কেশব তাকায়। এ দৃষ্টি আজকালই তার চোখে দেখতে পাচ্ছে। দুর্গা দু'টি চোখের স্বচ্ছ আয়নায় চিরদিনের চেনা গুড়ুকখোর নিরেট-মস্তিষ্ক কেশবের নূতন মূর্তি দেখে।

সারা অঞ্চলে গোলমাল। নীলচাষেব ভয়ে চাষীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। পাগলা টুইডির জয়বামপুর—এ গ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। পালাবার নাম কেউ মুখে আনে না এখানে। ইণ্ডিগো-কোম্পানি গ্রামের পত্তনিদার—তার উপর টুইডি যাকে যা দিয়েছিলেন, দীর্ঘকাল পরে হেলির আমলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসমেত সমস্ত টাকার সুখত দিতে হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও কালবৈশাখীর ঝড়ে এবার যখন চালের পচা ছাউনি উড়ে গেল, আর হুঁশ হল—খোরাকি ধান আউড়ির তলায় এসে ঠেকেছে, নির্লজ্জ চাষীরা তখন আবার দলে দলে নীলকুঠিতে গিয়ে হাত পাততে লাগল। হেলি বিমুখ করল না কাউকে—নীলের জন্য দাদন নিচ্ছে, এই মর্মে চুক্তিপত্র লিখিয়ে আবার টাকা দিল। পাঁচ আনা মন হিসাবে দাম কেটে নিয়ে পরিমাণ-মতো নীলের বীজও দিয়ে দিল ঐ সঙ্গে। সদরে প্লাণ্টার্স ক্লাবে হেলি দেমাক করে বলে এল, আর যেখানে যা-ই হোক, তার এলাকায় চাষ অনেক বেশি হবে অন্যান্য বৎসরের তুলনায়। সত্যই চাষ ভাল এবার—গোণ পেয়ে চাষীরা বিষম খাটছে। হেলি মাঝে মাঝে মাঠে গিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাষ দেখে।

চাষ হল, বীজ ছড়াল, অঙ্কুরোদ্গম হল—আরে আরে, কি সর্বনাশ! নীল তো নয়, আউশধন।

গেঁয়ো চাষীর এত সাহস? হেলি হেন ব্যক্তিকে ডাহা বেকুব বানিয়ে

দিল! ক্লাবে মুখ দেখানোর উপায় রইল না। অন্যের দুর্দশায় আনন্দ করবার মতো মনের সুখ এখন কোন কুঠিয়ালের নেই। হেলির কিন্তু নিশ্চিত ধারণা, অন্য কনসারনের লোকেরা মুখ টিপে হাসে তাকে দেখলে। যত ভাবে, ততই সে ক্ষেপে যায়। কুঠির লোক দিয়ে একদিন ধানবনে হৈ-হল্লা করে লাঙল দেওয়াল। কচি ধান-চারা ফলার মুখে উপড়ে নিশ্চিহ্ন হল জলে-কাদায়। কিন্তু এলাকা জুড়ে এই চালাকি করছে, কাঁহাতক লাঙল চষে চষে জমি ভেঙে বেড়ানো যায়? ক'টাকে কয়েদখানায় পুরবে, লাঠি দিয়ে ঠেঙাবে? তাতে তো নীলের চারা গজাবে না ক্ষেতে। মরশুমটা পুরোপুরি বরবাদ হয়ে গেল।

প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে দেখা গেল উলটো-উৎপত্তি ঘটছে। সাহেবের সামনে দৈবাৎ এসে পড়লে আগে যারা থরহরি কাঁপত, তারাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, মুই নীল বুনব না। ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, এতে তবু ইজ্জত বজায় থাকে —কিন্তু ভয় ভেঙে যারা মরীয়া হয়েছে তাদের নিয়ে উপায় কি এখন?

মধুসূদন পীতাম্বরকে বলেছিলেন, ভদ্রঘরের মাথাওয়ালা কুলাঙ্গার কতকগুলো দলে জুটেছে পিছন থেকে তারা উসকে দেয়। নইলে ওদের ক্ষমতা কতটুকু —দু-দিনের ভিতর ঠাণ্ডা করে দেওয়া যেত।

দুর্গা শুনেছে সমস্ত। মাথাওয়ালা দলের ভিতর কেশবেরও নাম বেরিয়েছে, এর চেয়ে হাস্যকর কি আছে? কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি সে। কিন্তু আজকে কেশবের সঙ্গে কথাবার্তায় সহসা তার মনে হল, বাজে গুজব বলে কোন খবর উড়িয়ে দেবার নয় এ সময়ে; কেমন যেন ভয় হতে লাগল কেশবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে।

কেশব হাসতে হাসতে বলল, গ্রামের মেয়ে—তার উপর পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে—যার তার হাতে পড়ে কষ্ট না পাও, সেইজন্য আঁকুপাঁকু করি। নইলে আমার কি যায় আসে বল।

কিচ্ছু আসে যায় না তোমার?

না, কিচ্ছু নয়। পণ্ডিত মশায় সোজা মানুষ—যে সম্বন্ধটা আসে, তাতেই নেচে ওঠেন। ভাবেন, এমন পাত্র ভূ-ভারতে নেই।

দুর্গা বলল, সুপাত্র তুমি একলা-ই ভূ-ভারতে?

ম্লান হেসে কেশব বলে, আমার কথা আর কেন? আমি তো সকল বিবেচনার বাইরে। কথা দিচ্ছি দুর্গা, ভাল ছেলে আসুক—সময়ে যদি কুলোয় নিজে আমি বরের চারদিকে কনের পিঁড়ি ঘোরাব।

সময়ে যদি কুলোয়—বড় ব্যস্ত আজকাল তুমি বুঝি?

এ প্রশ্ন কানে না নিয়ে কেশব বলতে লাগল, চিনেটোলার ছোঁড়াটাকে

জানি। এক নম্বর হতচ্ছাড়া। সকল রকম নেশা করে। ভেগে গিয়ে থাকে তো ভালই হয়েছে। তার জন্য দুঃখ পাওয়া কিংবা আমাকে ঘেন্না করার কোন কারণ নেই।

কিন্তু সত্যি সত্যি একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে। আগরহাটি যাচ্ছি, বাবা আর আমি। অমন পাত্র তপস্যা করে মেলে না—সুখময়-দা ব্যাখ্যান করছিলেন।

কেশব সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে।

দুর্গা বলতে লাগল, যাচ্ছি—যদি দয়া করে পছন্দ করেন। দিন আষ্টেক আজ মুখে বেসম আর সর ঘষছি, খুব ঘষামাজা করছি—কালোর উপর যদি একটু চিকন আভা খোলে। পাত্রের কুলমর্যাদা নেই—সুখময়-দা'র বউকে দিয়ে সেই সম্বন্ধে বাবা আমার মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। আমি খুশি মনে মত দিয়েছি।

কেশব জিজ্ঞাসা করে, আগবহাটিব পাত্র—কে বল দিকি?

পশুপতি চক্রবর্তী। নিশ্চয় চেন তুমি। তোমাব যা কাজ, একে না চিনে উপায় নেই।

গম্ভীর কণ্ঠে কেশব বলে, চিনেছি। কুলমর্যাদা কেন কোন মর্যাদাই নেই তার। ওব চেয়ে চিনেটোলার পাত্র ভাল। নেশা করে কবে একদিন সে নিজে মববে, কিন্তু পশুপতির মতো দেশসুদ্ধকে মেরে যাবে না।

দুর্গা সভয়ে বলে, আবার তুমি বাগড়া দেবে নাকি? খববদার!

কেশব বলে, কুঠিবাড়িব পাকা-দালানে উঠবার সত্যি সাধ হয়েছে? তাই হোক—একটা কথাও আমি বলতে যাচ্ছি নে। কি দবকার? ক'দিন পরে কোন পাত্তাই হয় তো পাবে না আব আমাব।

কোথায় যাবে?

কেশব হেসে উঠল।

কুঠির নায়েবের বউ হচ্ছ—কেন তোমায় সাক্ষি রাখতে যাব?

খড়ম কুড়িয়ে পায়ে পরে ধীরে ধীরে সে রান্নাঘরের দিকে চলল।

তার পরেও দুর্গা অনেকক্ষণ এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাগ হচ্ছে, হিংসা হচ্ছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে কেশব চিরদিনই নিচে। কত লোকে তাকে ঠাট্টা-তামাসা করেছে দুর্গার সঙ্গে তুলনা দিয়ে। আজকে কেশব তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। অনেক উপরে—নাগালের বাইরে যাচ্ছে ক্রমশ। কথা বলে আজকাল উঁচু ঢঙে, যেন কত দূরের মানুষ!

শেষ রাত্রে পীতাম্বর গরুর গাড়ি নিয়ে এলেন। এসে রুখে উঠলেন মেয়ের উপর।

পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস এখনো—ঘুম আসে এ অবস্থায় ?

জেগে আছি।

চুপচাপ পড়ে আছিস তবে কোন আক্কেলে ? পায়ে মল পরেছিস কই ? খোঁপা কই ?

তিন-চার দিন ধরে কথাবার্তা হচ্ছে, এই প্রথম দুর্গা আপত্তি করল। ক্রন্দনোচ্ছল কণ্ঠে বলে, আমি যাব না বাবা।

পীতাম্বর ক্ষেপে উঠে বলেন, যাবি নে কিরে ? সবে তো শুরু—গাঁয়ে গাঁয়ে তোকে ফিরি করে নিয়ে বেড়াব। ভেবেছিস কি ?

গাড়ির চালার উপর বসে পীতাম্বর গজর-গজর করতে লাগলেন, অপমানজ্ঞান তোরই আছে, মন বলে আমার কোন পদার্থ নেই ? এক কাজ করিস, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিস একদিন। তখন আর কিছু বলব না, কোথাও নিয়ে যেতে চাইব না।

আকাশে শুকতারা দপদপ করছে, সেই সময় তারা রওনা হল। সমস্ত গ্রাম অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কেশবের নিস্তব্ধ বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় গভীর নিশ্বাস ফেলল দুর্গা। কোথায় চলে যাবে সে আর ক'দিন পরে! সত্যিকার আপন জন কেউ থাকলে যাবার কথা বলতে পারত কি অমন করে ? যেতে কি দিত তারা ?

বাসায় একলা পশুপতির মা। আজ তিনি সামনে বেরিয়ে এলেন।

এই মেয়ে ?

তারপর অন্ধকার মুখে তিনি আহ্বান করলেন, এস বাছা। ওরে, বাইরের ঘরটা খুলে বসতে দে এঁদের।

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন, বাবাজী ?

বেরিয়ে গেছে। বড্ড গোলমাল।

থানার জমাদার ঐ-দিক দিয়ে ব্যস্ত ভাবে ছুটে যাচ্ছিল। পশুপতির মা ডাকলেন।

বড্ড যে ঢাকের বাজনা। অনেকক্ষণ ধরে বাজছে। পরব-টরব নাকি, নটবর ?

নটবর এই পাড়ারই—অবসর-মতো এঁদের ফাইফরমাশ খেটে কিছু রোজগারও করে। কাছে এসে নিম্নকণ্ঠে সে বলল, ঢাক-বাড়ি করেছে মা, রসকে-মুচির গোয়াল ঘরে। রাজ্যের ঢাকঢোল এনে জড় করেছে। কুঠির পাইক-বরকন্দাজ বেরুলে ঢাকে কাঠি পড়ে, গাঁয়ের মানুষ সামাল হয়ে যায়।

থামছে না তো মোটে! ভোরবেলা থেকে ড্যাডাং-ড্যাডাং বেজে চলেছে।

নটবর বলে, বিষম কাণ্ড আজকে। দল বেঁধে যত চাষী ঢাল-শড়কি নিয়ে

রসকের উঠোনে নাচছে ঢাকের তালে তালে। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যা সমস্ত বলছে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে পশুপতির মা বললেন, সর্বনাশ! পশুপতি আমার খানিক আগে বেরিয়ে গেল যে!

বেরুতে পারেন নি। থানা অবধি গিয়ে আটকে গেছেন। নেচেকুঁদে ওরা বাড়ি ফিরে যাবে, করবে কচু। ভয় নেই মা, সদর থেকে সিপাহি এসে পড়ল বলে, দু-দিনে সব ঠাণ্ডা করে দেবে। এই দেখ—আস্পর্ধা দেখ হারামজাদাদের —এই দেয়ালেও কি সব লিখেছে দেখ—

সবাই একসঙ্গে মুখ ফেরালেন। দেয়ালের বালির জমাটে কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে কবিতা লিখেছে—

আগরহাটির লম্বা লাঠি
পশুপতির মুণ্ডু কাটি

আবার লিখেছে—

জমির শত্তুর নীল
মাছের শত্তুর চিল
পশুপতির কানডা ধরে
পিঠি মারি কিল।

ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে মানুষের কোলাহল কানে আসছে এবার। অনেক লোক মিলিত-কণ্ঠে জবাব দিচ্ছে। কেঁচোর মতো নগণ্য মানুষের দল সাপ হয়ে ফণা তুলেছে। গা শিরশির করে উঠল দুর্গার। কেশব আছে কি ওর মধ্যে? এখানে না থাকলেও আছে নিশ্চয় কোন-না-কোনখানে রায়তদলের ভিতর। দেয়ালের লেখাগুলো—হ্যাঁ, কেশবের হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরের মতোই মনে হয়। কেশব এতদূর এই আগরহাটি এসে জুটেছে—এ অনুমান হয়তো ঠিক নয়। তবুও যেখানে গণ্ডগোল, দুর্গা মনে মনে সেইখানে কেশবের অস্তিত্ব ধরে নেয়।

পীতাম্বরের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। বললেন, আপনার মন ভাল নেই বেহান। আজকে ফিরে যাওয়া যাক, কি বলেন? আপনার কনে দেখা তো একরকম হয়ে গেল। হাঙ্গামা মিটে যাক। বাবাজী এরপর যেদিন জয়রামপুরের কুঠিতে যাবেন, আমাদের বাড়িতে যান যেন একটিবার।

গরুর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছে। পশুপতির মা সহসা ডেকে বললেন, মিথ্যে আশায় ঘোরাতে চাই নে পণ্ডিত মশাই—ভালই বলুন আর মন্দই বলুন। পশুপতি যাবে না।

পীতাম্বর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন।

শ্যামবর্ণ বলছিলেন—এ তো কালো। চুল পাকিয়ে ফেললেন, কাকে কোন রং বলে জানেন না? এই ধিঙ্গি মেয়ে—ঠানদিদির মতো দেখাবে যে আমার পশুপতির পাশে।

একবার ঢোক গিলে বললেন, বুড়ো মানুষ বার বার আসছেন, তাই খোলসা কথা বলে দিচ্ছি। হেলি সাহেব এসেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে আমার ছেলেকে করতেই হবে এ বিয়ে। আর এই কালো মেয়ে ফরশার কদরে বিকোবে, এমন সাহায্য এ দুঃসময়ে হেলি আপনাকে করতে পারবেন না। আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন পণ্ডিত মশাই।

দুর্গা অন্যদিকে মুখ ফেরাল। চোখে জল টলমল করছে, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। মেয়ের দিকে চেয়ে পীতাম্বরের মন স্নেহে গলে গেল। গায়ের রং একটু ময়লা হতে পারে, কিন্তু কি চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে! দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলেন, চোখ নেই—কানা মা মাগিটা। ছেলের দেমাকে আমার মেয়ের দিকে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখল না।

কিন্তু যোগাযোগ এমনি, এরই দিন পাঁচেক পরে পশুপতি পায়ে হেঁটে পীতাম্বর পণ্ডিতের বাড়ি উপস্থিত।

পণ্ডিতের বাড়ির দক্ষিণে বড় রাস্তার লাগোয়া প্রকাণ্ড বিল। আষাঢ় মাস—ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, অবিশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক। ধানবনে জল জমেছে। রাত্রি শেষ প্রহর। অভ্যাসমতো পীতাম্বর তামাক খেতে উঠেছিলেন, মানুষের আর্তনাদের মতো কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। বৃষ্টির একটানা আওয়াজের মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। অবশেষে নিঃসন্দেহ হলেন—মানুষই। দরজার খিল খুলতে দড়াম করে দুটো কবাট দু'দিকে আছড়ে পড়ল, বাতাসে মেটে প্রদীপ নিভে গেল। বাইরে কি দুর্যোগ চলছে দরজা না খোলা পর্যন্ত সঠিক আন্দাজ হয় নি।

জলে-কাদায় মাখামাখি—টলতে টলতে এক মূর্তি এসে ঘরে ঢুকল। আর হাঁটবার জো নেই—প্রাণের টানেই কেবল এতদূরে চলে এসেছে। এসেই মেজের উপর ধপ করে বসে পড়ল, এগিয়ে ফরাস অবধি যাবার সবুর সইল না।

কে তুমি?

অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরুল মাত্র।

পিছন দিককার দরজা খুলে পীতাম্বর চেঁচামেচি করতে লাগলেন, শিগগির উঠে আয় সুখময়, শিগগির—

আবার প্রদীপ ধরিয়ে চিনতে পারা গেল। পশুপতি। কাপড়চোপড়ে রক্তের দাগ—আট-দশটা পানি-জোঁক সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরেছে। খানিক সামলে নিয়ে পশুপতি দুটো-একটা কথা যা বলল—পীতাম্বর বুঝলেন, শোলা-ঝাড়ের ভিতর যে জায়গায় সে লাফিয়ে পড়েছিল, এখান থেকে সেটা ক্রোশ দেড়েকের কম নয়। একগলা ধানবনের ভিতর দিয়ে জলকাদা ভেঙে এই দেড় ক্রোশ পথ অন্ধকারে লক্ষ্যহীন ভাবে সে চলে এসেছে। ভাগ্য ভাল যে বেঁচে আসতে পেরেছে।

খুব কাঁপিয়ে জ্বর এল। সুখময় আর পীতাম্বর দু-জনে ধরাধরি করে দোতলার ঘরে তুলে খাটের উপর তাকে শুইয়ে দিলেন। পুরো দুটো দিন একটা রাত্রি বেহুঁশ তারপর। প্রবল জ্বরে কেবল উঃ-আঃ করছে। গা এত গরম যে মনে হচ্ছে ধান রেখে দিলে খই হয়ে ফুটে উঠবে। পীতাম্বরের ভয় হল, অথচ বাইরের কাউকে কিছু বলতে ভরসা হয় না। দেশের অবস্থা আর মানুষের মতিগতি আশ্চর্য রকম বদলে গেছে। কুঠির লোকের নাম শুনলে মানুষ যেন ক্ষেপে যায় তাদের সঙ্গে অতি সাধারণ সামাজিকতাটুকুও সন্দেহের চক্ষে দেখে বাসট্টি বৎসরের জীবনে পীতাম্বর স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি এ সমস্ত।

ভোগ বেশি হল না এই বাঁচোয়া দিন-চারেকের মধ্যে পশুপতির জ্বর ছেড়ে গেল। বোঝা গেল, তারও ইচ্ছা নয়—সে কোথায় আছে, জানাজানি হতে দিতে। এমন কি মধুসূদন দারোগাকেও জানাতে মানা করল। শুধু কয়েক ছত্রের এক চিঠি সুখময় একদিন চুপিচুপি তার মায়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে এল। এক তাজ্জব গল্প করল পশুপতি—বিচারের জন্য কোন গোপন আদালতে নাকি হাকিমেরা নথিপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রায়তদের ধরে ধরে তারা যেমন সাহেব-কুঠিয়ালদের কাছে হাজির করে, সেই রকমটা আর কি। তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পিতৃপুরুষের পুণ্যে প্রাণ নিয়ে কোন গতিকে পালিয়ে এসেছে।

বনবিষ্টুপুর কতদূর এ জায়গা থেকে?

নিকটেই—দুর্গা অবধি জানে গ্রামটার নাম। বর্ষাকালে খাল-বিল ঘুরে যেতে কিছু বেশি সময় লাগে, শুকনার সময় সোজা মাঠের ভিতর দিয়ে পথ অনেক কম।

বনবিষ্টুপুরে গিয়েছিল পশুপতি। রায়তেরা পালিয়েছে। একটা পাড়ার ঘর-বাড়ি সব পুড়ে গেছে। লোকে বলে, কুঠির বরকন্দাজেরা রাত্রিবেলা আগুন দিয়েছিল। এর অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। পশুপতি গিয়েছিল—ওখানে

খাস চাষ হবে, সেই ব্যবস্থা করতে। মোটামুটি কাজ শেষ করে ডিঙি নিয়ে সে সদর-কুঠিতে ফিরছিল। পাইক-বরকন্দাজদের গ্রামে মোতায়েন করে এসেছে, আমিন আছে শুধু সঙ্গে। মাঝি ছপছপ করে বৈঠা বাইছে, আর দু-জন মাল্লা গুণ টেনে চলেছে নদীর কিনারা দিয়ে। উজান কেটে দুলে দুলে চলছে নৌকা। একটা মানুষ নেই কোন দিকে, যেন মৃতপুরী। খালের জল কলকল করে নদীতে পড়ছে, কেবল তারই আওয়াজ।

আমিনের কাছে বন্দুক—টোটা পোরা আছে। চারদিক তাকিয়ে তারপর বন্দুকের দিকে পশুপতির নজর পড়ল। বন্দুক রয়েছে, তখন ভয় কিসের? বিরক্ত হয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে, কত দেবি আর জোয়াবের? কত আর তোমরা গুণ টেনে মরবে?

এই যে—জল থমথমে হয়ে গেছে। টান ফিরবে এবাব।

মানুষের গলা পাওয়া গেল এতক্ষণে। কাশবন—মানুষ দেখা যাচ্ছে না. হাঁক শোনা যায়।

নৌকো কার?

বদন সামন্ত আমার নাম। সাকিম বনবিষ্টুপুর।

ঘাটে ধর। ও-পার যাব—

পশুপতি ক্ষেপে উঠল।

ওরে আমার নবাবের নাতি! হুকুম ঝাড়ছেন, ঘাটে ধব। কক্ষনো নয়—চালাও।

বদন মাঝি সকাতরে বলে, এই আমাদের রেওয়াজ হুজুর, পাবে যেতে চাইলে 'না' বলবার নিয়ম নেই। আর এ অঞ্চলের এরা লোক সুবিধেব নয়। হামেশা চলাচল করতে হয়, এদের চটিয়ে রাখতে সাহস পাই নে।

পশুপতি বলে, করবে কি, আমি তো রয়েছি—

আপনি আজকে রয়েছেন হুজুর, কতক্ষণ আর থাকবেন! তাব পরে?

সমস্ত ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি—রোসো। তোমার গ্রামের ব্যাপার দেখলে তো? এখন ঐ চলল—অমনি হবে সব জায়গায়।

কিন্তু পশুপতির কথা কানে নিল না মাঝি—কাশবন ছাড়িয়ে ডিঙি কূলের কাছাকাছি যেতে হুড়মুড় করে জন পাঁচেক লাফিয়ে উঠল।

রুক্ষ স্বরে পশুপতি বলে, নৌকা ডুবিয়ে দিবি নাকি রে তোরা? আমিনের বন্দুকের দিকে সে তাকাল আর একবার!

আগন্তুকদলের অগ্রবর্তী লোকটি অতিশয় বিনয়ী। হাতজোড় করে সে বলল, দেওয়ানজি নাকি। আমরা নেংড়ের হাটখোলায় যাচ্ছি। এইটুকুন গিয়ে

নেমে যাব। ক'খানা বোঠে আছে তোমার মাঝি? দাও হাতে হাতে বেয়ে তাড়াতাড়ি হুজুরকে পৌঁছে দিই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

ছইয়ের উপরে-রাখা আর তিনটে বোঠে ও দু-খানা লগি তারা তুলে নিল। বাইছে। মুহূর্ত পরে বিষম কাণ্ড। লগি ফেলে দু-জনে ঝাপটে ধরল বন্দুকধারী আমিনকে। বন্দুক কেড়ে নিল, গুণের দড়ি কেটে দিল। নৌকা গাঙের মাঝখানে। একজন পাঁঠা-কাটা মেলতুক নিয়ে এসেছিল দেখা যাচ্ছে গায়ের চাদরের নিচে। সে সেই মেলতুক ঘোরাতে লাগল, আমিন আর বদর মাঝির মাথার উপরে।

নাম্, নেমে পড্ এক্ষুনি, নইলে কেটে কুচি কুচি করব।

গোপন যোগসাজশ ছিল বলে পশুপতির সন্দেহ। বদন মাঝি এবং তারপর আমিনও ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ল নদীতে। জোয়ার এসেছে, মাঝির জায়গায় ওদেরই একজন বোঠে ধরে বসেছে। খরস্রোতে পাক খেয়ে ডিঙি খালের ভিতর গিয়ে উঠল।

সেই বিনয়ী লোকটা বলল, মিছে চেঁচাচ্ছেন হুজুর, গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ এদিকে আসবে না।

অপর একজন মন্তব্য করল, আর এলেও বাঁচাতে আসবে না তো? উল্টে দুটো চড়-চাপড় দিয়ে, কি অকথা কুকথা বলে অপমান করে বসবে। কাজ কি —চুপচাপ থাকুন।

নিরুপায় পশুপতি প্রশ্ন করে, কি চাও তোমরা?

চার বোঠের তাড়নায় ডিঙি যেন উড়ে চলেছে। কেউ জবাব দিল না। নিবিড় অন্ধকার, আকাশ-ভরা কালো মেঘ।

কাতর কণ্ঠে পশুপতি বলে, আমার কি দোষ ভাইসব? চাকরি করি— উপরওয়ালার হুকুমে সব করতে হয়।

গ্রাম জ্বালাতে হয়? গৃহস্থের মেয়ে-বউ পথে তুলে দিতে হয়? উপর-ওয়ালারাও রেহাই পাবে না। এখনো নাগে পাই নি তাই। মহারানীর স্বজাতি বলে বাঁচতে পারবে না।

আবার একসময় পশুপতি বলে উঠল, ছেড়ে দাও আমায়—

ছাড়বার এখতিয়ার নেই। পঞ্চায়েতে বিচার হবে। ছেড়ে দেবেন কি দেবেন না—তাঁরাই ঠিক করবেন বিচারের পর। আমাদের গ্রেপ্তার করে পৌঁছে দেবার হুকুম, তাই করছি।

মুষলধারে বৃষ্টি নামল। কনুয়ে মাথা রেখে পশুপতি শুয়ে ছিল। ঘুমোবার মতো ভাব। হঠাৎ উঠে খালের পাড়ে লাফিয়ে পড়ল। সে-ও লোক সোজা

নয়—নইলে কম বয়সে এত উন্নতি করতে পারত না সাহেবি কনসারনে। ওই এক চালাকি খেলল ওদের উপর। ভেবেছিল, শোলার ঝাড়ের ভিতর শুকনো ডাঙায় গিয়ে পড়বে। কিন্তু জল সেখানেও—জুতো-জামাসুদ্ধ জলে পড়ে গেল। তবু সুবিধে হল—দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানবন চারিদিকে। মাথা নিচু করে এঁকে বেঁকে ধানবন দিয়ে চললে দিন দুপুরেই খুঁজে পাওয়া যায় না—এ তো অন্ধকার রাত্রি। জলের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে তবে পশুপতি গ্রাম পেয়েছে। ভাগ্যক্রমে পীতাম্বর পণ্ডিতের বাড়ি এসে গেছে।

অন্নপথ্য সাত দিনের দিন। সকালবেলা দুর্গা বাটিতে করে গরম দুধ নিয়ে এসেছে। পশুপতি মুখ ভার করে বলে, আমি খাব না।

দুর্গা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়। পশুপতি যত সুস্থ হচ্ছে, ততই যেন ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পশুপতি বলল, অসুখে অচৈতন্য ছিলাম—যা মুখে দিয়েছি খেয়েছি। তোমার ঘৃণার দেওয়া এই সব এখন আর খেতে যাব কেন?

দুর্গা ভালমন্দ কিছু বলে না, যেন সে বুঝতেই পারছে না তার কথা।

পশুপতি বলতে লাগল, নানারকম রটনা হচ্ছে আমার নামে। আমি নাকি মাথা হয়ে দাঁড়িয়েছি ওদের কনসারনের, যা বলি হেলি তাতেই ঘাড় নাড়ে। রায়তেরা পেলে উঠলে চিঁড়ের মতো আমায় দাঁতে পিশে ফেলত। সবাই ঘৃণা করে। তোমরাও ভাবো ঐ রকম নিশ্চয়। নিতান্ত ঘাড়ে এসে পড়েছি, ফেলতে পারছ না—কি করবে? কিন্তু একটা কথা বলি দুর্গা—

প্রতিবাদ প্রত্যাশা করেছিল দুর্গার কাছ থেকে। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে কৈফিয়তের সুরে পশুপতি বলতে লাগল, ব্যাপার হল—আমার উন্নতি দেখে সকলের চোখ টাটায়। সাহেবি কনসারনের ম্যানেজার হতে যাচ্ছি—ধর, এতদিনের একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। জাতসুদ্ধ এতে খুশি হওয়া উচিত—তা নয়, এ পোড়া দেশে পিছনে লাগতে আসে। কি করছে এরা বল তো? কোম্পানির রাজ্যে থেকে নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া? লাঠি-সড়কি সমস্ত বন্দুকের গুলিতে ঠাণ্ডা করে দেবে। সদরে নালিশ করেই বা করবে কি, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মুখ শোঁকাশুঁকি—ভাই-ব্রাদার ওরা সব। জাতভাইয়ের স্বার্থ না দেখে তারা কি রায়তের পক্ষে রায় দিতে যাবে?

এত কথার একটিও কানে যাচ্ছিল না দুর্গার। ঘৃণা করে বলে পশুপতি অনুযোগ জানাল, সেইটাই শুধু মনের মধ্যে বারংবার আনাগোনা করছে। কেশবকে একদিন সে-ই বলেছিল এমনি ঘৃণা করবার কথা। দুর্গার চোখে জল

এসে পড়ে। কথার মাঝখানে সে বলে উঠল, ঘৃণা আমি করি না। মিথ্যে কথা। আপনাকে না, কাউকে না। গর্ব করবার কি আছে যে অন্যকে ঘৃণা করতে যাব?

পশুপতি সামনে বসে, কিন্তু বলছে যেন অনেক দূরের আর কাকে উদ্দেশ্য করে।

পশুপতির মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলে, সে জানি। এই কথাটাই শুনতে চাচ্ছিলাম তোমার মুখ দিয়ে। ঘৃণা থাকলে এমন দরদ দিয়ে কেউ সেবা করতে পারে? মাকে বাদ দিলে এই বাড়ির তোমরাই শুধু সত্যি সত্যি আমায় ভালবাস। এত বড় কনসারনের এলাকায় এই একটামাত্র জায়গা আমার কাছে সকলের চেয়ে নিরাপদ। কুঠির মাইনে-খাওয়া লোকজনকেও প্রাণ খুলে এমন বিশ্বাস করতে পারি নে

তক্তাপোশের প্রান্ত দেখিয়ে বলে, বোসো দুর্গা—ঘৃণা কর না যখন, বোসো এই—এখানে।

দুর্গা বসে পড়ল।

কথা বল একটা-কিছু। শুয়ে পড়ে আছি। দিনরাত কাজকর্মে হৈ-হল্লার মধ্যে থাকা অভ্যাস—বড্ড কষ্ট হয় চুপচাপ থাকতে।

ক্ষীণকণ্ঠে দুর্গা বলে, কি কথা বলব?

সেটা আমি শিখিয়ে দেব?

স্পষ্ট অভিমানের সুর পশুপতির কণ্ঠে। বলে, যাকগে—কষ্ট করতে হবে না তোমার। আমিই বলছি কথা। কথা না বলে বলে মরে যাচ্ছি এই ক'দিন।

বলতে লাগল তার দুর্দৈবের কথা। রেখে ঢেকে বাইরে যতটু বলা যায় এই মেয়েটির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য। একেবারে নির্দোষ তার উপর নির্মম ষড়যন্ত্রের মনগড়া একটা কাহিনী সে বলে যেতে লাগল।

হঠাৎ দেখে দুর্গা ঘাড় ফিরিয়ে বসে আছে। পশুপতি চুপ করল।

বলুন—

তুমি শুনছ না, মিছে বকে মরছি।

শুনছি।

গলার স্বর অস্বাভাবিক মনে হল পশুপতির কাছে। রোগী এখনো সে—এক কাণ্ড করে বসল—হাত বাড়িয়ে হঠাৎ দুর্গার মুখ ফেরাল তার দিকে। ঝরঝর করে দুর্গার কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আর সে গোপন করল না, ঘনপক্ষ্ম সজল দু'টি চোখ তুলে নিঃশব্দে বসে রইল।

ক্ষণপরে ধীরে ধীরে পশুপতি বলে, মা কি-সব বলেছেন শুনেছি। কিন্তু সে জন্য আমায় দোষী করো না, আমার উপর বিরূপ হোয়ো না দুর্গা। নিয়তি অসহায় অবস্থায় তোমাদের আশ্রয়ে এনে ফেলেছে। তাই এত কথা মুখ ফুটে বলতে পারছি। তোমায় না পেলে জীবন আমার নিষ্ফল হয়ে যাবে।

দুর্গার বুকের ভিতর কাঁপে। কি করে বলে ফেলল, সে জানে না—বলল, আমি কালো-কুৎসিত—

কালো হতে পার—হাঁ, কালো নিশ্চয়ই, কিন্তু কুৎসিত কখনো নও। কুৎসিত কেউ এমনি করে মন বাঁধতে পারে? কাল সারারাত তোমার কথা ভেবেছি, সারারাত ঘুমোই নি। এর পরেও মা আপত্তি করলে আমাকে অবাধ্যপনা করতে হবে।

তারপর হেসে উঠে বলল, তার দরকার হবে না। তোমরা আমার জীবন দিয়েছ। আমি জানি—খুশি হয়েই মা মত দেবেন।

চলে যাবার দিন পশুপতি সুখময়কে বলে গেল, পাকা-দেখা দেখতে আসবে এই মাসের মধ্যেই। মধুসূদনবাবু আসবেন. আশীর্বাদ যা পাঠাবার—মা তাঁর হাত দিয়ে পাঠাবেন।

হেসে বলে, হেলি কি ছাড়বে? সে-ও এসে তার মামার মতো গ্যাঁট হয়ে ফরাশে চেপে বসবে। এসব কাজে তার উৎসাহ খুব—

কথা রাখল পশুপতি। মাসের ভিতরেই মধুসূদন দারোগা এসে পড়লেন। পশুপতি নিজেও আছে। হেলি এসে জুটল দলে। আরও বিস্তর লোক, বিষম সমারোহ। এসে পৌঁছেছে শেষ রাতে, এখন অবধি পীতাম্বরের বাড়ি আসবার ফুরসৎ হয় নি। উত্তরপাড়ায় আছে। খবর পাঠিয়েছে—সন্ধ্যার দিকে আসবে, খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় থাকে যেন দু-তিন জনের মতো। রাতটুকু এবাড়িতে থেকেও যেতে পারে, জানিয়ে দিয়েছে।

বিষম কাণ্ড উত্তরপাড়ায়, ভয়ানক দাঙ্গা। কেল্লার মতো দুর্ভেদ্য করে তুলেছে ও-পাড়ার বাড়িঘর—মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো সকলে মরিয়া। প্রথম মহড়ায় সড়কি এসে বেঁধে মধুসূদন দারোগার পায়ে। ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে তাঁকে সদরে পাঠিয়েছে। অতঃপর ক্ষেপে গেল থানার পুলিশ আর কুঠির বরকন্দাজের দল। খবর পেয়ে ও-পক্ষেও আশেপাশের গ্রাম থেকে পিঁপড়ের সারের মতো অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছে। হঠবার পাত্র কেউ নয়—লড়াই দস্তুরমতো। খবর পাওয়া গেছে, ঐ যে পঞ্চায়েত-আদালতের কথা শোনা যায়, সে-আদালত নাকি কেশবেরই বাড়িতে। কিন্তু সে অবধি

পৌঁছবে, সাধ্য কার? বল্লম হাতে বটগাছে চড়ে কেশব নিজে বিপক্ষদলের গতিবিধি দেখছে, আর সেখান থেকে উৎসাহ দিচ্ছে বায়তদের।

দুর্গা ব্যাকুল হয়ে ঘর-বাহির করছে। নানা খবর আসছে মুহুর্মুহু। টোটার বন্দুক চালাচ্ছে হেলি একবার। বিকালবেলা শোনা গেল, রণ-জয় হয়েছে হেলির, গুলি খেয়ে কেশব মারা গেছে। মাতব্বর বায়তদের ধরে তালা-চাবি দিয়ে রেখেছে, কেশবেরই শোবার ঘরের ভিতর। যে বাড়ি থেকে যার যে জিনিস ইচ্ছা, টেনে দিয়ে ফেলছে, ছড়াচ্ছে, ভাঙছে—কিছুমাত্র বাধা নেই। নানারকম গুজব জনতার মুখে মুখে—রাত্রি হলে নাকি আরও নানাবিধ কাণ্ড হবে। সমস্ত গ্রামে আর যে ক'জন পুরুষ আছে, তাদেরও নিয়ে আটকাবে। তারপর নিঃসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়ে এসব অবশ্য অনুমানের কথা। কিন্তু নৃশংসতার নমুনা দেখে সত্যি এবার ভয় পেয়ে গেছে জয়রামপুরের মানুষজন।

এরই মধ্যে একটু আনন্দের খবর একজনে দিয়ে গেল। কেশবের মৃতদেহের সন্ধান ওরা পায় নি, সুকৌশলে সরিয়ে নদীকূলে কেয়াবনে ঢুকিয়ে রেখেছে। গভীর রাত্রে চারিদিক নিশুতি হলে চুপি চুপি দাহ করবে। এত ভালবাসে তাকে সকলে, কিন্তু তার শেষকৃত্যে হরিধ্বনিও দেওয়া চলবে না একটিবার।

প্রহরখানেক রাত্রি। অতল নিস্তব্ধতা, দিনের তুমুল উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই। উত্তরপাড়ার পথে পথে বল্লম হাতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সতর্ক বরকন্দাজের দল। এতক্ষণে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে পশুপতি পীতাম্বরের বাড়ি এল। একা নয়—হেলি সাহেবকে নিয়ে এসেছে। আর ক'জন বরকন্দাজ এসেছে, তারা বাড়ি ঢুকল না—হুড়কোর বাইরে বকুলতলায় দাঁড়াল। ঐখান থেকে পাহারা দেবে যতক্ষণ এঁরা আছেন এখানে।

সাড়া পেয়ে পীতাম্বর বেরিয়ে এলেন। পাংশুমুখে চেয়ে রইলেন তিনি। গলা কাঠ হয়ে গেছে, ভালমন্দ একটি কথা বেরুল না মুখ দিয়ে।

হেলি বলল, তোমার বাড়ি এলাম পণ্ডিত। অতিথি। রাতে আবার বেরুতে হবে কি-না! কাজ আছে। তাই আর কুঠি অবধি ফিরে গেলাম না।

বলে সে বাঁকাহাসি হাসল।

দুর্গাকে ডাক দিয়ে পশুপতি বলল, বড্ড কষ্ট হয়েছে, খিদেও পেয়েছে। খাবার দাও।

হেলিকে দেখিয়ে বলে, আর এক ঘটি গরম জল নিয়ে এস দিকি তাড়াতাড়ি। সাহেব হাত-পা ধোবেন।

দুর্গা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়।

পীতাম্বর বিপন্ন ভাবে চুপিচুপি মেয়েকে বললেন, সত্যি যে এসে উঠল। কি করি বল্‌তো এখন ?

আপনার লোক বলে জানে, তাই এসেছে—

সংক্ষেপে বাপের কথার জবাব সেরে ওদের সঙ্গে সঙ্গে সে বৈঠকখানায় এল। পশুপতির দিকে চেয়ে কলকণ্ঠে বলল, বীরসজ্জা ছাড়ুন। ভাল হয়ে বসবেন চলুন উপরের ঘরে।

নড়বড়ে ভাঙা সিঁড়ি, দোতলার সঙ্কীর্ণ ঘর, আমের ডাল নুয়ে পড়েছে জানলার কাছে। দু-জনকে বসিয়ে সেই যে দুর্গা চলে গেছে, আর দেখা নেই। দুপুরে গোলমালের মধ্যে খাওয়া-নাওয়া হয় নি। স্বপ্নেও ভাবে নি, এত হাঙ্গামা পোয়াতে হবে এইটুকু এক পাড়া শাসন করতে এসে। কিন্তু এত দেরি করে কেন দুর্গা ? খাবার তৈরি করে নিয়ে আসছে ? হয়তো তাই। আগে আগে খবর পাঠিয়েছে অবশ্য, কিন্তু সমস্ত দিন যে ঝড় গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তাতে মাথার ঠিক থাকে কারো ? তাদের নিজেদেরই ছিল না, আর এরা তো নিরীহ নির্বিরোধী সেকেলে-পণ্ডিতের পরিবার।

আমগাছে বাদুড় ঝটপট করছে। হু-হু করে হাওয়া বয়ে গেল, পুরানো জীর্ণ চাটুজ্জে-বাড়ি সহস্র পদশব্দে বেজে উঠল যেন। আমডালের অন্ধকারের দিকে চেয়ে পশুপতির রোম খাড়া হয়ে ওঠে, দাঙ্গায় আহত মানুষগুলোর আর্তনাদ নিঃশব্দতার মধ্যে যেন কানে ভেসে আসছে।

এতক্ষণে কিন্তু দুর্গার আসা উচিত। নাড়ি হজম হয়ে যাবার যোগাড়— আর সে যোড়শোপচারে আয়োজন করছে নিশ্চয় বসে বসে। কুঠির সাহেব বাড়িতে বসে খাবে, এদের পক্ষে এ স্বপ্নাতীত ব্যাপার। হেলিকে এনেই মুশকিল হয়েছে, মনের মত করে না সাজিয়ে তার সামনে থালা আনবে না কিছুতেই। এলে পশুপতি মুখ ফিরিয়ে থাকবে, কথা বলবে না দুর্গার সঙ্গে। খিদেয় টলে পড়ে যাচ্ছি, দেখে গেলে—তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না কি তোমার ?

পায়ের শব্দ। কান পেতে শুনছে পশুপতি। সিঁড়ি বেয়ে শব্দ উঠে আসছে ধীরে ধীরে। দু-চোখের উদগ্র দৃষ্টি স্থাপিত করে সে তাকাল। হাঁ, দুর্গাই। এতক্ষণের ভেবে-রাখা অভিমানের কোন কথাই এল না পশুপতির মুখে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, এলে ?

হ্যাঁ—

ঘরে এলো দুর্গা। কুলুঙ্গির প্রদীপটা উঁচু করে ধরল সিঁড়ির দিকে।

আলো পড়ে অপরূপ ঔজ্জ্বল্য ফুটেছে তার কালো মুখে। সিঁড়িতে অনেক লোক। এদের দেখিয়ে দেয়, এই যে—সেবারের পালানো আসামী। আর সেই সাহেব, কেশব-দাকে যে খুন করেছে—

এর পরের কথা সঠিক কিছু বলতে পারব না নিশিকান্ত। এ-ও যা বললাম নিতান্তই গল্প, ঠাকুমার কাছে শুনেছি। গ্রামের যে-কোন মুরুব্বীর মুখে শুনতে পাবে মোটামুটি এই কাহিনী। উত্তরপাড়া আছে আজও। চাটুজ্জে—বাড়ি বলতে লোকে একটা উঁচু ঢিবি দেখিয়ে দেয়। দলিলপত্রে পাওয়া যায়, নীল-বিদ্রোহের পরেই ইণ্ডিগো-কোম্পানি নামমাত্র মূল্যে জয়রামপুরের কনসারন বিক্রি করে দেন নামখানার চৌধুরীদের কাছে। চৌধুরীরা চালাতে পারলেন না। কনসারনের সমস্ত কুঠি বন্ধ হয়ে গেল বছর চার-পাঁচের মধ্যে।

কাজকর্মে ও লোকজনের যাতায়াতে নীলখোলা সমস্তটা দিন সরগরম থাকত—আর আজকে দেখলে নিশিকান্ত তার অবস্থা। নাটা বৈঁচি ও কালকাসুন্দের জঙ্গল, দেয়ালের ফাটলে সাপের আস্তানা জঙ্গলে লাঠি পিটলে বুনো শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেরিয়ে পালায়। কোথায় সেই টুইডির দল! ঠাকুরমার মুখে এবং এর-তার মুখে শোনা গল্পের টুকরো সাজিয়ে গুছিয়ে দিব্যি তোমার কাছে গড়গড় করে বলে গেলাম যেন নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু গল্প গল্পই। কেশব বলে একজন ছিল বটে কিন্তু দুর্গার সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল—না-ও হতে পারে এমনটা। সেকালের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই—তখনকার কালের মানুষগুলোকে আন্দাজি পুরানো ছকে ফেলে গল্প জমাই। তবে এটা ঠিক, নীলকরদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার গ্রাম্য রায়ত রুখে দাঁড়িয়েছিল, সাদা সাহেব বলে আতঙ্ক ঘুচে গিয়েছিল সেই দূর অতীতেই। তাদের এমন জমিয়ে তোলা ব্যবসা অসম্ভব করে তুলেছিল। শুধু জয়রামপুরের এই একটা মাত্র নয়—এক এক করে বাংলার সমস্ত কনসারন এদেশী ধনীদের কাছে বিক্রি করে তারা বিদায় নিতে লাগল। খরিদ্দার অভাবে তালা পড়ল কোন কোন কুঠিতে। জার্মান ল্যাবরেটারির সস্তা নীল এসে পড়ায় নীল চাষ বন্ধ হয়ে গেল—এমনি একটা কথা সাহেবরা রটনা করে নিজেদের মুখরক্ষার জন্য। কিন্তু বুঝে দেখ নিশিকান্ত, জার্মানিকে নির্গোলে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় বানপ্রস্থ নেবে—তেমনি পাত্র কি ওরা? একালের ছেলেরা নীল-চাষের কথা বইয়ে পড়ে থাকে, চোখে দেখে নি। বিলুপ্ত ম্যামথের কঙ্কালের মতো এগ্রামে-ওগ্রামে ছড়ানো নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষগুলো না থাকলে তাদের বিশ্বাস করানো শক্ত হয়ে দাঁড়াত নীলকুঠি ও নীলবিদ্রোহের কাহিনী। তেমনি

আমার মনে হয়, আর এক শ' বছর পরে আগামী কালের ভাগ্যবান ছেলেরা ভারতবর্ষে ইংরেজ-প্রভুত্বের ইতিহাস পড়া কাহিনীও বিশ্বাস করতে চাইবে না ; এখনকার এই বিক্ষুব্ধ দিনের কণামাত্র ছায়া পড়বে না তাদের শান্ত কিশোর মনের উপর।

নীলের ব্যবসা বন্ধ হলেও সাহেবদের আনাগোনা বন্ধ হয় নি কখনো জয়রামপুরে। টুইডির আমলে গ্রাম পত্তনি নেওয়া ছিল—কুঠির হাতায় একটা ঘরে কাছারি বসিয়ে নায়েব-গোমস্তা রেখে কিস্তিতে কিস্তিতে খাজনা আদায় হত। পৌষ-কিস্তির সময় বেশি জমজমাট হত কাছারি। ধানকাটার মুখে বাদায় অনেক পাখি এসে পড়ত, শহর থেকে সাহেবরা দল বেঁধে আসত পাখি শিকার করতে। দুধ-মাছ তরিতরকারি প্রচুর মিলত ঐ সময়টায়। কুঠিবাড়িতে অহরহ মেলা জমে থাকত।

শুধু এই সামান্য সম্পত্তির ব্যাপারে এতদূর টানা-পোড়েন পোষায় না। লারমোর নামে একজন নূতন ব্যবসা ফেঁদে বসল। নীলের চাষ গিয়ে পাট-চাষের বেশি চলন হয়েছে—হাটখোলার পাশে ভদ্রার ধারে টিনের ঘর বেঁধে লারমোরের পাটের গুদাম হল। লারমোরকে লালমোহন-সাহেব বলত চাষা-ভূষা সকলে। পাটের মরসুমে লারমোর নিজে এসে চেপে বসত। প্রচুর পাট কিনে গাঁইট বাঁধা হত, পরে কলকাতায় চালান দিত মনের মতো দর পেলে। ভদ্রা মজে আসছিল। এই সময় ছোট-লাইন বসল, লারমোরের ব্যবসার সুবিধা হল এতে। শুধু নৌকাযোগে নয়, স্থলপথে খুব অল্পসময়ে পাট চালান যেতে লাগল।

রেলগাড়ি ধোঁয়া উড়িয়ে জয়রামপুরের ভিতর দিয়ে প্রথম যেদিন স্টেশনে এসে দাড়াল, গ্রামবাসী সকলের কি উৎসাহ আর উত্তেজনা! নিতান্ত ছেলে-মানুষ আমি তখন। গোড়ায় একখানা মাত্র গাড়ি দিয়েছিল—সেইটে সকাল-বেলা ছুটত শোলাদানা অভিমুখে, বিকেলে আবার আগরহাটি ফিরে যেত। শোলাদানা নোনা জায়গা—মাছের সায়র ছিল, সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক মাছ আমদানি হত ওখানে। ঐ মাছ এবং মধ্যবর্তী বিভিন্ন জায়গা থেকে পাট ও মাদুর চালান যাবে, এই ভরসায় এক বিলাতি কোম্পানি লাইন খুলেছিল। আমাদের জয়রামপুরে রেলের ওয়ার্কশপ হল। এই উপলক্ষে অনেক ফিরিঙ্গি কর্মচারী সপরিবারে এসে উঠল পুরানো সাহেবপাড়ায়। অনেক নূতন বাংলো উঠল, পাড়ার শ্রী ফিরল। হাটও খুব জাঁকিয়ে উঠল লাইন খোলার পর থেকে। গাড়ি অনেকক্ষণ থাকত এখানকার স্টেশনে, মানুষ ও বিস্তর মালপত্রের ওঠা নামা হত।

কার্জন বাংলাদেশকে দু-টুকরো করেছে, তাই নিয়ে আমাদের গ্রামেও সোরগোল। তখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি। বছর ঘুরে আবার তিরিশে আশ্বিন এল—বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের তারিখ। পাঁজিতে পর্বদিনের নির্ঘণ্টের ভিতর ছেপে দিয়েছে—জাতীয় রাখীবন্ধন ও অরন্ধন। ভারাক্রান্ত মনে ইস্কুলে গিয়েছি। পাঠশালায় পর্যন্ত ছুটি—আমাদের ইস্কুল খোলা আছে, ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট লারমোর সাহেব ঐদিন ইস্কুল পরিদর্শনে আসছেন বলে।

নীলকমল দাস আমাদের ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন। ফর্শা রং, লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথার সামনে টাক। ফরিদপুরের দিকে কোথায় বাড়ি, চাকরির ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে জয়রামপুরে এসে পড়েন। চমৎকার পড়াতেন, অল্পদিনেই ছেলে মহলে খুব নাম হল। তখনকার দিনে একখানা ইতিহাস পড়তে হত—'ভারত ইংরেজের কার্যাবলী' এই গোছের নাম। ইতিহাস আদপেই নয়—ইংরেজ আমাদের আধা অসভ্য ভারতবর্ষে রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ পোস্ট-অফিস ইত্যাদি সহযোগে স্বর্গলোক রচনা করেছে, আদ্যোপান্ত তারই ফিরিস্তি। নীলকমল মাস্টারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর গম গম করে ক্লাসের মধ্যে বাজত, এক সেকেণ্ডও ফাঁকি দিতেন না তিনি। সমস্ত ঘণ্টা পড়িয়ে অবশেষে মন্তব্য করতেন, যা পড়ালাম—আগাগোড়া মিথ্যা কথা। পেটের দায়ে ইংরেজ এসেছিল এদেশে, ছল চাতুরী করে এখন অধীশ্বর হয়ে বসেছে। যা কিছু করেছে, সমস্ত নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার সুবিধা হবে বলেই। পেটের দায়ে আমাদের এই আজগুবি ইতিহাস পড়িয়ে যেতে হচ্ছে। তোমরাও মুখস্থ করছ ভবিষ্যতে পেট চালানোর সুবিধা হবে বলে।

বলে তিনি হেসে উঠতেন।

সেদিন তাঁর ক্লাস। কিন্তু মুখে হাস্যলেশ নেই। ইতিহাসের বই না খুলে বাংলাদেশের একখানা ম্যাপ এনে দেওয়ালে টাঙালেন। আমাদের একজনের কাছ থেকে একটা রুল নিয়ে ম্যাপের উপরে সেটা দিয়ে দুই বাংলার সীমানা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, আজকের দিনে বিশেষভাবে উপলব্ধি কর—কি দশা করেছে আমাদের। সোনার বাংলা কেটে দু-ভাগ করেছে বাঙালীর প্রাণশক্তি বিচূর্ণিত করবার জন্য।

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, উদ্গত অশ্রু সামলে নিচ্ছেন যেন। তাঁর বুকখানাই চিরে দু-ভাগ করেছে, ভাব দেখে এমনি মনে হল। বড্ড কষ্ট হচ্ছিল আমাদের।

বারাণ্ডার দিক থেকে হেডমাস্টারের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। চিৎকার করে হুকুম দিলেন, ফটক বন্ধ করে দাও। এই দিকেই আসছেন তিনি, জুতার

মসমস আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলকমল মাস্টার তাড়াতাড়ি দেওয়ালের ম্যাপ গুটিয়ে একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা উলটাতে লাগলেন। গোড়া থেকে শেষ অবধি উলটিয়ে যান, আবার গোড়ায় আসেন। একটি কথাও বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। রাস্তায় মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্‌-ধ্বনি। সবাই আমরা কৌতূহলী কিন্তু, হেডমাস্টারের আতঙ্কে গলা বাড়িয়ে বাইরে তাকাবারও সাহস নেই। লক্ষ্মণ বাইরে গিয়েছিল—তোমাদের আজকের সভার সভাপতি লক্ষ্মণ মাইতি, আমাদেরই সহপাঠী সে। ছুটতে ছুটতে সে এসে ঘরে ঢুকল।

নীলকমল মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে ওদিকে?

লক্ষ্মণ বলল, বড্ড মারধোর করছে। প্রফুল্ল-দার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। রাস্তার পগারে অজ্ঞান হয়ে তিনি পড়ে গেছেন।

কোন প্রফুল্ল বুঝতে পারলে নিশিকান্ত? বুড়ি-মেমের কুঠিতে যে হাসপাতাল করে দিয়েছে, আজকের উৎসব-সভার প্রধান উদ্যোক্তা। চাল সাপ্লাইয়ের কাজে ইদানিং তার প্রচুর টাকা। নূতন যে বাড়িটা করেছে, এ অঞ্চলে তেমন বাড়ি আর নেই। সেই যে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তার শতগুণ পুরস্কার মিলেছে জীবনে। ফাটা-মাথার দৌলতে সে এখন এসেম্বলির মেম্বর। অচিরেই স্বাধীন দেশের মন্ত্রীর গদিতে সমাসীন হবে, এই রকম শোনা যাচ্ছে। আমাদের দু-ক্লাস উপরে পড়ত প্রফুল্ল, সেই তিরিশে আশ্বিন তারিখে সে ইস্কুলে আসে নি। ভোরবেলা দল বেঁধে ভদ্রায় স্নান করে তারপর এর-ওর হাতে হলদে রাখি পরিয়ে বেড়াচ্ছিল, আর বিলাতি কাপড় সংগ্রহ করে স্তূপাকার করছিল—বিকালবেলা হাটখোলায় নিয়ে আগুন দেওয়া হবে সকলের সামনে। বাবার চোখ এড়িয়ে আমিও একবার ওদের সঙ্গে খানিকটা বেড়িয়ে এসেছি। প্রফুল্লর সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করছিলাম। বাবার কড়া শাসন না থাকলে আমিও কি চুপচাপ ক্লাসে এসে বসতাম আজকের দিনে? এই যে শোনা গেল, মার খেয়ে সে ধরাশায়ী হয়ে আছে—এর জন্যও হিংসা হচ্ছে প্রফুল্লর উপর।

নীলকমল মাস্টার বইয়ের পাতা উলটানো বন্ধ রেখে মুহূর্তকাল টেবিলের দিকে চেয়ে রইলেন। কি ভাবছিলেন কে জানে। তারপর আমাদের দিকে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বলে উঠলেন, বন্দেমাতরম্‌ বলা বেআইনী হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে চেঁচামেচি করে খবরদার কেউ ডেপোমি করতে যাস নে।

চেয়ার থেকে উঠে সামনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, এত গণ্ডগোলে পড়াশুনা হয়? অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। চুপ কর তোমরা এইবার।

আমি বললাম, চুপচাপ বসে থাকি। আজকে আর পড়াবেন না।

ভ্রূকুটি করে তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন।

বাইরে তুমুল কাণ্ড। দুয়োর এঁটে শান্তমনে পড়াশুনোর সময় কি এখন? নীলকমল মাস্টার বললেন, বড় লড়াইয়ের ভিতর কারখানা এক মিনিটও বন্ধ রাখা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় মাপ মিলিয়ে কারিগর বারুদ-গোলাগুলি তৈরি করে।

একটি ছেলে বলল, আমরা বুঝি গোলাগুলি মাস্টার মশাই? ইস্কুল কারখানা?

গোলা-বারুদের চেয়ে ঢের বেশি জোরালো অস্ত্র তোমরা। দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে, সেদিনও ইস্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা যাবে না একটা দিনের জন্য।

আর একটা কথাও না বলে তিনি ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের অধ্যায় পড়ালেন। যা পড়াচ্ছেন, ছাপা-বইয়ের সঙ্গে তা মেলে না। সেই একটা দিন পড়লাম বটে নীলকমল মাস্টারের কাছে, আজকে বুড়ো বয়সেও তার স্মৃতি ভুলতে পারি নি। স্বাধীনতার জন্য এই যে আমরা সংগ্রাম করে চলেছি, সেদিন তারই যেন এক পশ্চাৎপট আমাদের কিশোর মনের উপরে তিনি এঁকে দিলেন, ভারতের প্রথম ইংরেজ-বিতাড়ন চেষ্টায় ব্যর্থ ঘটনা-পরম্পরার বর্ণনা করে। তার মাস্টারি-জীবনের সেদিন শেষ পড়ানো—কোন দৈবশক্তির বলে যেন টের পেয়েছিলেন, তাই তিনি অমন প্রাণ ঢেলে পড়ালেন।

ঘণ্টা শেষ হয় নি, হেডমাস্টারের লিখিত হুকুম এল—সকলকে মাঠে যেতে হবে তখনই। প্রেসিডেন্টের সামনে ইস্কুলের সমস্ত ছেলে একসঙ্গে ড্রিল করবে, ক'দিন থেকে তার তোড়জোড় চলছিল। ড্রিলের পর সাহেব ছেলেদের সম্বোধন করে দু-চারটে উপদেশ দেবেন। কিন্তু সে তো এখন নয়, প্রেসিডেন্ট ঘুরে ঘুরে ক্লাস পরিদর্শন করবেন—তারপর। আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

গিয়ে দেখলাম, কানু গাঙ্গুলি, আমাদের অনেক নিচে পড়ে—তাকে নিয়ে ব্যাপার। লারমোর সাহেব আর হেডমাস্টার মাঠের প্রান্তে পাশাপাশি দু-খানা চেয়ারে বসেছেন। ইস্কুলের দারোয়ান তাঁদের ঠিক সামনে দৃঢ়মুষ্টিতে কানাই-এর হাত ধরে আছে। হেডমাস্টারের মুখে-চোখে যেন আগুনের হল্কা-বেরুচ্ছে। সকল ছাত্র হাজির হলে তাদের সামনে খুব জাঁকালো রকমের শাস্তি দেবেন—এইজন্যে বহু কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে আছেন।

কানু—আমাদের কানাই। ফুটফুটে অতি সুন্দর চেহারা বলে ইস্কুলসুদ্ধ সবাই ভালবাসত কানুকে। ক-বছর আগেকার কথা—প্রথম যেবার কানু

ভরতি হল। তখন তার আরও কম বয়স। এই নীলকমল মাস্টারই ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন, কানু শুকনো মুখে বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নীলকমল হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ফাঁকি দিয়ে এখানে বেড়াচ্ছিস যে তুই?

ভাল লাগে না মাস্টার মশাই।

তার কোমল স্বরে মুহূর্তে নীলকমল মাস্টারের রাগ জল হয়ে গেল। ছোট শিশু, মা-ভাই-বোনের কাছ-ছাড়া হয়ে এসেছে—ইস্কুলের এত ছেলে, মাস্টার ও নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেকে নিতান্ত একলা মনে করছে। গলা নামিয়ে তিনি বললেন, তা বারান্দায় বেড়াস নে ও-রকম, হেডমাস্টার দেখলে রক্ষে রাখবে না। বেড়া গলে বেরিয়ে যা বাঁশতলা দিয়ে। কুমোরেরা ঐদিকে হাঁড়ি-মালসা পোড়াচ্ছে, দেখে আয়।

নীলকমলের মতো রাশভারি মাস্টার আমাদের সকলের সামনে অবলীলা-ক্রমে এই একফোঁটা ছেলেকে ইস্কুল পালাতে পরামর্শ দিলেন। সেই নিরীহ শিশুর ইতিমধ্যে এমন উন্নতি হয়েছে যে, তার শাস্তি-গ্রহণের সাক্ষি হবার জন্য শিক্ষক-ছাত্র সকলে মাঠে এসে দাঁড়িয়ে আছি কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে। আমরা সবিস্ময়ে বলাবলি করি—হাবা ছেলেটা কি কাণ্ড করে বসেছে না জানি, যার জন্যে কচি মাথার উপর বজ্র নিক্ষেপের এই আয়োজন।

অবশেষে অপরাধ জানা গেল। কানুর ক্লাশের একটি ছেলে চুপিচুপি বলল। লারমোর হেডমাস্টারের সঙ্গে ক্লাস পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন। কানুদের ক্লাসে গিয়ে সদুপদেশ দান করছিলেন, ছেলেরা এই যে 'বন্দে মাতরম্' বলে হল্লা করে বেড়াচ্ছে, ধামা-ধামা বিলাতি নুন এনে পুকুরের জলে ঢালছে, বিলাতি কাপড়ে আগুন দিচ্ছে—এ সমস্ত অত্যন্ত অনুচিত, ছাত্রদের শুধু একমনে পড়াশুনা করাই কর্তব্য। সুরেন বাঁড়ুজ্যের নামে খুব গালিগালাজ করলেন এই প্রসঙ্গে। কানু উঠে সাহেবের কাছে এল। তার নধর সুন্দর চেহারা দেখে প্রসন্ন হাসি ফুটল সাহেবের মুখে, কি চাই—বলে সস্নেহে তাকে প্রশ্ন করলেন। কানু মুখে কিছু না বলে একগাছি হলদে রাখি পরাতে গেল সাহেবের হাতে। পরাতে পারে নি, সাহেব ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিলেন।

সকলে সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছি। একবার কানুর দিকে আর একবার হেডমাস্টার ও লারমোর সাহেবের দিকে তাকাই। হেডমাস্টার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, সকলের সামনে সাহেবের পা ধরে মাপ চা, নয় তো রক্ষে নেই। নিজের কান নিজে মল্। বল্, আর কক্ষণো এমন করব না।

কানু জবাব দেয় না, ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। হেডমাস্টার এক থাপ্পড়

কষিয়ে দিলেন তার গালে। কানু পড়তে পড়তে সামলে নিল। তেমনি স্থাণুর মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি অফিস-ঘর থেকে বেত নিয়ে এসে সপাসপ কানুর পিঠে মারতে লাগলেন।

নীলকমল মাস্টার ছুটে গিয়ে কানুকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্যাকুল পক্ষীমাতা যেমন পালক দিয়ে ঢাকে শাবককে।

হেডমাস্টার বললেন, সরে যান নীলকমলবাবু। এত বড় শয়তানের উপর দয়া দেখাতে চান?

নীলকমল বললেন, সাহেব ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট—আমাদের আপনার লোক। তাই একটা রাখি পরাতে গিয়েছিল। এই সামান্য ব্যাপারে এত উত্তেজিত হয়েছেন কেন আপনারা?

হেডমাস্টার বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন, সরে যেতে বলছি, আপনি তা শুনবেন না? বুঝতে পারি না, আপনি কি করে উৎসাহ দেন এ ব্যাপারে।

নীলকমল দাস সৎকাজে ছেলেদের চিরদিনই উৎসাহ দিয়ে এসেছে।

লারমোরের রোষদৃষ্টি কিংবা হেডমাস্টারের আস্ফালনে কিছুমাত্র দৃকপাত না করে কানুর হাত ধরে তিনি বেরিয়ে গেলেন। হেডমাস্টার চেঁচিয়ে বললেন, আর ঢুকবেন না কোনদিন ও-ফটক দিয়ে। প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমে আপনাকে বরখাস্ত করা হল।

নীলকমল বললেন, ইস্কুলটাকে আপনারা জল্লাদখানা করে তুলেছেন। কচি ছেলেপুলের উপর জল্লাদ-বৃত্তি করা পোষাবে না আমরাও।

নীলকমল আর ইস্কুলে ঢোকেন নি। ক'টি ছেলে পড়াতেন, আর খাতা লিখতেন হাটখোলায় এক মহাজনের গদিতে। একলা মানুষ—নিজে রান্না করে খেতেন—এতেই চলে যেত। কিন্তু কানু ফিরেছিল। তার বাবা মহা-মহোপাধ্যায় হরিচরণ ন্যায়তীর্থ এ অঞ্চলের সর্বশ্রদ্ধেয়। সাহেবপাড়াতেও তাঁর খাতির ছিল। একবার এই লারমোরের জন্যই বহু আয়োজনে তিনি তিনদিন-ব্যাপী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছিলেন। কানুর বৃত্তান্ত কানে গেলে সেই বিকালেই ন্যায়তীর্থ মশায় ছেলেকে হিড়হিড় করে টেনে এনে হেডমাস্টারের সামনে হাজির করলেন। লারমোর তখনো চলে যান নি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ করজোড়ে কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন। তাঁর বড় ছেলে এই ইস্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে পাশ করেছে, এখনো সে সাহেবসুবো ও পূজ্যজনের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস করে না। আর এই একফোঁটা ছেলের এই রকম দুষ্প্রবৃত্তি—নিশ্চয় কুসঙ্গে পড়ে এমনটা হয়েছে। ন্যায়তীর্থ মশায় হায়-হায় করতে লাগলেন।

কান্থর অপরাধের মার্জনা হল। যথারীতি সে ইস্কুলে পড়াশুনা করতে লাগল। কিন্তু কুসঙ্গ ছাড়াতে পারলেন না হেডমাস্টার বা ন্যায়তীর্থ মশায় অহরহ সতর্ক দৃষ্টি রেখেও।

ক্লাসের দেয়ালে হঠাৎ একদিন একখানা কাগজ আঁটা দেখলাম—

লারমোর ও তাহার তাবেদার ঐ হেডমাস্টার ত্রৈলোক্য গড়গড়িকে আমরা চক্ষের পলকে শেষ করিতে পারি। কিন্তু মশা মারিবার জন্য তোপের অপব্যয় করিব না। অস্ত্রবলে ইংরেজকে দূর করিব, তাহারই বিরাট আয়োজন হইতেছে। আমরা তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছি। যে-কেহ আত্মদান করিতে চাও, অতি সহজে সন্ধান পাইবে।

সন্ধান পেয়েছিলাম। আমি, কান্থ ও আরও অনেক। অস্ত্রের বিরাট আয়োজনই বটে। ইস্পাতের নয়—সর্বত্যাগী শত শত বীর কিশোরের দেশপ্রেম ও বীর্যের অস্ত্র।

হাল ফ্যাসানের বাড়িটা দেখছ বুঝি অবাক হয়ে! পল্লীগ্রামে এমন বাড়ি দুর্লভ। প্রফুল্ল তৈরি করেছে—এরই কথা বলছিলাম নিশিকান্ত। বিয়াল্লিশ সালে আমরা জেলে ছিলাম, তখন মিলিটারি সাপ্লাইয়ে এবং পরের বছর দুর্ভিক্ষের সময় চাল ধরে রেখে সে দেদার টাকা কামিয়েছে। বেনামি ব্যবসা—কাগজপত্রে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া পাবে না সব্যসাচী নাম দেওয়া চলে প্রফুল্লর—অর্থার্জন আর দেশসেবা একসঙ্গে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে শেষবার জেলে গিয়েছি। শেষবার বলা ঠিক হল না হয়তো। স্বাধীন-ভারত হলে কি হয়, আমাদের কথা বলবার জো নেই। গাজনের সন্ন্যাসীর অবস্থা হয়েছে, ঢাকের বাজনা শুনলেই পিঠ সুড়সুড় করে ওঠে। ইংরেজদের সঙ্গে অসম-সংগ্রামে দীর্ঘকাল লাঞ্ছনা-নির্যাতন সয়ে সয়ে বড় স্পর্শকাতর হয়ে আছি আমরা। কান্থর কথা, প্রভাস মহাবাজের কথা আরও কতজনের কত কথা মনে আসে। তাদের নিষ্ঠার মধ্যে একতিল ফাঁকি ছিল না—তেমনি তাদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতার মধ্যে একবিন্দু মালিন্য সহ্য হবে না আমাদের। এরকম মনোবৃত্তি নিয়ে কতদিন চলতে পারব প্রফুল্লদের সঙ্গে?

কিন্তু থাক এ সব। এক বছরের জেল হয়েছিল, সে তো আমাদের কাছে একদিনের সর্দিজ্বরের শামিল। জেল থেকে বেরিয়ে কিছুকাল এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে গ্রামে এসেছি। প্রফুল্ল এল দেখা করতে। কেন জানি না, আমায় সে অত্যন্ত খাতির করে। অথচ নির্বিরোধী মানুষ আমি, চালের

কারবারের তথ্য উদ্ঘাটনে লেগে যাব—এমন আতঙ্ক নিশ্চয়ই তার নেই আমার সম্পর্কে। ইংরেজ ছাড়া কেউ কোন দিন আমার শত্রু নয়। ইংরেজও আর শত্রু থাকবে না যদি সরল মনে সত্যি সত্যি নিঃসম্পর্ক হয়ে যায় এদেশের সঙ্গে—নাক ঢুকিয়ে ফের শয়তানি করতে না আসে।

প্রফুল্ল বলল, ভাল হয়েছে—তুমি এসে গেছ। শুনেছ বোধ হয়, হাপলার মা'র বাড়ির জায়গাটা কিনে আমি বাড়ি তোলবার ব্যবস্থা করছি। হাসি কি করে টের পেয়ে গেছে কানুর সমস্ত বৃত্তান্ত।

আজকে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রফুল্ল আমাদের সেকালের গোপন কাহিনী জাহির করে বেড়াবে। তাতে তার পশার বাড়বে, আখেরের সুবিধা হবে। কিন্তু সেদিন স্বাধীনতা আসে নি। তাই চারিদিক সন্তর্পণে তাকিয়ে চুপি-চুপি প্রফুল্ল বলল, একসময় গিয়ে জায়গাটা নিরিখ করে দিয়ে এস। আমি পেরে উঠলাম না। জায়গা সাব্যস্ত হলে আলাদা করে ঘিরে সেখানে কানুর স্মৃতিস্তম্ভ গেঁথে দেব।

দু-একদিন অন্তর এসে ঐ কথা তোলে। তাগিদ দিয়ে দিয়ে অস্থির করে তুলল। শেষকালে একদিন কোদাল আর কয়েকটি ছেলে নিয়ে চলে এলাম এখানে। সেকালের মতো এখনকারও কিশোর একদল আমায় ভালবাসে, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, যা বলি তখনই তামিল করে।

খোঁড় দিকি এই জায়গায়। হাত তিনেক খুঁড়লেই বোঝা যাবে। খোঁড় আচ্ছা, আর খানিক দক্ষিণে গিয়ে খোঁড়—যতক্ষণ না পাস এমনি খুঁড়তে খুঁড়তে চলে যা। নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

খুঁড়ছে তারা। কড়া রোদ, সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। খুঁড়ে যাচ্ছে তবু।

একজনে প্রশ্ন করল, গুপ্তধন আছে নাকি দাদা এখানে?

সে কি আজকের ব্যাপার নিশিকান্ত? জোয়ান-যুবা ছিলাম, এখন বুড়ো হয়েছি—ছেলেদের কথায় হাসি পায়। সত্যি, গুপ্তধনই বটে! এমন মণি-মাণিক্য ক'টা জাত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে?

হাসিমুখে আমি জায়গার নির্দেশ দিচ্ছি—উঁহু, এদিকটায় আর নয়। ডোবা ছিল, ডোবার পাশে আমবাগান। এখানে হবে কি করে? কি হে, হাত-পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে কেন? তোমাদের ওধারেই হবে।

কোদাল মারতে মারতে কি অবস্থা হয়েছে দেখুন দাদা—

যার দিকে চেয়ে বলছিলাম, সে হাত মেলে দেখাল। টুকটুকে ফরসা

বড়লোকের ছেলে—কোদালের মুঠো জীবনে ধরে নি। হাত রাঙা হয়ে গেছে।

এত কষ্ট দিচ্ছি ওদের, তার জন্য অপ্রতিভ হই। বললাম, কি করব—ধরতে পারছি না যে, তখন এরকম ছিল না—বনজঙ্গল, বাগিচা, ন্যাপলার মা'র দো-চালা কুঁড়েঘর একখানা। অন্ধকার রাত্রি—তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলেছিলাম। জায়গার নিশানা রাখা হয় নি, আর সময়ও ছিল না তাই। আবার কোন দিন যে খুঁড়ে দেখবার দিন আসবে, একালের সোনার ছেলে তোমরা কোদাল হাতে এসে জুটবে, সে কি ভাবতে পেরেছি সেদিন ?

উৎসাহ দিয়ে বলি, খোঁড়—খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে পেয়ে যাবে একটা কলসি। সোনার নয়, পিতলের নয়, মাটির কলসি।

কলসির ভিতর ?

সেই ফরসা বাবু-ছেলেটি বলল, সোনার মোহর—

আর একটি ছেলে বলে, মোহর আসবে কোত্থেকে ? বড়লোক ছিলেন না তো এঁরা—

বড়লোকেরা দিত ! টাকা নইলে এত সব কাজ চলত কি করে ?

আমি বললাম, দিত কি সাধ করে রে ভাই।

সেই পুরানো কালের কথা ভেবে কষ্ট হয়। কত শক্তি, উদ্যোগ ও জীবন নষ্ট হয়েছে টাকা-সংগ্রহের ব্যাপারে। তরুণেরা প্রাণ দিতে আকুণ্ঠে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু টাকার সিন্দুক আগলে ছিল বড়লোকেরা। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, মহা-শক্তিধর ইংরেজকে বিদায় নিতে হবে অদূরকালে, সর্বরিক্ত স্বপ্নবিলাসী আমাদেরই দল জয়যুক্ত হবে।

একটি ছেলে আমার কথার পরিপূরণ দিল, দিত না বলেই তো এঁরা ডাকাতি করে আনতেন।

আমি হেসে বলি, ডাকাতি কখনো স্বীকার করি নি। বলে আসা হত, দেশের কাজে ঋণ নেওয়া হচ্ছে, স্বাধীন-ভাবতে সুদ সমেত পরিশোধ করা হবে। সেই সব উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারীরা জাতীয়-ঋণ বলে স্বচ্ছন্দে টাকার দাবি করতে পারে আজকের গবর্নমেন্টের কাছে। দেশের কাজেই লেগেছিল সে টাকা পুরোপুরি। এক একটা রিভলভারেরই জন্য লাগল পাঁচ-শ' থেকে হাজার। কী রকম খরচ তা হলে বোঝ।

গাছতলায় ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। নজরের সে জোর নেই। একেবারে অপরিচিতের মধ্যে এসে পড়েছি, এইরকম মনে হচ্ছে। গাছপালা-বিহীন এই সুপ্রশস্ত জায়গা, আশে পাশে উদ্ধত আধুনিক বাড়ি কয়েকটা—

সেকালের সঙ্গে কিছুতেই এদের যোগ ঘটাতে পারে নি। দু-তিন বছর পরে এক একবার জেল থেকে বেরিয়ে নূতন পরিচয় শুরু করি—ভাল চেনা-জানা হবার আগেই আবার ধরে নিয়ে আটকে রাখে।

বিকাল অবধি বিশ-পঁচিশ জায়গায় খুঁড়েও মাটির কলসি পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি গেলাম। ডাক্তার যথারীতি কলে বেরিয়ে গেছে। দু-হাতে রোজগার করছে সে-ও, তাকে বাড়ি পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার। মানইজ্জত খুব। প্রফুল্লর হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তো আছেই—তা ছাড়া গবর্নমেন্টের পেয়ারের লোক হয়ে উঠেছে এই জয়রামপুরে থাকা সত্ত্বেও। আর বেশি দিন এখানে থাকবে না জানি, কলকাতায় গিয়ে উঠল বলে ভাল সরকারি চাকরি নিয়ে।

তিন বার গিয়ে রাত্রি সাড়ে-নটায় ডাক্তারের দেখা পেলাম। মোটরসাইকেল কিনেছে, সাইকেল চাকরের জিম্মায় দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল, আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারান্দায় এল।

চোখে আজকাল কম দেখছি অমূল্য ভাই, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। তুমি নিশ্চয় জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে।

কোন জায়গা?

মনে পড়ছে না? ন্যাপলার মা'র বাড়িতে সেই যে রাত্রিবেলা—

অনেক দিনের কথা, মনে না পড়ার জন্য অমূল্যকে দোষ দেওয়া যায় না। অবশেষে তার মনে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলে, আমাকে আর ও-সবের মধ্যে কেন দাদা? ও বি. ই টাইটেল দিয়েছে এবার আমাকে।

বললাম, ভোরবেলা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে তুমি একটু আন্দাজ দিয়ে এসো। বেড়াচ্ছ না বেড়াচ্ছ—কে দেখছে অত সকালে? ছেলেরা আজ সমস্তটা দিন জমি কুপিয়ে আধমরা হয়ে গেছে।

কবে কে আমার হাত এড়াতে পেরেছে বল নিশিকান্ত? এখনই দেখছ তো—তোমাদের এমন জরুরি মীটিং, তবু কাজকর্ম ফেলে গল্প শুনে বেড়াচ্ছ তুমি এই বুড়োর সঙ্গে। অমূল্য ডাক্তারকে এইখানে এনে তবে ছাড়লাম। খুব ভোরবেলা—রাত আছে বললেও হয়—সেই সময়ে দুজনে এসেছি। আমবাগান কেটে ফাঁকা করে ফেলেছে। বাড়ির সীমানা ঠিক করে খুঁটো পুঁতেছে। ইট এনে ঢেলেছে গাড়িগাড়ি খোয়া ভেঙে পাহাড় জমিয়েছে। অমূল্যর চোখ চকচক করে উঠল।

উঃ—বিষম বাড়ি ফেঁদেছে তো এতটা জমি নিয়ে! এদিকে আজকাল বড় একটা আসা হয় না—এত বড় ব্যাপার, তা জানতাম না।

ঘুরে ঘুরে সন্ধান করছে, কিন্তু মন তার ওদিকে। আবার বলতে লাগল, অ্যাসেম্বলির মেম্বর—মোটা মাইনে-ভাতা, তার উপর সাপ্লাইতে কম টাকা পিটেছে! ডাক্তারি না করে পলিটিক্সে নামলে মুনাফা অনেক বেশি ছিল দেখছি। আর আমার সুযোগ ছিল—আধাআধি তো নেমেই ছিলাম। কি বলেন?

অবশেষে সন্ধান হল জায়গাটার। অমূলাই দেখাল।

কাঁঠালগাছের গর্তের ভিতর মৌচাক হয়েছিল—মনে আছে দাদা? এই যে সেই গাছের গোড়া। আপনার চোখ খারাপ বলে দেখতে পান নি। কাঁঠালগাছের গোড়া নিশানা করে খুঁড়তে বলবেন ওদের। খুঁড়তেও হবে না, ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, খড়ি দিয়ে দেগে দিয়ে গেছে এই দেখুন। কত বড় বড় ঘর ফেঁদেছে—উঃ।

অমূলা দেরি করল না, মানুষজন এদিকে এসে পড়বার আগেই অদৃশ্য হল।

ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, শুনে আরও ব্যস্ত হয়ে ছেলেদের ডেকে নিয়ে এলাম। প্রফুল্লর এত হাঁটাহাঁটি তো এই ভয়েই—কবরের উপর পাছে বাড়ি তুলে বসে।

খোঁড়—

মিস্ত্রি-মজুরেরা হাঁ-হাঁ করে এল। এখানে কি মশাই? আরে যেখানে যা ইচ্ছে করুন গে, ভিতের উপর কোদাল চালাতে দেব না।

বললাম, তোমাদের বাবুকে খবর দাও গিয়ে। তার কাছ থেকে শুনে এস, সেই-ই বা কি বলে।

ছুটে চলল তারা। কাজ বন্ধ করি নি, ছেলেরা খুঁড়ে চলেছে। কিন্তু মানা করতে কেউ ফিরে এল না। পরে সরকার বাবুর মুখে শুনেছিলাম ওদের যা কথাবার্তা হয়েছিল প্রফুল্লর সঙ্গে। প্রফুল্ল অবহেলার ভাবে জবাব দিল, যাকগে বুড়োমানুষ যা করছেন করতে দাও—

সরকার আশ্চর্য হয়ে বলল, এদ্দিন এদিকে-ওদিকে হচ্ছিল—আজকে যেখানটায় আরম্ভ করছেন, তাতে আমাদের প্ল্যান মতো কাজ করা কোন মতেই আর চলবে না।

প্রফুল্ল বলল, প্ল্যান বদলাতে হবে তা হলে। চুপচাপ দু-চারদিন তোমরা বসে থাক গে, ওদিকে যেও না। ওঁর যা করবার, উনি করে চলে যান।

দু-চার দিনের আর দরকার হয় নি নিশিকান্ত, কলসি সেইদিনই পাওয়া গেল। ঠুক করে একটু আওয়াজ হল কোদালের আগায়। গাছতলায় বসে ক'টি ছেলের সঙ্গে আমি গল্পগুজব করছিলাম। ক্ষীণ শব্দ শুনে ছুটে এলাম সেই জায়গায়।

বেরিয়েছে ? ইস, কানায় কোপ ঝেড়ে দফাঠি সেরে দিয়েছিস একেবারে ! কলসির কানা একটুখানি ভেঙে গিয়েছিল কোদালের কোপ লেগে। ছেলেরা নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করছে কি আছে ওর ভিতর, যার জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছি ঐ কলসি আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু দেখবার কিছু নেই আপাতত। মাটি ঢুকে কলসির ভিতরটা বোঝাই—সোনার মোহর ইত্যাদি যদি থাকে তো ঐ মাটি চাপা পড়ে আছে। মাটি বের করে দেখবে তার আগেই আমি এসে পড়েছি।

হ্যাঁ—এইটেই। এইটে বলে মনে হচ্ছে। এক কাজ কর্—একটা খোঁটা পুঁতে রাখ ঐখানটায়। কলসি তুলে নিয়ে আয়—দেখি, সেই কলসি কি না—

কলসি উপরে নিয়ে এল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মাটি বের করে ফেলছি। ছেলেরা চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে, নিশ্বাস পড়ছে না কারও যেন। তারা মনে করছে, কী তাজ্জব জিনিস না জানি এর মধ্যে, সাত রাজার ধন কোন মানিক। মাটি বের করে যাচ্ছি আমি, কলসির তলা অবধি শুধুই মাটি। এ কলসি নয় নাকি তবে? তারপর পেয়ে গেলাম। আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে ছেলেদের বলি, হাঁ—এই বটে !

মুঠো খুলে তাদের দেখালাম—কড়ি কতকগুলো। বললাম, পাওয়া গেছে রে—এ সেই জায়গা। কলসি যেমন ছিল বসিয়ে রেখে আয় ওখানে।

ছেলেরা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার চোখে সহসা জল আসবার মতো হল। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললাম, খোঁটার আগায় নিশান উড়িয়ে দে। কানু গাঙ্গুলির কবর এখানটায়।

গাঙ্গুলির কবর—বলেন কি ?

মহামহোপাধ্যায় হরিচরণ ন্যায়তীর্থ মশায়ের ছেলে।

বুড়ো হয়ে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে নিশিকান্ত, অতি-নিকটের জিনিসও স্পষ্ট দেখতে পাই নে। মনের দৃষ্টি কিন্তু পরিচ্ছন্ন আছে। বরঞ্চ বুড়ো হয়ে যেন স্বচ্ছতর হচ্ছে দিন দিন, দূর-কালের ঘটনা জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। যেন এখন—এই মুহূর্তে ঘটেছে সমস্ত চোখের উপর। আজকে জয়রামপুরের সমৃদ্ধি বেড়েছে; মিউনিসিপ্যালিটি বসেছে, অনেকগুলো পাকা-রাস্তা। তখন একটা মাত্র পাকা-রাস্তা ছিল সাহেবপাড়া থেকে আগরহাটির গঞ্জ অবধি। তারপর মিটার-গেজের লাইন বসল পাকা-রাস্তার পাশ দিয়ে, রাস্তারই একটা অংশ দখল করে। ভদ্রার কূলে সাহেবপাড়ার প্রান্তে রেলের

ওয়ার্কশপ। মোটরবাসের দৌরাত্ম্যে রেললাইন শেষাশেষি অচল হয়ে ওঠে; সাহেব-কোম্পানি এক ভাটিয়ার কাছে সবসুদ্ধ বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ল। এসব ভিন্ন এক কাহিনী। এখন ছোট-রেলের কোনই চিহ্ন নেই এ অঞ্চলে, যুদ্ধের সময় লোহার পাটিগুলো অবধি উপড়ে নিয়ে গেছে।

তখন দস্তুরমতো যুবাপুরুষ আমি—বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি নয়। অন্ধকারে পিছল মেঠো-পথ ধরে টিপি-টিপি চলেছি। আজকের স্বনামধন্য প্রফুল্ল মজুমদার এম. এল. এ. মশায়ও সেই দলে। প্রফুল্লর বাড়ি থেকেই সব রওনা হয়েছি। প্রফুল্লর বোন হাসি। মোটা থপথপে বিধবা মেয়েটা তখন ছিল নিতান্ত ছেলেমানুষ। কী রকম সন্দেহ হয়েছিল বুঝি তার—যাবার সময় জোর করে একমুঠো সন্দেশ খাইয়ে দিল কানুকে। কানু কিছুতেই খাবে না তখন হাসি তার হাত ধরে ফেলল। জীবনে সেই প্রথম সে তার হাত ধরল—গা শিরশির করে উঠেছিল কি-না বলতে পারিনে সে-দিনের কুমারী মেয়ে হাসির।

অন্ধকার বর্ষারাতে পা টিপে টিপে সকলে যাচ্ছি। নীলরতন মাস্টার ফিসফিস করে নির্দেশ দিচ্ছেন, বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে তাঁর কণ্ঠের মৃদু আওয়াজে। হ্যাঁ—দেয়ালে আঁটা সেই কাগজের লেখকের সন্ধান করতে করতে নীলরতন মাস্টার মশায়ের নূতন পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা। ফেরারি হয়ে ছদ্মনামে জয়রামপুরে এসেছিলেন। বছর চারেক পরে আবার একদিন সহসা অদৃশ্য হয়ে যান।

ওয়ার্কশপের কুলি-বস্তি উত্তীর্ণ হয়ে আর খানিকটা গিয়ে সাহেবপাড়ায় পা দিলে মনে হয়, নন্দনকাননে এসে পড়লাম নাকি? ওদের সুস্থ ছেলেমেয়েগুলো পরিচ্ছন্ন লনের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কোঁকড়ানো সোনালি চুল বাতাসে ওড়ে। রাত্রে জোরালো পেট্রোমাক্স জ্বলে প্রতি বারান্দায়, রেকর্ডে নাচের বাজনা বেজে ওঠে। আর রাস্তার অন্ধকার মোড় থেকে বস্তির ছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অকারণে উল্লসিত হয়, ঘরে এসে সাহেবপাড়ায় কি দেখে এল সেই গল্পগুজব করে, দূরের গ্রাম থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব যারা আসে—তাদের কাছে সগর্বে ঐ সব কাহিনী বলে।

খবর এসেছিল, লারমোর সাহেব অনেক টাকা নিয়ে সদর থেকে এসেছেন। মরশুম এসে পড়েছে—পাট কিনবার জন্য এখন হপ্তায় হপ্তায় টাকা আসবে কলকাতার হেড-অফিস থেকে। গাড়ি আজ লেট ছিল, সন্ধ্যার পরে এসে পৌঁছেছেন, সমস্ত টাকা সাহেব নিজের কোয়ার্টারে আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েছেন, অফিসের আয়রন-সেফে রাখেন নি—এ অঞ্চল অনেক দিনের চেনা-জানা—টাকাকড়ি সম্বন্ধে অত্যধিক সতর্ক হবার প্রয়োজনও মনে করেন নি।

একটা কথা জেনে রাখ নিশিকান্ত, সাদা চামড়ার মানুষগুলোর মধ্যে এমন কাপুরুষ আছে, যাদের জুড়ি সারা দুনিয়ায় নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগে লবণ সত্যাগ্রহে কিংবা আগস্ট-আন্দোলনের সময় বহুক্ষেত্রে ওদের বীরত্বের বহর সবাই দেখেছে—আর আজকে আমার কাছ থেকে শোন সেই রাত্রে সাহেবপাড়ার বাসিন্দারের বীরত্ব-কাহিনী। গুলি-বোঝাই ছয় সিলিণ্ডার রিভলবার হাতে রয়েছে কিন্তু লারমোর সাহেব ট্রিগার টিপলেন না, কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। আর কানাই সেইটাই তুলে ধরল তাঁর মুখের সামনে। রাত তখন বেশি নয়। দলের একজন দুজন করে দাঁড়িয়েছে এক এক বাংলোয়, সম্রাটের জ্ঞাতিগোষ্ঠি অতগুলো প্রাণীর তাতেই মূর্ছার অবস্থা। মোটের উপর এত নির্গোলে কাজ হাসিল হবে, কেউ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

বেরিয়ে চলে আসছি—সাহেবরা নিপাট ভদ্রলোক, হাতখানা উঁচু করবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে, তারা কিছু করেনি—পিছন দিক থেকে রাইফেলের গুলি কানুর পিঠে এসে বিঁধলে। বাহাদুর বলে এক গুর্খা ছোকরা ছিল পাহারাদার—গুলি করেছে সে-ই। এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, আর অব্যর্থ টিপ—কানাই মাটিতে পড়ে গেল। আর ওদিকে এই গোলযোগে কুলিবস্তি থেকে পিল-পিল করে মানুষ বেরুচ্ছে। মানুষ দেখে সাহেবদের হতভম্ব ভাব কাটল এতক্ষণে, তারাও বেরুল। কানু অসাড়, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। পাশে বসে একটুখানি দেখব, রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করব—সে উপায় নেই। পঙ্গপালের মতো মানুষ আসছে, বিষম হৈ-চৈ, টর্চের আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেছে। মুহুর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

আজ বলে নয়—চিরদিনই সাফ বুদ্ধি প্রফুল্লর, সে এক চালাকি করল। ওদের ধাঁধা দেবার জন্য তিন-চার জনে মিলে উল্টোমুখো পাকা-রাস্তা বেয়ে ছুটল। বুটজুতোর আওয়াজ তুলে সাহেব ক'জন পিছু ছুটেছে। বকুলতলার অন্ধকারে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সুযোগের অপেক্ষায়। সবাই খুব খানিকটা এগিয়ে গেলে কানুকে কাঁধে নিয়ে টিপিটিপি জাঙালের ভিতর দিয়ে বিলের প্রান্তে এসে পৌঁছলাম।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। কানুর মুখখানা ভাল করে একবার দেখবার চেষ্টা করলাম—যে মুখে ওরা লাথি মেরে গেছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে তার সর্বাঙ্গ বেয়ে। সাহেবরা প্রফুল্লর পিছু-পিছু যখন ছুটছিল, বকুলতলা থেকে ওদের টর্চের আলোয় দেখলাম—ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে একজন বুটের লাথি ঝেড়ে দিয়ে গেল চেতনাহীন কানুর মুখে। ফুটফুটে ছেলে

কানাই—পবিত্র পুণ্যবান বংশের ছেলে। নিঃশব্দে নিষ্পলক চোখ মেলে আমি দেখলাম, লাথি মেরে আক্রোশ মিটিয়ে ওরা আবার ছুটল।

কানুকে নিয়ে এলাম ঐ যে বিশাল কম্পাউণ্ড—ওরই ভিতর। তখন প্রকাণ্ড আমবাগান, তার এক প্রান্তে জেলেদের এক বুড়ি কুঁড়ে বেঁধে বসতি করত—ন্যাপলার মা বলে ডাকত সকলে। কখন কখন শুধুমাত্র 'মা' বলে ডাকতাম আমরা, মা ডাকে বুড়ি গলে যেত। কত যে ঝঞ্ঝাট পোহাত! রাতবিবেতে যখনই দায় পড়ত, আমরা চলে আসতাম ন্যাপলার মা'র ওখানে। ন্যাপলার মা আজ বেঁচে নেই, তার ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্রও নেই,—কতদিন আমাদের কত সাহায্য করেছে, কত ঘটনার সাক্ষি ছিল সে! দশ বাড়ি ধান ভেনে গোবর মাটি লেপে খাওয়া-পরা চালাত—বক-বক করা ছিল তার স্বভাব, কাজ করতে করতে কোন্ অদৃশ্য অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে গালি পাড়ত, যত কষ্ট হত গালিরও জোর বাড়ত তত বেশি। কিন্তু আশ্চর্য, কখনো কোন অবস্থায় আমাদের বিষয়ে একটা কথা বুড়ি উচ্চারণ করে নি।

ন্যাপলার মা'র ঘরের ভিতর তো এসে নামালাম কানুকে। টেমি জ্বলছিল, ফুঁ দিয়ে বুড়ি সেটা নিভিয়ে দিল—কি জানি খোঁজে খোঁজে কেউ যদি এসে পড়ে। কানুর তখন জ্ঞান ফিরেছে অল্প অল্প। অস্পষ্ট কণ্ঠে জল চাইল। ন্যাপলার মা সজল চোখে—বাসনপত্র তো নেই—নারিকেলের মালায় জল গড়িয়ে দিল। কানুকে নামিয়ে রেখে আমি ছুটে বেরিয়েছি ডাক্তারের সন্ধানে। ডাক্তার এনে ফল যা হবে, সে অবশ্য জানাই আছে। তবু মনকে প্রবোধ দেওয়া—ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। আর ডাক্তারও সেই সময়টা সহজলভ্য ছিল—ঐ অমূল্য সরকার। তাকে খবর দেওয়ার অপেক্ষা।

পুরোপুরি ডাক্তার নয় তখন অমূল্য কোথ ইয়ারে পড়ত। প্লুরিশির মতো হয়—মাস ছয়েক তাই গ্রামে থেকে বিশ্রাম করছিল। এ ব্যাপারে বাইরের কাউকে ডাকা চলে না। অতএব অমূল্যের চেয়ে ভাল ডাক্তার আর কোথায়?

অমূল্য ঘুমুচ্ছিল। বাইরের একখানা চৌরিঘরে সে শুত, আমার জানা ছিল। দরজায় টোকা দিলাম, ঘুম ভাঙল না। তখন ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়া দু-হাতে একটু ফাঁক করে ফিসফিস করে ডাকতে লাগলাম, অমূল্য! অমূল্য! সে পাশ ফিরে শুল। বাখারি ছিল একটা পড়ে, সেইটে ঢুকিয়ে খোঁচা দিতে ধড়মড় করে অমূল্য উঠে বসল।

কি!

চুপ! বেরিয়ে এসো—

মেঘ জমে আছে আকাশে, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বললাম, বুলেট রয়ে গেছে, বের করে ফেলতে হবে। শিগগির চল।

অমূল্য বলে, তাই তো—অপারেশনের যন্ত্রপাতি কিছু যে নেই আমার কাছে। যেন যন্ত্রপাতি থাকলেই আর কোন রকম ভাবনার বিষয় ছিল না। যাই হোক, যন্ত্রও মিলল অবশেষে, খুঁজে-পেতে, ভোঁতা একটা ল্যানসেট পাওয়া গেল তার বাক্সের মধ্যে। সেইটে আর এক শিশি আইডিন পকেটে পুরে অমূল্য দ্রুতপায়ে আমার সঙ্গে চলল।

গিয়ে অবাক। আশাতীত ব্যাপার—কানু বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, টরটর করে কথা বলছে। প্রফুল্ল ফিরে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে তখনও—হাঁপাতে হাঁপাতে কৃতিত্বের গল্প করছে, কেমন করে ধোঁকা দিয়ে দলসুদ্ধ সে খেয়াঘাট অবধি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বোঁ করে দৌড় দিল পাটক্ষেতের দিকে—পুরো দমে ছুটলে তাকে ধরতে পারে কে? এ ক্ষেত থেকে সে ক্ষেত—শেষকালে চারিদিকে দেখে-শুনে সন্তর্পণে এখানে চলে এসেছে।

আবার টেমি জ্বালতে হল ডাক্তারকে অবস্থা দেখাবার জন্য। হাসিতে উদ্ভাসিত কানুর মুখ, প্রফুল্লর গল্প সে খুব উপভোগ করছে। বুলেট আটকে রয়েছে পিঠের দিকটায়, এখনও রক্তবন্ধ হয় নি, যন্ত্রণায় মুখ এক একবার কালিবর্ণ হচ্ছে, দেহ আকুঞ্চিত-হয়ে উঠছে, হাসির প্রলেপ কিন্তু তার ঠোঁট দু-খানার উপর।

টেমির আলোয় তিন দিকে ভাল করে ঢেকে দেওয়া হল, কানুর দেহ ছাড়া বাইরে কোন দিকে আলোর রেশ না বেরোয়। প্রফুল্ল আর আমি দু-পাশে তৈরি হয়ে বসেছি, কানু ইসারায় মানা করল—ধরবার প্রয়োজন হবে না তাকে।

দাঁতে দাঁত চেপে সে উপুড় হয়ে আছে, অমূল্য ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে ল্যানসেট একবার আধ-ইঞ্চিখানেক বসিয়ে আবার তুলে নিল। যাচ্ছে না ঠিকমতো। নূতন হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে তাতে ঘষে ঘষে ধার দিল যন্ত্রটায়। আগুন করে একটুখানি সেঁকে নিয়ে এমনভাবে চিরতে লাগল যে মুখ ফিরিয়ে নিতে হল। এ বীভৎস ব্যাপার চোখ মেলে দেখা যায় না—কাজ সেরে টেমি নেভাতে পারলে বেঁচে যাই।

কিন্তু কোন লাভ হল না নিশিকান্ত, চামড়া চিরে খোঁচাখুঁচিই হল খানিকটা। নিঃশব্দে অমূল্য নাড়ি ধরে বসে আছে। একবার দেশলাই জেলে হাতঘড়ি দেখল—সাড়ে তিনটে। মেঘভাঙা অল্প অল্প জ্যোৎস্না ফুটেছে তখন। তিনজনে আমরা মাটির উপর উবু হয়ে বসে আছি। ন্যাপলার মা জল গরম করবার জন্য মাচার উপর থেকে টেনে শুকনো নারিকেলপাতা বের করছে। প্রফুল্ল ডেকে বলল—থাক মা, আর দরকার হবে না।

ধপ করে দাওয়ার উপর সেইখানেই বসে পড়ল ন্যাপলার মা।

আমগাছের বাসা থেকে হঠাৎ কাক ডেকে উঠল। আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে আমরা চমকে উঠলাম—রাত আছে মোট ঘণ্টা দেড়েক। ন্যায়তীর্থ মশায় গত হয়েছেন—প্রফুল্ল ছুটল কানুর দাদা বলরামের কাছে—একটিবার শেষ দেখা দেখতে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ নিশিকান্ত, রায়সাহেব বলরাম গাঙ্গুলী, ডাকনাম ছিল বলাই। অমন অবাক হয়ে তাকাবার কি আছে? এমনি সর্বত্র—ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ইংরেজের খোসামুদি করে যারা দিন গুজরান করত, খোঁজ করলে হয়তো দেখতে পাবে, ইংরেজদের প্রবলতম শত্রু তাদের বাড়িতেই। লাঠি মেরে মাথা ফাটানো যায়, কিন্তু মনের মাথায় যে লাঠি পড়ে না! শেষাশেষি আর এদেশে ইংরেজদের নিরাপদ ভূমি এক টুকরোও ছিল না—কেউ ভাল চোখে দেখত না ওদের! কম মুশকিলে পড়ে ওরা ভারত ছেড়েছে!

হাত তিনেক গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আমতলায় নাটার ঝোপের আড়ালে। গর্তের ভিতর কানুকে এনে নামানো হল। এমন সময় রায়সাহেব এলেন, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গভীর একটা নিশ্বাস চেপে নিলেন।

বলরামকে বললাম, আপনি একা এলেন গাঙ্গুলী মশাই, আপনার মাকে নিয়ে এলেন না কেন? তিনিও একটু দেখে যেতেন।

বলরাম বিচলিতভাবে না-না করে উঠলেন। বললেন, মা দেখে তো কষ্টই পাবেন শুধু, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবেন। তার চেয়ে আমি রটিয়ে দেব, কানু নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ইদানীং বেড়াচ্ছিল সেইভাবে,—একদিন এক পলক দেখা গেল-তো মাসখানেক আর পাত্তা নেই। না-না, মাকে আর এর মধ্যে টানাটানি করতে যেও না। এক কান দু-কান করে ছড়িয়ে যাবে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—বাড়িসুদ্ধ টান পড়ে যাবে আমাদের।

পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে কানুর মুখের উপর। ঝুরঝুর করে আমি আর অমূল্য গুঁড়ো-মাটি ছড়িয়ে দিচ্ছি দেহের চারিদিকে। প্রফুল্ল চলে গেছে আজকের ব্যাপারে টাকাকড়ি যা পাওয়া গেছে, তার বিলিব্যবস্থা করতে। নিষ্পলক চোখে চেয়ে চেয়ে সহসা রায়সাহেব বলে উঠলেন, মহামহোপাধ্যায়ের ছেলের শেষটায় কবর দিলে তোমরা?

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিছু বলছি নে এ নিয়ে। শ্মশানে নিতে গেলে জানাজানি হয়ে পড়বে, এ ছাড়া উপায় কি? যে যেমন অদৃষ্ট করে এসেছে!

বলে নিশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে গেলেন।

আমি বললাম, হিন্দু আর মুসলমান, শ্মশানঘাট আর কবরখানা—যারা খবরের কাগজের রাজনীতি করে, পাখার নিচে বসে বখরার হিসাব কষে, তাদের কাছে! লড়াইয়ের মুখে জাত-বেজাতের হিসাব থাকে না রায়সাহেব।

মাটির বড় চাঁইগুলো কানুর নধর গায়ে চাপাতে কেমন মায়া লাগছিল, তার মাথার ধারে বসে হাতের মুঠোয় মাটি গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ফেলছি। ন্যাপলার মা এই সময়ে মাটির কলসি আর পাঁচ কাহন কড়ি এনে বলল, দাও বাবা. এ সব ওর সঙ্গে দিতে হয়। কড়ি নইলে বৈতরণী পার হতে দেবে না যে!

ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে দুস্তর ভয়াল বৈতরণী নদী। কানুর বিদেহী আত্মার পারানি কড়ি কলসির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হল তার সঙ্গে। ধরণীর এত ঐশ্বর্যের মধ্যে পাঁচ কাহন কড়ি মাত্র শেষ সম্বল—যা এত বছর তার নিঃশেষিত দেহ-চিহ্নের নিশানা হয়ে রয়েছে ভূমি-গর্তে।

গর্ত ভরাট হল। তার উপর নারিকেল-পাতা বাঁশের চেলা সাজিয়ে ঢেকে দিলাম। এইসব কাঠ-পাতা যেন অনেকদিন ধরেই এই রকম পড়ে আছে—কেউ যাতে তিলমাত্র সন্দেহ করতে না পারে!

সন্দেহ কেউ করে নি! অমূল্য বড় ডাক্তার—সরকার মহলে অনেক নাম। রায়সাহেব বলরাম যথারীতি সেলাম বাজিয়ে রায়বাহাদুর-রূপে কিছুকাল আগে রিটায়ার করেছেন। আমাদের প্রফুল্ল এম, এল. এ, হয়ে সরকারি চালসাপ্লাইয়ের কাজ বাগিয়ে নিয়েছে। ন্যাপলার মা বুড়ি কোন্ কালে মরে গেছে। তার সেই বাড়ি আর আশেপাশের অনেক জমি নিয়ে অপরূপ বাগানবাড়ি প্রফুল্লর।

কানুর স্মৃতিস্তম্ভ আজও হয়ে ওঠে নি! কিন্তু এবারে স্বাধীন-ভারতে নিশ্চয় প্রফুল্ল গেঁথে দেবে—আর টালবাহনা করবে না। বছরের একটা দিন বিশ-পঞ্চাশ জন জমায়েত হয়ে সভা করেও যাবে হয়তো এখানে কিন্তু ঐ পর্যন্ত! সেকালের সেই প্রফুল্ল আর নেই। কজনই বা মনে রেখেছে কানুকে! মড়ার পাশে তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়ে টেমি নিভিয়ে দিয়েছিলাম কেউ দেখতে পাবে বলে—সে আলো আবার কেউ জ্বালাতে আসবে না কবরের উপর। কিংবা ঠিক বলা যায় না, প্রফুল্লর বোন ঐ মোটা হাসির ভাবটা কেমন কেমন!

নাছোড়বান্দা তার কাছে একদিন অবশেষে বলে ফেলেছিলাম আগাগোড়া এই কাহিনী। আমা হেন লোক—আমারও মুখ খুলতে হয়েছিল দলের বাইরে ঐ মেয়েটার কাছে! হাসি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই যে চলে-গেলে কোথায় গেলে তোমারা তারপর দাদা? কানাই গেল কোথায়? মিথ্যা বলা আমাদের অনেক সাধনা করে অভ্যাস করতে হয়, জাঁদরেল পুলিস-অফিসারদের মুখের উপর অবাধে কত মিথ্যা বলে গিয়েছি, কিন্তু সজল-চোখ

মেয়েটার সামনে মুখ দিয়ে কিছুতেই আমার মিথ্যা বেরুল না। হাসির চেহারা দেখে তোমার হাসি পাবে হয়তো। ঐ স্থুলবপুর নিচে একটি বেদনা-খিন্ন মন আছে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু চুপিচুপি বলি নিশিকান্ত, আমার মুখে কানুর কাহিনীর শুনে বিধবা মেয়েটা আকুল হয়ে কেঁদেছিল সারা বেলা ধরে।

দেশব্যাপী কি ঝড় উঠেছিল ভাবতে গেলে এখন তাজ্জব লাগে। আশার ক্ষীণতম আলো ছিল না সেদিন চোখের সামনে, তবু প্রাণ দেবার মানুষের অভাব হয় নি। বরঞ্চ এর জন্য প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না, অনেক সময় বড়ি ফেলে ঠিক করতে হত কে কোন অ্যাকশনে যাবে। মরে মরে তারা মরার ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে গেল তাদেরই মৃতদেহের উপর দিয়ে স্বাধীনতার সিঁড়ি উঠেছে। কিন্তু শুধুই বা তাদের কথা বলি কেন? নীলকর-আমলের গরিব রায়তদল কিংবা বিয়াল্লিশের আগস্টের অনামী আত্মত্যাগীরা কি নয়? শুধু এই এক জয়রামপুরের সংগ্রামীদের কথা আজকে পুরো দিনটা ধরে বললেও বোধ হয় ফুরোবে না। এমনি দেশের সর্বত্র। তার ক'টা ঘটনাই বা জানি আমরা? মোটের উপর—অত্যাচার যত কঠোর হয়েছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ততই ছড়িয়ে পড়েছে গণমানুষের মধ্যে। জালিয়ানওয়ালাবাগে দশ মিনিটে ষোল শ' গুলি ছুড়ে মহাবীর ডায়ার অন্তত ষোল শ' গুণ বাড়িয়ে দিল আন্দোলনের গতিবেগ।

আরও অনেক বছর কেটেছে তারপর। মুক্তি-রথের সারথি গান্ধিজী। নানা কাজে প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকি। গ্রামে গেলে চাষীরা ঘিরে ফেলে গান্ধিরাজার খবর কি?

একদিন, মনে আছে নিশিকান্ত, খেজুরবনের মধ্যে বসে পড়তে হয়েছিল তাদের আগ্রহাতিশয্যে। সাড়া পড়ে গেছে সমস্ত বিলে লাঙল ছেড়ে একে দুয়ে এসে জড় হচ্ছে। বেঁদার আগুন কল্কেয় ভেঙে দিয়ে কাদা-মাখা পা ছড়িয়ে আমায় ঘিরে বসেছে।

লড়াইয়ের খবর বল। কে জিতছে? কোম্পানি না গান্ধিরাজা?

অনেক দূরে—ঠিক কোন জায়গায় সঠিক আন্দাজ নেই, এই দেশেরই কোন প্রান্তে ঘটছে প্রচণ্ড মহাযুদ্ধ। অমিত পরাক্রম গান্ধিরাজার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সৈন্য, বিপুল অস্ত্রসম্ভার। ইংরেজ নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

লোকালয় অনেক দূরে, বিলের বাতাস হু হু করে বইছিল। চষা ক্ষেতের মাটি চাংড়ার উপর বসে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করেছিলাম আমি। সে ছবি আজও মনে করতে পারি নিশিকান্ত। তারা বুঝবে না, কিছুতে বিশ্বাস করবে না—ইংরেজের প্রবল প্রতিপক্ষ সেই মহারাজার হাঁটুর নিচে কাপড় জোটে

না। সসৈন্যে আক্রমণ করতে চলেছেন গান্ধিরাজা, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা গোনা উনআশি জন। আরও পরমাশ্চর্য ব্যাপার—না রাজা না সৈন্য কারো হাতে অস্ত্র নেই—গরু তাড়ানোর পাচনবাড়ির মতো একটুকরো লাঠিও নেই। ঘোড়ার পিঠে নয়, রেলগাড়ি বা মোটরগাড়িতে নয়—সবরমতী থেকে ডাণ্ডি এই দুশ-মাইল পায়ে হেঁটে চলেছেন তাঁরা। তাতেই থরহরি কম্পমান ইংরেজ সরকার।

শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি, একেবারে অরণ্যে রোদন হচ্ছে, কেউ একবর্ণ বিশ্বাস করছে না আমার কথা। গান্ধি-রাজার মহৈশ্বর্যময় সিংহাসনের উপর অর্ধনগ্ন ফকিরকে আরোপ করতে তাদের আত্মারাম সায় দিচ্ছে না।

অবশেষে একদিন গান্ধি-রাজার সৈন্য আমাদের জয়রামপুর অবধি হানা দিল। তিনজন মাত্র তারা। সৈন্যবাহিনীর অবস্থা কিছু ভাল রাজার চেয়ে। মাথায় সাদা টুপি, গা ঢাকা আছে জামা দিয়ে।

গান্ধি-মহারাজের জয়।

সকালবেলা তিনকণ্ঠে সমবেত জয়াকার দিয়ে তারা গ্রামে ঢুকল। যত দিন যাচ্ছে, ততই প্রবল হচ্ছে জয়ধ্বনি। গান্ধি-রাজার সৈন্য গ্রাম ভরে গেল দেখতে দেখতে, তিনটি মাত্র ছেলের জায়গায় শ'তিনেক হয়েছে—সারা অঞ্চল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তারা।

নোনাখোলা বলে একটা জায়গা আছে নিশিকান্ত, আর খানিকটা এগিয়ে ডাইনের দিকে। উঁচু টিলা—অনতিদূরে মজা খাল। চারিপাশের দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানক্ষেতের মধ্যে অনুর্বর শ্বেতাভ টিলার মাটি, একটা দূর্বাঘাসও জন্মে না এমন ভয়ানক নোনা। মাটির কণিকা জিভে দিলেও নোনতা স্বাদ পাওয়া যায়। কোদালি দিয়ে সেই মাটি তুলে নিয়ে জলে গোলা হল। আর ওদিকে আমাদেরই দু-জন আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে ছুটল আগরহাটি থানায় খবর দিতে।

দারোগা বললেন, নুন তৈরি করছেন, তালগাছ কেটে কেটে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের পিছনে এমন করে লেগেছেন কেন বলুন তো? কেশবপুরে মদের দোকানের সামনে লাঠি পেটা করে এই সবে এসে দাঁড়িয়েছি মশায়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন আর-এক দফা নিমন্ত্রণ। এক গ্লাস জল খেয়ে ঠাণ্ডা হব, কি টের পাই নি বলে দুটো জায়গায় যাওয়া বন্ধ রাখব—তাও আপনারা উপায় রাখেন না। আমাদের মেরে ফেলবেন নাকি দৌড়ঝাঁপ করিয়ে?

সংবাদবাহকেরা হেসে উঠল।

দারোগা আগুন হয়ে বললেন, চরকির মতো ঘুরপাক খেয়ে মরছি—হাসবেন বই কি আপনারা! কিন্তু থাকবে না ও-হাসি। নিংড়ে মুছে দেব। লাঠি মেরে হবে না, মার খেয়ে খেয়ে চামড়া পুরু হয়ে গেছে—বন্দুক দিয়ে ঘায়েল করব।

দারোগা সেদিন অবশ্য ভয় দেখানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু ক্ষণে-অক্ষণে কথা পড়ে যায় নিশিকান্ত। এর কিছুকাল পরে গ্রামের লোকেরা চৌকিদারি-ট্যাক্স বন্ধ করল। ট্যাক্সের দায়ে গরু-বাছুর থালা-ঘটি-বাটি টেনে-টুনে নিয়ে যাচ্ছে, আর ওদিকে স্ফূর্তি করে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাচ্ছে সকলে পাড়ায় পাড়ায়! সেই চরম উত্তেজনার সময় পুলিসের গুলিতে সত্যিই মারা পড়ল আমাদের বাসু। বাসুর নাম আছে দেখো আজকের সভায় যারা শহীদ-পদক পাবে তাদের তালিকার মধ্যে। লক্ষ্মণ কম্পমান হাতে পদক তুলে আমাদের নাম পড়বে।

কিন্তু যা বলছিলাম। দুপুর-রোদে তেতেপুড়ে দারোগা দলবল নিয়ে হাজির হলেন নোনাখোলায়। টগবগ করে ফুটছে নোনাজল। লাঠির ঘায়ে হাঁড়ি ভাঙল, উনুন নিভে গেল জল পড়ে।

কিন্তু গান্ধি-রাজার সৈন্য কেউ পালায় না থানার মানুষ দেখে। সরল সাদাসিধে কথা। আমাদের গাঁয়ের মাটিতে ঈশ্বরের দেওয়া নুন আপনি ফুটে বেরিয়েছে, তুলে খাব আমরা। স্বাভাবিক অতি-সাধারণ এর অধিকার।

জয়রামপুরের গৃহস্থ-চাষী মেয়ে পুরুষ মন্ত্রের জোরে সহসা নূতন আত্মমর্যাদা পেয়েছে। নিচু মাথা সবল সমুন্নত হয়েছে, বজ্রদৃঢ় হয়েছে শিরদাঁড়া। গান্ধি-রাজার সম্পর্কে কত অলৌকিক আজগুবি কাহিনী চলিত ছিল—হঠাৎ সবাই উপলব্ধি করল, কোন সময়ে তারাও গান্ধি-রাজার সৈন্য হয়ে গেছে।

বাসুর কথা বলছিলাম। এসো, এই ভাঙা চাতালটার উপর বসি। গল্পটা আগে শোন, তারপর একটি প্রশ্ন করব তোমার কাছে। ইদানীং প্রায়ই একটা সন্দেহ জেগে উঠে মনকে পীড়িত করে—জেলের মধ্যে অনেক ভেবেছি, তারপর বেরিয়ে এসে শান্তি-বউদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বাসুর কথা নয় —তার পাষণ্ড বাপ যতীন-দার কথা। কিন্তু শান্তি জবাব দেয় না। স্তব্ধ হয়ে পায়ের নখে রাস্তার ধুলোর দাগ কাটে। আমার প্রশ্ন যেন কানেই যাচ্ছে না —সে ঘুরে-ফিরে কেবলই বাসুর কথা তোলে। তার মানে যতীন-দার প্রসঙ্গে লজ্জা পায়, লোকে যতীন-দার কথা ভুলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন বউদি। এই ঘাটে কাল শান্তি-বউদি আছড়ে আছড়ে ক্ষারে-সেদ্ধ কাপড় কাচছিল। দশের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বাসুর পদকখানা নিতে হবে তো, তাই বউদি কাপড় কেচে সাফসাফাই করে নিয়েছে।

বাসুকে যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, নিশিকান্ত। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, গলায় কারে-বাঁধা রূপোর কবচ—তার ভেতর নারায়ণের তুলসী, যাতে কোনরকম বিপদ-আপদ না ছুঁতে পারে। দু তিনটে মরে যাবার পর এই

ছেলে—সর্বক্ষণ বউদির মন পড়ে থাকত তার উপর, তিলেক সে চোখের আড়াল হলে বউদি অস্থির হয়ে উঠত।

বাসুর সঙ্গে পেরে উঠা সোজা কথা? হাটবারে গ্রামের পাশ দিয়ে সারবন্দি বোঝাই গরুর গাড়ি যেত। কতদিন দেখেছি, বাসু পিছন দিক দিয়ে কোন্ ফাঁকে তার একটায় উঠে গুটিসুঁটি হয়ে বসে আছে। লক্ষ্য নীলখোলার বৈঁচিবন —পায়ে হেঁটে যাবার কষ্টটুকু এড়াতে চাইত এমনি করে। আজকে দেখছ নিশিকান্ত, ভাঙাচোরা এক-খানা দু-খানা ঘর আর পোড়ো-ভিটে। সে-আমলে মনে আছে, এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর উঠান পার হয়ে আমাদের পাড়ার ভিতর ঢুকতে হত। গোলকধাঁধা বিশেষ—ঢুকে পড়ে নূতন লোকের পক্ষে মুশকিল হত বেরিয়ে যাওয়া। ভিটের ওপর দেখো, এখানেও কসাড় বৈঁচির জঙ্গল এঁটে এসেছে। বাসু থাকলে সুবিধা হত, কি বল—কষ্ট করে আর তাকে নীলখোলা অবধি যেতে হত না।

একটা তাজ্জব কাণ্ড ঘটে মাঝে মাঝে নিশিকান্ত, এইখানে এসে যখন বসে থাকি। এক লহমার মধ্যে কি হয়ে যায়—চোখের উপর স্পষ্ট দেখি, এই পুকুরের চারপাশে চারটে ঘাট—খেজুরগুঁড়ি দিয়ে বাঁধা, ঠিক যেমনটি দেখে এসেছি ছেলেবয়স থেকে। পাড়ার মধ্যে একটিমাত্র পুকুর—আমাদের বেটা-ছেলেদের ভারি মুশকিল ছিল, খানিক বেলা না হলে আসবার উপায় ছিল না কোন ঘাটে। দেখো, নূতন বউ ওদিকে পানকৌড়ির মতো ঝুপ-ঝুপ করে ডুব দিচ্ছে, জল ঝাড়বার জন্য এলোচুলে দিচ্ছে গামছার বাড়ি, জলকণা রোদে ঝিল-মিল করছে। দেখো, দক্ষিণ-ঘাটে ঝকঝকে পিতলের কলসি-কাঁখে শান্তি-বউদি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, একরাশ এঁটোবাসন নিয়ে ঘাট জুড়ে আছে অন্ন—সেখানে পা ফেলবার উপায় নেই—দুখি কাল মুক্তেশ্বরের মেলা থেকে এসেছে, বাসন ফেলে রেখে হাঁ করে গিলছে তার কথা। শান্তি-বউদিকে দেখে বলল, এই হয়ে গেছে, দিদি দাঁড়াও—এই ক'খানা ধুয়ে নিয়ে উঠছি আমি। থালার উপর মাজনি দিয়ে জোরে জোরে সে ঘষতে লাগল। আর গাবতলার ঘাটে যেন ডাকাত পড়েছে, দাপাদাপি করছে একপাল ছেলে-মেয়ে, সাঁতার কাটার মুরোদ নেই—খোঁটা ধরে পা ছুঁড়ছে। মুক্তোপিসি স্নান করতে এসে এদের কাণ্ড দেখে জ্বলে উঠলেন।

ঘুলিয়ে জল দই-দই করে ফেলল হতচ্ছাড়ারা? ওঠ এক্ষুণি—নয়তো কান ধরে ধরে সব উঠিয়ে দেব।

উঠতে তাদের বয়ে গেছে। মুক্তোপিসিকে জানে—উল্টে পিসির গায়েই জল ছিটাতে লাগল। ক্ষেপে গেছে মুক্তোপিসি, হাতের কাছে যা পাচ্ছে

ছুঁড়ছে আর গালিগালাজ করছে, মরিস নে কেন তোরা? মরে যা—হাড় জুড়োক পাড়াটার।

শান্তি-বউদি কলসি নামিয়ে রেখে দ্রুত ও-ঘাটে গেল। ঠিকই ভেবেছে, তার বাসুও ওর মধ্যে।

পাজি ছেলে—ফুলো কঞ্চি দিয়ে তোমায় আগা-পাস্তলা পেটাব। আয়—আয় উঠে।

উনিশ কুড়ি বছর হতে চলল তো নিশিকান্ত, কিন্তু একেবারে সেদিনের কথা বলে মনে হয়। দেখ—কাঁটাঝিটকের ঝোপে কোন্ জায়গায় ঘাট ছিল বোঝবারই জো নেই, খেজুরগুঁড়িগুলো পচে বর্ষার জলে ভেসে গেছে। কাল শান্তি-বউদি আমার কাছে বলতে লাগল সেই সব দিনের কথা। বলবার কি আছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওসব পোড়ো ভিটে নয়—ভিটের উপর ঘর-দুয়োর মানুষ-জন গরু-বাছুর। এতটুকু বয়স থেকে দেখে এসেছি নিশিকান্ত, সব একেবারে মুখস্থ হয়ে আছে—পুলিসের অত্যাচারে পাড়ার মানুষ ঘরদুয়োর ছেড়ে সেদিন পথে এসে দাঁড়াল, কিন্তু মাথা নোয়াল না—সেই তখন অবধি। চুপ করে দু-দণ্ড বসলে সমস্ত চোখের সামনে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, কেবল যখন জল এসে দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয় সেই সময়টা ছাড়া। চোখের জলের একটা ওষুধ বাতলে দিতে পার নিশিকান্ত?

বাসুর কথা বলতে ডেকে বসাই নি কিন্তু। সবাই তা জানেন, খবরের কাগজে পর্যন্ত উঠেছে। তোমাদের মীটিঙেও তার সম্বন্ধে কত বক্তৃতা হবে শহীদ পদক দেবার সময়। আমি সেই দলের মধ্যে ছিলাম, সমস্ত জানি। তুমুল কাণ্ড, পাড়ায় পুলিস এসে পড়েছে, পুলিস সাহেব খোদ হ্যামিল্টন সেই দলের প্রথমে। নিরস্ত্র জনতার সামনে ওদের বীরত্বের তুলনা নেই। এই হ্যামিল্টনেরই পাশাপাশি মনে পড়ছে, আর একদিন এক ফোঁটা কানুর সামনে লারমোরের সে কি থরহরি কম্পমান অবস্থা! তার হাতে অস্ত্র ছিল, সেই জন্যই।

সব বাড়ির জিনিসপত্র টেনেটুনে দমাদম রাস্তায় এনে ফেলেছিল। নিলাম হবে—কিন্তু খরিদ্দার নেই। সদরে পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু গরুর গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না স্টেশনে পৌঁছে দেবার, কোন নৌকার মাঝিও নিয়ে যেতে রাজি হয় না। হ্যামিল্টন সাহেবের চোখমুখ আগুনের মতো রাঙা হয়েছে—রোদে পুড়ে আর রাগে ঝাঁজে। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সে। বাড়ি বাড়ি ঝাঁজ-ঘণ্টা বাজাচ্ছে, দাঁত বের করে হাসছে লোকগুলো, আর হ্যামিল্টন ততই ক্ষেপে গিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। নিজের বুকেই বা গুলি করে বসে, এই রকম ভাব।

দারোগা-কনস্টবলরা এখন ভাতের হাঁড়ি ভাঙছে রান্নাঘরে ঢুকে, দুধের কড়াই আঁস্তাকুড়ে আছড়ে ফেলছে, ট্যা-ট্যা করে কাঁদছে ছেলেপিলে, কাঁজ-ঘণ্টার আওয়াজে কান্না ডুবে যাচ্ছে। এর ওপর আবার উলু দিতে আরম্ভ করল এবার মেয়েরা। মুংলি জিওলগাছে বাঁধা ছিল। একজন চৌকিদার দড়ি খুলে তাকে রাস্তার দিকে নিয়ে চলেছে যেখানে ক্রোক-করা অন্যান্য মালপত্র গাদা করে রেখেছে! আর-একজন দমাদম পিঠে লাঠির বাড়ি মারছে যেতে চায় না বলে। মুংলি হাম্বা রবে ডেকে উঠল।

কোথায় ছিল মুক্তোপিসি—হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। বকনাটা তার। ঘোষাল-বাড়ি গাই দুইত—কাটিঘায়ে গাই মরে গেল, তখন রোগা মরণোন্মুখ বাছুরটাকে সে চেয়ে নিয়েছিল ঘোষাল-গিন্নির কাছ থেকে। তৈলচিক্কন নধর চেহারা এখন মুংলির—মুক্তোপিসি দড়ি ধরে মাঠে মাঠে ঘাস খাইয়ে বেড়ায়, এর-তার বাড়ি থেকে পোয়াল-বিচালি চেয়ে-চিন্তে পরম যত্নে জাবনা মেখে দেয়। নিঃস্ব বিধবার সন্তানের মতো হয়েছে ঐ মুংলি।

মুক্তোপিসি বাঘের মতো এসে পড়ল চৌকিদারের উপর।

কোন্ সাহসে মুংলিকে মারিস নচ্ছার হারামজাদারা? মানুষ পিটে পিটে হাতের সুখ বেড়ে গেছে—না? তোদের সাহেব-বাবাকে বল্ গিয়ে, মুক্তো বেওয়া কারো ধেরে খায় নি, আধলা পয়সা টেক্স দেয় না মহারানীকে।

এমনি নির্ভেজাল স্বদেশী গালিগালাজ করতে করতে পিসি একটানে গরুর দড়ি নিয়ে নিল। নিরুপদ্রব্য সত্যাগ্রহের সে ধার ধারে না। চৌকিদারী ট্যাক্স তাকে দিতে হয় না, একথাও ঠিক। ঘর-বাড়ি নেই, ট্যাক্স ধার্য হবে কিসের উপর? এর বাড়ি ধান ভেনে ওর বাড়ি চিঁড়ে কুটে দিন চালায়। রাত্রে আমাদের কাঠকুটো-রাখা চালাঘরে মাচার নিচে শোয়। মুংলি থাকে আমাদের গোয়ালে।

বিষম সোরগোল উঠল! হ্যামিল্টন ছুটে এসে দেখে, গরু ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চৌকিদারের হাত থেকে। বন্দুক তুলল জনতার দিকে—ভয় দেখাতে কি সত্যি সত্যি গুলি করতে, বলতে পারি নে। কিন্তু বাসু এই সময় এক কাণ্ড করে বসল। ঐটুকু ছেলে, তার সাহসটা বোঝ—পাখির মতো যেন উড়ে এসে হ্যামিল্টনের হাতের বন্দুক কেড়ে নিল। এবার আর দ্বিধা নয়, কোমরের রিভলভার টেনে বাসুর উপর তাক করল সাহেব। আওয়াজ হল, মুখ থুবড়ে পড়ল বারো বছর বয়সের কালো-কালো ছেলেটা।

দেখলাম মুক্তোপিসিকে। বকনা ছেড়ে দিয়ে এই পুকুর থেকে আঁচল ভিজিয়ে জল নিয়ে এল। এক বেটা কনেস্টবল পথ আটকাল, পিসি এমন করে তার দিকে

তাকাল যে সুড়সুড় করে সে রাস্তার দিকে চলে গেল! বাসু হাঁ করছিল—মুক্তো-পিসি আঁচল নিংড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগল তার মুখে। আর সে কি তুমুল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি চারিদিকে! এতবড় কাণ্ড হয়ে গেল, একজন কেউ পালায় নি—বাসুর নির্ভীকতা ঢেউ তুলেছে সকলের বুকের ভিতর। আচ্ছা, হ্যামিল্টনের খবর কিছু জানো নিশিকান্ত? ফট ফট করে শিমূলবনে ফল ফাটার সময়ের মতো গুলি চালিয়ে রামদাস মোড়লের বারান্দায় উঠে হাতটা ধুয়ে মোড়ার উপর বসে দিব্যি সিগারেট ধরাল—হিম্মত আছে সাহেবের। এর অনেকদিন পরে জয়রামপুরের এই গণ্ডগোলের ব্যাপারে তদন্ত হয়েছিল, তদন্ত কমিটির সামনেও নাকি খুব চোখা-চোখা জবাব দিয়েছিল হ্যামিল্টন।

বাসু পড়ে গেলে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন নি কেন? আপনার লঞ্চে করে সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতেন, ছেলেটা হয়তো বেঁচে যেত তা হলে।

হ্যামিল্টন জবাব দিয়েছিল, সেটা আমার কাজ নয়। গ্রামের লোক ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারত। খুব সম্ভব আমি বাধা দিতাম না।

কলকাতার ইংরেজ-মেয়েরা নাকি অনেক টাকা তুলে ভোজে আপ্যায়িত করেছিল এই হ্যামিল্টনকে, এক বড় সাহেবী ফার্ম থেকে অনেক টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল তার কর্মক্ষমতার জন্য। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাঁচিয়েছিল সে বহু ক্ষেত্রে এমনি বীরত্ব প্রদর্শন করে। একা বাসু নয়—এই রকম অনেক—অনেক নাকি মরেছে তার হাতে। কোথায় আছে আজকাল হ্যামিল্টন বলতে পার? বিলেত চলে গেছে? তার সাধের সাম্রাজ্যের পরিণাম দেখে জানতে ইচ্ছা করে, আজকের দিনে কি ভাবছে সে মনে মনে।

কিন্তু যা বলতে যাচ্ছি—পাকুড়তলায় তোমরা মিটিং করছ, লক্ষণ মাইতি নিজে হাতে করে সবাইকে মেডেল দেবে। লক্ষণের কাছ থেকে হাত পেতে মেডেল নেওয়া ভাবি গৌরবের কথা। শান্তি-বউদি কাপড়-চোপড় ফরসা করে তৈরী হয়ে আছে, এই আজ সকালেও সে বাসুর কথা বলছিল আমার সঙ্গে। সে কাঁদছে না, সত্যি বলছি—অনেক বড় বড় কথা বলছিল, নভেলে যে রকম লেখা থাকে। আচ্ছা—আমাদের জয়রামপুরেই এই সেদিন অবধি যা সব ঘটেছে, সে তো নভেলকে হার মানিয়ে দেয়। সে যুগে আমাদের গোপন আস্তানায় নীলকমল মাস্টার শিখ আর রাজপুতের ইতিহাস থেকে বীরত্ব ও দেশপ্রেমের গল্প শোনাতেন—কোথায় পড়ে থাকে এদের কাছে ইতিহাসের মরা কাহিনী! কত লোকে কতই তো লিখেছে নিশিকান্ত, এই সব সত্যি ব্যাপার নিয়ে তোমরা নভেল লেখ এইবার।

কেবলি অন্য কথা এসে যাচ্ছে। যতীন-দার কথা বলব বলে বসলাম

তোমায়। সবাই তাকে ঘৃণা করি। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে, ঈশ্বর উচিত শাস্তি দিয়েছেন—এই কথা বলে বেড়ায় সকলে। বাসুকে যারা মেরে ফেলল, বাপ হয়ে সেই দলের অত খোশামুদি করা—ঘৃণা হয় না কার বলো? বলতে কি—নিজে আমি থুথু দিয়ে এসেছি যতীন-দার গায়ে। থুথু দিয়ে মনে মনে দেমাক হয়েছিল, খুব একটা বীরত্বের কাজ করলাম। যতীন-দা যদি চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়ে থাকত সেই রাত্রে! শান্তি-বউদি তো স্রেফ বেকবুল গিয়েছিল, বাড়ি নেই, যতীন মিস্তিরি, ঘোষগাতি কুটুম্বর বাড়ি গেছে। ওরাও বিশ্বাস করে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় যতীন-দা বেরিয়ে এল। এসে বলে আছি আমি হুজুর। বউ মিছে কথা বলেছে, মনের অবস্থা বিবেচনা করে ওকে মাপ করুন। ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ না হলে—হুজুরেরা বিপদে পড়েছেন, এ সময় মিথ্যে বলে এমন এড়াবার চেষ্টা করে?

সত্যি, যতীন-দা না বেরুলে বৈদ্যনাথ আর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সে বিপদের পার ছিল না। পরের দিনও সম্ভবত বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে জয়রামপুরে তাঁদের বন্দী হয়ে থাকতে হত। যে-সে মানুষ নন সিরাজউদ্দিন-বৈদ্যনাথ—হ্যামিল্টনের ডান-হাত বাঁ-হাত। কে ডান-হাত আর কে বাঁ-হাত ঠিক করে বলা শক্ত—এ নিয়ে কিছু রেষারেষিও ছিল তাঁদের মধ্যে। কিন্তু সরকারী কাজের সময় একেবারে অভিন্ন-হৃদয়। মীটিঙে বৈদ্যনাথকে দেখতে পাবে নিশিকান্ত, স্বাধীনতালাভের পর থেকে বিষম গান্ধিভক্ত হয়েছেন—গান্ধি-টুপি মাথায় দিয়ে খোঁড়া পায়ে তদারক করে বেড়াচ্ছেন, অনুষ্ঠানের অন্যতম মাতব্বর তিনি। আর-স্বাধীন ভারত চোখে দেখবার জন্য বেঁচে নেই যে সিরাজউদ্দিন—থাকলে তিনিও নিশ্চয় দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতেন এমনি কোনখানে।

একেবারে রাস্তার উপর ঐ যে কাঁটা ভিটে—ঐ ছিল আমাদের বাড়ি। আমার আর যতীন-দার ঘর এক উঠোনের দক্ষিণ পোঁতা আর পশ্চিম পোঁতা। সম্পর্কে আমরা ভাই হই। ঘরে শুয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা হয়, তা পর্যন্ত কানে পৌঁছয়।

বাসু মারা পড়ল, তারপর কি হল শান্তি-বউদির—চল্লিশের কাছে, তবু একেবারে নূতন বউয়ের অধম হয়ে উঠেছে। যতীন-দাকে নিয়ে সদাই ব্যস্ত—কোলের ছেলেটার প্রতিও তেমন আর মনোযোগ নেই। রাতে ভাল করে ঘুমুতে পারে না, ঘন ঘন উঠে বসে, যতীন-দার কোঁচার খুঁটের সঙ্গে শাড়ির আঁচল বেঁধে রাখে। তাতেও সোয়াস্তি নেই, যদি কোন ফাঁকে খুঁট খুলে

উঠে গিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে আবার ভালমানুষ হয়ে এসে শুয়ে থাকে! দরজা বন্ধ করে শোবার আগে একটুকরো কাগজ চুপিচুপি হুড়কোর সঙ্গে লাগিয়ে রাখে, যতীন-দা লুকিয়ে যদি হুড়কো খুলে বেরোয়, অজান্তে কাগজের টুকরো পড়ে যাবে নিশ্চয়। সকালবেলা শান্তি-বউদি মেজেয় ঠাউরে ঠাউরে দেখে, বেরিয়ে যাবার চিহ্ন আছে কিনা কোথাও। ঘুমন্ত যতীন-দার পায়ের তলা দেখে, পা ধুয়ে শুয়েছিল—রাতে বেরিয়ে থাকে তো ধুলো-মাটির দাগ আছে। নানা কৌশল করেও শান্তি বউদি আবিস্কার করতে পারে না স্বদেশি দলের সঙ্গে যতীন-দার যোগাযোগ আছে। রাগ বেড়ে যায় আরও নিজের উপর, রাগ হয় ঘুমের উপর। জেরা করে যতীন-দাকে, হঠাৎ বা ক্ষেপে উঠে গালিগালাজ শুরু করে দেয়।

বেরিয়েছিল তুমি। ঐ ও-ঘরের চারু বললে যে! মিথ্যুক তুমি—মিথ্যে বলে আমাকে ভুলোও।

চারু আমার স্ত্রী। বউমানুষ—তার সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, যতীন-দা ভাদ্রবধূ-সম্পর্কীয়ার সঙ্গে কথাটা আস্কারা করতে যাবে না—শান্তি-বউদি তাই অবাধে তার নামটা করে দিল। চারু এঘরে শুনতে পেয়ে রাগ করে।

দেখ কাণ্ড! ভাসুর ঠাকুরের কাছে ডাহা মিথ্যে লাগাচ্ছে আমার নামে।

অনেক করে চারুকে আমি ঠাণ্ডা করি। শান্তি-বউদি এমনি সব জলজ্যান্ত সাক্ষি-সাবুদের নামোল্লেখ করত—ভাঁওতা দিয়ে যতীন-দার মুখ থেকে আদায় করতে পারে যদি কিছু। কিন্তু কিছুই পারে না, শান্তি-বউদি ক্ষেপে যায় আরও; চোখ দিয়ে যেন অগ্নি-জ্বালা ছিটকে বেরোয়। বাইশ-তেইশ বছর এক সঙ্গে ঘর করার পর শেষকালে ওদের দাম্পত্য জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে একেবারে।

একদিন রাত একটা-দেড়টা হবে তখন নিশিকান্ত, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসছে। অনেকগুলো মানুষ এল আমাদের উঠানে দুমদাম করে, তারা যতীন-দার দাওয়ায় উঠল।

যতীন, যতীন মিস্তিরি!

আমি আর আমার গা ঘেঁষে চারু—জানলার একখানা কবাট খুলে উঁকি দিচ্ছি। যা ভেবেছি, থানার মানুষ—সেই পোশাক, সেই চালচলন।

শান্তি-বউদি বলল, না—বাড়ি নেই তো উনি।

দোর খুলে সঙ্গে সঙ্গে যতীন-দা বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্নার আলোয় আমরা দেখতে লাগলাম।

ইদিকে এস তো মিস্তিরি, দেখে যাও—

ভাষাটা অনুরোধের, কিন্তু হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে রাস্তায় চলে গেল যেন সে খুনি আসামি। সবাই উঠানে নেমে এসেছি। যতীন-দার আগে পিছে জন-আষ্টেক কনেস্টবল—হাতে দড়ি দেয় নি এই যা—হাত ধরে দ্রুত নিয়ে চলেছে।

তা হলে বোধ হচ্ছে যতীন-দা একটা কিছু করে বসেছে গোপনে গোপনে—আমরাও যা জানি নে—শান্তি-বউদির সন্দেহ মিথ্যা নয় একেবারে। রাত থমথম করছে। এ অবস্থায় এখন কি করব ভেবে পাই নে। রামদাস কাশছে ওদের টিনের ঘরে, কাশির আওয়াজ বিশ গুণ হয়ে বাইরে আসে। শান্তি-বৌদি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

রামদাস হাঁক দিচ্ছে, ও যতিন হল কি ? কান্না কেন তোমাদের বাড়ি ?

একজন দু-জন করে ভিড় জমে গেল। বামদাস জিজ্ঞাসা করে, কি করেছিল বল তো ? করেছে নিশ্চয় কিছু—নইলে শুধু-শুধু ধরতে যাবে কেন ? বুকের জ্বালা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিল, বাইরে কিছু টের পাওয়া যায় নি।

আ-হা-হা ! বলে সহানুভূতিব নিশ্বাস ফেলে কাশতে কাশতে রামদাস বাড়ি ফিবে গেল

কিন্তু নিয়ে গেল কোথায় এইবাত্রে ? এগিয়ে মোড় অবধি গিয়ে দেখি, ফিরে আসছে। সঙ্গে অনেক পুলিস। খানাতল্লাসি কবতে সঙ্গে নিয়ে আসছে নাকি ?

যতীন-দা আগে আগে—দলসুদ্ধ সে রামদাসের বাড়ি নিয়ে তুলল। ডেকে বলে, রাত্তিরটুকু সিরাজউদ্দিন সাহেব এখানে থাকবেন। বদ্যিনাথবাবু আর সিরাজউদ্দিন সাহেবের নাম শুনেছ—এই যে এঁবাই। বনবিষ্টুপুর চলেছেন। টিনের বেড়া-দেওয়া ভাল ঘব—তাই তোমাব এখানে ব্যবস্থা করলাম। দোর খুলে দাও শিগগিব, বিছানাপত্তোর কি আছে নিয়ে এস।

হাঁকডাকে বাড়িসুদ্ধ তোলপাড় করে তুলছে। সেই কাণ্ডের পর থেকে হ্যামিল্টন আব সদর ছেডে এখানে আসে না। হয়তো বা সদরই ছেড়েছে। ইতিমধ্যে এই দুইজনের নাম জেলাময় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের জয়রামপুরে শুভাগমন হয়েছে—মহাপ্রভু দু'টিকে একবার চোখে না দেখে পারি নে। গাবতলায় এসে তাই দাঁড়িয়েছি। যতীন-দা তখন বলছে, খাওয়া-দাওয়ার কি হবে হুজুর ? ভাত চলবে, না লুচি-টুচি ?

বৈদ্যনাথ তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বললেন, এখন আর হাঙ্গামে দরকার নেই মিস্তিরি, ভরপেট আমরা খাবার খেয়ে রওনা হয়েছি।

সে কি কথা হুজুর, কত ভাগ্যে অতিথি হয়েছেন আমাদের পাড়ার ! ঘাড় নেড়ে আরও জোর গলায় বলল, আজ্ঞে না, সে হবে না—কক্ষণো হতে পারে না—

সিরাজউদ্দিন দেখি চোখ কট-মট করছেন বৈদ্যনাথের উপর। বিপুল দেহ—ভাব দেখে মনে হয়, নিদারুণ ক্ষিধে পেয়েছে। বৈদ্যনাথ ফিসফিস করে তাঁকে কি বললেন। কি বললেন না শুনেও আন্দাজ করতে পারি। মনে মনে বেশ জানেন, লোকে কি চোখে দেখে ওঁদের! রাত্রিবেলা অজানা জায়গায় খাবারের সঙ্গে বিষ-টিষ মিশিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়।

বৈদ্যনাথ বললেন, কাজকর্ম চুকে যাক—সময় থাকে তো বরঞ্চ সকালবেলার দিকে দেখা যাবে। পার তো আমাদের সিরাজউদ্দিন সাহেবকে একটা ডাব খাইয়ে দাও। শোবার আগে ওঁর ডাবের জল খাওয়া অভ্যাস। আর ধকলটা কি রকম দেখছ তো—সকলেরই তেষ্টা পেয়ে গেছে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—অভ্যাস আছে যখন সাহেবের—

সেই দুপুর রাত্রে লোকাভাবে নিজেই যতীন-দা নারকেলগাছের মাথায় চড়ে কাঁদির পর কাঁদি কাটল, নেমে এসে ডাব কেটে কেটে ওদের সামনে ধরতে লাগল। শাঁসে-জলে পুরো এক গণ্ডা নিঃশেষ করে সিরাজউদ্দিন সাহেব তবে শান্ত হলেন। বৈদ্যনাথ খেলেন একটি মাত্র—তাও শুধু শাঁস। সর্দির ধাত, রাত্রি জেগে তার উপর কাজের তদারক করতে হবে—ডাবের জল সহ্য হবে না এ অবস্থায়।

অবাক হয়ে যতীন-দার কাণ্ড দেখছি। ঐ কনেস্টবলগুলোর কেউ কেউ হ্যামিল্টনের পাশে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল, চিনতে পারলাম। যতীন-দা ডাব কেটে সকলের মুখে ধরছে। তারপর সিরাজউদ্দিন দালানের দরজা দিলেন, জানলার প্রত্যেকটি কবাট এঁটে পরখ করে দেখলেন, একটা কনেস্টবল সশস্ত্র মোতায়েন থাকতে হুকুম দিলেন দোরগোড়ায়।

এই সব চুকিয়ে আসতে যতীন-দার দেরি হচ্ছে। অনেক—অনেক দেরি। শান্তি-বউদি তার অপেক্ষায় হুড়কোর ধারে দাঁড়িয়ে। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, আঁচলটা তুলে দিয়েছে মাথায়। আমি অভয় দিচ্ছি, কিছু ভাবনা নেই বউদি, যা খোশামুদি করছে দেখে এলাম—

যতীন-দা আসতেই শান্তি-বউদি এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। আমি সামনে রয়েছি, তা বলে সঙ্কোচ নেই। এক্ষুণি যেন সে পালিয়ে যাবে, এমনি ভাবে ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

যতীন-দা বলে, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঘা লেগে ওদের মোটরটা জখম হয়েছে। মুশকিলে পড়ে গেছে। আমায় ঠিক করে দিতে বলল।

শান্তি-বউদির মুখের উপর হাসি চিক-চিক করে উঠল এতক্ষণে। যতীনদার দিকে চোখদুটো তুলে বলে, গাড়ি এমন করে দাও, কক্ষণো আর না চলে—

যতীন-দা সবিস্ময়ে বলে, তুমি বলছ এই কথা ? রাত-দিন ঝগড়াঝাঁটি করে মরছ, ছেলে গেছে আবার আমি যাতে গণ্ডগোলের মধ্যে না যাই—

তা বলে গোলামি নিতে বলেছি ওদের ?

ভালই তো ! তুমি নিশ্চিন্ত, আমিও।

শান্তি-বউদি দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিল যতীন-দার। যতীন-দা হাসতে লাগল। হাসি আমারও বিশ্রী লাগছিল ! শান্তি-বউদি ফিরেও আর না চেয়ে দাওয়ায় উঠে গেল। এদের প্রতি রাত্রের দাম্পত্য কলহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, আজকে চুপচাপ। শান্তি-বউদি কথাবার্তাই বন্ধ করেছে। ভাবলাম, বেশ হয়েছে—রাতটুকু নিরুপদ্রবে ঘুমানো যাবে।

কিন্তু ঘুমানো গেল না ভিন্ন এক কারণে। চারু আমার গা ঝাঁকাচ্ছে, আর উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকছে, ওঠ—ওঠ, আগুন লেগেছে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, উজ্জ্বল আলোকিত আকাশ। উঠানে লাফিয়ে পড়লাম। যতীন দাও উঠেছে, টেমি জেলে দাওয়ায় নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ করে হুঁকো টানছে।

দেখতে পাচ্ছ না ?

যতীন-দা বলল, হা, আমায় ডেকে তুলে দিয়ে গেল—কাজে লাগব এইবার। তার আগে বুদ্ধির গোড়ায় একটুখানি ধোঁয়া দিয়ে নিচ্ছি। আরে আরে, তুই চললি কোথারে ?

রূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে এক নজর চেয়ে ছুটলাম। যখন ফিরে আসছি, দেখি—যতীন-দা গজেন্দ্রগতিতে চলেছে।

জান ? আগুন লাগিয়েছে ওরাই।

যতীন-দা হা-হা করে হেসে উঠল : বুদ্ধি করেছে ভাল। চাঁদ ডুবে গেছে, কোথায় কার বাড়ি লণ্ঠন খুঁজে বেড়াবে ? জোরালো আলোয় মোটর মেরামত হবে, আর আঁধারে-আঁধারে নোনাখেলায় আবার কেউ আইনভঙ্গ করতে না পারে—তারও পাহারা দেওয়া চলবে।

ভলান্টিয়ারদের চালা পুড়ছে।

সেই-তো ভাল রে ! তোর আমার ঘর পুড়ল না, এক তিল জিনিসের অপচয় হল না। ওদের তো এক একটা গামছার পুঁটুলি সম্বল—সেইটে বগলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চালার আগুনে খানিকক্ষণ গা-হাত-পা সেঁকে নিয়ে আর কোনখানে সরে পড়ুক।

আবার বলে, বদ্যিনাথবাবু নিজে এসে আমায় ডেকে গেল। বনবিষ্টুপুরে

হাট জমবার আগে দলবল সুদ্ধ গিয়ে পড়তে হবে বিলাতি কাপড় আর মদের দোকান সামাল দিতে। গাড়ি তাড়াতাড়ি সেরে দিতে হবে।

তখনও ভাবছি, মুখে যা-ই বলুক—বয়ে গেছে যতীন-দার গাড়ি মেরামত করে দিতে! দায়ে পড়ে স্বীকার করেছে, যা হোক একটা জবুথবু করে দেবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বেলা না উঠতেই খবর নিয়ে এল, বিগড়ানো ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে আবার। মায়াবী যতীন-দা—কলকব্জা যেন তার পোষা জানোয়ার—হাতের একটু স্পর্শ কি দুটো থাবড়া খেলেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবেগে অমনি কাজে লেগে যায়।

বৈদ্যনাথ ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছিলেন। যতীন-দার দিকে সপ্রশংস চোখে তাকালেন।

সাবাস! খুব বাহাদুর তুমি মিস্তিরি—

দশ টাকার নোট একখানা বের করলেন। দু-হাত পেতে বকশিশ নিয়ে যতীন-দা মাথা নিচু করে নমস্কার করল।

পুলকিত বৈদ্যনাথ সিরাজউদ্দিন সাহেবকে খবর দিতে ছুটলেন। ফিরলেন তখনই। বললেন, এদিকে তো হল—বিপদ হয়েছে এখন ড্রাইভারকে নিয়ে। তার বেশি লাগে নি ভেবেছিলাম, এখন দেখছি হাঁটুর মালা ফুলে গোদ হয়েছে, পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে বেটা। ইয়ে হয়েছে, ড্রাইভ করতে নিশ্চয় জানো তুমি মিস্তিরি—

যতীন-দা বলল, খাস কলকাতার লাইসেন্স আমার হুজুর। বারো বছর এই লাইনে বাস চালিয়ে এসেছি, সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। এখন এইসব গণ্ডগোলে লাইন বন্ধ—আর ধরুন গে, সেই আমার ছেলের ব্যাপারের পর মন-মেজাজও ভাল ছিল না—

এ সমস্ত আমাদের চরের মুখে শোনা। শুনে রাগে ফুলতে লাগলাম। রওনা হতে কিন্তু ওদের দেরি হয়ে গেল। সিরাজউদ্দিন একেবারে বেঁকে বসলেন, রাতে উপোস গেছে—খাওয়া-দাওয়া না করে এক-পা নড়বেন না এ জায়গা থেকে। বনবিষ্টুপুর গিয়ে কি অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, ঠিক কি? আর এখানে ভুরিভোজনে অসুবিধা কিছু নেই, সিকি পয়সা খরচও হবে না। ক্ষেত থেকে খুশিমতো তরকারি খুলে আন, চাল-ডাল হুকুম কর যে কোন গৃহস্থের বাড়ি, মাছ খাবার ইচ্ছে হলে যে পুকুরে ইচ্ছা জাল নামিয়ে দাও—মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করবার গরজ নেই কারও কাছে। সিরাজউদ্দিনের যুক্তি সবাই প্রণিধান করল, রামদাসের গোয়ালঘরে উনুন খুঁড়ে কনেস্টবলরা রান্না চাপাল। রাজসিক ব্যাপার—এর ওর বাড়ি থেকে ডেগচি-কলসি থালা-বাসন চেয়ে এসেছে।

যতীন-দা এক ফাঁকে বাড়ি এসে বলল, আর ভয় রইল না তো তোমার। গোলমাল যদি কিছু হয়, থানায় খবর দিও—থানাসুদ্ধ ছুটে আসবে দেখো আমার খাতিরে। ওঁরাই মুরুব্বি হলেন আমাদের, সুনজরে দেখছেন।

শান্তি-বউদি তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

দেখছি, আর রাগে ফুলছি আমরা। গাড়ি ঘাটের ধারে এইখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে। পেট্রোলের খালি টিনে জল এনে ইঞ্জিনে ঢালছে। গর্জন করছে ইঞ্জিন, আক্রোশে কাঁপছে থরথর করে, যেন এক বিপুলকায় দৈত্য নখ-দাঁত উদ্যত করে তৈরি হয়েছে। ক্রোশ চারেক দূরে বনবিষ্টুপুরের গঞ্জে রুক্ষ-চুল বিবর্ণ দেহ ছেলেমেয়েদের দল দোকানের পথের উপর শুয়ে পড়ে আছে—মহাজাতির নৈতিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না কোনক্রমে, আর দেশের সম্পদ নিয়ে যেতে দেবে না সমুদ্রপারে, অমোঘ সঙ্কল্প আর আত্মপ্রত্যয় জনে জনের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় রেখায়—সেইখানে ছুটে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরতে হবে তাদের। পলকে রক্তাক্ত হয়ে যাবে গঞ্জের পথমৃত্তিকা।

আর দেখ, ষ্টিয়াবিঙের চাকা ধরে বোধ করি আমাদের দিকেই চেয়ে কি-রকম হাসছে যতীন-দা।

মাথার মধ্যে কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল, আমি থাকতে পারলাম না নিশিকান্ত। দৌড়ে যতীন-দার কাছে গিয়ে থুতু দিলাম তার গায়ে। হৈ-হৈ রব উঠল। বৈদ্যনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঝাপটে ধরল আমায় তিন-চারটে কনেস্টবল, দু-চারটে কিল-চড়ও খেলাম। যতীন-দা তাড়াতাড়ি মাঝে পড়ে ছাড়িয়ে দিল।

আমার খুড়তুত ভাই হয়। আমাদের ঘরোয়া ঝগড়া। আমি একদিন জিওলের ডাল দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে পিটেছিলাম, তারই কিছু শোধ দিয়ে গেল। আপনাদের কোন ব্যাপার নয়। ছেড়ে দিতে বলুন।

ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে দিল, বাঁচিয়ে দিল—তা বলে কৃতজ্ঞতা বোধ করি নি নিশিকান্ত। এটুকু লাঞ্ছনা ভাত-কাপড়ের সামিল আমাদের, এতে মন খারাপ হয় না, ফাঁক কাটাতে পারলে আনন্দও হয় না তার জন্য। মোটর বেরিয়ে গেল ভকভক করে পেছনের নলে ধোঁয়া ছেড়ে—যেন উপহাস করে আমাদের। যতীন-দা হাসতে হাসতে গেল। হাত নিসপিস করছিল—থুতুতে কি হবে, থুতু গায়ে লাগে—মন অবধি পৌঁছয় না ওদের। থুতু না দিয়ে অন্তত একটা ঘুসি যদি ঝেড়ে দিতাম, তাহলেও গায়ের ব্যথা মরতে একটা দিন সময় লাগত, কিছু পরিমাণে শাস্তি হত।

তা আমাদের হাতে না হোক, শাস্তি এড়াতে পারল না যতীন-দা, ভয়ানক

শান্তি—আমরা এর সিকির সিকি কল্পনা করতে পারতাম না। দিন কয়েক পরে খবর এল, যতীন-দা মারা গেছে। এখান থেকে ক্রোশ চারেক দূরে ন-হাটা বলে গ্রাম—সদলবলে গিয়ে কাণ্ডটা ঘটেছে সেখানে। গাড়ি নিয়ে পুলের উপর উঠতে গিয়ে উলট-পালট খেতে খেতে একেবারে খালের গর্তে। দিন দুপুর—তামাক ছাড়া কোন রকম নেশাও করত না যতীন-দা—কেমন করে কি হল, সঠিক কেউ বলতে পারে না।

গরুর-গাড়ি করে শান্তি-বউদিকে নিয়ে গেলাম ন-হাটায়। কোল-মোছা ছেলেটাকে বুকে করে শান্তি-বউদি চলল আমার সঙ্গে। বৈদ্যনাথও ছিলেন যতীন-দার সেই গাড়িতে, তারপর হাসপাতালে গেছেন। প্রাণে বেঁচে যাবেন, কিন্তু একখানা পা কেটে ফেলতে হয়েছে, খোঁড়া অবস্থায় ন্যাং-ন্যাং করতে হবে চিরকাল। রজনী দফাদার যতীন-দার পাশে ছিল, কপাল জোরে প্রায় অক্ষত অবস্থায় সে বেঁচেছে। সে বলতে লাগল, কাঁধে যেন ভূত চেপেছিল মিস্তিরির। গাড়ি ছুটছে—জোর দিচ্ছে, কেবলি জোর দিচ্ছে, হু-উ উঁ-উ করে আওয়াজ হচ্ছে—ভাবতে গা শির-শির করে মশায়, আর ঐ যে হাসত কথায় কথায়—সেই রকম হাসতে লাগল চাকায় হাতটা রেখে। আমি বলছি, সামাল মিস্তিরি—পুল ঐ সামনে, অনেকখানি উঁচুতে উঠতে হবে। বলতে বলতেই গাড়ি পাক খেয়ে পড়ল। নিতম্ব গুরুবল ছিল—আমি লাফিয়ে পড়লাম। তারপর উঠে দেখি, আগুন ধরে গেছে দাউ-দাউ করে জ্বলছে গাড়ি, পেট্রোলের গন্ধ আর কালো ধোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়—

যতীন-দাকে দেখলাম—বলে দিল, তাই ধরে নিলাম এই যতীন-দা। আধপোড়া বীভৎস মূর্তি—মনে পড়লে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে নিশিকান্ত। পুলিসের দল ন-হাটার কাজ চুকিয়ে বিদায় হয়ে গেছে, বৈদ্যনাথকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার তাগিদেই এত তাড়াতাড়ি তারা গ্রাম ছেড়েছে। মানুষজন পাওয়া গেল না—যারা গ্রাম জব্দ করতে এসেছিল, কে আসবে বল তাদের মড়া পোড়াতে? আড়ালে খুব তারা হাসাহাসি করছে, অনুমানে বুঝলাম। কাঠ-কুটোরও যোগাড় হল না। রজনী দফাদারের সাহায্যে পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে খালের কলমিদামের নিচে কোন গতিকে ঠেলে দিলাম মৃতদেহ। আর একটা ব্যাপার নিশিকান্ত—শান্তি-বউদি চোখের উপর সমস্ত দেখল, যতই হোক স্বামী তো! কিন্তু একটু বিচলিত হতে তাকে দেখলাম না, একবিন্দু চোখের জল পড়ল না।

রাত দুপুর অবধি গলদ্ঘর্ম হয়ে চুকিয়ে-বুকিয়ে এলাম। রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলা ফিরে যাচ্ছি। খাল-ধার দিয়ে পথ। দেখি শিয়ালে এরই মধ্যে

ডাঙায় তুলেছে, কুকুর আর শকুনে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। জেলের মধ্যে এই ছবি মাঝে মাঝে আমার মনে উঠত, আর বড় কষ্ট হত নিশিকান্ত। হোক দেশদ্রোহী—বাস্তুর বাবা আমাদের যতীন-দা তো!

কত দিনের ঘটনা এসব! তারপর অনেক সময় বেড়েছে, বুড়ো হয়েছি। এখন নূতন করে ভাবি সেই সব সে-কালের কথা। দুঃখ হয় যতীন-দার জন্য। সর্বনিন্দিত হয়ে মারা গেল। মরেও নিষ্কৃতি নেই, শবদেহ ছিঁড়ে খেল শিয়াল-শকুনে। জেলেব মধ্যে হঠাৎ একদিন মনে উঠল, মতলব করে মরে নি সে তো? ঘুঘু-বৈদ্যনাথটাকে নির্ঘাৎ সঙ্গে নিয়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু তা হবে কেন? আগস্ট-আন্দোলনের সময়ে এই জয়বামপুরেই আব এক দফা ইংরেজের নিমকেব মর্যাদা বেখে সবকারি মেডেল পাওয়া এবং স্বাধীনতালাভের মুখে সেই মেডেল প্রত্যর্পণ কবে দেশপ্রেমী রূপে মাতব্ববি করা তাঁব ভাগ্যের লিখন—শুধু একটা পা খুইবে তিনি বেঁচে বয়ে গেলেন। গান্ধিটুপিব নিচে পূর্বতন সকল দুষ্কৃতি চাপা দিয়ে সভায় ঘোবাঘুরি কবতে দেখবে বৈদ্যনাথকে। রিটায়ার কববার পর এখনো জয়বামপুব আঁকড়ে আছেন। প্রফুল্লব ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁরই মন্ত্রণামতো চলে—তাঁব বড় মুরুব্বি প্রফুল্ল।

কিন্তু আব সন্দেহ যাচাই কবি কাব কাছে নিশিকান্ত? গোপন অভিপ্রায় কাউকে তো বলে যায় নি যতীন-দা! তোমাদেব উৎসব-সভায় ভুলেও কেউ তার নাম কববে না। আব দৈবাৎ যদি উঠে পড়ে, সমস্ত শ্রোতা—শান্তি-বউদি অবধি লজ্জায় মুখ ফেবাবে।

এই যে সভার জায়গা। পৌঁছলাম এতক্ষণে। খাসা সাজিয়েছে! প্রফুল্লর কাজে খুঁত থাকে না, বরাবব দেখেছি। পাকুড়গাছ শাখা বিস্তার করে আছে, রোদ লাগবে না মানুষ-জনেব গায়ে। শেয়াকুল আর ন্যাড়াসেজির ঝাড় সাফ-সাফাই হয়ে গেছে; স্বাধীন-ভারতের নিশান টাঙিয়েছে ইস্কুল-বাড়ির সামনে। এই ইস্কুলে পড়েছি আমবা, আমাদের নীলকমল মাস্টার মশায়ের স্মৃতিপবিত্র ইস্কুল। আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন মাস্টার মশায়, তারপর আর কোন খবব পাইনি। হয়তো কোন গ্রামপ্রান্তে সকলেব অজান্তে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন তিনি। আরও কত জনে এমনি গেছেন।

বিয়াল্লিশ সনে আট-দশ গ্রামেব মানুষ মিলে এক নিশান বেঁধে দিয়েছিল ঐ ইস্কুল বাড়ির ছাতে। সে নিশান কিন্তু এত বড় ছিল না, আর উড়ে ছিল বড় জোর পাঁচটা কি ছ'টা দিন। সেবারেব পরাহত পতাকা, দেখি নিশিকান্ত, প্রসন্ন আলোয় মাথা তুলে হাসছে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে।

লক্ষণ মাইতি সভাপতি—তার জায়গা তক্তাপোষের উপর ? তবেই হয়েছে ! খুব ভাল জানি তাকে, ক্লাসে পাঁচ বছর পাশাপাশি বসে পড়েছি। খ্যাপাটে মানুষ—চিরকালের ধর্মভীরু। পরমহংসদেবের মানস-শিষ্য—ঠাট্টার ছলেও একটা মিথ্যা কথা বলে না। লক্ষণের ছেলে প্রভাস—বাপের ছেলে সে, বাপকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল সদাচরণে। বাপ বা ছেলে—কোন দিন ওদের উঁচুতে বসতে দেখি নি দশজন থেকে আলাদা হয়ে। লক্ষ্মণ কিছুতে বসবে না দেখো ঐ উঁচু সভাপতির আসনে।

শহীদ-বেদি ঐ ? বেদির গায়ে নাম লেখানো হচ্ছে কেন বাহাদুরি করে ?' ক'টা নাম জান, কতটুকু খবর রাখ ? আমাদের যতীন-দার নাম লিখবে কি বেদির উপর ? দুর্গা আর নীলকমল মাস্টার মহাশয়ের নাম ? আদিকাল থেকে প্রবলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কত জনে প্রাণ দিয়েছে—আমাদের এই এক জয়রাম-পুরের কথাই ধর না—সংখ্যায় তারা কি একজন-দু'জন ? নিজেরাই জানত না, সভ্যতাব রথরজ্জু টানছে তারা, জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও মমতা সঞ্চয়ন করছে উত্তরপুরুষেব জন্য। আজকে ঐ স্বাধীন-পতাকার নিচে শুভ্র খদ্দরে ঢাকা বেদি গাত্র থেকে কতজনের স্থানচ্যুতি ঘটবে—তার চেয়ে নামে একটাও লিখো না তোমরা, লিখে রাখ—'সর্বযুগেব শহীদজনের স্মৃতিতে।'

অত ফুল—শহীদ-বেদিতে ঢালবে ? কিন্তু কতক্ষণ থাকবে বল নিশিকান্ত ? বাতাসে ঝুরঝুর করে পাকা পাতা ঝবে তোমাদের ফুলসজ্জা তলিয়ে দেবে। এই তো ক'বছর আগে রক্তের ছোপে রাঙা হয়েছিল ওখানটা। আবও কতবার রক্তে ভেসেছে আমাদের দেশ—আমাদের এই গ্রামটুকুও। সারা দেশের মাটি খুঁজে দেখ, এক ফোঁটাও রক্তের দাগ নেই কোনখানে। লোকের মনে একটু-আধটু যা আছে তা-ও মিলিয়ে যাবে আর কয়েক বছরে বিপুল জীবনোল্লাসের মধ্যে। দোষ দিই না—স্বাধীন দেশের ভাগ্যবান নরনারী, সামনে এগোবার তাগিদ—পিছনে ফিবে নিশ্বাস ফেলবার সময় কতটুকু ?

শপ এনে এনে জড় করছে। শপের কি দরকার ? শুকনো পাতা স্তূপাকার হয়ে আছে—ওরই কতক এনে গড়িয়ে দাও, গদির মত হবে, দিব্যি আরাম করে সকলে বসবে। কতদিন আমরা পাতার বিছানায় ঘুমিয়েছি—সে জায়গা দেখিয়ে এলাম নিশিকান্ত। প্রভাসের কথা ভাবছি। প্রভাস—আমাদের প্রভাস মহারাজ ! ইস্কুলের মাঠে উৎসব-সভা—এমন দিনে সে নেই ! এই মাঠ থেকে একদা নিশিরাত্রে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' সঙ্কল্প নিয়ে পথে পথে বেরিয়েছিলাম আমরা, প্রভাস আর ফেরেনি। কাঠখোট্টা চেহারা, কদম-ছাঁটা চুল, গেরুয়া পরত না বটে—কিন্তু হাঁটুর নিচে কখনো কাপড় নামতে দেখি নি।

বছর পনেরো নিরামিষ ধরেছিল, তার মধ্যে নুন ছুঁত না বছর পাঁচেক—ছেলেরা প্রভাস মহারাজ বলে ডাকত। কিন্তু মনে তার ফুর্তির জোয়ার—সেই ফেরারি অবস্থায় মসগুল করে রাখত সে সকলকে। এক টুকরো বাঁশের গোড়া আতার ছোটায় বেঁধে ঝুলিয়ে দোলনার মতো করে নিয়েছিল আমাদের বাঁশবনের আশ্রমে। যেদিন পেটে ভাত পড়ত না, দোল খাওয়ার শখ বেড়ে যেত প্রভাসের সেই দিন।

পোড়া ইস্কুল-ঘরে আজ কত মানুষের আনাগোনা! এ দালান পুড়িয়ে দিয়েছিল সেবার। দরজা-জানালা পুড়ে গিয়ে ঘর হা-হা করত, আবার তার চেহারা ফিরেছে। এক পাশে বিজলী-ডাক্তার খাবার জল আর তুলো-আইডিন নিয়ে হাসপাতাল সাজিয়ে বসে আছে আজকের দিনটার জন্য। পাশের ঘেরা-বারাণ্ডায় একটুখানি বিছানা করা আছে, সভাপতি লক্ষ্মণ যদি বিশ্রামের দরকার মনে করে ওতদূর এসে পৌঁছবার পর। বুড়োমানুষ, তার উপর শরীরের এই হাল—লোকে নেহাৎ নাছোড়বান্দা বলেই সভা করে বেড়াতে হচ্ছে এখানে-ওখানে। কি দেখেছি বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময়, কিংবা লক্ষ্মণের জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর! তার নামে পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকেও মানুষজন ভোরবেলা চাল-চিঁড়ে নিয়ে বেরিয়েছে। বক্তৃতা করতে পারে না লক্ষ্মণ, দুটো কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলতে কালঘাম ছুটে যায়, অ্যাঁ-অ্যাঁ করে। সেই সময় পাশ থেকে কথা জুগিয়ে দিতে হয়। অথচ তার এত জনপ্রিয়তা! কিন্তু এবারে উবে গেল নাকি? প্রফুল্ল-বৈদ্যনাথেরা বিশেষ উদ্যোগী বলেই হয়তো মানুষজনের চাড় দেখা যাচ্ছে না তেমনি। কিন্তু প্রফুল্লও ছাড়বার পাত্র নয়, হাজির করবে দেখো সকলকে ঠিক সময়ে। হাত ধরবে মাতব্বরদের, না আসে তো ট্যাক্স বাড়াবার ভয় দেখাবে। কাজকর্ম ফেলে মীটিঙে ছুটতে দিশা পাবে না তখন চাষীরা। আজই সকালবেলা রামদাস তুলেছিল এই প্রসঙ্গ। আমি তাকে উপদেশ দিলাম, কান খাড়া রেখো শঙ্খ বাজবে লক্ষ্মণের গলায় মালা দেবার সময়। তখন গিয়ে হাজির হোয়ো—তা হলেই চলবে।

লক্ষ্মণের সঙ্গে এবার একই দিনে আমি জেল থেকে বেরোই। গাঁয়ে এসে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—কোন জায়গায় ঘরবাড়ি ছিল, চিনে উঠতে পারে না। আর আমার ঠিক উল্টো অবস্থা—চারিদিকে খাঁ-খাঁ করছে, তবু সমস্ত যেন জীবন্ত দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। সেই আগের মতোই তারা চলে-ফিরে বেড়ায়। যতীন-দাকে দেখি, কানুকে দেখি, প্রদীপ্তমুখ প্রভাস মহারাজকে দেখতে পাই। জেলে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। রোগের শেষ যায় নি, এখনো অনেকের সন্দেহ। আমি কিন্তু নিজে কোন রোগের লক্ষণ একবিন্দু টের পাই নি। অতীতের প্রিয় মানুষগুলি রাতদিন যেন আমায় ঘিরে বসে থাকত, ভারি আনন্দে ছিলাম। বরং মনে হয়, পাগল ঐ বুড়ো লক্ষ্মণ। কোন দিন ওর রোগ নিরাময় হবে না। দেখলে মনে হবে, অমন সুখী লোক ভূ-ভারতে নেই। জেল

থেকে বেরিয়ে ঘর সে আর নূতন করে বাঁধল না। বললে হাসে। হেসে হেসে বলে, কি দরকার বল ভাই? কথা মিথ্যা নয়—ঘরের কি দরকার লক্ষ্মণ মাইতির? নিজে তো আজ এখানে কাল সেখানে—এই করে বেড়াচ্ছে। বউ জলে ডুবে মরেছে, জলের তলে জ্বালা জুড়িয়েছে হতভাগীর। দুটি ছেলের মধ্যে প্রভাস ফাঁসিতে গেছে, আর একটি জেল থেকে নানা জটিল রোগ নিয়ে এসেছে—হাসপাতালের একরকম কায়েমি বাসিন্দা তাকে বলা যায়। লক্ষ্মণ কেন মিছে ঘর-বাঁধার হাঙ্গামা করতে যাবে?

প্রভাসের কথা শোন। বারটা মনে হচ্ছে—বিষ্যুৎবার। হাট বসেছিল সেদিন. হাটবার ছিল—তাই মনে আছে বারটা। সকালবেলা টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রভাসকে ধরল, হাত-পা বেঁধে নিয়ে চলল। হাঁটু অবধি খদ্দর-পরা মুখে প্রশান্ত হাসি আমাদের প্রভাস মহারাজ—তার হাতে দড়ি না দিলেও চলত নিশিকান্ত। ইস্কুল-ঘর দখল করে নিয়ে পুলিস ওখানে ঘাঁটি করেছিল। সামান্য এই পথটুকু নিয়ে আসার মধ্যে আসামি পালিয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পালাবার হলে অপেক্ষা করত কি সে বাড়ি বসে? কত জনে সে বুদ্ধি দিয়েছিল, সে যায় নি। ওরা এলে প্রভাস বেরিয়ে এসে হাত দু-খানা এগিয়েই দিল একরকম। হাতে হাতকড়ি পরাল, কোমরেও এই মোটা এক দড়ি বেঁধে হিড়-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল। সোজাপথে না নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে ভদ্রার কূলে কূলে হাটখোলা অবধি তাকে নিয়ে বেড়াল। তার মানে, সারা অঞ্চলের মানুষ দেখে নিক ওদের প্রতাপ। কাল হল এই প্রতাপকে দেখতে গিয়েই। বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাটুরে মানুষ জমতে লাগল. সকলের মুখে ঐ এক কথা। ভোরবেলা ওরা যে যার ঘরের মধ্যে ছিল, থানার লোক যেন ফাঁক বুঝে সেই সময় জুতো মেরেছে এক। প্রভাসকে নয়—অঞ্চলসুদ্ধ মানুষের মুখে। প্রভাসকে এমনি ভালবাসত সবাই। বাসবে না কেন নিশিকান্ত, সর্বত্যাগী হয়ে কে এমন ভালবেসেছে দেশের মানুষদের? বারাণ্ডায় ঐ যে আধ-পোড়া শাল-খুঁটি, ঐখানে ঠিক-দুপুরে প্রভাসকে বসিয়ে রেখেছিল। মালসায় করে গুড়-মুড়ি খেতে দিয়েছে, তা সে খায় নি। প্রহরখানেক একটানা জেরা করে ক্লান্ত বৈদ্যনাথ সবেমাত্র খেতে গেছেন, খেয়েদেয়ে এসে নব উদ্যমে আবার এক দফা চেষ্টা চলবে, তারপর পাঁচটার গাড়িতে সবসুদ্ধ আগরহাটি হয়ে সদরে রওনা হয়ে যাবেন. এই সাব্যস্ত আছে। কাণ্ডটা ঘটল এই সময়। আশ-পাশ আট-দশখানা গ্রামের বিস্তর লোক দলে দলে মিছিল করে এসে পড়ল। শত শত নিশান উড়ছে, গর্জমান জনতরঙ্গ অধীর হয়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে—

ভাবতে গেলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে নিশিকান্ত। খাওয়া হল না বৈদ্যনাথের—এঁটো-হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটলেন। হাটুরে মানুষও যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। প্রভাসের হাতকড়ি ভেঙে কোমরের দড়ি কেটে কাঁধে তুলে লাফাতে লাফাতে তারা নিয়ে গেল। জনতার নজর এড়িয়ে বৈদ্যনাথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এঁদোপুকুরের কচুবনের ভিতরে গিয়ে

বসেছিলেন, চাঁদ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে হয়েছিল নাকি তাঁকে। সত্যি, তাজ্জব ঘটে গেল নিশিকান্ত—এক মুহূর্ত আগে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। প্রভাসকে শুধু ছাড়িয়ে নিয়ে আসা নয়—জমাদার-কনেস্টবল উর্দি-চাপরাস ফেলে 'বাপ' 'বাপ' বলে পালিয়েছে, তাদেরই ক'জনকে ধরে তালাবদ্ধ করে রাখল ঐ পাশের কামরায়। তে-রঙা নিশান পতপত করে করে উড়ছে ইস্কুলঘরের ছাতে। পাঁচ রাত চার দিন উড়েছিল ঐ ভাবে।

রাত্রি প্রহরখানেক অবধি এই সমস্ত চলল তো নিশিকান্ত, তারপর চারিদিক স্তব্ধ হলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবছি, এ কী হয়ে গেল—ঠিক এমনটা চাই নি, আশাও করি নি এত সহজে এমন দখলে এসে যাবে সমস্ত। কাগজে লড়াইয়ের খবর পড়ি—সে ব্যাপারও এইরকমটা নাকি? হঠাৎ বিজয় হয়ে যায়, যত মানুষ মরবে আর যত গোলাগুলি চলবে বলে আস্ফালন করা হয় আসলে তার সিকির সিকিও লাগে না। এর পরবর্তী অধ্যায়ের আঁচ করছি, এ ব্যাপার অবশ্য এখানেই চুকবে না। আমরা, বয়স যাদের বেশি, সাব্যস্ত করতে পারি নে কি করতে হবে অতঃপর আমাদের। কিন্তু জোয়ান ছেলেগুলো বেপরোয়া. তাদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, হাসি-স্ফূর্তির অবধি নেই—খবর নিয়ে আসে, শুধু একটা জায়গা নয়—সর্বত্র প্রায় একই অবস্থা। সাম্রাজ্যের হাজার ছিদ্র, সামলাবে ওরা আর ক'দিকে? কত মানুষ আছে শুনি, কত হাতিয়ার? আর হাতিয়ার হাতে পেয়ে কে কোন দিকে তাক করবে, তারই বা ঠিক কি? ওদের নিজের ঘরের ছেলেরাই বিরক্ত হয়ে বেঁকে বসছে ক্রমে। শহর থেকে ফিরে এসে একজন গল্প করছে, সাদা সৈন্যের ব্যারাকের সামনে দিয়ে জনতা জকার দিতে দিতে যাচ্ছিল, কুইট ইণ্ডিয়া—ভারত ছাড়। সৈন্যদেরই একজন নাকি দরজায় বেরিয়ে হাসিমুখে জবাব দিল ফর গড্‌স্ সেক—ঈশ্বরের দোহাই, ভারত ছেড়ে দেশে ফিরতে দাও আমাদের। ছেলেগুলো মুখ নেড়ে নেড়ে আমাদেরই উপদেশ দিতে আসে, অত ভাবছেন কি দাদা? চালাও হুকুম এবার, নেতার মুখ চেয়ে থাকতে হবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পোস্ট-অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে, খবরের কাগজ বন্ধ। ছেলেরা বলে, ভাল হয়েছে—বানানো গল্প আর সুকৌশলে পিছু হঠার বাহাদুরি পড়তে হবে না এখন আর। কাগজ আসছে না, তা বলে খবরের প্রচার কিন্তু বন্ধ নেই। গাছে গাছে অলক্ষ্যে এঁটে দিয়ে যাচ্ছে সাইক্লোস্টাইল-করা খবর। হুলস্থূল কাণ্ড। বিদেশে ফৌজ গড়েছে আমাদের। আসছে, তারা এসে গেল বলে। পথ তৈরি কর তাদের জন্য।

রাস্তায় বড় বড় গাছ কেটে ফেলেছে, পগার কেটেছে দশ-বিশ হাত অন্তর। খেয়া-নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে। ছোট রেললাইনও একেবারে বেমালুম মাঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে পাঁচ-সাত জায়গায়। সদর থেকে সৈন্য নিয়ে আসা সহজ হবে না আর এখন। রোজই নূতন নূতন বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা দিন গুণছি নিশিকান্ত—খবর নিচ্ছি, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে কি আগুন। আগাপাস্তলায় আগুন লেগে গেলে জল ঢালবে তখন কোন দিকে?

কিন্তু আটকানো গেল না নিশিকান্ত। রাস্তায় নূতন মাটি ফেলে গাছ সরিয়ে মেটে রঙের সারবন্দি ট্রাক এসে পড়ল, আর কোন উপায় নেই। সমস্ত রাত্রি হেঁটে জন চারেক আমরা একবার রানায়ের মোহানা অবধি গিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু দূরের জায়গায় বেশি বিপদ। সবদিকে ডামাডোল চলছে, অচেনা লোক দেখলে সবাই কেমন এক ভাবে তাকায়। মুশকিলের কথা বলব কি—সারাদিনের মধ্যে একমুঠো ভাত কি চিঁড়ে জোটাতে পারলাম না, সকলে চোখ কটমট করে চায়, অনেকে নূতন মানুষ দেখে সন্দেহ করছে পুলিসের চর আমরা। কে পুলিস আর কে কর্মী আলাদা করার উপায় ছিল না, পুলিসই ভলান্টিয়ার সেজে খোঁজখবর নিত সময় সময়। অবস্থা দেখে আমাদের আতঙ্ক হল, দিনের বেলা এই রকম—রাত্রে নিশ্চয় ধরে পিটুনি। অথচ আত্মপরিচয় দিতেও ভরসা হয় না। যত ঢাকাঢাকি করছি, সন্দেহ ততই বেড়ে যাচ্ছে সকলের।

চুপিচুপি বলি তা হলে নিশিকান্ত, জেলে গিয়ে যেন সোয়াস্তির শ্বাস ফেলেছিলাম ছ-সাত মাস পর। নিশ্চিন্ত। মাথা খারাপ হল শুনে তোমরা হায়-হায় করতে, আমার তার জন্য কিন্তু এতটুকু কষ্ট ছিল না। এক বিচিত্র অনুভূতি স্বপ্নের মতো এখনো আবছা-আবছা মনে পড়ে। মোটা মোটা গরাদে আর উঁচু পাঁচিলে যেন লোহার কেল্লা গড়ে রাজাধিরাজ হয়ে নিঃশঙ্কে ছিলাম। পথের কুকুরের মতো আর তাড়া খেয়ে ঘুরতে হত না।

প্রভাসকে শেষ দেখেছিলাম গরাদের ফাঁক দিয়ে। সে দেখে নি, অঘোরে ঘুমুচ্ছিল তখন। উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে সেলের ভিতরটা অবারিত। ওয়ার্ডার পাহারা দিচ্ছে দরজার সামনে। ফাঁসি-কাঠে কালো বার্নিশ লাগিয়েছে, চর্বি দিয়ে মেজেছে। প্রভাসেরই ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে সকালবেলা। তারা তৈরি!

ঘুমুচ্ছিল, রাতের স্তব্ধতা চূর্ণিত করে ঘণ্টার আওয়াজ এল। শোনা কথা অবশ্য—ধড়মড়িয়ে উঠে সে বলছিল, স্নান করব, পুণ্যকর্মে যাচ্ছি, শুচি-স্নাত হয়ে যেতে চাই।

উদাত্ত কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, শেষ রাত্রের নির্মল আকাশে অজস্র হীরার কুচির মতো তারা দপদপ করছে—সেই সময় ঘুম ভেঙে বসে শুনতে পাচ্ছি, যার কাছে যে দোষ করেছি, মাপ চেয়ে যাচ্ছি ভাই। শুনতে পাও বা না পাও, আমায় মাপ কোরো তোমরা—

চোখে দেখি নি, কিন্তু ছবিটা আন্দাজ করতে পারি নিশিকান্ত। পবিত্র আগুনের মতো প্রদীপ্ত মুখ, ফাঁসির মঞ্চে অচঞ্চল উঠে দাঁড়াল আমাদের প্রভাস মহারাজ।

যে সময় বিচার চলছিল; একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষ মারতে পার তুমি? সত্যি কি মেরেছিলে?

খানিক হাসিমুখে তাকিয়ে থেমে সে বলেছিল, মানুষ কি মারা যায়?

জানোয়ার মরেছিল কি-না খবর রাখি নে। তারপর একটু স্তব্ধ থেকে বলল, একটা কাজ কোরো ভাই দয়া করে। মহাত্মাজী বেরিয়ে এলে তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।

আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ কর মহাত্মাজী।

তুমি সেই ভারতবর্ষ গড়তে চেয়েছ, যেখানে দীনতম ব্যক্তিও উপলব্ধি করবে এ তারই দেশ; দেশের পরিগঠনে তাদের মতামতও কার্যকর হবে। সেই ভারতে উচ্চ-নীচ সমাজ-বিভেদ থাকবে না, সর্বসম্প্রদায় পরস্পর প্রীতিমান হয়ে বাস করবে। অস্পৃশ্যতা থাকবে না, মাদক-সেবন থাকবে না, নারী পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে। তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষের এই ছবি এঁকে দিয়েছ আমাদের মনে।

এই সভাক্ষেত্র শেষ নয় জয়রামপুরের। দুর্গম পথ এবার। ঐ নাবাল বিলের প্রান্তে চাষীদের বসতি—প্রায় আড়াই শ' ঘর হবে। তাদের কেউ এখনো সভায় আসে নি। তাকিয়ে দেখ নিশিকান্ত, রুক্ষ বিল নবাঙ্কুরে শ্রী ধারণ করেছে। সারবন্দী চাষীরা ক্ষেত নিড়াচ্ছে এই পড়ন্ত বেলাতেও। ক্ষেতে বড় গোন। টিলার উপর বাঁশ ফাড়ছে ফটফট আওয়াজে—জাঙালের দু-পাশ ঘিরে দেবে, গরুতে মুখ বাড়িয়ে যাতে ধানচারা না খেতে পারে। দেখ চেঁচোঘাসের বোঝা এনে এনে জাঙালে ফেলছে—বাড়ি ফিরবার সময় নিয়ে যাবে, রাত্রে কুঁড়োর সঙ্গে মেখে জাবনা হবে গরুবাছুরের। ঘাড় উঁচু করে একবার ওরা তাকিয়েও দেখছে না এদিককার এ উৎসবের আয়োজন। ইতিহাসের এমন একটা স্মরণীয় দিন—তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারো।

রাগ কোরো না, ওরা খবর পায় নি। খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে যে স্বাধীনতা এসে গেল—আর ছাপার অক্ষরে দিনের পর দিন মিথ্যা কথাই বা লিখবে কেন? কিন্তু আমাদের জয়রামপুর অবধি এসে পৌছবার দেরি আছে। বিয়াল্লিশ সনে লাইন উপড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে রেলগাড়ি চলে না। ভদ্রা মজে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে একটা ছোট্ট ডিঙি আনতে গেলেও কলমির দামের ভিতর দিয়ে লগি ঠেলে অনেক কষ্টে নিয়ে আসতে হয়। দিল্লী-করাচির স্বাধীনতা চট করে কি পৌছতে পারে এতদূর?

প্রফুল্লদের গাফিলতি নেই। হাটে দু-হপ্তা ধরে কাড়া দিচ্ছে। তোমাদের সকলের নাম দিয়ে হাণ্ডবিল বিলি করছে—পতাকা উত্তোলন হবে, মস্ত বড় সভা হবে, শহীদ-বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি ও শহীদ-পদক দেওয়া হবে, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। এসব সত্ত্বেও খবর পায় নি ওরা। যেমন গ্রাম-গ্রামান্তে বিনা তারে খবর হয়েছিল দূর-অতীতে নীল-বিদ্রোহের দিনে, কিংবা এই সেদিন লবণ-সত্যাগ্রহ ও আগস্ট বিপ্লবের সময়।

ওদের কাছে খবর পৌছবার উপায় কর নিশিকান্ত। প্রফুল্লদের সাধ্য নেই। কালোরা সাদার আসনে বসেছে, সেই আনন্দে মশগুল; হুকুম-হাকাম চালাচ্ছে, যতদূর পারছে পকেট ভরে নিচ্ছে। এই অবধি পারে প্রফুল্লরা

অনেক সাধনায় বক্তৃতামঞ্চের উপর মনের হাসি গোপন করে অশ্রু নিঃসরণের কায়দাটা শিখেছে। কর্তৃত্বের সকল কারচুপি নখমুকুরে। আজ ইংরেজ গবর্নমেণ্ট—সেলাম, আমরা সঙ্গে আছি স্যর। এসেছে, স্বরাজ—জয় হিন্দ, এই যে হাজির আমরা।

ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির দুর্গে বসবাস করে নিবিঘ্ন মনে করছে নিজেদের। স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না, চাষীপাড়ার ছেলেরা ইতিমধ্যে আর এক রকম হয়ে উঠেছে। প্রফুল্ল-বৈদ্যনাথের তদ্বিরে সভার জায়গা শেষ অবধি নিশ্চয় ভরে যাবে নিশিকান্ত—বুড়োরা আসবে, আমাদের পাড়ার দিককার অনেকে আসবে, কিন্তু ঐ ছোকরাদের আসবে না প্রায় কেউ। একালের ওরা মাথা নিচু করে বেড়ায় না আর ভক্তিমান ভাবে, জুতো খেয়ে পিঠের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চোখের জল ফেলে না। কারুরও দয়ার প্রত্যাশী নয় ওরা। কেমন করে লোভ ঢুকে পড়েছে মনে—প্রফুল্লদের মতো দালান-কোঠায় শোবে এলাক-পোশাক হবে ঐ রকম। কালীতলায় ঢাক বাজে না আগেকার মতো, ঢাকের তালে নেচে মাটিতে লুটায় না ভক্তের দল। পুজোর কাছে ওদের বেশি আনাগোনা দেখা যায় পাঁঠাবলির সময়টা। অবিশ্বাসী ওরা—বুড়োরা বলে নরকেও জায়গা হবে না। বলিপর্ব শেষ হতে না হতে ছাল ছাড়াতে লেগে যায়, অগোচরে মহাপ্রসাদের মাংস পেঁয়াজ-রসুন সহযোগে চাপিয়ে দেয় উনুনের উপর। পুরুত বিষ্ণু চক্রবর্তী অভিসম্পাত করেন এই নাস্তিকের জন্য। ওরা হাসে। চাষীপাড়ার পৌরোহিত্য ছেড়ে দেবেন বলে তিনি শাসিয়েছেন অনেকবার, এরা পদানত হয় নি। অবশেষে অনেক বিবেচনা করে পুরুতঠাকুরই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমা করেছেন।

ঘন গিরাওয়ালা বাঁশের লাঠি কেটেছে ওরা, বেতের ঢাল বানিয়েছে। যখন স্বাধীন দেশের সৈন্য নেওয়া হবে—ওদের পাড়ায় তখন লোক পাঠিও, সৈন্যদল আধাআধি তৈরি হয়ে আছে ওখানে। ও-পাড়ার শিশুরা সকালে নারিকেল-গামড়ার গরু বানিয়ে খেলা করত, এখন খেজুর-ডালের গোড়া চেঁচে-ছুলে নিয়ে বন্দুক বন্দুক খেলে। কি করে বলতে পারি না—জানাজানি হয়ে গেছে পৃথিবীর নানা দেশের অনেক গুহ্য খবর, প্রফুল্লরা কিছুতেই যা ফাঁস করতে চায় না। নিজেদের আর অসহায় দুর্বল মনে করে না ওরা কেউ। ঐ যে শত শত বাঁশের ঘর, কঞ্চির বেড়া—বাঁশের কেল্লা ওগুলো, রামজয় ঠাকুরের একটার জায়গায় দেশব্যাপী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ—

সৈনিক

(উপন্যাস)

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৪৫

উৎসর্গ

লাঞ্ছিত বিস্মৃত বিগতপ্রাণ
দেশপ্রেমের অপরাধে অপরাধীদের উদ্দেশে

পুরানো খাতায় 'সৈনিক'এর সময়-ক্রম পাওয়া গেছে। অষ্টম সংস্করণে (আগস্ট, ১৯৪২) সেটা সংযোজিত হল। ঘটনাগুলো নিম্নোক্ত সময়ে ঘটেছিল, ধরে নেওয়া যেতে পারে কৌতূহলী পাঠক ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন।

১ম	পরিচ্ছেদ	মে,	১৯৪২
২য়	,,	জুন,	,,
৩য়	,,	জুলাই,	,,
৪র্থ	,,	,,	,,
৫ম	,,	আগস্ট,	,,
৬ষ্ঠ	,,	সেপ্টেম্বর,	,,
		ডিসেম্বর,	,,
৭ম	,,	এপ্রিল,	১৯৪৩
৮ম	,,	জুলাই,	,,
৯ম	,,	আগস্ট,	,,
১০ম	,,	সেপ্টেম্বর	,,
১১শ	,,		

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

পান্নালাল জেল থেকে বেরুল। জেলে গিয়েছিল সত্যাগ্রহ করে। প্রকাণ্ড ফটকটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল তার পেছনে। সে মুক্ত এবার।

হন-হন করে চলেছে। দূর থেকে ডাক আসে, পান্নু-দা!

উমা যে! তুমি এখানে···জানলে কি করে যে খালাস পাব আজকে?

কাজে যাচ্ছিলাম এদিকে। হঠাৎ দেখি—

ঘাড় নেড়ে পান্নালাল বলে, উঁহু, বিশ্বাস করলাম না। দিন গুণেছ, খবর নিয়েছ তুমি। যথাসময়ে এসে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছ।

উমা হেসে বলে, বেকার মানুষ নই পান্নু-দা। বাজে খরচের সময় কোথা অত?

করছ কি আজকাল?

মাস্টারি। দু-পাতা ইংরেজি-শেখা মেয়েদের যা চরম মোক্ষ।

খুশি মুখে পান্নালাল বলে, বেশ, বেশ—

রিক্সাওয়ালা যাচ্ছিল ঠুন-ঠুন করে। তাকে ডাক দিল, এ-ই—

তারপর বলে, তোমরা লেখাপড়া শেখ, মাস্টারি করে আবার কতকগুলো ভাবী মাস্টারনী তৈরি করবার জন্য—

উমা বলে, বেশ করি। বেরুলে এদ্দিন পরে—রাস্তায় দাঁড়িয়েই এখন কুচ্ছো চলবে নাকি?

না—রাস্তায় আর কেন। রথ খাড়া আছে, ওঠ—

রিক্সায় চাপল দু-জনে। উমার সঙ্কোচ হচ্ছে ঘেঁষাঘেঁষি করে যেতে এই রকম। বলে, ঘোড়ার-গাড়ি নিলেই হত একটা—

ভাড়া যে পাঁচ গুণ। হেসে উঠে পান্নালাল বলতে লাগল, বোঝা-বওয়া জানোয়ারগুলো পেরে উঠছে না মানুষের সঙ্গে কমপিটিশনে। ঠেলাগাড়ির ঠেলায় গরুর-গাড়ি পয়মাল, রিক্সার জন্য ঘোড়ার আর দানাপানি জুটছে না। একটা মানুষ পোষার খরচ ঘোড়া পোষার চেয়ে অনেক কম।

মোড় অবধি এসে রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করে, কোন দিকে?

তাই তো, নিশ্চিন্ত ছিলাম সরকারি পাকা দালানে। মুশকিল হল ছাড়া পেয়ে। যাই কোথা এখন? চল্ দেখি পূবমুখো—

উমা দুঃখিত স্বরে বলল, জীবনটা প্রায় জেলে জেলেই কাটালে দেশের জন্য। আজ জায়গার ভাবনা ভাবতে হচ্ছে!

পান্নালাল বলে, সময়টা বড় বেয়াড়া কি না! নইলে দেখতে মালা নিয়ে মিছিল আসত, মোটরগাড়ি দুয়োর খুলে আমন্ত্রণ জানাত, কোনো বাড়ির সামনে দাঁড়ালে শঙ্খ বেজে উঠত উপরের ব্যালকনি থেকে—

উমা হঠাৎ বলল, আচ্ছা—এবারে যে জেলে গিয়েছিলে, তার কোন মানে হয়?

পান্নালালের চোখে ধ্বক্ করে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু মুখে অমায়িক হাসি। বলে, দুর্লভ মানব-জীবনের দেড়টা বছর বোকার মতো অনর্থক নষ্ট করে এলাম, এই বলতে চাচ্ছ?

উমা বলে, একা একটি প্রাণী পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলে—হৈ-চৈ নেই, কিচ্ছু নেই। একটা বার মুখের কথা না বলে ভারতকে যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করেছে, জাতির অবমাননা হয়েছে—তাই জানালে, যুদ্ধ-চালনায় তোমাদের আপত্তির কথা। কিন্তু কে শুনল? ক'টা লোকই বা জানতে পারল! ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিল। ব্যস, ঠাণ্ডা। কি ক্ষতি হল ওদের?

ক্ষতি করতে তো চাই নি। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে—এটা কি হৈ-চৈর সময়?

তবে?

বলতে চেয়েছি, লড়াইটা জবর কর আরও। অস্ত্রের শক্তি ছাড়া আরও কিছু চাই। যার অভাবে মালয়ে আর বর্মায় কেলেঙ্কারি ঘটালে। যারা মানুষের মতো বেঁচে থাকতে দিচ্ছে না, তাদের বলেছিলাম, মানুষের মতো মরবার অধিকারটুকু দাও অন্তত। ভাতের অভাবে বা টাকার লোভে নয়—স্বদেশের জন্য লড়ছি এই দাবিতে ফ্রন্টে গিয়ে দাঁড়াব।

কিন্তু কানেই তো নিল না—

নেওয়াতে পারলাম না। শক্তের ওরা ভক্ত। মিউনিকে তার নমুনা দেখেছি। বোঝা গেছে জাপানের হুমকিতে যখন বর্মা রোড বন্ধ করে দিয়েছিল—স্বাধীনতার যোদ্ধা চীনের দিকে তাকায় নি সে সময়।

উমা বলে, মেনে নিচ্ছ তোমরা শক্তিহীন?

সৈন্য আর ইস্পাতের অস্ত্রকেই শুধু শক্তি বলে মানলে আমরা তাই বটে!

প্রদীপ্ত দুটি চোখ উমার মুখের উপর ফেলে পান্নালাল বলতে লাগল, জগতে কার এমন বুকের পাটা বল দিকি উমা, আগেভাগে নোটিশ দেয়—তোমার

সঙ্গে বনছে না, আমার আত্মা অবমানিত হচ্ছে, আমার পথে চলব আমি, যা ক্ষমতা থাকে কর। অশক্তের সাধ্য আছে এই সত্যাগ্রহের?

গম্ভীর হয়েছে পান্নু, গভীরভাবে ভাবছে। নিশ্বাস ফেলে সে বলল, উভয় সঙ্কট! এ ছাড়া আর কি-ই বা করা যেত বলো উমা। খুব কড়া সংঘর্ষের সময় এটা নয়। ভাবীকালের বিচারের জন্য রইল ভারতের ঐ প্রতিবাদ। জগতের মানুষ শুনবে নিরপেক্ষ কান থাকে যদি কারও—

রিক্সা যাচ্ছে রসা রোড দিয়ে। ট্রাম-বাস যে জায়গায় থামে, পোঁটলা-পুঁটলি আর মেয়েলোক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে অগণ্য মানুষ।

চলল কোথা?

এভ্যাকুয়েশন। রেঙ্গুন গিয়েছে। জাপানীরা জোর কদমে আসছে যে এইদিকে—

পান্নালাল উৎকট হাসি হেসে উঠল।

পরাধীন জাতির একটা সুবিধা উমা, মাথার উপর গার্জেন থাকে, ভরসা করা যায়। এই এরা সব নিশ্চিন্তে পালাতে পারছে—জানে, সাদা অভিভাবকেরা রইলেন—তাঁদের গড়া শহর দেখবেন তাঁরাই।

রিক্সাওয়ালা প্রশ্ন করে, কদ্দ র বাবু?

কলেজ স্ট্রীট—

॥ ২ ॥

কলেজ স্ট্রীটে মহেশ নামে এক পুরোনো বন্ধু পাঁঠার দোকান করেছে। দেউলির বন্দিশালায় অনেক দিন একসঙ্গে বসবাস করে পাকাপোক্ত হয়েছে বন্ধুত্বের ভিত। জেলে যাবার আগে সে মহেশের ঘরে তার সঙ্গেই ছিল মাসখানেক। মহেশ বলত, পলিটিক্স তোবা করেছি ভাই। অগ্নিমন্ত্রের মানুষ আমরা, আজকাল তোমাদের নন-ভায়োলেণ্ট পিটুনি-খাওয়া বরদাস্ত করতে পারি নে। মানুষ মারা মানা হয়ে গেছে, চুপচাপ এই পাঁঠার গলায় কোপ ঝাড়ছি। হাতের নিশপিশানি ওতে কমে খানিকটা।

তা কোপ মারছে দৈনিক এমন একশ দেড়শ পাঁঠার গলায়। দোকান করে ক'বছরেই মহেশ ভুঁড়ি বাগিয়েছে।

জেড় বছর আগেকার জীবনোচ্ছল বিচিত্র কলকাতার ভীত মূর্তি দেখতে দেখতে পান্নালালেরা চলেছে। পলায়নের হিড়িক পড়ে গেছে। লড়াই এসেছে একেবারে ঘরের কাছ বরাবর—কলকাতার না-জানি কী দশা হবে এবার! বর্মা থেকে মানুষ আসছে দলে দলে। কায়ক্লেশে এসে যারা

পৌঁচেছে, নানারকম কাহিনী তাদের মুখে মুখে। পথে মরে পড়ে আছে শত শত—কলেরা হয়ে, সাপের কামড়ে কিম্বা খাদ্যের অভাবে। বিস্তর কষ্টে ও অবিশ্বাস্য মূল্যে কদাচিৎ পাওয়া গেছে একখানা নৌকা বা গরুর-গাড়ি। খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে মগেরা ঘিরে ফেলেছে পাড়ার মধ্যে। জল নেই—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ। কে একজন দয়া করে বাংলা হরফে গাছের গুঁড়িতে ছালের উপর দাগ কেটে কেটে লিখেছে—নেমে যাও, নিচে ঝরনা—

ব্যাকুল হয়ে দলের পর দল নিচে নামছে প্রায় হাত পঞ্চাশ আঁকা-বাঁকা এবড়ো-খেবড়ো পথে। জল পড়ছে বটে ঝিরঝির করে, কিন্তু—

দাও হাতে দাঁড়িয়ে ষণ্ডামর্ক বর্মি জনকয়েক। ছুঁতে দেবে না ঝরনার জল। এক এক টাকা ফেল, তবে এক এক ঘটি। টাকা বের করে দেওয়ায় আরও বিপদ। যা-কিছু সম্বল নিয়ে চলেছে, দেখতে পেলে লোভ উদ্দাম হয়ে উঠবে। সংখ্যায় যে দল কম, ভয়ে ভয়ে তারা ফিরে যায়, জল খাওয়া ভাগ্যে ঘটে না।

এই বর্মা-ফেরতদের মধ্যে বাহাদুর একজন নাকি গল্প করে বেড়ায়, আমি করলাম কি—পায়ে এই মোটা এক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়েছি, ব্যাণ্ডেজের নিচে নোট সাজানো। সবাইকে বলি, পা পিছলে পড়ে ঘা হয়েছে, পুঁজ রক্ত পড়ছে—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলি—কেউ আর সেদিকে ফিরেও তাকায় না—হা-হা, আমার সঙ্গে চালাকি!

আবার স্টেটস্‌ম্যানে পড়া গেল, রোমহর্ষক বিবরণ—এভ্যাকুয়েশন নয়, প্রমোদ-ভ্রমণ যেন। প্রশস্ত পথ, যান-বাহনের সমারোহ···মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম-শিবির, সুপ্রচুর খাওয়াদাওয়া—মায় বলনাচের পর্যন্ত বন্দোবস্ত—

বকবক করে এইসব এতক্ষণ একলাই বকে যাচ্ছিল উমা। কথার শেষে মন্তব্য করে, বুঝলে পানু-দা, পথ ছিলো দুটো। দু-পথের দুই চেহারা।

তিক্ত কণ্ঠে পানু বলল, জাতও দুটো কিনা তাই। মরে গিয়েও মানুষ জাত ভোলে না।

এক অনুপম ঘোষের গল্প বলছিল উমা। উকিল ভদ্রলোক—কিন্তু কোর্টে যান না, এসেম্বলির মেম্বর। তা ছাড়া অনুমান হয়, অপ্রকাশ্য অনেক-কিছু আছে। আছেন ভাল, দেশসেবা হচ্ছে, দু'পয়সা আসছেও। যুদ্ধ-বিশারদ বলে সম্প্রতি বিষম খ্যাতি রটেছে অনুপমের। কাগজে যা ছাপা থাকে এবং যা থাকে না—প্রতিটি খবর তাঁর নখাগ্রে। উমার সঙ্গে চেনা হয়েছে বিশেষ

স্বয়ং ভদ্রলোকের। তিনি পর্যন্ত রায় দিয়েছেন, গতিক সুবিধের নয়। পালাতে হবে, এ একবারে অবধারিত। অতএব সময় থাকতে সরে পড়। এখনো তবু চাকার গাড়িতে গড়াতে গড়াতে যেতে পারবে, পরে সম্বল থাকবে কেবল পা দু'খানি।

রোজই নতুন নতুন গুজব রটছে চারিদিকে। গুজব বললে আপত্তি উঠবে, প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টাদের চোখে-দেখা বৃত্তান্ত। হাওড়া আর শিয়ালদহ—বহির্গমনের প্রশস্ত পথ দুটো ব্যারিকেড-ঘেরা। সাধারণ মানুষের সহজভাবে বেরোবার উপায় নেই। শহরের ভিতর বুকিং-অফিসগুলোয় মানুষ লাইনবন্দি দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মানুষ ও মালপত্র বোঝাই ঘোড়ার গাড়ি, মোটর গাড়ি মিছিল করে যেন চলেছে স্টেশনমুখো। পশ্চিমা গোয়ালারা গাড়ির তোয়াক্কা রাখে না, সংসারের তৈজসপত্র গরু-মহিষের পিঠে চাপিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড বেয়ে। কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে; তারপর এক মাস লাগুক দু-মাস লাগুক, মরে যাক হেজে যাক—কুছ পরোয়া নেই!

রেলের কড়া আইন। একেবারে গোনাগুনতি টিকিট—সিকিখানা তার উপর ছাড়বার উপায় নেই। অগণ্য মানুষ কাতরাচ্ছে টিকিট-ঘরের জানলায়। হাত-জোড় করছে দুয়োরের সামনে দাঁড়িয়ে।

না—না, হবে না, হঠ যাও—

চালাক যারা, পাঁচ টাকার জায়গায় পঁচিশ টাকা নিয়ে জোর করে ঘুলঘুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়। টিকিট বেরিয়ে আসে। সম্বল যাদের কম রেল-লাইন ধরে তারা হেঁটে চলেছে—স্টেশনের পর স্টেশনে খোঁজ নিচ্ছে, মিলবে কি এবার টিকিট? লাগবে কত? সঙ্গতির মধ্যে পৌঁছলেই টিকিট কেনে। টিকিটের উপর টাকার অঙ্ক একটা ছাপ থাকে, সেটা একেবারেই অবাস্তর। রীতিমতো দরদস্তুর করে কিনতে হয়। আর যতই দিন যাচ্ছে, হু-হু করে চড়ছে টিকিটের দর।

মহেশের পাঁঠার দোকান বন্ধ। পাশের বিড়িওয়ালা বলল, দিন দশেক মশায় তালা ঝুলছে ঐ রকম। মাংস খাবার পুলক আছে কি মানুষের? আমারও দৈনিক চার সাড়ে-চার বিক্রি ছিল, এখন চারটে পয়সা হয় না। তালা দেব আমিও।

মহেশের বাসায় গিয়েও দেখা গেল, ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিদায় হয়েছে সেখান থেকে। এককালের অগ্নিমন্ত্রের মানুষটি কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে পাত্তা পাওয়া গেল না।

কি করা যায় ?

ঘোরাঘুরি করতে করতে একটা হোটেল মিলল শিয়ালদহের কাছে।

তুমি যে বাপু দোকান গুটাও নি এখনো ?

হোটেলের ঠাকুর স্টেশনের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল, ওখানে মশাই কুরুক্ষেত্র চলছে। খালি পেটে লড়াই জমবে না, তাই আছি কোন রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে।

লোকটার বীরত্ব দেখে পান্নালালের ইচ্ছে করে, বাহবা দিয়ে পিঠ ঠুকে দেয়। খদ্দেরের ভিড় খুব। হুড়োহুড়ির ফাঁকে মানুষ কোন গতিকে দু-গ্রাস খেয়ে যাচ্ছে। এক দণ্ড বসে যে একটা নিশ্বাস ফেলবে এমন ফুরসত নেই।

॥ ৩ ॥

খাওয়ার পর সেই হোটেলেরই বারান্দায় তক্তাপোষের উপর শুয়ে পড়ল। বড় ক্লান্তি লাগছে। কাজকর্ম নেই, সঙ্গীসাথী দলের মানুষ কেউ নেই শহরে। সন্ধ্যার মুখে একবার উঠে হাত-মুখ ধুয়ে আবার গড়াবে গডাবে মনে করছে। উমা এল সেই সময়।

খবর কি ?

এইবার রাজতক্ত ছাড়তে হবে পানু-দা। চল আমার সঙ্গে।

কোথা ?

রাতের উপায় ভাবছ ? তোমার হোটেলওয়ালা যত বড় মহাবীর হোক, এই ডামাডোলের বাজারে কিছুতে অচেনা মানুষকে রাত্রে জায়গা দেবে না।

বেরিয়ে এল তারা। এরই মধ্যে পথে একটা মানুষ দেখা যায় না। অন্ধকারনিমগ্ন শহর। ট্রাম বন্ধ। অনভ্যস্ত পথে পায়ে ঠোক্কর লাগে।

নিঃশব্দে দু'জন পাশাপাশি চলেছে—অশরীরী দুটি ছায়া। চেনা-জানা জগতের যেন মৃত্যু হয়েছে, অন্ধকারে চারিদিককার নিশ্বাস নিরুদ্ধ। মানুষের কাছে আর শান্তি ও করুণার প্রত্যাশা নয়—নিষ্ঠুর জিঘাংসায় একজন আর একজনকে হনন করবে, ঢাক পিটিয়ে পরস্পরের কলঙ্ক ঘোষণা করবে—এইটেই পরম স্বাভাবিক আজকের দিনে।

হু-হু করে এক ঝাপটা জোলো-হাওয়া বয়ে গেল, রাজপথের উপর পাতা ঝরল ঝুর ঝুর করে। লোকের ভিড়ে আর আলোর উল্লাসে এ যাবৎ কোনদিন কি তাকিয়ে দেখেছি, কলকাতার পথের উপর আছে বড় বড় গাছ—বিস্তীর্ণ ডালপালায় আকাশ ঢেকে রেখেছে ? এখন ব্লাক-আউটের মধ্যে মনে হচ্ছে, গহন অরণ্য-ছায়ে অনন্ত রাত্রিবেলা চলেছে দুটি প্রাণী। দু'পাশের

রুদ্ধ-কবাট নিঃশব্দ বাড়িগুলি যেন বহু শতাব্দীর পরিত্যক্ত অট্টালিকা —মাটির নিচেকার বিলুপ্তি থেকে সম্প্রতি এক প্রাচীন নগর খুঁড়ে বের করা হয়েছে।

ভয়-ভয় করছে উমার। কাছে—অত্যন্ত কাছাকাছি একেবারে পান্নুর গা ঘেঁষে চলেছে।

পান্নু-দা গো!

পান্নালাল অন্যমনস্ক ছিল, চমকে ওঠে।

ফুটপাথে উঠে এস। লরী আসছে ঐ যে। চাপা দেবে।

দুটো আলো অনেক দূরে—দৈত্যের রক্তাক্ত চোখ দুটো। গর্জন করতে করতে প্রবলবেগে লরী ছুটে গেল। বন্দুক হাতে একদল বিদেশী তার উপর। তাদের হাসির ধ্বনি আর লরীর আলোয় রাস্তাটা এক মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে আবার গভীরতর অন্ধকার নিমগ্ন হল।

গাছের ছায়ায় উমা পান্নালালের হাত জড়িয়ে ধরেছে।

কী ঠাণ্ডা তোমার হাত পান্নু-দা!

পান্নালাল জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছ? আর কতদূর বল তো?

উমা জবাব দেয় না। বিরক্ত পান্নালাল বলে, কথা বল যা-হোক একটা কিছু। জমে গেলাম যে!

দুটো রাস্তার মোড়ে বড় গোছের পান-সিগারেটের দোকান। দোকানের আলো বাইরে আসে নি, প্রতিটি আয়োজনের উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

উমা বলে, মানুষ দেখে বাঁচলাম পান্নু-দা। আঁধারে গা ছম-ছম করে, কাঁধে যেন ভূত চেপে বসে।

খিল-খিল করে প্রাণখোলা হাসি হাসল এতক্ষণে।

দোকানের সামনে এক ছোকরা সাহেব। তাকে ঘিরে জন তিন-চার দাঁড়িয়ে। সাহেব এক টিন সিগারেট টেনে নিয়ে ইসারায় দর জিজ্ঞাসা করে।

ওয়ান রুপি ফোর অ্যানাস, মিস্টার—

দু-আঙুলে দু-টাকার নোট একটা ছুঁড়ে দিল। দোকানি পয়সা গণছে। সাহেব বলে, নো—নো—

ফেরত পয়সা সে চায় না। তাই নয় শুধু—সেখানেই টিনটা খুলল। সিগারেট একটা নিজে ধরিয়ে তারপর যেন হরির লুট লাগিয়েছে। দোকানির দিকে ফেলে দিল গোটা দুই-তিন। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদেরও দিকে টিন বাড়িয়ে বলে, লেও—লেও—

ওধারে ইস্কুপের কারখানা—এক ফালি ঘর, সামনেটা অতি সঙ্কীর্ণ, ভিতরে গহ্বর বিশেষ। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু অহোরাত্র কাজ হচ্ছে। ছুটে বেরুল ক'জন সেখান থেকে।

পাগলা সাহেব এসেছে রে! কোথায় ছিলে সাহেব, সমস্তটা দিন?

সাহেব তাদেরও দিকে টিন বাড়িয়ে সদ্য আয়ত্তে-আনা খাস দেশি ভাষায় বলছে, লেও—বিলকুল লে লেও—

যে যেমন খুশি তুলে নিল। টিন প্রায় খালি। থমকে দাঁড়িয়েছে পান্নালাল। হাত ধরে জোরে টান দিয়ে উমা বলে, রাত হচ্ছে না? চল—

কয়েক পা এগিয়ে এসে বলে, কটমট করে কী রকম তাকাচ্ছে আমার দিকে—ঐ দেখ।

আলোহীন এক বাড়ির সামনে তারা দাঁড়াল।

উমা বলে, এইখানে থাকি। চাকর-বাকর আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক মানুষই থাকত, সবাই প্রায় পালিয়েছে! একলা বুড়োকর্তা চারতলায় যক্ষের মতো আয়রন-সেফ আর শেয়ার-সার্টিফিকেট আগলে আছে। আর আছে মেয়েটা—সুপ্রিয়া, আমার ফ্রেণ্ড। সে পালাই-পালাই করছে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে—বাপকে রেখে যায় কেমন করে? বাপও যাবেন না এ সমস্ত ছেড়ে।

পান্নালাল বলে, উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছ কি?

খেয়ে দেয়ে বাপ-বেটি উপরে উঠে গেছে কি না, খোঁজ নিয়ে আসি। এক্ষুনি আসছি। নিচে থাকলে ঢুকব না এখন। নতুন মানুষ সঙ্গে দেখলে সাত-সতেরো জেরা করবে।

পান্নালাল বলে, আমি ঢুকছি না—তোমায় পৌঁছে দিলাম, ব্যস—ছুটি আমার। রাতটুকু কোন বারান্দায় পড়ে থাকব। বৃষ্টি আর হবে না বলে মনে হচ্ছে।

উমা রাগ করে বলে, গরজটা কি কৃচ্ছ্র-সাধনার? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় বুঝি!

মালিকের অজান্তে নিশুতি রাত্রে চুপি-চুপি বাড়ি ঢুকব—আমি চোর না ডাকাত?

তুমি স্বদেশি, জেল-ফেরত। বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াও কিনা, কোন ঘরে তাই জায়গা হল না।

পান্নালাল হেসে ফেলল।

কদর বুঝলে না তোমার পানু-দার। পালাবার হিড়িকে সবাই মত্ত, নইলে

এতক্ষণ হৈ-হৈ পড়ে যেত, বড় বড় মীটিং হত, মালা পরাত। বক্তৃতায় কত গুণপনা শুনতে পেতে আমার।

উমা বলে, সে-সব করত, কিন্তু বাড়ির মধ্যে ডেকে আনত না কেউ।

বলতে চাও, ভণ্ড আমার দেশের মানুষ?

উমাও সমান তেজে কি জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার দিকে চেয়ে থেমে গেল। অন্ধকারে কি দেখল মুখাচ্ছায়ায়, কে জানে! ঘাড় নেড়ে বলল, না—তারা তোমায় শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভয় করে আরও বেশি। তোমরা হচ্ছ বিষম একটা অনিয়ম; এই বাজারে তা না হলে এমন গুছিয়ে নিতে পারতে যে চৌদ্দপুরুষের আর নড়ে বসতে হত না।

চারতলায় হঠাৎ আলো জ্বলল। তখনই অন্ধকার। উমা ব্যস্ত হয়ে বলে, এস—চলে এস পানু-দা। পথচলতি মানুষ আমরা দুটো—তেমনি ভাবে সরে যাই। গলা শুনতে পেয়ে বুড়ো উপর থেকে দেখছে। এইখানে দাঁড়াতে দেখলে সমস্ত রাত বেচারা ঘুমুতে পারবে না। ভাববে, ডাকাত আনাগোনা করছে। চল, পার্কে গিয়ে বসি একটু—

যেতে যেতে আবার বলে, মানুষ দেখলেই সন্দেহ করে—বিশেষ এই রাত্রিবেলা। রাগ কোরো না, ওদের পায়ের নিচেকার মাটি সরে যাচ্ছে। যে নিয়মের মধ্যে বসে আজীবন টাকা জমিয়েছে, সমস্ত টলমল করছে আজকে।

কথা ঠিক। এমনি রাত্রিবেলা হরিহর রায় সুবৃহৎ অলিন্দে এসে সত্যি বড বিচলিত হয়ে পড়েন। রাস্তার দিকে চেয়ে গা ছম-ছম করে। বাড়িগুলো যেন কিসের এক বিষম আশঙ্কায় নিস্তব্ধ হয়ে আছে। প্রায়ই আজকাল ঘুম হয় না হরিহরের, পায়চারি করে বেড়ান। শহরের উপরে যেন আচ্ছন্ন মৃত্যুচ্ছায়া। লণ্ডনে যা ঘটেছে, রেঙ্গুনে যা ঘটে গেছে, সেই দাহন থেকে কলকাতা কি অব্যাহতি পাবে?

সারা জীবনের অবিচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে প্রথম এই অসোয়াস্তির ছায়া পড়ল। বিভিন্ন দেশে বিপ্লব হয়েছে, এক কালের ধনী ও ভাগ্যবানেররা ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে, নতুন চেতনা ও নব ব্যবস্থার অভ্যুদয় হয়েছে মানুষের সমাজে—সিনেমার ছবির মতো সেই সব কাহিনী চকিতে ভেসে যায় হরিহরের মনের উপর দিয়ে। কি করা যায়! কী করবেন এখন তিনি?

ব্যাঙ্কে টাকা আছে। টাকা থাকাও যে কত বড় মুশকিল, প্রথম এই মর্মান্তিক উপলব্ধি হচ্ছে। কিছু পরিমাণে তুলে এনে সিকি দুয়ানি আর রূপোর টাকায় খুচরা করে নিয়েছেন। আয়রন-সেফে রাখা নিরাপদ নয়।

যদি গোলমাল ঘটে—ঘটবে তো নিশ্চয়ই—লুঠ করতে এসে সকলের আগে চাইবে আয়রন-সেফের চাবি। হরিহর তাই করছেন কি—পাশবালিশের মুখ কেটে তার মধ্যে টাকার থলি ভরে আবার মুখ সেলাই করে দিয়েছেন। রাত্রে সেই পাশবালিশ জড়িয়ে তিনি পড়ে থাকেন। দিনমানে অবহেলায় বালিশ-বিছানা ফেলে রাখেন খাটের পাশে। শুদ্ধাচার মানুষ—তাঁর বিছানাপত্তরে কারও হাত দিতে মানা।

আর হাত দেবার মানুষই বা কই? অতি-পুরোনো চাকর দাসু মাত্র ভরসা। দিন তিনেক আগের কথা। সে-ও এসে ভক্তিমান হয়ে প্রণাম করেছিল।

কি ব্যাপার?

দেশে যাব বাবু। শ্বশুরের অসুখ, খবর এসেছে।

শ্বশুর আবার জন্মাল কবে রে? বিয়েই তো করিস নি।

করেছিলাম। বউ নেই, শ্বশুরটা রয়েছে।

বউ যখন গেছে, যাক না শ্বশুরটা। ও পাটই উঠে যাক। পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম তোর।

তখনকার মতো দাসু চলে গেল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, দু-এক দিনের মধ্যে আবার সে এসে প্রণাম করবে, নতুন একটা-কিছু মুখে করে। কেউ এসে যখন যুদ্ধের কথা বলে শত কাজ ফেলে সে দরজার আড়ালে চুপটি করে শোনে, কোথায় কি ঘটেছে শুনতে শুনতে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

আজকাল হরিহরের বড় মনে পড়ছে গ্রামের কথা।

বাঁকাবড়শি গ্রাম। অনেকদিন যাওয়া-আসা না থাকায় গ্রাম ও গ্রামের মানুষজন ঝাপসা হয়েছে স্মৃতিতে। বড় নদী গ্রামের পূর্বদিকে; আর দক্ষিণে সীমাহীন বিল—বউডুবির বিল বলে তাকে। ফাল্গুন-চৈত্রে বিল মরুভূমির মতো ধূ-ধূ করে, আঁকা-বাঁকা অসংখ্য খাল, সেগুলো হেঁটে পার হওয়া চলে তখন। বর্ষায় এই বিলের আর এক মূর্তি। যতদূর নজর চলে, কেবলি ধান-ক্ষেত। হরিহরের মনে পড়ে, নৌকোয় উঠে ছেলেবেলা পুঁটিমাছ ধরতে যেতেন বিলের মধ্যে খালের বাঁধালে।

কী করা যায়? কলকাতার এই অবস্থা! অবস্থা জানিয়ে হরিহর চিঠি দিয়েছেন গ্রামের বড় কারবারি ভূষণ দাসকে। ভূষণ তাঁর বড় অনুগত, মাল গস্ত করতে এলে হরিহরের বাসায় এসে একবার অন্তত খোঁজখবর নিয়ে যাবেই।

॥ ৪ ॥

সমস্তটা দিনই তো গড়িয়েছে হোটেলের তক্তপোশে, তবু পান্নালালের

চোখ ভেঙে আসছে। কত যুগ এই রকম ' যেন হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে সে শুয়ে পড়ল। শিয়রে উমা, ধীরে ধীরে তার রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলে আঙুল বুলাচ্ছে।

এক একটা মুহূর্ত অতি করুণ—সুদীর্ঘ কালের কঠিন বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চঞ্চল আঙুলগুলো কখন স্থির হয়ে গেছে, উমা চুপচাপ পান্নুর কাছে বসে। রাজশত্রু এই পান্নালাল—বছরের পর বছর কেটে গেছে জেলের অন্ধকারে গ্রামান্তের নির্বাসনে। কিন্তু এখন আর এক মানুষ—মেঘ-ম্লান তারার আলোয় শান্ত কোমল অত্যন্ত অসহায় মূর্তি !

পান্নালালের তন্দ্রা এসেছিল। মধুর স্বপ্নাবেশ। কাপড়ের খসখসানি··· চোখ মেলে দেখে, কী সুন্দর অনতিস্পষ্ট ছবি একখানা। সারাদিন যে-উমা তার সঙ্গে ঘুরেছে, এ যেন সে নয়। ঝিনমিন চুড়ির শব্দ···সুঠাম বাহু অবধি অনাবৃত···কাপড়ে-চোপড়ে মৃদু সুবাস। মনে বিভ্রম জাগায়। অনেককাল আগেকার ছেঁড়া-ছেঁড়া স্মৃতি। দেড় বছরের অনাদৃত কারাগারের বাইরে এত স্নেহ বিছানো রয়েছে তার জন্য !

গুনগুন করে কী গুঞ্জন করছে উমা। কথা স্পষ্ট হল ক্রমে। কবিতা। তারার বিষণ্ণ আলোয় কী মাধুরী উমার মুখে।

বিল নিঃসাড়···ডিঙা বাঁধা, চাঁদ আকাশে হাসে—
রাতের পাখিরা পাখা ঝাপটায়—
জাগো জাগো বধূ, দেখতে পাও
দিগন্তে ওড়ে লাখ লাখ পাখি,
জ্যোৎস্না-সায়রে ঢেউ রঙিন ?
বিলের স্বপন আজ নিশিরাতে ঝাঁকে ঝাঁকে হল গাঁয়ে উধাও—
পত-পত-পত স্বপন-পাখনা ক্ষীণ—ক্ষীণতম—বাতাসে লীন।
রাঙা স্বপনের কণিকা কি বধূ
পড়ল তোমার ঠোঁটের পাশে ?
বিভল রাত্রি·· ডিঙা বাঁধা, আর
চাঁদ ও তারারা আকাশে হাসে।

কোথা গ্রাম-রেখা ? সীমাহারা বিল !
আমি একা জাগি এ ঘুম-পুরে।
জাগো জাগো বধূ, দেখ আজ এ কি
রূপসী রাতির চোখে আবেশ।

অতন্দ্র রাতি অনন্ত বিল ফিসফিস করে এ-ওর কানে—
চুপি চুপি কথা—মনে মনে কথা—
কথা অফুরান…কথা অশেষ—
কেবল একটি ছোট্ট মানুষ রাতি ও বিলের মধ্যখানে!
যদি দেখে ফেলে? ভয় হয়, যদি
মুঠো করে মোরে ফেলায় ছুঁড়ে?
আর, এ আকাশ বিল ও রাত্রি
হা হা হেসে ওঠে বিজন পুরে?
জাগো বধূ, ওঠো—কাছে এসো, দাও দু'খানি হাত।
আজি সীমাহারা শূন্য বিলের তেপান্তরে
মোহিনী রজনী এলায়ে পড়েছে;
ধান-পাতে রূপ গড়ায়ে যায়—
মৌন প্রহরী তারারা দীপিছে মাথার 'পরে;
আর একপাশে কচি ধানবনে
ছোট আমাদের ডিঙা ঘুমায়।
কোথা প্রাণ নাই, আলো-রেখা নাই,
জ্যোৎস্না অতল, গভীর রাত—
আমি ডুবে যাই রাতের গভীরে
ওঠো ওঠো প্রিয়া, ধর দু-হাত।

হাসি-ভরা মুখ তুলিয়ে উমা জিজ্ঞাসা করে, বুঝতে পার? মনে পড়ে?

পড়ে অতি-আবছা রকম একটু—

কি বল তো?

স্নিগ্ধস্বরে পান্নালাল বলে, নিষ্কর্মা ভাবপ্রবণ এক কিশোর ছিল, নাম তার পান্নালাল। উমা নামক এক স্বপ্নমূর্তি সে গড়েছিল মনের তৃপ্তি হয়ে, আনন্দ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, আর এমনি সব আগড়ুম-বাগড়ুম কবিতার প্রলাপ দিয়ে।

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলল, একদিন এসব লিখেছিলাম, ভাবতে আজ লজ্জায় মুখ তুলতে পারিনে। তারপর অনেক দূরে চলে এসেছি—দু'জনেই। সেই উমা আজ ইস্কুল-মাস্টারনী আর সে-পান্নালাল মরে ভূত হয়ে সরকার আর সরকারের অনুগৃহীত সাধু-সজ্জনের আতঙ্ক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘুমের আবিলতা কেটে যেতে পান্নালাল কড়া হয়ে উঠল।

এ কি উমা?

ঝিমুনি এসেছিল পান্নু-দা। এই একটুখানি—

লজ্জা করে না তোমার? ছিঃ ছিঃ!

উমা অপ্রতিভ হয় না। বলে, আমার মা আর তোমার বাবা চেয়েছিলেন তো আমাদের এক বাসরে ঢোকাতে। জেলে জেলে থাক, এতকাল পরে ফুরসত হল আজকে—এই রেলিং-ভাঙা পার্কে কাদা-মাখা বেঞ্চির উপর। আলোর মুখ চুড়িতে ঢাকা—এই একটুখানি যা আবরু। আমাদের নতুন কালের নতুন বাসর পান্নু-দা।

আমার বাবা আর তোমার মা কখনো চান নি এ রকম—

নতুন কালকেই তাঁরা চান নি। আগেকার নায়ক-নায়িকা মিষ্টি ব্যবধান গড়ত নিজেদের মধ্যে। যেন দুটো পাখি আলাদা দুই দ্বীপের নারিকেলকুঞ্জে গান গাইছে, সিন্ধু-সমীর উতলা হয়ে উঠছে। যা তারা কখনো নয়, তাই নিয়ে একে অন্যের স্বপ্ন দেখত। আর এখন—

কি মোহ আছে উমার কণ্ঠে, পান্নালালের মনের উষ্ণতা আবার জুড়িয়ে আসে। সে প্রতিধ্বনি করে, এখন?

দেখ, দাঁড়িয়ে কে? লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে আমাদের।

পান্নালাল হেসে বলে, ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব আর কি! বাসরঘরে পাতান দিচ্ছে বাইরে এসেছি, ওদেরও চোখের ঘুম হরে গেছে অমনি।

উমা বলে, বোঝ তা হলে। দু-দণ্ড থেমে দাঁড়িয়ে প্রেমালাপের আর সময় নেই পান্নু-দা। দ্বিধা-সঙ্কোচের অবসর কোথা? কাব্য নয়, কল্পনা নয়—পুরুষ আর নারী এখন এই আমাদের নিরলঙ্কার রূপ। আগে মুখে যখন বলেছি 'না' মনের কথা সে সময় 'হাঁ'। কত মধু ঝরেছে হাঁ-না-এর সংগ্রাম নিয়ে। আর এখন তোমার পাশে বসে ঘন ঘন উপরে তাকাচ্ছি, চাঁদ-তারার মাঝে কখন বম্বার এসে অগ্নিক্ষরণ শুরু করবে। কখন ঐ দরদী কুটুম্ব আবার তোমার জেলের পাকা ঘরে তুলে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলবে।

লোকটির দিকে এক নজর চেয়ে পান্নালালের দু-চোখে যেন অগ্নিশিখা ফুটল।

আমরা স্বাধীনতা চাই—এর মধ্যে ডিপ্লোমেসি কিছু নেই। বাঁ-হাত কারো লুকানো নেই যে গুপ্তি-ছোরার আবিষ্কার হবে পিছন দিকে। নিরস্ত্র দলে দলে বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছি, সর্বস্ব হারাচ্ছি, মরছি অহিংস সংগ্রাম করে। তবু এ সব কেন? এই অবিশ্বাস, এই পিছন-পাহারার বন্দোবস্ত?

সে উঠে দাঁড়াল।

হাত ছাড় উমা। জল-কাদায় ঝোপের ভিতর কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোলাকাত করে আসি, আমারই জাতভাই তো!

ব্যাকুল কণ্ঠে উমা বলে, না—না, ঘরে চল তুমি। ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমোবে আজকে—এই একটা রাত্রি অন্তত।

॥ ৫ ॥

এক রকম বন্দী করে এনে উমা খিল এঁটে দিল দরজায়।

পান্নালাল হুকুম করে, চা নিয়ে এস তা হলে। জলে ভিজে সর্দি ধরেছে।

উমা বলে, চলেছিলে ঐমুখো মোলাকাত করতে। নিয়ে গিয়ে ওরা চা খাওয়াত, দাওয়াই দিয়ে সর্দি সারিয়ে দিত।

পান্নালাল বলে, যাই বল, ওরা কিন্তু খাওয়ায় ভালো। আতিথ্যের নিন্দে করব না, তোয়াজে রাখে।

মায়া কাটাতে পার না বুঝি সেই লোভে? বলতে পার, জ্ঞান হবার পর ক'দিন একসঙ্গে বাইরে থেকেছ?

হাসতে লাগল পান্নালাল। জিজ্ঞাসা করে, শুতে হবে কোথায়? এই ঘরে, না আর কোথাও?

উমা বলে, তোয়াজে থাকা অভ্যাস, স্প্রিংয়ের খাটেই বিছানা করে দেব। তেমন কি হবে ওদের মতো!

আর তুমি?

নিস্পৃহ কণ্ঠে উমা বলে, খাটে না হোক, ঘরটা বড় আছে—কুলিয়ে যাবে দু'জনেরই।

পান্নালাল সবিস্ময়ে বলে, বল কি?

ভয় করে? বাঘ-সিংহ নই। বনে-বাদাড়ে কত রাত্রি কাটিয়েছ, নিরীহ একটা মেয়ে কি ভয়ানক তারও চেয়ে?

তুমি মুখ দেখাবে কি করে উমা?

সবাই পালাচ্ছে, থেমে দাঁড়িয়ে মুখ দেখবার সময় কার? ক'দিন পরে একটা মানুষও থাকবে না শহরে, মুখ মোটে দেখাতেই হবে না পানু-দা।

সুইস টিপে আলো নিভিয়ে দিল।

পান্নালাল উঠে দাঁড়াল তো ছুটে গিয়ে উমা দরজা আটকায়।

যাবে কি করে পানু-দা? জোরাজুরি করে ঠেলে না ফেললে তো যাবার পথ নেই।

পান্নালাল বলে, যাব না তো কি পাগলের সঙ্গে থেকে মারা পড়ব? নিশ্চয় তুমি ক্ষেপে গেছ।

ক্ষেপি নি, ক্ষেপাচ্ছিলাম। খিল-খিল করে হেসে উমা আলো জ্বালল। বলতে লাগল, দরখাস্ত করে কেঁদে ককিয়ে তোমার পায়ের নিচে জায়গা নিতে হবে, মান-ইজ্জত নেই নাকি আমার?

ক্ষণকাল চুপ করে পান্নুর দিকে চেয়ে উমা বলে, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম আর এই মুখের দিকে চেয়ে চাঁদের আলোয় তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে—কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে। চুপি-চুপি আমায় ডেকেছিলে। মনে পড়ে?

সজোরে ঘাড় নেড়ে পান্নালাল বলে, কিছু মনে পড়ে না। বাজে কথা, মিথ্যে কথা। কবিতা তোমার মাথায় চেপেছে, বিষম জিনিস।…তুমি চা আনতে পারবে কি-না বল। চা খেয়ে সরে পড়ি।

উমা রাগ করে বলে, এক বর্ণও মিছে বল নি যে মরে তুমি ভূত হয়ে গেছ। বলছিলে, লজ্জা করি নে কেন? তোমায় আবার লজ্জা! কাঠ-পাথরকে কেউ লজ্জা করে? এক বোঝা হাড়-পাঁজরা ছাড়া আছে কি তোমার?

সেই স্প্রিংয়ের খাটে আয়েস করে বসে পান্নালাল চা খাচ্ছে, আর বলছে, সত্যিই ভূত আমি। বাতাসে ভেসে আছি, এখানকার যেন কেউ নই। দেড় বছরে যেন দেড়শ বছর কেটে গেছে জেলের বাইরে। কি শহর রেখে গেছলাম, আর ফিরে এলাম এ কোথায়? কর্তাদের বলতে ইচ্ছে করে, যেখানে গ্রেপ্তার করেছিলে, সেইখানে পৌঁছে দাও আমায়।

উমা রেগে আছে, জবাব দেয় না।

এঃ, পোকা পড়েছে তোমার চায়ে।

কাপের সমস্ত চা পান্নালাল ছুঁড়ে দিল জানলা দিয়ে। জানলায় দাঁড়িয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

লক্ষ্যভেদ করেছি উমা, দেখ—দেখে যাও—

আনন্দের আতিশয্যে হাত ধরে টেনে উমাকে সেখানে নিয়ে আসে। বলে, দেখ কাণ্ড। ফ্রণ্টে গেলে একলাই পুরো রেজিমেণ্ট সাবাড় করতে পারতাম। বোমা নয়, মেশিন-গান নয়—গরম চায়ে ঘায়েল করেছি। পার্ক থেকে বেটা পিছু নিয়েছে। নজর ছিল আমার—

রাস্তার ও-পারে গ্যাস-পোস্টের নিচে একটা লোক ব্যাকুল হয়ে আমার আস্তিনে হাত মুছছে, মুখ ঘষছে।

পান্নালাল বলে, পিছু নেবার কি আছে? কোন কাজটা আমরা চুরি

কয়ে করি? কোটি মানুষের বুকের রক্তে লেখা স্বাধীনতার সঙ্কল্প—কার ভয়ে আমরা গোপন পথ ধরতে যাব?

উমা নজর করে দেখে বলে, যা ভাবছ তা নয়। ও যে সেই সাহেবটা। পিছু নিয়েছিল তোমার নয় পানু-দা, আমার।

তাই তো! পান্নালাল শেষটা চিনতে পারল।

সর্বনাশ, মাননীয় অতিথি! নাবালক জাতের অভিভাবক–মাতব্বর হয়ে দেশ ঠেকাতে এসেছে আমাদের। ডেকে নিয়ে আসি।

উমার দিকে চেয়ে বলে, রাগ করে আছ কেন? তোমার তো খুশি হওয়াই উচিত।

উমা বলে, চোখ দিয়ে আমায় গিলে খাচ্ছিল, আর খুশি হতে বলছ?

ওদের দেশের মেয়েরা হয়। তারা মনে করে, রূপ আর যৌবনের বন্দনা।

বেরিয়ে এসে পান্নালাল সাহেবকে বলল, দুঃখিত অত্যন্ত দুঃখিত, দেখতে পাই নি। ভিতরে এস, তোমার হাত-পা কোট-কামিজ ধোয়ার ব্যবস্থা করছি।

সাহেব কৃতার্থ হয়ে একগাল হেসে উঠে এল।

বছর পঁচিশ বয়স, ভদ্রবংশীয়। য়ুনিভার্সিটিতে পড়ত, যুদ্ধের ডাকে ছিটকে পড়েছে। কথার জাহাজ, পাঁচ মিনিটে পঁচিশ বছরের সকল কথা বলে খালাস! বলে, ব্যারাকে মন বসে না, বাড়ির জন্য প্রাণ হু হু করে। ফাঁক পেলেই ঘুরে ঘুরে তোমাদের দেশ দেখে বেড়াই—

হেসে পান্নালাল বলে, খবরদার, খবরদার! পাড়ায় পাড়ায় ঘুরো না কিন্তু ও-রকম। বিপদে পড়বে।

পান্নালালের চা করতে গিয়ে অমনি একটা পান সেজে গালে দিয়ে এসেছিল উমা। সাহেব ছোকরার ফরমায়েস, পান চাই। দোকানের মতো নয়, যত্ন করে তৈরি-করা আর্টিস্টিক খিলি।

গল্প করছে, তোমাদের এক স্বামীজী ন্যু-ইয়র্কে আমার বুড়ি পিসির বাড়ি অতিথি হয়েছিলেন কয়েকটা দিন। কি জাদু ছিল তাঁর—যে টেবিলে লিখতেন, যে শয্যায় শুতেন, জীবনান্ত অবধি পিসি সেসব শুদ্ধাচারে রেখেছিলেন, কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দিতেন না।

গদগদ হয়ে বলতে লাগল, আমার বড় ভাগ্য স্বামীজির দেশ—টেগোর আর গান্ধির দেশ চোখে দেখতে পেলাম।

ছেলেটির সরল কথাবার্তা ভারি ভাল লাগে। গভীর কণ্ঠে পান্নালাল

বলল, না ভাই, কোথায় টেগোর? তাঁর পৃথিবী আজও জন্মায় নি। গান্ধিও তো অতি বেয়াড়া মানুষ তোমার উপরওয়ালাদের মতে।

বোধ করি লজ্জা পেয়ে ছেলেটি মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে। শেষে নিশ্বাস ফেলে বলে, যাই বল—শান্তিতে আছ তোমরা। তোমাদের ভারতবর্ষ অন্যের রাজ্যে নাক ঢোকাতে যায় না। কেন তোমাদের পিছু নিয়েছিলাম শোন। ছুটিতে তোমরা আসছিলে, মনে হল চিরসুখী একজোড়া দম্পতি। হাঁটছিলে নৃত্যের ছন্দে, কথাবার্তায় যেন আনন্দের গান। যেন কোনদিন বিচ্ছেদ হয় নি তোমাদের মধ্যে। দেখে মনটা কেমন করে উঠল।

একটা সিগারেট ধরাল ছোকরা। আস্তিনে অকারণ মুখ মুছল।

আমরাও বেড়াতাম ঠিক ঐ রকম—আমি আর জুডি। তারপর যুদ্ধ এল। সে ভোলে নি! চিঠি আসে—এক মেলে দু'খানা তিনখানাও। ছবি পাঠায়।

বুকপকেট থেকে ফোটো বের করল একখানা। সাদাসিদে পোশাক, শান্ত-চেহারা সুশ্রী মেয়েটা। ছোকরা যেন চোখ ফেরাতে পারে না, একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

উমা পান সেজে নিয়ে এল। তাকে প্রশ্ন করে, কি রকম দেখছ ছবিতে? লভলি—নয়?

টপাটপ গোটা চার-পাঁচ খিলি ফেলল মুখের ভিতর। শতমুখে তারিফ করে, ফুলের আদল ফুটিয়ে তুলেছ সামান্য খিলির উপর। শিল্পীর জাত তোমরা। চমৎকার, চমৎকার!

চুনে গাল পুড়িয়ে জিভ মেলে হা-হা-হা করে। হেসে বলে, চমৎকার হলেও কিন্তু অতি-সাংঘাতিক তোমরা। শুনেছি, তোমাদের মতো মেয়েরা নাকি নিখুঁত তাক করে রিভালভার ছোঁড়ে হাত কাঁপে না।

উমা বলে, মেরেছি এককালে। সে কাল উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি এখন। তোমাদের হাত থেকেও কামান-বন্দুক-রিভলভার কেড়ে জলে ফেলে দেব; এই হল আজকের ভারতের সঙ্কল্প।

উমার মুখের দিকে চেয়ে ছোকরা বলে, শুনলাম তুমি রাগ করেছ। বিশ্বাস কর, অপমান করতে চাই নি। অনেকদিন পরে কেমন জুডির কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

তারপর বলতে লাগল, কোটি কোটি মানুষের এত বড় দেশ খবরদারি করতে কেন আসতে হয় আমাদের? কেন, কেন? এ অন্যায়। তোমাদের ভার তোমরা নাও, ভারত ছেড়ে চলে যাই আমরা।

পান্নালাল বলে, খবর রাখ সাহেব, ভার নেবার জন্তই আমরা সর্বস্ব খোয়াচ্ছি ; কতজনে প্রাণ দিয়েছে !

উমা বলে, বোলো তুমি নিজের দেশে ফিরে তোমার বাপ-মা ভাই-বোন আত্মীয়স্বজনের কাছে, কোটি কোটি মানুষের একটা দেশ দেখে গেলে— হাত-পা-মুখ বাঁধা, কিন্তু প্রাণে অনির্বাণ স্বাধীনতার ক্ষুধা। এই যে দেখছ এই মানুষটিকে—আটত্রিশ বছর বয়স, যোগ করে দেখলে তার মধ্যে জেলে বাস বিশ বছরের বেশি ছাড়া কম নয়। এমনি চলবে যতদিন বুকের নিচে ধুক-ধুক করবে প্রাণটা, যতদিন স্বাধীনতা না আসে দেশের।

ছোকরা অস্ফুট শব্দ করে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকাল।

উমা বলে, একজন-দুজন নয়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। এদের নিন্দায় দুনিয়া ভরে গেল। সরকারি গ্রামোফোনরা নানান সুরে এদের গালিগালাজ করে বেড়াচ্ছে দেশ-বিদেশে।

দেয়ালঘড়ি বাজে টং-টং করে। এগারোটা। ব্যস্ত হয়ে সাহেব উঠে দাঁড়াল।

এত রাত্রি, টের পাই নি তো। গুডনাইট !

উমা ডেকে বলে, কদ্দিন থাকবে এখানে জানি নে। মন খারাপ হলে চলে এস দূর-দেশের এই ভাই-বোনের বাড়ি।

কৃতজ্ঞচোখে ছোকরা ফিরে তাকাল একবার।

জনহীন রহস্যাবৃত রাজপথ। দরজা বন্ধ করে উমা ফিরে এল। ও ঘরে গিয়ে নিজের জন্য বিছানা করছে। পান্নালালের নড়াচড়া নেই, চোখ বুজে পড়ে আছে আরাম-চেয়ারে। দেয়ালঘড়ি টক-টক করে চলেছে। বুকের ভিতরেও স্পন্দন অমনি শোনা যাচ্ছে বুঝি। হঠাৎ কার গান শোনা গেল অনেক দূরে—কোথায়। আঁধারের মধ্যে আলো, পাখি আর হাসি আনন্দের গান। 'প্রিয়, আছ স্মরণে তুমি'—এই হল গানের কথা। কাজ বন্ধ করে উমা স্তব্ধ হয়ে শোনে। গান এখনো আছে পৃথিবীর কণ্ঠে ? শ্মশানের উপরেও গান ? আলো জ্বালাতে মানা, কিন্তু গান গাইতে আটকায় না কোন আইন ?

ট্রাঙ্ক খুলে বের করল পরম যত্নে-রাখা অনেক দিন আগেকার অনেক চিঠি।

উমা গ্রামে থাকত, সেই তখন পান্নালাল লিখেছিল। আজ কে বিশ্বাস করবে, পান্নালালের চিঠি এসব ? রীতিমতো রোমান্টিক কবিতা লিখতে এই পান্নালাল ! কী মোহ রাত্রির ! কবিতা আজ ঘুমুতে দেবে না উমাকে ?

ওগো মেয়ে, আজো তারা দেখে থাক,
— পোহাতি তারা ?

কবে—কোন যুগে উঠত সে তারা, স্মরণে আছে ?
তারা-তুবড়ির ফুলকি ঝরত চাঁপার গাছে ?
খুব ভোর বেলা···ধরণীর চোখে ঘুমের ঘোর···
বিলে ধানবনে কাঁপত তাহার আলোর ধারা,
তুমি আর আর আমি বসে দেখতাম পলক-হারা—
দেখে থাক সেই সোনার তারা ?

চিঠি লিখো মেয়ে, লিখো—আজো সেই
তারা কি ওঠে ?

চাঁপার বনের ফাঁকে চুপি-চুপি তেমনি চায় ?
বাতাসে বাতাসে ধানবনে আলো ছড়ায়ে যায় ?
ছড়ায়ে গড়ায়ে আসত ও তুটি আঁখির পটে,
গড়ায়ে পড়ত সে-আলোর ঢেউ মনের তটে,
তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—
আর ঐ তারা···একলা মোটে।
সে তারকা আজো তেমনি ওঠে ?

সেই চাঁপা-বন—শুনছি, সে নাকি ভেঙেছে ঝড়ে ?
জঙ্গল কেটে হয়েছে মস্ত ইটের ঘর ?
পাঁচিলে আটকা পড়েছে তেপান্তর ?
আর বিল মজে নিঃসীম ধূ-ধূ বালির চর ?

আমারে জানায়ো—জানায়ো জানায়ো
সোনার মেয়ে,

ভোরে আজো তারা ওঠে কি তোমার মুখের 'পরে ?
সেই যে তু'জনে তারা দেখতাম, মনে কি পড়ে ?
তোমরো মন কি ভেঙেছে ঝড়ে ?

উমা এসে ডাকল, খাটে গিয়ে ভাল হয়ে শোও, ও পানু-দা—
পান্নালাল চোখ মেলে তাকাল : ওঃ, তাই তো—
হঠাৎ উমা প্রশ্ন করে, লড়াই কবে শেষ হবে, বলতে পার ?

পান্নালালের মুখের উপর ব্যাকুল দৃষ্টি ফেলে বলতে লাগল, যেদিন আর জেলে জেলে নয়, ধরা দেবে ঘরের কোণে ? মেঘ কেটে চাঁদ উঠবে আকাশে —যে আলোয় নূতন চোখে আবার একদিন চেয়ে দেখবে আমার মুখ ?

চেয়ারের হাতার উপর জুড়ি। ফোটো ফেলে গেছে পাগলটা। কেশের গোছা থরে থরে পড়েছে কাঁধের দু'পাশ দিয়ে। আনীল-নয়না তাকিয়ে আছে। ভিন্ন তারা ভিন্ন চাঁদের দেশের মেয়ে। কবে তার প্রদীপ্ত মুখ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠবে সৈনিকের অস্ত্র-জর্জর বুকের তলায়? কবে?

॥ ৬ ॥

পান্নালাল ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—আজ এখানে, কাল সেখানে। কোথাও স্থিতিলাভ করে নি। দুপুরের খাওয়া এবং দুপুরের শোয়ার জায়গা শুধু ঠিক আছে—সেই শিয়ালদ'র হোটেল এবং বারান্দায় তক্তাপোশখানা।

পান্নালাল অভয় দেয়, কিছু ব্যস্ত হয়ো না উমা। যে রেটে মানুষ পালাচ্ছে তুমি আর আমি এই রকম জন দুই-চার থাকব মোটে। দেদার বাড়ি থাকবে, বারান্দায় পড়ে থাকার শোধ তুলে নেব সেই সময়।

দিন পাঁচেক পরে উমা সু-খবর নিয়ে এল। সুরাহা হয়েছে। শুধু থাকবার জায়গা নয়, চাকরি অবধি জুটে গেছে।

বটে! কোনখানে শুনি?

উমা বলল, সেই যে—আমি যে বাড়ি থাকি। বুড়োকর্তার সঙ্গে কথাবার্তা হল। মস্তবড় ধান-চালের বিজনেস—রাইস-প্রিন্স বলে লোকে। বর্মার কারবার নয়-ছয় হয়ে গেছে, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। তবু যা আছে, সাত পুরুষে উড়িয়ে শেষ করতে পারবে না। আটখানা বাড়ি এই শহরে। সেই বাড়িগুলো তুমি দেখাশুনা করবে, ভাড়া আদায় করবে—

বিরাট চাকরি বাগিয়েছ তো! উৎসাহে পান্নালাল লাফিয়ে উঠল। বলে, থাকতে দেবে—খেতেও দেবে তো?

ঘাড় নাচিয়ে হাসিমুখে উমা বলে, আরও মাইনে—

ব্যস, ব্যস—এক্ষুণি চল।

একটা রাত্রি থেকে গিয়েছিল পান্নালাল। অন্ধকারে তেমন ঠাহর হয় নি; দিনের আলোয় এখন বাড়িখানার চেহারা দেখে ঐশ্বর্যের আন্দাজ পাওয়া গেল।

গ্যারেজের উপর নিচু-ছাত ঘরখানা দেখিয়ে উমা বলে, কিন্তু তোমার কোয়ার্টার এই—ওদিকে নয়। উঠে দেখে যাবে নাকি?

উঠতে হবে কেন? এই তো দিব্যি দেখা যাচ্ছে। শতকণ্ঠে পান্নালাল তারিফ করতে লাগল। খাসা ঘর, চমৎকার ঘর—সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাবে

না অবিশ্যি, তা শোবার ঘরে দাঁড়াবারই বা দরকার কি? দাঁড়াবার জন্যে তো উঠোন রয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা রয়েছে—

হরিহর নিরহঙ্কার সদাশয় ব্যক্তি। নিবিষ্ট মনে পরমহংসের কথামৃত পড়ছিলেন। বাইরের অবস্থা যত খারাপ হয়ে আসছে, নানারকম সাধুগ্রন্থ পড়ে ততই তিনি আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছেন। উমাকে দেখিয়ে বললেন, বুঝলে বাপু, এটিও আমার এক মেয়ে। এর কোন কথা ঠেলতে পারি নে গাঁয়ের লোকে ডাকাডাকি করছে, দেশে গিয়ে কিছু-দিন থাকব ভাবছি। তুমি তা হলে এখানেই থাক। হাত-খরচও পাবে টাকা কুড়িক করে।

কথা বন্ধ করে হঠাৎ তিনি চশমার ফাঁকে তাকিয়ে রইলেন পান্নালালের দিকে কুণ্ঠিতভাবে। তারপর বলে উঠলেন, আপনাকে কি—

ধুপধাপ ছুটে এল সুন্দরী একটা মেয়ে—সুপ্রিয়া। এসে হরিহরের কাঁধ জড়িয়ে আদর করতে যাচ্ছিল, পান্নালালকে দেখে থমকে গেল। একনজর দেখেই সুপ্রিয়া বলে উঠল, আপনাকে চিনি তো! আসানসোলে সেই মাতাল গোরাগুলো আমাদের জিনিষপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল, আপনিই তো—

কৃতজ্ঞকণ্ঠে হরিহর বলে উঠলেন, বড্ড রক্ষে করেছিলেন সেদিন আপনি।

সুপ্রিয়া অভিমান ভরে বলল, এত করে বলে এলাম—তারপর একটা দিন এলেন না আমাদের বাড়ি। ঠিকানা পর্যন্ত লিখে দিয়ে এলাম।

পান্নালাল বলল, ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল! আর তা ছাড়া—

সুপ্রিয়া তাকিয়ে আছে মুখের দিকে।

তা ছাড়া জেলে গিয়েছিলাম সত্যাগ্রহ করে। দেড় বছর পরে বেরিয়েছি। বেরিয়েই এসেছি। এসে চাকরি পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

সুপ্রিয়া হাসিমুখে হরিহরকে জিজ্ঞাসা করে, কি চাকরি দিলে এঁকে বাবা? হরিহর বললেন, দূর, তুইও যেমন খুকি! কি চাকরি আছে আমাদের যে ওঁর মতো মানুষকে দিতে পারি? অবিশ্যি, সত্যিই যদি ওঁর কাজকর্ম করবার ইচ্ছে হয়ে থাকে, খোঁজখবর করে নিশ্চয় দেখব, বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলব—

উমা বলল, কেন—আপনার ঐ ভাড়া আদায়ের কাজ? ওতেই পানু-দার আপাতত চলে যাবে।

হরিহর জিভ কেটে বলেন, ছি-ছি! ওঁর মতো মহাপ্রাণ মানুষ দেশের কাজকর্ম নিয়ে রয়েছেন' ওঁকে কি—

পান্নালাল বলে, কপাল ভেঙেছে উমা, দেখছ কি! চাকরি ধোপে টিকল না। দেশের কাজে জেলে যায়, এই উড়ন-চড়ুই মহাপ্রাণদের বিল-সরকারি দিয়েও ভরসা করতে পারেন না এঁরা।

হাসিমুখে জোড়হাত করে বলে, আচ্ছা, নমস্কার।

হরিহর চিঠি লিখেছিলেন, ভূষণ দাস তার জবাব দিয়েছে। বাঁকাবড়শির লোক রায়মশায়ের নাম করে আর দশখানা গাঁয়ের মধ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, যদিও অধিকাংশই চোখে দেখে নি তাঁকে। তিনি যদি সত্যিই গ্রামে যান, গ্রামের তা হলে অভাব কি? গ্রামবাসীরা তাকিয়ে আছে অধীর অপেক্ষায়। তাঁকে সকলে মাথায় করে রাখবে।

সেই চিঠি হরিহর মেয়েকে দেখালেন।

কি বলিস?

সুপ্রিয়া লাফিয়ে ওঠে। ছেলেবেলা সে-ও একবার গিয়েছিল গ্রামে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। বলে, লিখে দাও বাবা আমরা যাচ্ছি তোমার আবার হয়তো মত ঘুরে যাবে, আজই লেখ। রোসো, আমিই লিখছি।

উমার অফুরন্ত উদ্যম। পরদিন হোটেলে আবার এসে হাজির।

পান্নালাল বলে, হল কি? বাজে খরচের এত সময় আজকাল? মাস্টারিতে ইস্তফা দিলে নাকি?

উমা বলে, যা জিজ্ঞাসা করি জবাব দাও। কাল রাত্রে ছিলে কোথা?

পরমোৎসাহে পান্নালাল বলে, সে একটা সুবিধে হয়েছে। কালকেই মাথায় এল বুদ্ধিটা। আর তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। তোফা জায়গা!

কোথায়?

ট্রামগাড়িতে। রেলিং টপকে ডিপোয় ঢুকেছিলাম। দিব্যি ছিলাম। ব্ল্যাকআউটে বেশ মজা, সন্ধ্যের পর সবাই অন্ধ।

উমা বলে, পোঁটলা-পুঁটলি কিছু থাকে তো নাও। আছে নাকি? আজকে আর-এক জায়গায়। ভয় নেই, ফিরতে হবে না। এবার নির্ঘাত।

নিয়ে গেল অনুপমের বাড়ি। অনুপম ঘোষ—সেই যুদ্ধ-বিশারদ। দু'জনে সোজা লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে উঠল।

সত্যি, পরিশ্রম করে অনুপম। অতিকায় টেবিলে ঘরটা প্রায় ভর্তি। বড় বড় ম্যাপ শোয়ানো টেবিলের উপর। আলপিনের মাথায় চিত্র-বিচিত্র কাগজের নিশানা দিয়ে যুদ্ধরত জাতিগুলোর প্রতীক বানিয়েছে; বিভিন্ন দলের অগ্রগমন ও প্রত্যপসরণ রোজই সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি অবধি পিন পুঁতে সে আয়ত্ত করে নেয়। পৃথিবীব্যাপ্ত রণক্ষেত্র তার কুঠুরির মধ্যে—একেবারে চোখের সামনে। এরা ঢুকেছে, কিন্তু এমন নিবিষ্ট অনুপম যে কিছু টের পায় নি। বিষম ধাপ্পা হয়ে উঠেছে কোন অনামা সেনাপতির প্রতি, ম্যাপের দিকে চেয়ে

খুব ধমকাচ্ছে, ব্রেইনলেস গর্দভ! কোন্ আক্কেলে এগোচ্ছ এমন আনপ্রোটেকটেড? জাঙ্গল-অ্যাটাক নিশ্চয় হবে, টের পাচ্ছ না—

উমা মৃদুকণ্ঠে বলল, আমরা—

মুখ ফিরিয়ে অনুপম হেসে ফেলল। ফর্সা—লিকলিকে প্যাকাটির মতো হাত-পা। মানুষ ভাল। বলল, বসুন। দেখছেন—মাথা খারাপ করে দিচ্ছে একেবারে। কোদালই ধরতে জানে না, তারা সব অস্ত্র ধরেছে!

পান্নালালকে বলে, আপনিই বুঝি? নমস্কার! বাড়িতে একেবারে একা হয়ে পড়েছি মশায়, হাঁপিয়ে উঠি। তেতলায় আমি থাকতাম, সেটা আপনি দখল করুন। আমি একতলায় থাকব। হাসছেন কেন?

পান্নালাল বলে, পাশা উলটে যাচ্ছে—

অর্থাৎ?

বোমা তেতলার মানুষদের একতলায় নামাচ্ছে, শহরের মানুষদের গাঁয়ে পাঠাচ্ছে। গাঁয়ের শিয়াল-কুকুর গোরু-ছাগল এসে শহর দখল করবে এইবার—

অনুপম হাসতে লাগল। বলে, আজকেই আসছেন তো? তাই আসুন। কাইগুলি।

পান্নালাল বলে, এসেই তো গেছি। আমাদের আসার সুবিধা আছে। হাঙ্গামা নেই, জিনিস বওয়া-বওয়ি করতে হয় না। পা দু'খানা অনায়াসে পৌঁছে দেয় দেহটা।

তারপর হেসে বলে, পরিচয় জানেন আমার? সরকারের সঙ্গে সম্প্রীতি নেই। জেল থেকে বেরিয়েছি এই ক'দিন আগে—

নমস্কার মশায়, নমস্কার! দু'হাত জুড়ে অনুপম কপালে ঠেকাল। বলতে লাগল, আমরা জেলে যাই নে, কিন্তু যাঁরা যান নমস্য। এই যে আনা দুই আন্দাজ স্বরাজ পেয়েছি, অ্যাসেম্বলির গদিতে বসে চুটিয়ে দেশ-সেবা করছি—এ যে কাদের ঠেলায় তা বুঝি মশায়। অকৃতজ্ঞ নই।

বলতে বলতে হেসে ওঠে। বলল, শুধু একটা আরজি—আপাতত কিছুদিন এবার বাইরে থাকুন অনুগ্রহ করে। এই দুটো কি তিনটে বছর—তার মধ্যেই ইংরেজ আবার গোছগাছ করে নিতে পারবে। তদ্দিন এইখানে সঙ্গী হয়ে থাকবেন আমার।

উমা বলল, ইংরেজ জিতবে শেষ পর্যন্ত, এই আপনার অনুমান?

অনুমান নয়, পাকা সিদ্ধান্ত। বলে অনুপম ঘাড় নাড়ল। বলতে লাগল সর্বস্ব স্টেক করছি। সে সব খুলে বলবার ব্যাপার তো নয়, অনুমান করে

নিন। কত লেনদেন বিলিব্যবস্থা বাকি থাকবে, ইংরেজ না জিতলে রক্ষা আছে! জেতাতেই হবে।

পান্নালাল বলে, আমরাও একমত আপনার সঙ্গে। আমাদের নিজেদের বাহিনী যখন নেই, অগত্যা এই পক্ষেরই জয় চাচ্ছি।

অনুপম আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনারা?

কারণ, জিতলেও নখদন্তহীন এরা সাম্রাজ্যিক শোষণ টিকিয়ে রাখতে পারবে না। নতুন বিজয়ে মাতাল আর-এক বিদেশীর আনকোরা জোয়াল ঘাড়ে চেয়ে এটা মন্দের ভালো।

তেতলায় নিয়ে চলল অনুপম। পাশাপাশি চারটে ঘর। বলে, এটা বসবার ঘর, ওটা শোবার ঘর, ওটায় কাপড়চোপড় থাকবে, আর ঐটে হবে আপনার স্টাডি। অসুবিধা হবে না, কি বলেন?

পান্নালাল বলল, তা গোড়ার দিকে হবে বই কি! নিশ্চয় হবে।

একটু আশ্চর্য হয়ে অনুপম তাকাল তার দিকে।

পান্নালাল বলতে লাগল, শোবার ঘরেই হয়তো পোশাক পরে ফেলব কখন, স্টাডিতেই পড়ে পড়ে ঘুমোব। সময় লাগবে বই কি এত অভ্যাস করে নিতে!

আস্তানা ঠিক করে এবার একদিন উমার সঙ্গে পান্নালাল চলল ভবানীপুরে রঞ্জনলাল দাসের কাছে। রঞ্জন নাম-করা কর্মী, মফস্বলে বাড়ি, বার মাস মফস্বলেই থাকে, কদিনের জন্যে এসেছে কি কাজে। তার কাছে দেশের মানুষের খাঁটি খবর সে জানতে পারবে। জেনে ওয়াকিবহাল হবে। দেড় বছরের মধ্যে বিস্তর অঘটন ঘটে গেছে। রেঙ্গুন জাপানীদের দখলে। বর্মার উত্তর অঞ্চলে ইংরেজ সম্প্রতি সংগ্রাম ও বীরোচিত বেগে অপসরণ করেছেন। সাত সমুদ্র পার হয়ে ক্রীপস সাহেব উড়ে এসেছেন প্রতিশ্রুতি-পত্র নিয়ে, পাঁচটার মধ্যে চার দফাই তার দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। গান্ধিজীর কথায় —দেউলে হতে চলছে যে ব্যাঙ্ক, তার উপর দূর-তারিখের দরজা চেক-কাটা। পুরাতন কথার নূতন ভাষায় মোলায়েম আবৃত্তি। ক্ষুণ্ণ চিত্তে অবশেষে ফিরে গেছেন ক্রীপস সাহেব। ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ যেন ভারতের আবহাওয়ায়। দেশের নাড়িতে কী প্রতিক্রিয়া চলছে এ সমস্তর, ভাল করে জানবার দরকার বই কি!

হেঁটে যাওয়া চলে না অত দূর। ভবানীপুর কি এখানে? ট্রামে লোকারণ্য। জানলার কাঠ ধরে শূন্যমার্গে ঝুলছে অন্ততপক্ষে জন ত্রিশ। সমস্ত দিন জনপ্রবাহ চলছে এই রকম স্টেশনমুখো। বিপাকে পড়ে আবালবৃদ্ধ অকস্মাৎ বিষম ব্যায়ামবীর হয়ে পড়েছে। গাড়ির দরজা দিয়ে ওঠানামা

মুষ্টিমেয়র ভাগ্যে ঘটে, জানলার খোপ কিম্বা পিছন দিক দিয়ে সব লাফিয়ে উঠছে, টপকে পড়ছে।

অতএব যদিচ দক্ষিণ দিকে ভবানীপুর, এরা চলল উত্তরে। ডিপো মাইলখানেক পথ। তার আগে ওঠা যাবে কি না, সেটা নির্ভর করে গায়ের জোর আর কলকৌশলের উপর। জেলে থাকার দরুন এ সম্বন্ধে পান্নালাল নিতান্ত আনাড়ি। বিশেষত উমা আছে সঙ্গে। অতএব ডিপো পর্যন্তই যেতে হবে, মনে হচ্ছে।

অনেক কষ্টে অবশেষে তারা বেঞ্চির উপর বসেছে। গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো। পিছনের ভিড় থেকে পিঠে পড়ল মৃদু এক টোকা।

মুখ ফিরিয়ে পান্নালাল অবাক হয়ে বলে, আপনি!

সুপ্রিয়া একেবারে তাদের বেঞ্চির পিছনটিতে এসেছে। পান্নালাল প্রশ্ন করে, আপনি যাচ্ছেন ট্রামে!

সুপ্রিয়া বলে, আশ্চর্য হচ্ছেন?

না আনন্দ হচ্ছে।

দুর্দশা দেখে? পেট্রোল পাওয়া যায় না, গ্যারেজে পচছে ক্রাইসলারখানা।

পেট্রোল এইরকম না পাওয়া যায় আর কখনো!

অর্থাৎ বিজ্ঞানের নির্বাসন চান সমাজ থেকে?

পান্নালাল বলে, বিজ্ঞানের সুখ পেলাম কবে যে নির্বাসনের কথা উঠবে? সে তো শুধু আপনাদের জনকয়েকের—

হাসিমুখে আবদারের ভঙ্গিতে সুপ্রিয়া বললে, উঠুন। দাঁড়িয়ে আছি দেখছেন না? বসব।

আপনি বসলে আমাকেই যে দাঁড়াতে হবে।

মহিলার সম্ভ্রমজ্ঞান নেই? ছি-ছি—

পান্নালাল বলে, দেখুন, লেখাপড়া শিখেছেন—স্বতন্ত্র সম্ভ্রমই বা চাইবেন কেন আপনারা? হেসে উঠে বলল, আপনারা কি সংখ্যালঘিষ্ঠ? ঐ যেমন কাগজে লিখে থাকে—প্রমাণ করুন যে আপনারাও তাই। হৈ-চৈ করে চরম পরাকাষ্ঠা দেখান আত্মমর্যাদার।

উমা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

বসো ভাই সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া বলে, না—না, সে কি! তোমাকে কে বলছে?

পান্নালাল বলে, তোয়াজে-রাখা শরীর আপনার, দাঁড়িয়ে হাঁপ ধরে যাচ্ছে। আর রোদে পিকেটিং করে করে কড়া পড়ে গেছে উমার চামড়ায়।

তার উপর মাস্টারনি—বেত নাচিয়ে গ্রামার শেখায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ও-ই দাঁড়িয়ে থাকুক। অভ্যাস আছে, ক্ষতি হবে না।

সুপ্রিয়া যেমন ছিল, দাঁড়িয়েই রইল। পান্নালাল উমাকে বলে, মিছে তুমি জায়গা করে দিলে। বসবেন না উনি, বসতে পারেন কি আমার মতো লোকের পাশে?

সুপ্রিয়া ভ্রূভঙ্গি করে তাকাল পান্নালালের দিকে।

তা পারব কেন? পিন পোঁতা রয়েছে কি না আপনার পাশে!

ঝুপ করে সে বসে পড়ল।

তা হলে আমিই উঠলাম।

সত্যি পান্নালাল জায়গা ছেড়ে উঠল।

কী রকম অনর্থক ঝগড়া! উমার বড় অসোয়াস্তি লাগছে। ব্যাপারটা লঘু করে সে উড়িয়ে দিতে চায়। বলল, আমার দুঃখে বিচলিত হলে বুঝি দাদা?

উহু। সুপ্রিয়ার দিকে আড়-চোখে চেয়ে পান্নালাল বলতে লাগল, আশঙ্কা হচ্ছে—হয়তো উনি মনে করবেন, কৃতার্থ হয়েছি ওঁর সুকোমল সান্নিধ্য পেয়ে। হয়তো বা গল্প করবেন এই সব—

সুপ্রিয়ার দুচোখে যেন অগ্নিকাণ্ড। এক ঝটকায় উঠে জনতা ঠেলে পথ করল। সেইখানেই একটা স্টপেজ—চক্ষের নিমেষে নেমে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উমা দুঃখিত স্বরে বলল, বিষম অন্যায় তোমার পানু-দা—না-হক এমনি অপমান করা, তোমার মনে সব সময় একটা কমপ্লেক্স পীড়া দিচ্ছে।

না রে, পীড়া দিচ্ছিল ছারপোকা। কষ্টে-সৃষ্টে মান ইজ্জতের ভয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ। ঝগড়া করে উঠে দাঁড়িয়ে বেঁচে গেলাম রে ভাই—

সে হেসে উঠল।

জেলের দরজায় পান্নালালকে যে বোঁচকাটা ফেরত দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল এক জোড়া খড়ম—প্রায় মান্ধাতার আমলের। যে সময়ে কলেজে সে ইস্তফা দিল, সেই তখনকার কেনা। গভীর রাত অবধি সেই খড়ম পায়ে খটখট করে পাশাপাশি চারটে ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করে বেড়ায়। অনুপম শুয়ে শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত কংক্রিটে তৈরী নূতন বাড়িতে সেই আওয়াজ শোনে। শুনে আমার পায় মনে মনে, গোঁয়ার-গোবিন্দ স্বদেশী মানুষটা জেগে জেগে তার বাড়ি পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

পায়চারি করতে করতে পান্নালাল একবার বা বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়! অন্ধকারমগ্ন শহর আকাশের চাঁদ-তারার মাঝ দিয়ে অগ্নিক্ষরণের ভয়ে নিরুদ্ধশ্বাস হয়ে আছে। নিঃশব্দ, পথ ঘাট নির্জন, জীবন্ত মানুষ সমস্তই যেন

চলে গেছে—বাড়িগুলো পড়ে রয়েছে শুধু। যেমন একবার সে ফতেপুর সিক্রিতে বিশাল পরিত্যক্ত রাজধানী দেখে এসেছিল তেমনি। আবার যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুর দেখা দিশে এই শহরে, সন্ধ্যাবেলা শিয়াল ডাকবে চৌরঙ্গিতে, রাত দুপুরে আসবে বাঘের আওয়াজ।

কিছু লিখবে বলে অনেক দিনের পর বসল পান্নালাল। লেখক মানুষ সে—কিন্তু পোষাপাখির মতো প্রথম বয়সের সেইসব মিষ্টি মিষ্টি বুলি কপচাতে এখন তার লজ্জা লাগে। মরুভূমিতে ফুল ফোটে না—কেবল কাঁটাভরা ক্যাকটাস। জাত-গোলামের আবার ভালবাসাবাসি কি? নিছক যেটুকু সামাজিক প্রয়োজন—তার অধিক নয়···

কে আসে!

এস বি পুলিশ নয়—সুপ্রিয়া। তার ঘরে লক্ষপতি রাইস-ক্রিম্সের মেয়ে—ট্রামের মধ্যে যাকে অপমান করেছিল। সত্যি, আজ পৃথিবী দেখছে সে দেড় বছরের পর এই বাইরে এসে।

কলকণ্ঠে সুপ্রিয়া প্রশ্ন করে, এখানে থাকেন আপনি?

খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

সুপ্রিয়া বলে, অনুপমবাবুকে—

তাই বলুন। সমস্যার যেন মীমাংসা হয়ে গেল, এমনিভাবে নিশ্চিন্তে মুখ ফিরিয়ে পান্নালাল আবার লিখতে লাগল।

সুপ্রিয়া গেল না, উসখুস করছে। পান্নালাল হাত তুলে দেখিয়ে দেয়, অনুপমবাবু নিচে। তেতলা ছেড়ে নেমে গিয়েছেন আজকাল।

পাশে এসে সুপ্রিয়া ঘনিষ্ঠ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি লিখছেন?

গালিগালাজ—

এ বিদ্যেয় মহামহোপাধ্যায় তো আপনি। পাত্র পেলে স্থানকালের বিচার করেন না। ঘরে বসে তারই মক্স করেন বুঝি?

পান্নালাল বলল, এ গালি যাদের নামে তারা অবোলা বঙ্গনারী নয়। শুনতে পেলে মুখ রাঙা করে নেমে যাবে না, চোখ রাঙা করে তেড়ে আসবে।

হঠাৎ সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা—একটা কথাও হেসে কইতে পারেন না কি আপনি? এ কি রোগ আপনার—কেবলই মুখ বাঁকিয়ে বেড়ান সমস্ত মানুষ আর সমস্ত কাজের উপর।

পান্নালাল বলে, ঐ যে বিদেশী সৈন্যগুলো চরে বেড়াচ্ছে এখানে, ওদের নামে এত অপবাদ শোনা যায় কেন বলুন তো! তারাও মায়ের ছেলে, বোনের ভাই—

কেন ?

অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে বলে। মানুষ মারবার কল-কৌশল শিখতে হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। দরদ নেই, শুধু নিয়মানুবর্তিতা। আমাদেরও তাই। পরাধীনতা মানুষের সমাজে সবচেয়ে জঘন্য অনিয়ম।

গভীর দৃষ্টিতে সুপ্রিয়া চেয়ে আছে। লজ্জা হল পান্নালালের। নিতান্তই গায়ে পড়ে আপমান করেছিল সেদিন। একগাড়ি মানুষের মধ্যেও রেহাই করে নি। বলল, স্থুল মনে আঘাত তেমন হয়তো লাগে না, কিন্তু আমার বিচার-বুদ্ধি একেবারে ঘুলিয়ে যায়। সেদিনকার ব্যাপারে আপনি রাগ করেছেন নিশ্চয়—

না, রাগ করব কেন ?

করা উচিত ছিল। পান্নালালের স্বর নিমেষে রুক্ষ হয়ে উঠল। বলে, স্থুল মনের কথা বলছিলাম, আপনিই তার একনম্বর দৃষ্টান্ত। অপমান বেমালুম হজম করতে পারেন, প্রতিকার তো পাছের কথা—রাগ করবার শক্তিটুকুও নেই।

সুপ্রিয়া বলল, কিন্তু সে আপনি বলেই ! আর একদিন এতবড় অপমান থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সে কি ভুলে যাব ? আসানসোল রেল-স্টেশনে—

মাতাল গোরাগুলোর সঙ্গে ঘুসোঘুসি করেছিলাম। বিশ্বাস করুন, আপনাদের অপমান থেকে বাঁচাবার মতলব তাতে ছিল না। দেশটাই যখন গরিব-কাঙালের, গোটা কয়েক দরিদ্র-অক্ষমের সেবায় পৌরুষ দেখানো তথা পুণ্যলাভের লোভ আমার নেই।

তা হলে ?

তাদের বুঝিয়ে দিলাম, সাদা চামড়া হলেই লাট সাহেব হয় না। পরাধীনের পায়ের শিকলের খবরদারি করে বেড়ায়—ওদের জব্দ করবার সুযোগ পেলে কিছুতে আমি ঠিক থাকতে পারি নে।

সুপ্রিয়া বলে, গোটা জাতের বিরুদ্ধে আক্রোশ ? কিন্তু ইংরেজ কেবল তো লিওপোল্ড আমেরি নয়, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজও—

পান্নালাল বলে, সেইটে মনে থাকে না। দু'শ বছরের গোলামি স্মৃতিভ্রংশ করে দেয়। শুনুন, সন্তোষ বলে এক কলেজি বন্ধু ছিল আমার। একদিন চুনোগলি দিয়ে যাচ্ছি। আংলো-ইণ্ডিয়ানের এক বাচ্চাকে একলা পেয়ে সন্তোষ কান মলে দিল। মাতাল গোরা পেয়ে ঐ যে আমি হাতের সুখ করে নিয়েছিলাম—সেই রকমটা আর কি ! বললেন, নিছক কাপুরুষতা সন্তোষের—এবং আমারও। কিন্তু পরাধীনকে কাপুরুষ বললে গালাগালিটা

বেশি হল কি? আপনাকে যে অপমান করেছিলাম, সে-ও একরকম কর্তাকে না পেয়ে পেয়াদার উপর এক-হাত নিয়ে নেওয়া। স্বীকার করছি, মন আমার অসুস্থ।

শুধু মন নয়, দেহটাও। দরদে অতি স্নিগ্ধ সুপ্রিয়ার মুখখানা। বলল, উমার কাছে আমি আপনার সমস্ত শুনেছি। এদ্দিন আটকা ছিলেন, ফাঁকায় যাবেন আমার সঙ্গে আমাদের গ্রামে?

পান্নালাল বলল, গ্রামে যাচ্ছেন?

বাবার মন টেনেছে এবার। সবাই যাচ্ছি আমরা। মস্ত এক গ্রামোন্নয়নের স্কীমও ফেঁদে ফেলেছি এর মধ্যে। কৃষক-সভা করে চাষাদের জাগিয়ে তুলব। ভাল করব সকলের, সবাই বেঁচে যাবে—

সকলের না হোক, আপনাদের ভাল হবে সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ?

শহরে হরিহর রায় হাজারা আছে, ও-তল্লাটে আপনারা হবেন বিশেষ একটি—

নাম বাজাতে যাচ্ছি, আপনি বলতে চান?

ইচ্ছে করে যাচ্ছেন। জাপানিরা তাড়িয়ে তুলেছে। মহাত্মা গান্ধি আর সতীশ দাশগুপ্ত এত বক্তৃতা আর লেখালেখি করে যা পারেন নি, জাপানিরা তাই করল।

সুপ্রিয়া রাগ করে না। হেসে বলল, বেশ তাই। কিন্তু জাপানিরা রেহাই দেবে না আপনাকেও। আপনি চলুন উমাকেও তা হলে নিয়ে যাবে টেনেটুনে।

না—বলে ঘাড় নাড়ল পান্নালাল।

অধীরকণ্ঠে সুপ্রিয়া বলতে লাগল, বোমার ঘায়ে চুরমার হবে এখানকার ঘরবাড়ি, মড়া রাস্তায় পচবে, লুঠতরাজ চলবে বেপরোয়া…হাসছেন আপনি? বড় বড় নেতারা অবধি পালাচ্ছেন—

পান্নালাল বলে, বড় বলেই পালাচ্ছেন তাঁরা। তাঁরা মরলে নেতৃত্ব মারা পড়বে, টাকা-পয়সা-মান-ইজ্জত যাবে। আমার কি—আমি মরলে যাবে তো শুধু প্রাণটা—

আবার কি বলতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়া। বাইরে হাত বাড়িয়ে পান্নালাল বলল, নিচের ঘরে অনুপমবাবু। উনি যাবেন হয়তো; ওখানে যান।

এক গম্ভীর বিচিত্র কণ্ঠস্বর পান্নালালের। সুপ্রিয়া আর কিছু বলতে ভরসা করে না। এক-পা দু-পা করে বেরিয়ে গেল।

পান্নালাল লিখে যাচ্ছে। দেড় বছর নেপথ্য-বাসের পর বাইরের এ কি

চেহারা! একটা বিচিত্র উল্লাস অনুভব করেছে সে। গতানুগতিক দিনকাল আর নেই। এই ভাঙা-গড়ার পরিশেষে···তারপর? রোমাঞ্চ লাগে মনের মধ্যে। যুদ্ধ মিটে গেলে যে-যেমনটি ছিলেন—লণ্ডভণ্ড সম্পত্তি গুছিয়ে গাছিয়ে আবার যে সব গাঁট হয়ে বসবেন, সেটি হবে না। বিপাকে শত্রু-মিত্র সবাই লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছে বড় বড় চার্টারে—কথার মারপ্যাচে হয়কে নয় করা চলবে কি এবারও? জালিওয়ানালাবাগে সেই সেবার যেমন ভারতবর্ষের মিলেছিল পুরস্কার? সঙ্কটের শেষে যে জায়গায় পৌছবে বলে সাবধানী ডিপ্লোম্যাটরা নিখুঁত হিসাব কষছে, তীরবেগে ঘটনাধারা ঠেলে ভাসিয়ে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে হিসাবপত্রের। নূতন জীবন, নূতন জগৎ জগৎ, নবীনতম ব্যবস্থা। এ শীঘ্র যে আসবে এমন দিন, অতি বড় আশাবাদীও কি ভাবতে পেরেছে! ভাবতে পেরেছিল কি প্রথম-মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার মানুষ?

খসখস করে মনের ভাবনা লিখে পান্নালাল। ভাষায় এসব সরব হলে পরাধীন দেশে বিপদ আসে। তবু সে লেখে এইরকম মাঝে মাঝে। মনের অব্যক্ত ব্যথা খানিকটা তাতে প্রকাশের তৃপ্তি পায়। কত দেশে আরও এমনি কোটি কোটি মানুষ দহন সইছে, লিখতে বসে ক্ষণিকের জন্য তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে পান্নালাল। লেখার পর হয় সে পুড়িয়ে ফেলবে, নয় তো এমন জায়গায় লুকোবে যে মানুষের চোখে পড়বে না—আজকের যাঁরা বনেদি দেশ-নেতা তাঁদের চোখেও নয়। তাঁরাও স্তম্ভিত হবেন ভবিষ্যতের সেই চেহারা দেখে, এত বিবর্তন বরদাস্ত করতে পারবেন না। অনেক বন্ধু হারাব, আবার নূতন নূতন বন্ধু পাশে এসে দাঁড়াবে অগ্রগমনের পথে। জনপ্রবাহ কারো ছক-কাটা সড়ক বেয়ে চলে না, নিজের বেগে পথ বানিয়ে নেয়। ভাব দিকি, প্রথম যুগের সেই আবেদননিবেদন-পন্থী স্বরাজ-প্রচেষ্টা আজ কোথায় এসেছে, আর চলেছেও এ কোন্ দিকে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

বড় গ্রাম বাঁকাবড়শি। নদী ও বিল দুই প্রান্তে। বিলের ভিতর কাছাকাছি আরও দুটো গ্রাম আছে—মাদারডাঙা ও গড়ডাঙা। যেন দুটো দ্বীপ। নূতন বর্ষার এখন আউশ-ক্ষেতের মাঝখানে বাড়ি-ঘর আম-কাঁঠাল-খেজুর-বাগান দেখতে ছবির মতো লাগে।

গড়ডাঙার কেদার মোড়লের বউ রূপদাসী বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে

বাপের বাড়ি ছুটল। গিয়ে দেখে বাপ মারা গেছে। কান্নাকাটি এবং শ্রাদ্ধশান্তিও চুকল। মাগ্যিগণ্ডার বাজারে কতদিন পরের সংসারে পড়ে থাকবে? আর থাকবেই বা কেন—নিজের ঘরে আধ-আউড়ি ধান এখনো। মেয়ে আর বাপ কি করছে, তিন তিনটে দোওয়া-গোরু ঠিকমতো জাবনা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না—সংসারের নানা ভাবনায় মন তার বড় উতলা হয়ে পড়েছে।

আসবার দিন পাগল হয়ে এসেছিল—খানিক পথ হেঁটে, খানিকটা হাটুরে-নৌকোর এক পাশে বসে। সে উত্তেজনা নেই এখন। ছোট ভাই মুক্ত নেড়ামাথায় পাড়ায় মাতব্বরদের বাড়ি ঘুরছে, বড় ভাইটা নাকি ডাহা ফাঁকি দিচ্ছে। পৃথক না হলে আর চলে না। রূপদাসী বলে, যা করবার করিস রে ভাই, আগে আমায় রেখে আয়।

এখনো বিয়ে হয় নি, তাই বোনের কথা মুক্তই যা একটু-আধটু শোনে। ঘাটে নৌকো নেই। এমনকি কাঠখালি অবধি একদিন ঘুরে দেখে এল, সেখানে যদি কোন নৌকো ভাড়ায় যায়। ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, রূপদাসী পথে তাকিয়ে আছে, সেই সময় ভিজতে ভিজতে মুক্ত ফিরে এল। বলে, না দিদি, দেড় টাকা কবুল করলাম, তবু শালারা ঘাড় নাড়ে।

লাটসাহেব হয়ে গেল নাকি সব?

ক্ষেতে যে বড্ড গোন। আউশ কাটা; আমন রোওয়া। আউশ ঘরে এনে তুলেছে, আমন-চারা বওয়াবয়ি করছে ক্ষেতে। তার উপর বাঁধে মাটি দেওয়া আছে। এক ক্রোশ দুক্রোশ থেকে মাটি আনতে হয় নৌকোয় করে। নৌকো আজকাল কেউ ছাড়বে না।

রূপদাসী সভয়ে বলে, হেঁটে যেতে হবে নাকি তা হলে? ওরে বাবা!

হাঁটবে কোথা? আলপথ সব জলের নিচে। সাঁতরে যাওয়া ছাড়া উপায় দেখি নে।

কি করা যায়!

নিঃসীম বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে রূপদাসীর কাঁদতে ইচ্ছে করে। কি করবে সে এখন?

মুক্ত বলল, হতে পারে এক তালের ডোঙা। চড়তে পারবে? বড্ড টলে কিন্তু।

ডুবে যাবে না তো?

পিঁড়ি পেতে দেব। নড়াচড়া কোরো না, বসে থাকবে পুতুলের মতো।

এ ছাড়া উপায়ই বা কি! একটা সুবিধা, নৌকোর আধাআধি সময়ে ডোঙা ঘাটে পৌঁছে যাবে।

রূপদাসী সাবধান করে দেয়, অথই জলে নিয়ে যাস নে কিন্তু। খবরদার! খালের কিনারে কিনারে যাবি।

মুক্ত বলে, বয়ে গেছে খাল ঘুরে ঘুরে যেতে। ধানবনের ভিতর দিয়ে কোনাকুনি চালিয়ে দিচ্ছি, দেখ না।

প্রাণপণে মুক্ত লগি ঠেলছে। ধানগাছ কাত হয়ে পথ করে দিচ্ছে। ডোঙার গায়ে খসখস আওয়াজ। ধারাল ধান-পাতা লাগছে রূপদাসীর গায়ে, নিটোল কালো বাহুর উপর সাদা সাদা দাগ ফুটে উঠেছে। বলেছে ঠিক—তীরের মতো চলেছে ডোঙা।

সারি সারি কয়েকটা শোলার ঝাড়—বিলের একটানা চেহারার মধ্যে রকমফের দেখা দিল। ঠিক সামনে বাঁশের খুটি দিয়ে মাচা বাঁধা হয়েছে, তার উপর হাত দুই-তিন উঁচু খড়ের কুঁজি। জায়গাটাকে বলে বড়-বাঁধাল। শোলার ঝাড়ের ধারে ধারে বিস্তব কুয়ো। আর দিনকতক পরে জলের টান ধরলে জেলেরা বাঁশের পাটা দিয়ে মাছ আটকাবে। অগুনতি মাছ এখানে, কই মাগুর সিঙি—

প্রলুব্ধ চোখে চেয়ে মুক্ত লগি ঠেলছে। বলে, কুয়োর মুখে চারো পেতেছে দিদি। মাছ পড়েছে, মাছ—ঘাসবন নড়ছে ঐ দেখ! বোসো।

লগির মাথায় চারো উঁচু করে তোলবার চেষ্টা করে। হয় না। তখন ডোঙা সেইখানটায় ঠেলে নিয়ে নিচু হয়ে তুলছে। সহজে ওঠে না—ধানের পাতায় পাতায় গিঁঠ দিয়ে রাখা, উপরে শেয়াকুলের কাঁটা। চারো একটু উঁচু হতেই খলবল করে ওঠে ভিতরের মাছ। প্রকাণ্ড একটা শোল। মনের উল্লাসে লগি ফেলে সে দু' হাতে মাছ-সমেত চারো জাপটে ধরতে যায়। হঠাৎ ডোঙা কাত হয়ে জল উঠল। রূপদাসী চেঁচিয়ে ওঠে, কুয়োর পাড়ে লাফাতে গিয়ে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

কারা ওখানে? অ্যাঁ—

মানুষের গলা, খুব কাছেই মানুষ। নূতন বর্ষায় উল্লসিত ঘন সতেজ ধান-চারা এক-একটা দিনে আকাশের দিকে যেন এক এক বিঘত মাথা তুলছে। তোমার কাছ থেকে এক হাত দূরেও যদি কেউ থাকে, কথা না বলা পর্যন্ত টের পাবে না। কসাড় ধানবন বেমালুম ঢেকে রাখে।

শোলার ঝাড়ের খটাখট আওয়াজ, ডিঙি বেয়ে দ্রুত আসছে। এসে পড়ল—জোয়ান যুবা, লোহার মতো শরীর। ভর সন্ধ্যা। লোকটা হাঁক দেয়, তাই তো বলি—এত মাছ আফালি করে বেড়ায়, চারোয় আমার মাছ ঢোকে না কেন? বারে বারে ঘুঘু তুমি—

রাগের বশে হাতের বৈঠা উঁচিয়েছে মুক্তর মাথার উপর। তখনো হাতে চারো—বামালসুদ্ধ ধরা পড়ে গেছে, কি আর বলবে মুক্ত, বাঁহাতখানা উঁচুতে তুলেছে, বৈঠার বাড়িতে মাথাটা দুফাঁক করে না দেয়! আর ওদিকে রূপদাসী চেঁচাচ্ছে, পাঁকে পা বসে যাচ্ছে—বাঁচাও!

লোকটা ফিরেও তাকাল না। মুক্তর হাত থেকে এক টানে চারো নিয়ে যথাস্থানে বসাতে লাগল। রূপদাসী ক্রমাগত কাঁদছে, মরে যাই যে! তলিয়ে যাচ্ছি—ডুবে মরলাম!

মরবার অবশ্য কোন সম্ভাবনা নেই এরকম জায়গায়। খুব বেশি হলে কোমর-জল। চারোর উপর কাঁটা সাজিয়ে দিতে দিতে নিস্পৃহভাবে লোকটা বলে, দু'পা এগিয়ে কুয়োর পাড়ে উঠে নাকে কাঁদোগে ঠাকরুন। বড় বড় জোঁক এখানটায়।

জোঁকের ভয়ে উঠি-পড়ি করে রূপদাসী উঠল পাড়ের উপর। ডিঙির দিকে আর লোকটার দিকে চেয়ে মুক্ত বলে উঠল, কার্তিক? ও দিদি, মাদারডাঙার দ্বারিক সর্দারের ছেলে—কার্তিক আমাদেব।

মুক্তর কথা কানে না নিয়ে কার্তিক রূপদাসীকে প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?

গড়ভাঙা—আমাদের বাড়ি সেখানে।

এস আমার নৌকোয়।

তাড়াতাড়ি মুক্ত খাতির জমাবার চেষ্টা করে। তা নৌকো একখানা বটে! এই হল বুঝি তোমার নীলমণি? কী গড়ন, কী রকম চলন! শখ করে নৌকোর নামখানা যা দিয়েছ বাপু, একেবারে মোক্ষম।

বলে সে-ও এগিয়ে আসছিল। কার্তিক সঙিনের মতো বৈঠা উঁচিয়ে বলে, খবরদার! এক নম্বর হারামজাদা তুমি—আমার চারো ঝাড়ছিলে। নৌকো চড়তে হবে না, জল ভেঙে বাড়ি যাও। শামুকে পা কাটবে, সাপেও ঠুকতে পারে। বেশ হবে, চমৎকার হবে।

কুয়োর পাড়ে—রূপদাসী যেখানটায় দাঁড়িয়ে, সেইখানে নৌকো লাগল। মুক্ত হতাশ হয়ে বলে, তুমি তা হলে যাও দিদি। আমি দেখি, ডোঙাটা তোলা যায় কিনা।

নীলরঙের ছোট নৌকো, পরিষ্কার ঝকঝক করছে। জল ছোঁয় কি না ছোঁয়—পাখির মতো উড়ে চলল। দেখতে দেখতে অনেক দূরে গেল। মুক্ত তখন চিৎকার করে বলে, ওরে আমার নেয়ে রে! তিনখানা গাঁয়ের মানুষ

নৌকো-নৌকো করে মরছে—চাষবাস ভেস্তে যাবার দাখিল, আর বাবু বেড়াচ্ছেন চারো পেতে মাছ ধরে ফুর্তি মেরে। তুও—তুও—

সোজা উত্তর দিকে বটতলায় লাইনবন্দি গোলপাতার ঘর আর ছোট ছোট চালা। বউডুবির হাট ওটা, এ অঞ্চলের প্রধান গঞ্জ। মাঝারি গোছের এক নদী গিয়েছে হাটখোলার নিচে দিয়ে। এদের অতদূর যেতে হবে না। গড়ভাঙা এসে গেল বলে, তিনটে তালগাছ, ঐ যে—ওরই কাছাকাছি ঘাট!

ঘাটে নেমে রূপদাসী বলে, এস বাবা—

কার্তিক ঘাড় নাড়ে, উঁহু।

বাড়ি আমাদের ঐ দেখা যাচ্ছে।

তা হলে যাও না গুটিগুটি। আমার কাজ আছে।

এত কষ্ট করে পৌঁছে দিলে। না বাবা, সে হবে না।

রূপদাসী খপ করে তার হাতে ধরল।

মুখ বেজার করে কার্তিক পিছু-পিছু চলে। বলে, কত কাজকর্ম বাকি! মানুষের ভাল করতে গেলে হয় এই রকম। কলিকালে ভাল করতে নেই।

উঠোনে পা দিয়েই রূপদাসী কেদারকে বলে, যা বোটে উঁচিয়েছিল ছেলে—মাথা ভেঙে ছাতু-ছাতু হয়ে যেত।

কার্তিক অপ্রতিভ হয়ে মুখ ফেরাল। দাওয়ার উপর থেকে খিল-খিল করে হেসে উঠল কেদার নয়—মেয়ে যামিনী।

খুশি যেন উপচে পড়ছে রূপদাসীর। কেদারের কানে কানে বলে, সেই কার্তিক গো। চার বচ্ছর ঘোরাচ্ছে ওরা। আশায় আশায় মেয়ে থুবড়ো করছি। কায়দায় পেয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম। আসতে কি চায়!

কার্তিক তখন বলছে, চলি এবার, কি বলেন?

কী রকম! এক-হাঁটু কাদা—হাত-পা ধোও, নেহাত দুটো নারকেলসন্দেশ মুখে দিয়ে যাও।

না, না,—আজ থাক, আর একদিন আসব।

কেদারের কাছে গিয়ে বলে, কলকেটা দেন বরং, দু'টান টেনে যাই।

কার্তিক কলকে টানছে। যামিনী তখন দাওয়ার ওধারে পিঁড়ি পেতে জলের গ্লাস এনে জল ছিটোচ্ছে।

কার্তিক বিরক্ত হয়ে বলে, বললাম যে খাব না। গোরু মাঠে বাঁধা। গিয়ে এখন গোয়ালে তুলব। বসে বসে খাই কখন?

গরুর কথা মনে পড়তে শিউরে ওঠে। রাত হয়েছে, এখনো মাঠে পড়ে।

এই বিল পাড়ি দিয়ে গাঁয়ে পৌঁছতে আরও কত রাত্রি হবে। সে উঠানে নেমে পড়ল। শব্দ শুনে পিছনে চেয়ে দেখে, যামিনী পিঁড়ি তুলে নিয়েছে; গেলাসের জলটা ছড়াত করে ঢেলে ফেলে দিল।

॥ ২ ॥

আসবে বলেছিল, তা কথা রেখেছে কার্তিক। দিন পাঁচেক পরে ঠিক দুপুরবেলা আপনি এসে উপস্থিত। রূপদাসী গামছা আর জলের ঘটি আনছিল। কার্তিক বলে, লাগবে না। ঘাট থেকে ভাল করে হাত-পা ধুয়ে এলাম।

আবার আমতা-আমতা করে কৈফিয়ৎ দেয়, হাটে যাচ্ছিলাম। তা মনে হল, কেমন আছেন সব দেখে যাই অমনি এই পথে।

কেদার বলে, হাটে আমিও যাচ্ছি। ওঠ তা হলে, কথাবার্তায় যাওয়া যাবে।

রূপদাসী বলে, ছেড়ে দিও না কিন্তু আজকে, সঙ্গে করে এনো। রাত্রে থাকতে হবে বাবা, বুঝেছ?

কেদারকে ডেকে চুপি-চুপি বলে দেয়, মাছ কিনে এনো ভালো দেখে। সর্দার-বাড়ির ছেলে, যেমন-তেমন খাওয়া অভ্যাস নয় ওদের। আদর-যত্ন করতে হবে।

দু'জনে যাচ্ছে। মাদারভাঙা গ্রামের রতন সর্দারের সঙ্গে পথে দেখা। অবাক হয়ে রতন বলে, হাটে চলেছ কার্তিক-দা? শুনলাম, তুমি পালিয়ে গেছ। তোমার বাপ তো কুরুক্ষেত্তোর লাগিয়েছে। গালি দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে তোমার নামে।

কার্তিক বলে, এই দেখ। গাঁজা খেয়ে রটায় নাকি এই সমস্ত? বাবাই তো হাটে পাঠাল। কালোবয়রা ধানের বীজ-পাতা কিনতে যাচ্ছি।

হাটখোলায় সবচেয়ে বড় আড়ত ভূষণ দাসের। তারও বাড়ি গড়ভাঙায়— কেদারের গ্রামে। আউশধান সবে উঠছে; যা আমদানি হয়, প্রায় সবই ভূষণ দাস কিনছে। ধান-চালের চালান দেবে এবার কলকাতায়, এইরকম মতলব। হরিহর রায়ের বর্মার ব্যবসা ডুবেছে, কায়েমি হয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন। ভূষণের সঙ্গে তাঁর যে চিঠিপত্র চলেছে, চালানি কারবারের প্রসঙ্গও আছে তার মধ্যে।

কেদার ধানের দর নিতে এসেছে। এ সময়টা প্রায় প্রতি হাটেই সে আসে। নতুন ধান যা পেয়েছে, তাক বুঝে তার কতক বেচে দেবে। জমিজমা বেশি নয়; আর শরীর ভাল নয় বলে খাটতেও পারে না সে রকম।

সামাল হয়ে হিসাবপত্র করে চলে। আর রূপদাসীও পাকা গিন্নী ; সেই জন্য অভাব নেই তার সংসারে।

ভূষণের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং আর দু'চারজন ব্যাপারির সঙ্গে দরাদরি করে কেদার ও কার্তিক মেছোহাটায় ঢুকল। জো আছে ঢুকবার ? পায়ে জুতো চাষাপাড়ার সকলেরই। নতুন ধান-বিক্রির টাকায় মেজাজ গরম। টেড়ি-কাটা কানে বিড়ি গোঁজা ফূর্তিবাজ ছোকরাগুলো কনুই ঠেলে মাছের ডালার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ছে।

জেলেরা মাছ নামিয়ে রেখে ডাঁড় নিয়ে ছোটে নদীর ঘাটে। কেদার ডালা উঁচু করে দেখে, পছন্দসই মাছ কি এল। এসেছে—কার্তিকেরই কপাল-জোর —এ রকম ভেটকি ইদানীং আসে না বড়-একটা।

জেলে ফিরে এসে মাছে জল ছিটাতে লাগল। কেদার বলে, তোল দিকি ঐটা পাড়ুয়ের পো।

ছোটখাট অন্য মাছ তুলছে জেলে, কেদারের কথা কানে নিচ্ছে না। কেদার আঙুল দেখিয়ে বলে, আহা ঐ যে—ঐ ভ্যাকটটা—(ভেটকি বড় হলে সম্মান করে এই নাম দেওয়া হয়।)

জেলে বলল, হাট লাগুক ভাল করে। আসুক মানুষজন।

এত মানুষ—দেখতে পাচ্ছ না চোখে ?

এবারে জেলে মনের কথা স্পষ্ট বলে ফেলল। মানুষ আছেন আজ্ঞে, কিন্তু এ মাছ খাবার মানুষ নেই এক দ্বারিক সর্দার ছাড়া।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, কি জানি আসছেন না কেন এখনো ? তিনি এলে তুলব।

কথাটা এমন খাঁটি যে এত লোকের মধ্যে একটা কথা কেউ বলল না। কার্তিক কেবল আগুন হয়ে উঠে, এ তল্লাটে আর কেউ নেই তিনি ছাড়া ?

আবার কি বলতে যাচ্ছিল জেলে। চিৎকার করে কার্তিক বলে, কত দাম চাও, বল—

তখন জেলে মাছটা ডালায় তুলে দর হাঁকে, পুরো টাকা।

ভিড়ের মানুষদের সাক্ষী মেনে কেদার বলে, শুনলে তো ? শোন সকলে, এক টাকা চাচ্ছে মাছের দাম।

জেলেকে বলে, 'খেদাই না উঠোন চষি'—তোমার হল সেই বৃত্তান্ত। মাছ তুললে বটে, কিন্তু বেচবে না দেখছি দ্বারিক না আসা পর্যন্ত। একটা মাছের দাম এক টাকা—কোন পুরুষে কেউ শুনেছে ? খদ্দের-তাড়ানো দর বললে চলবে কেন বাপু ?

জেলে নরম হয়ে বলে, এক দরে কেনা-বেচা হয় না তো। আপনি কত বলছ?

তিন আনা—

চোখ টিপে হাসিমুখে কেদার জলের দিকে তাকায়।

কি হে, বলছ না যে কিছু?

কি বলব? জানি তো সবাইকে! ঐ জন্যেই তুলতে চাচ্ছিলাম না।

কেদার বলে, চৌদ্দ পয়সা—যাগগে সমান সমানই হল।

সমান সমান অর্থাৎ চার আনা—পুরোপুরি সিকি একটা।

জেলে চটে গিয়ে বলল, চার আনায় মোড়লমশায় এ মাছের কানকো দিতে পারি একখানা।

কার্তিক লাফিয়ে পড়ে মাছ চেপে ধরে। বেশ, কানকো কেটে দাও। ছাড়ব না—শুধু কানকোই নিয়ে যাব। ইয়ার্কি খদ্দেরর সঙ্গে?

গণ্ডগোল জমে উঠল। চেঁচামেচিতে যত হাটুরে মানুষ ছুটছে সে দিকে। কেদারকে জিজ্ঞাসা করে, হল কি মোড়ল? তুমি বুড়ো-মানুষ—ছি-ছি, হাটের মাঝখানে এ সমস্ত কি কাণ্ড?

কেদার লজ্জা পায়। অবস্থা বুঝে কার্তিক সরে দাঁড়াল। বলে গেল, আচ্ছা—কে নেয় ও-মাছ ওর বেশি দিয়ে, দেখি। চলে যাচ্ছিনে আমরা।

এদিক-ওদিক তারা ঘোরাঘুরি করছে। তরকারিহাটায় গিয়ে কাঁচকলা কিনল। ভূষণের কর্মচারী তিনকড়ির সঙ্গে কার্তিকের ভাবসাব আছে, সেখানে বাখারির মাচার উপর বসে বিড়ি ধরাল একটা। নজর সব সময় ঐ মাছের দিকে।

হঠাৎ কার্তিক শুকনো মুখে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঘুরছে।

সে কি? মহাব্যস্ত হল কেদার। তাই তো, মুশকিল হল যে এই হাটের মাঝখানে!

দোকানে ঝাঁপের বাঁশটা ধরে একটু সামলে কার্তিক বলে, ও কিছু না। মাঝে মাঝে হয় এই রকম। বেসাতি করুন আপনি—আমি ফিরি।

কেদার বলে, যাচ্ছ আমাদের ওখানে তো? না গেলে যামিনীর মা বড্ড রাগ করবে।

তাই যাব আজ্ঞে। দাঁড়াতে পারছি নে, চললাম।

একরকম সে ছুটে বেরুল।

দ্বারিক সর্দারকে দেখা গেল ওদিকে। ধেনোহাটে দর নিয়ে সে আসছে।

দীর্ঘ দেহ—পাকা চুল ও পুষ্ট গোঁফ-ওয়ালা মুখ হাটের সকল মানুষ ছাড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায়। কথা বলে—যার না জানা আছে, সে মনে করে ঝগড়া করছে। বয়স হয়েছে, কিন্তু সামর্থ্য একটুও কমে নি। পুরো জোয়ান, কেউ তার সঙ্গে লাঙল ঠেলে পারে না। হাট-বাজার সমস্ত সে নিজে করে। দ্বারিক যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, আপন-পর সবাই তটস্থ।

এমন মাছটা দেখে দ্বারিক উল্লসিত হল।

কত?

কিছু দর কমিয়ে জেলে বলে, বারো আনা—

দ্বারিক বলে, উঁহু, আট আনা! তুলে দাও।

কেদার ছুটে আসে। মাছ যে আমি তুলেছি সর্দার-ভাই।

এই এদের মধ্যে দস্তুর, একজনের পছন্দ-করা জিনিস দরাদরি চলতে থাকা অবস্থায় অপর কেউ নিতে এগোয় না।

দ্বারিক বলে, তুমি তো ছিলেই না মাছের কাছে।

কলহের সম্ভাবনা দেখে জেলে মাছটা তাড়াতাড়ি তুলে দিতে যায় দ্বারিকের থালুইতে।

কেদার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কত দিচ্ছে সর্দার? বড্ড বাড় বেড়েছে, বিস্তব পয়সা হয়েছে—না?

আট আনা দর সাব্যস্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও দ্বারিক একটা আধুলি দিয়ে তার উপর ছুঁড়ে দিল আবার একটা সিকি।

অপমানিত কেদার হাঁক দিয়ে ওঠে, মাছ দিও না—খবরদার। আমি চোদ্দ আনা দেব।

রোখ চেপেছে দ্বারিকেরও। সে বলে, পাঁচ সিকে—

এর ভিতরে এসে পড়ল বিনোদ দাস—ভূষণের ছেলে। জেদাজেদি চলল দস্তুরমতো। শেষ পর্যন্ত সেই মাছ সাতসিকেয় এসে রফা হল। আধুলি আর সিকির উপর নিতান্ত বাজে কাগজের মতো একখানা এক টাকার নোট ফেলে বিজয়ীর দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চেয়ে দ্বারিক তুলে নিল মাছটা। বিনোদেরা কারবারি মানুষ—টাকা থাকলেও এমন অপব্যয় ধাতে সয় না। বিশেষ করে বাপের মুখোমুখি হতে হবে এখনি, এক শ' গণ্ডা কৈফিয়ত দিয়ে মরতে হবে, গালি খেতে হবে অতিরিক্ত দামে মাছ কেনার জন্য।

রূপদাসী ছিল রান্নাঘরে; কেদারের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল।

কি নিয়ে এলে? কই—একগাদা কাঁচকলা দেখছি যে কেবল! মাছ কোথা?

হল না। দ্বারিক সর্দার ছোঁ মেরে নিয়ে গেল চিলের মতো।

গলা নামিয়ে কেদার জিজ্ঞাসা করে, ছেলেটা এসেছে তো? মাথা ঘুরছে বলে চলে এল হাট থেকে।

রূপদাসী বলে, মাদুর পেতে দিয়েছি, চোখ বুজে পডে আছে। ঘুমিয়েছে বোধ হয়।

তারপর বিব্রত ভাবে সে বলে, কি করি এখন। মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। তুমি হাড-কিপ্পন—জানতাম, এই রকম কিছু হবে। ভাল ঘরের ছেলে, কোনদিন আসে না, কাঁচকলা সেদ্ধ আর ভাত আমি দেব কেমন করে?

কেদার বলে, কি করব বল? কে পারবে দ্বাবিকের সঙ্গে? পয়সা তো নয়—ধান-বেচা কাগজ। ছুঁডে ফেলে দেয়। পয়সা যদি মনে করত, দরদ হত তা হলে।

অপমানের ব্যথা টন-টন করে ওঠে। হঠাৎ জ্বলে উঠে সে বলতে লাগল, ধরাকে সরা ভাবছে—অতি-বাড ভাল নয়। খোয়ারটা দেখে নিও এর পর—এই আমি বলে রাখলাম।

তামাক সেজে কেদার দাওয়ায় উঠল। ঘুম কোথায়—বেড়া দিয়ে বিলমুখো তাকিয়ে আছে কার্তিক। কেদাব বেকুব হয়ে গেল। কথাবার্তা শুনতে পায় নি তো ছোকরা।

পায়স হবে, পিঠে হবে, মাছের খুঁত অন্য দশ রকমে পুষিয়ে দেবে। রান্নার ভারী আয়োজন। রূপদাসী রাঁধছে; যামিনী বাটনা করে দিচ্ছে, টেমি ধরিয়ে ঘন ঘন জল বয়ে আনছে পুকুর থেকে।

কলসি নিয়ে যেতে যেতে একবার শুনতে পায়, কথা হচ্ছে কেদার আর কার্তিকের মধ্যে—কেদার কার্তিকেব বাড়ি-ঘর-দোর জোতজমি বিষয়-আশযেব খববাখবব নিচ্ছে।

টেমিটা রান্নাঘরে রেখে এসে আঁধারে আঁধারে যামিনী দাওয়ার পাশে দাঁডাল। টিপি-টিপি বৃষ্টি পডছে, আঁচলটা তুলে দিল মাথায়। আর কি কথাবার্তা হয় শুনবে সে ভাল করে।

সীমাহীন বউডুবির বিল। বাদালার বাতাস আসছে হু-হু করে, গাছপালার ব্যবধান নেই। আঁধার ধানবনের মধ্যে অনেকগুলো আলো ঘুর-ঘুর করছে। কি, ও সমস্ত কি? আলচোরা (অর্থাৎ আলেয়া) নাকি? গাঁয়ের এত কাছাকাছি এসেছে আলচোরা? কেদার বুঝিয়ে দেয়, উঁহু—আলোর মাছ-মারার মরশুম পড়েছে আমাদের এদিকটায়। গাঁয়ের মানুষ মাছ মারতে এসেছে।

শিকারি কার্তিক লাফিয়ে ওঠে। যাই না কেন?

বল কি? বিকেলবেলা তোমার অসুখ হল—

কার্তিক কানেই নেয় না কেদারের কথা। ডাক দেয়, ও যামিনী, দা-টা আনো দিকি। আর লণ্ঠন একটা। আহা, আপনি কেন—বুড়োমানুষ আপনাকে যেতে হবে না—

. কিন্তু সর্দার-বাড়ির ছেলে, একটা রাতের অতিথি সে একলা বিলে যাবে এই বা কেমন করে হয়! আর মেয়েটা তেমনি—মুখের কথা না বেরোতে খেজুরগাছ-কাটা ধারাল দা দিয়ে গেল, কাচে-ঘেরা লণ্ঠনের মধ্যে টেমি জেলে রেখে গেল।

বিস্তর মানুষ ধানবনে। এক হাতে দা, এক হাতে আলো, আর পিছনে চলছে আর একজন খালুই নিয়ে—এই রকম দু'জনে এক একটা দল। ধানবনের আড়ালে-আবডালে সন্তর্পণে যাচ্ছে, কখন বা আলো ধরে থমকে দাঁড়াচ্ছে জলের উপর। আলো দেখে ফূর্তিতে মাছ কাছে চলে আসে, আলোয় সম্মোহিত হয়ে চুপচাপ মাথা ভাসান দিয়ে থাকে। তখন দা দিয়ে দেয় কোপ ঝেড়ে! জল রক্তাক্ত হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মাছটা ধরে খালুইতে পুরে ফেলে।

হোগলাবনের নিচে এদিকে-সেদিকে এরা ঘুরল অনেকক্ষণ। একটা কই আর দু'তিনটে শিঙি মাত্র শিকার হয়েছে। জুত হচ্ছে না, মাছ সব সেয়ানা হয়ে গেছে, জলের উপর এত আলো নাড়ছে—মাছ আসে কই?

কেদার বিরক্ত হয়ে বলে, এত মানুষ এসে জুটেছে, মাছ তো মাছ—বাঘ অবধি ভয় পেয়ে যায়। আর কিছু হবে না, চল—উঠে পড়ি।

বহুদূরের কটা সঞ্চরণশীল আলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে কার্তিক বলে, ওদিকে হৈ-হৈ নেই। অনেক দূরে গেছে ওরা, বুদ্ধির কাজ করেছে। নৌকো নিয়ে গেছে বুঝি?

কেদার ঘৃণার ভাবে বলে, যাকগে—অমন যাওয়া কারো যেতে না হয়। হাঘরে মানুষ—ইটে নেই, ভিটে নেই। চাষার কি নৌকো দিয়ে মাছ ধরবার সময় এখন? না, প্রবৃত্তিতে আসে?

এমন সময় ধানবনের মধ্য থেকে ডাকছে,—কোন গ্রাম এটা? উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে বারম্বার চিৎকার করছে।

কেদার হাঁক দেয়, কারা গো?

এটা কি বাঁকাবড়শিতে এলাম ভাই?

বাঁকাবড়শি যাবে, তবেই হয়েছে! দিকভুল হয়ে গেছে। যাটে এস। সমস্ত রাত চললেও বাঁকাবড়শি পৌঁছবে না।

কেদার লণ্ঠন উঁচু করে দাঁড়াল ঘাটের উপর। একখানা পানসি এসে লাগল। সওয়ারি হরিহর রায় আর হুপ্রিয়া। তাঁরা দেশে আসছেন। দেশে থাকবেন যতদিন গণ্ডগোল না মেটে। বিকালে স্টেশনে নেমেছেন। বর্ষার সময়টা সোজাসুজি বিল পাড়ি দিলে অনেক পথ-সংক্ষেপ হয়, সেই আশায় বিলে নেমে পড়ে এই দুর্গতি। সেই সন্ধ্যাবেলা থেকে ধানবনের অকূল পাথারে লগি ঠেলাঠেলি চলছে।

আশ্চর্য হয়ে কেদার বলে, আ আমার কপাল! কাশীনাথ মাঝি—তোমার এই কাণ্ড? যাবে উত্তরে, চলেছ সটান পশ্চিমমুখো—

কাশীনাথ লজ্জা পায়। এ অঞ্চলের নাড়ি-নক্ষত্র তার চেনা, তবু এই অবস্থা। দিনের বেলাতেই ধানবন পথ ভুলিয়ে দেয়, মাঝ-বিলে গিয়ে যেদিকে তাকাও এক চেহারা—তালগাছ, আমগাছ, খেজুরগাছ, বাঁশঝাড়, হয়তো বা খড়ের চালার একটুকু। যেটা দেখছ, সেইটাই মনে হবে তোমায় গ্রাম। রাত্রে আরও মুশকিল। আলো দেখে বসতি অনুমান করতে হয়। সে আলো আলেয়া হতে পারে,—অন্ধের পথ-চলার অবস্থা আর কি!

হরিহর বললেন, পথটা খুব ভাল করে বাতলে দাও তো বাপু। ঠিকঠাক যাতে উঠতে পারি, আর ঘুরে মরতে না হয়—

কেদার বলে, নেমে আসুন কর্তা। কোন্ বেঘোরে গিয়ে পড়বেন, সমস্ত রাত কষ্ট পাবেন। আপনার মাঝির কাছে শুনে দেখুন—এ তল্লাটে সবাই জানে গড়ভাঙার কেদার মোড়লের নাম। গরীব মানুষ, কিন্তু ভালবাসেন সকলে।

পানসির ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল। একেবারে নাছোড়বান্দা। বলে, যখন আসা হয়েছে, পায়ের ধুলো দিতেই হবে। আমার বাপ-ঠাকুরদার কিরে দেওয়া আছে। বাঁকাবড়শি পথ বেশি নয় অবিশ্যি, কিন্তু কষ্ট হবে আজ বাঁচিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে। ভাঁটা হয়ে গেছে, জলই নেই হয়তো অনেক জায়গায়, নৌকো চলবে না। কাজ কি, চলে আসুন। আসুন কর্তামশায়, আসুন খুকি-ঠাকরুন।

কাশীনাথ মাঝি চুপি-চুপি পরিচয় বলল, শুনে কেদার তাজ্জব হয়ে যায়। বাঁকাবড়শি আর মাদারভাঙা—দুখানা তালুকেরই মালিক ইনি। বউডুবির হাটও এঁর—ভূষণ দাস ইজারা নিয়েছে। সেই লক্ষপতি মানুষটি পরীর মতো পরমাসুন্দরী মেয়ে নিয়ে আজ পাড়াগাঁয়ে বিলের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। দেখ কাণ্ড।

হরিহর বলেন, এটা গড়ভাঙা? আমাদের ভূষণের বাড়ি এখানেই তো!

হাতজোড় করে কেদার বলে, তিনি বড়লোক, সেখানে তো যাবেনই। গরিবের উঠানের উপর দৈবাৎ যখন এসে পড়েছেন, কিছুতে ছাড়ব না, একটিবার নামতে হবে।

সুপ্রিয়া বলে, নামাই যাক না বাবা। দাসু আছে, চেনা মাঝি কাশীনাথ—

খেজুর-গুড়ি সাজিয়ে তৈরি খালের ঘাট, অনতিদূরে খোড়ো ঘর, পরিপাটি আঙিনা—তারার ম্লান আলোয় রূপকথার দেশের মতো লাগছে। এতক্ষণের আতঙ্ক গিয়ে আনন্দ উপচে পড়ছে সুপ্রিয়ার মনে।

॥ ৪ ॥

কেদারের পেটকাটা ঘরে হরিহর রায় জাঁকিয়ে বসেছেন। পাশে সুপ্রিয়া। খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে চিঁড়া-ভেজানো, পাকা কলা আর দুধ।

খেয়ে দেয়ে পরমানন্দে হরিহর ঢেকুর তুলছেন। ভাত রাঁধলেন না বলে খুঁতখুঁত করছিল কেদার। হরিহর বলেন, আরে ভাত তো অহরহ খেয়ে থাকি। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম এ সবের আস্বাদ।

কেদারের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এদিককার অবস্থা কেমন? চাষবাস চলছে ভাল? পাল-পার্বণ হয় আগেকার মতো? চৈত্র-সংক্রান্তিতে মাদার-ভাঙায় সেই জাঁকিয়ে মেলা বসত— এখন হয়ে থাকে সে রকম?

ম্লানমুখে কেদার বলে, দিনকাল বদলে গেছে বাবু। না খেলে পেট মানে না, তাই খাওয়া। খাওয়ার সে আমোদ-ফূর্তি নেই। পাল-পার্বণ আছে, কোন রকমে রীত-রক্ষে। মানুষ কি রকম হয়ে হয়ে যাচ্ছে যেন।

হরিহর বলেন তবু তোমরা খাসা আছ হে। টানা-পোড়েন করে করে মরে গেলাম আমরা। যথাসর্বস্ব ফেলে প্রাণ হাতে করে এলাম বর্মা মুলুক থেকে। দুটো দিন জিরোতে না জিরোতে কলকাতা থেকেও তাড়া। কি যে আছে অদৃষ্টে, কি বলব।

শ্রোতাগুলি আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে আছে।

দম নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, দেখছ কি কলি ওলটাবে এবার। মহাপ্রলয়! রেঙ্গুন আর পেগুতে আমার চারটে আড়ত কড়কড়ে বোঝাই, আর বাকি চাল যোগাড় করতে গিয়ে পথের মধ্যে মেরে ফেলেছিল আর কি!

ভাগ্যে ভাল যে, মেয়েরা কলকাতায় ছিল, বর্মায় ছিলেন তিনি একা। পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে লুণ্ঠক মগদের হাত থেকে আধ-মরা অবস্থায় দেশে এসে পৌঁচেছেন। এ এক নূতন জন্ম বললে হয়!

এরা শুনে যাচ্ছে, চমৎকার লাগছে। লোকে রূপকথা যেমন নির্লিপ্ত

আগ্রহে শোনে, তেমনি একটা ভাব চোখে-মুখে। রেঙ্গুন নামটা শোনা আছে, কোথায় কেউ জানে না—রেঙ্গুন থেকে চাল আসে, একেবারে স্বাদহীন সাদা রঙের চাল, নিতান্ত অপারগ না হলে কেউ তা খায় না। আর জাপানি বোমাও জানে সকলে। একবার কালীপুজোর সময় নকড়ি দফাদার কি কি জাপানি মসলায় বোমা বেঁধেছিল, পয়সা-পয়সা বিক্রি করত। শেষ পর্যন্ত কোন বোমা ফাটল না। নকড়ি বলত, তোমাদের কপাল বাপু, আমি কি করব? সেই বোমায় নাকি রেঙ্গুন শহর তোলপাড় হয়ে গেছে, বোমাওয়ালারা দ্রুত এখন এগিয়ে আসছে এদিকে।

কার্তিক কেবল মাছ মারে না—বুনো শুয়োর, ক্ষেপা কুকুর, এমনকি কেঁদো-বাঘও কতবার সড়কির ফলায় গেঁথেছে। তার বীর-হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বলে, মানুষ নেই সে দেশে? রুখতে পারল না?

সুপ্রিয়া বলব, দেশটা তাদের—তাই কি তেমন করে ভাবতে পেরেছে তারা? ভাবতে দিয়েছে কি?

ভাল রে ভাল। তাদের নয়—কার তা হলে? এই যে গড়ভাঙা-মাদারভাঙা—এ আমাদের হল না, হবে কি বিলপারের সাতু চক্কোত্তির?

সুপ্রিয়া জবাব দেয় না। কথা মনে লাগে। কিছুদিন থেকেই সে ভাবছে এই ধরনের কথা। ভাবছে, এ যে চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাচ্ছে দেশের মানুষ। বিপাকে পড়লে খিলপারের চক্রবর্তী মশায়েরা বিল ঝাঁপিয়ে ঠিক ঘরে গিয়ে উঠবেন, মরলে মরব তখন আমরা হতভাগার দল। না—না, বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে যতটা সম্ভব তৈরি হবে এরই মধ্যে। তৈরি করতে হবে এই এদের—গ্রামের প্রতি মানুষের প্রতি মন যাদের মমতায় ভরা।

হরিহর বলছিলেন, সে যাই হোক, দেশ পরের হোক বা নিজেরই হোক —কাজটা কি এগুবে তাতে - সবাই যে আমরা ঠুঁটো-জগন্নাথ। শুধু-হাতে লড়াই চলে?

বড্ড হাসি পায় কার্তিকের। এই সব ঘরে বসে গলাবাজি করেন, একটা আরশুলা উড়ে এলে কিন্তু এখনি চেঁচিয়ে কুরুক্ষেত্র বাঁধাবেন। মারামারি লড়াই-দাঙ্গার কি জানেন এঁরা? বলে, দেখেন নি কর্তামশায়, রোখের মুখে বেড়াল কি'রকম লাথি মারে কুকুরের মুখে। গায়ের জোরের হিসাব করে লড়াই হয় না। আসুক দিকিনি সেই তারা আমাদের এ তল্লাটে—ধানবনে নাকানি-চুবানি খাইয়ে মারব না?

তা মিথ্যে নয়, সেটা মানি অবশ্য: বলে হেসে হরিহর ঘাড় নাড়লেন। ধানবনের মহিমা বিকাল থেকে তিনি হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন! বললেন, এসব

জায়গায় আসা বাস্তবিক বড় মুশকিল বাইরের লোকের পক্ষে। কলকাতায় এতগুলো বাড়ি আমার—সমস্ত ছেড়ে তাই তো গাঁয়ে যাচ্ছি। জাপানি-জার্মানী কারও চিনে আসতে হবে না এই ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরের দেশে—

কার্তিকের ধরন-ধারন সুপ্রিয়ার বড় ভাল লাগল। জোয়ান মরদ—তেজ আছে। অনেক রাত হয়েছে। সঙ্গে বিছানা ছিল—মেজেয়বিছিয়ে হরিহর শুয়ে পড়েছেন। সুপ্রিয়া এখনও গল্প করছে। এদের মাঝখানে এই রকম জায়গায় রাত কাটছে. এ তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। গেরিলা-যুদ্ধের গল্প হচ্ছে—সর্বস্ব হারিয়ে তবু মানুষ সকলের হুমকি মেনে নিচ্ছে না, কেমন করে পথ ভুলিয়ে নিজেদের খপ্পরে নিয়ে ফেলছে, শত্রু মারছে—মরছে নিজেরাও।

কার্তিককে বলে—শোন, এই সব কায়দা শেখাতে হবে সমস্ত অঞ্চলে। ঠিক শেখাবার জিনিস নয় অবশ্য। তবু যাঁরা এ সম্বন্ধে জানেন শোনেন, তাঁদের গ্রামে নিয়ে আসব। কৃষক-কনফারেন্স করব, এই দুর্দিনে কৃষকদের কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে। খবর দেব, তুমি যাবে তো? নিশ্চয় যেও। কাজ তোমাদের, তোমরাই সব ব্যবস্থা করবে।

কার্তিকের সত্যিই মাথায় ঢোকে না, সভাসমিতি করা ও শেখানোর কি আছে এই ব্যাপারে? বুনো-শূয়োর একবার তাদের মানকচু-বন তছনছ করেছিল। সড়কি নিয়ে সে ছুটেছিল বাঁধাঘাট অবধি শূয়োরের আড্ডায়। মানুষ-জন ডেকে কায়দা-কানুন শিখে আগে ভাগে তালিম দিতে হয়েছিল কি সে সময়?

শুয়ে শুয়েও কার্তিকের মনের মধ্যে তোলপাড় করছে ঐ সব। এই গ্রাম কি তার নয়? তার এবং আর যারা আছে এই অঞ্চলে? বউডুবির বিল, বড়-বাঁধাল, বউডুবির হাট, ধানক্ষেত, বাঁওড়, লাউমাচা, মাঠে-বাঁধা গরু-ছাগল, বিলে শাপলাফুলের রাশি,—কে আসবে জবরদস্তি করে এই সকলের মাঝে? আসুক দিকিনি। চাঁদ উঠেছে, দাওয়ার উপর জ্যোৎস্না তেরছা লয়ে পড়ছে। চাঁদটাকেও মনে হচ্ছে একেবারে নিজস্ব তাদের। সমস্ত মিলিয়ে যেন একখানা সাজানো বাগান। সে, তার পিতামহ আর এমনি হাজার হাজার মানুষ রোদে পুড়ে, বৃষ্টি আর ঘামে ভিজে বাগান সাজিয়ে রেখেছে, লণ্ডভণ্ড করতে এলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে নাকি তারা? নিঃসীম ধানবন—শনশন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে কম্পমান ধানের আগা। নৌকা নিয়ে ওর মধ্যে এক হাত দূরে ওত পেতে থাকলেও নজরে আসে না। শত্রু এলে ধানবনের ঐ গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলবে তাদের। কার্তিকের নীলমণির নীল রং রাঙা হয়ে যাবে রক্তের ছোপে।

॥ ৫ ॥

অনেক মানুষ বাড়িতে। মা আর মেয়ে রান্নাঘরে শুয়ে ছিল। শেষ রাতের দিকে যামিনী ঘুম ভেঙে দেখে, একটা লণ্ঠন যেন চলছে উঠান পার হয়ে—হাঁ, লণ্ঠনই। কার্তিক যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে ঝাঁপ খুলে সে ঠাহর করে দেখে। যাচ্ছে হোগলা-বনের দিকে। জঙ্গলের মধ্যে অবাধে ঢুকে পড়ল। বাপরে বাপ! আস্ত ডাকাত—সাপের ভয়ও করে না!

সকালবেলা হরিহরেরা চলে যাচ্ছেন। সুপ্রিয়া রূপদাসীকে বলে, চমৎকার কাটিয়ে গেলাম রাত্রিটা।

রূপদাসী বলে, কিছু যে খাওয়াতে পারলাম না মা! আমাদের ক্ষেতের লক্ষ্মীভোগ চাল—ভুরভুরে গন্ধ ছাড়ে, ফুঁ দিলে ভাত উড়ে যায়—

তার জন্যে কি? গাঁয়ে থাকছি তো, একদিন এসে খেয়ে যাব দেখবেন।

তারপর বলে, হাঙ্গামা মিটে যাক। কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যান-টান যদি—আমাদের বাড়ি উঠবেন। বাগবাজারে, গঙ্গার থেকে দূর নয় বেশি—

রূপদাসী ঘাড় নেড়ে বলে, আ আমার কপাল! পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে, ঘুঁটে কুড়োবে কে?

কিন্তু পাপী হওয়ার দরুন দুঃখ মোটেই নয়—দেমাক-ভরা হাসি তার মুখে। বলে দুদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, শেষটা ছুটে আসতে পথ পাই নে! আষ্টেপিষ্টে এমন বাঁধনে বেঁধেছে মা, যে না মারলে আর নড়বার উপায় নেই।

হাসতে লাগল রূপদাসী। কোমরের ভারী রুপোর গোট দুলছে হাসির সঙ্গে।

কার্তিক পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। উঠানে পুরো এক খালুই মাছ। সন্ধ্যার দিকে জুত হয় নি, কার্তিক করেছে কি—আবার নিশুতি রাত্রে জনহীন বিলে নেমে মনের সাধে মাছ মেরে এনেছে। বাতিক বটে!

ভাল করে রোদ না উঠতে দ্বারিক সর্দার এসে হাজির। রতন সর্দারের সঙ্গে সেই যে দেখা হয়েছিল কার্তিকের, খোঁজ দিয়েছে সে-ই। এতটা পথ দ্বারিক ছুটতে ছুটতে এসেছে। পা হড়কে পথে পড়ে গিয়েছিল, সর্বাঙ্গে কাদা। এসেই—ঘুমন্ত মানুষ বলে করুণা নেই—কার্তিকের পিঠের উপর দমাদম ঘুষি।

লাফিয়ে উঠে কার্তিক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়াল।

মর, মর—মরিস নে কেন তুই?—মুখ দেখাবার জো থাকল না। হুঁকো-নাপিত বন্ধ হবে তোর জন্যে!

গতিক তাই বটে। বর্ষা চেপে পড়েছে, দিনরাত্রি খবর হচ্ছে—এই এখানে বাঁধ ভাঙল, ওখানে ভাঙো-ভাঙো। বৃষ্টি-বাতাস আলো-আঁধার নেই, দু-চারজন ঘুরছেই। আশঙ্কার কিছু দেখলে হাঁক ছাড়বে, এ-এ-এ—হৈ! দিনমানে হোক, রাতদুপুরে হোক—সে ডাক শুনে কারও ঘরে থাকবার জো নেই। তোমার ধানজমি এককাঠাও যদি না থাকে, যেতে হবে দশজনের কাজে। ঘাটে যে নৌকো থাক—হোক তালুকদার-বাড়ির কিম্বা ভূষণ দাসের অথবা বিদেশী গুড়ের ব্যাপারির—তখনি বিলে নিয়ে ছুটবে। ক্রোশের পর ক্রোশ ধানবন, এক ঝুড়ি মাটি আনতে হলে যেতে হবে গ্রাম অবধি। তার জন্য চাই নৌকো—দশ, বিশ, পঞ্চাশ—গোনাগুনিত নেই, যেখানে যত আছে সমস্ত। এ হেন সময়ে স্বার্থপর কার্তিক কিনা তার নীলমণি নিয়ে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

কার্তিক আকাশ থেকে পড়ল।

পালিয়ে তো আসি নি—এঁরা নেমন্তন্ন করেছিলেন, তাই। তা বলে নৌকো আনলাম কখন? কে লাগিয়েছে মিথ্যে করে, আর অমনি তুমি ক্ষেপে গেছ। এই এঁদের সব জিজ্ঞাসা করে দেখ না, নৌকো দেখছেন কিনা?

কেদার প্রবল কণ্ঠে সায় দিল, না না—নৌকো-টৌকো নেই। আপনাব কার্তিক এমনি চলে এসেছে। আমরা কেন মিছে কথা বলতে যাব?

অপ্রত্যয়েব সুরে দ্বারিক বলে, নৌকো হল ওর প্রাণ—নৌকো রেখে আসবে? কি জানি! কার্তিককে বলে, নিয়ে আসিস নি তবে কোথায় রেখে এলি, বের করে দিয়ে যা হারামজাদা, যদি ভাল চাস।

হাত ধরে এক রকম হিড-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল। ঘাট অবধি গিয়ে দ্বারিক আগুন হয়ে আবার ফিরে আসে। কেদারকে বলে, মিছে কথা বলেন না যে আপনি? নৌকো নাকি আনে নি!

কেদার অবাক হয়ে বলে, এনেছে? কই, আমরা তো—

দেখেন নি তো, দেখে যান। আপনি না দেখে থাকেন, আপনার মেয়ে কিন্তু দেখেছে। দেখে যান, নৌকোর উপর আপনার মেয়ে।

ঘাটে খণ্ডপ্রলয় বেধেছে। হোগলা-বনে নীলমণি লুকানো ছিল, যামিনী টের পেয়ে অনেক কষ্টে বের করে এনেছে। টের পেয়েছে শেষরাত্রে কার্তিক যখন চুপি-চুপি নৌকো নিয়ে আলোর মাছ মারতে বেরুল। এ সময়টা সবাই ওদিকে—খালের ঘাটে কারও আসবার কথা নয়। যামিনী লগি ঠেলছিল, এই ফাঁকে কিছু শাপলা তুলে আনবার মতলবে। দ্বারিক যখন রাগে গরগর

করতে করতে কেদারকে ডাকতে বাড়ির দিকে গিয়েছে, কার্তিক মেয়েটার কান ধরে নামিয়ে দিয়েছে নৌকো থেকে, কষে দিয়েছে এক চড়।

যামিনীর চোখে জল টলমল করছে। বলছে, নৌকো কি খেয়ে ফেলেছি? কেন মারবে আমায় তুমি? কেন? কেন?

দ্বারিক আর কেদার আসছে। কি না জানি ব্যাপার—রূপদাসীও খানিকটা পিছনে। কার্তিক উচ্চকণ্ঠে নালিশ জানায়, দেখেন তো—কাদা মাখিয়ে ছিন্নকুট্টি করেছে আমার নীলমণি।

বলতে বলতে স্বরটা ভারী হয়ে ওঠে। কেঁদে ফেলবে নাকি? বলে সবাই নিন্দে করে, বাবা দুবেলা গাল-মন্দ করেন, তবু আমি এক কোদাল মাটি তুলতে দিই নে। দুবেলা ধুই, ছায়ায় ছায়ায় রাখি, রঙ মাখাই। দেখেন তো— দেখেন, কি করছে—

তখনো মেয়ের গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে রয়েছে। রূপদাসী দ্রুত কাছে আসে। কিন্তু মেয়েব হয়ে কিছু বলে না, উল্টে গালি দেয় তাকে।

মদ্দা মেয়ে, লজ্জা করে না নৌকো বাইতে? আবার ঝগড়া করছে দেখ না!

দ্বারিক এসে চোখ মুছে দিল যামিনীর। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে, কাঁদিস নে—কাঁদিস নে মা। হাবামজাদাকে নিয়ে কি যে করি। কাজকর্ম করবে না—এই এক ডিঙি হয়েছে, খালি টহল দিয়ে বেড়াবে।···উঁহু, আর নয়—এই শ্রাবণেই চুকিয়ে ফেলতে হবে।

কেদারকে ডেকে বলে, বুঝলেন বেহাই, আর দেরি করব না, দেরি করে অন্যায় করেছি। কাজকর্ম কিছুই দেখবে না, খালি টহল মেরে বেড়াবে। কাজ নেই আর বাছাবাছির। আপনার এখানে—এই শ্রাবণেই—

যাক—পাকা-কথা পাওয়া গেল এতদিনে। যামিনী মুখ ঢাকে। রূপদাসী কেদারকে ডেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, বেহাইকে বল—ছেলে অনেক মাছ মেরে এনেছে, দুপুরে দুটো খেয়ে যেতে হবে।

দ্বারিক ফিরল। বেলা হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় 'না' বললে ভাল দেখায় না। আর বিয়ের কথাবার্তাও খানিকটা এগিয়ে রাখা যাবে। সত্যি, যত দিন যাচ্ছে, ভারি বেয়াড়া হচ্ছে কার্তিক। বিয়ে না দিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে না হতভাগা।

যামিনীকে একবার আড়ালে পেয়ে কার্তিক বলে, চড়টা একটু বে-আন্দাজি হয়ে গেছে রে!

অনুতপ্ত হয়ে প্রকারান্তের সে মাপ চাইছে আর কি! বলে, মুখ ভার থাকিস নে। নৌকোর হেনস্তা দেখলে আমার কেমন মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা শোন—একদিন তোকে নৌকো চড়িয়ে অনেক দূর ঘুরিয়ে আনব।

যামিনী মুখ ঘুরিয়ে বলে, বয়ে গেছে নৌকোয় উঠতে।

অনেক—অনেক দূর। বাঁধাঘাটে গিয়েছিস কখনো?

বাঁধাঘাটের নামে যামিনীর চোখের তারা জল-জল করে উঠে। জায়গাটার নাম শুনেছে। বলে, নিয়ে যাবে? সেখানে নাকি মস্ত পদ্মবন—অনেক পদ্ম ফুটে থাকে?

কার্তিক ঘাড় নেড়ে বলে, আর বেতবাগান, বাঁশঝাড়, ভাঙা ইটের পাঁজা। কত শূয়োর মেরেছি। তোকে নিয়ে গিয়ে পদ্মের চাক তুলে দেব এই এমন এক বোঝা।

যে কটা কথা বলল যামিনীকে, তার চেয়ে অনেক বেশি মনে মনে ভাবছে। সমস্ত মুখ ফুটে বলা যায় না। নিঃশব্দ রাত্রে যামিনীকে নিয়ে সে বেরুবে। পাখির মতো তার নীলমণি—কেউ টের পাবে না, রাতের মধ্যেই নূতন বউকে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগেও তার একবার যেতে হচ্ছে বাঁধাঘাটে। পদ্ম তুলতে! পদ্ম ফুলে সাজাবে নীলমণির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। বাজনা বাজবে ঢোল, কাঁসি, সানাই—ধানবন আলোড়িত হবে। ফুলের সাজে-সাজানো নীলমণি ধানবন ফুঁড়ে মাদারডাঙা থেকে সগর্বে আসবে এই গড়-ভাঙায় তার বউ নিয়ে যেতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কৃষক-নগর।

খুব লম্বা এক দেবদারুগাছ কেটে চাঁচাছোলা হয়েছে। তার মাথায় বাঁশের ফ্রেমে তুলোর অক্ষরে লেখা নামটা অনেক দূর থেকে—বউডুবির হাটখোলা থেকেও দিব্যি পড়া যাচ্ছে।

কৃষক-সভা—কৃষকদের ব্যাপার। কিন্তু মাতব্বররা বিশেষ ধরা-ছোঁওয়া দিচ্ছে না। তবু আয়োজন চলছে। সুপ্রিয়া একাই এক-শ'। আর আছে কায়েত-পাড়ার জন কয়েক কলেজি ছেলে। কলেজ বন্ধ—এ অবস্থায় গ্রামে এসে নিষ্কর্মা হয়ে ছিল; কাজ পেয়ে তারা মেতে উঠেছে। আর কার্তিক

আছে, প্রাণ দিয়ে সে খাটাখাটনি করছে। যা বলা যাচ্ছে, তাতেই সে উঠে পড়ে লেগে যায়।

চাঁদা তোলা হচ্ছে। নগদ টাকা-পয়সা বিশেষ ওঠে না, তবে ধান-চাল আদায় হচ্ছে কিছু কিছু। পুরুষমানুষদের যে সময়টা বাড়ি থাকার কথা নয়, বিশেষ করে সেই সময়টা ছেলেরা বেরোয়। মেয়েদের গিয়ে বলে, সভা হবে, মোটরগাড়ি পুরে শহর থেকে বড় বড় নেতারা আসবেন; যুদ্ধ দেখানো হবে একদিন—ভিক্ষে দাও মায়েরা। মেয়েরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধান এনে ঢেলে দেয় তাদের ধামায়। আট-দশ বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে ধামা ভরতি। বউডুবির হাটে সেই ধান তারা বিক্রি করে হাটখোলার মাঝখানে বসে।

হরিহর মনে মনে বিরক্ত। বড় মুশকিল মেয়েকে নিয়ে। চুপচাপ থাকা তার কোষ্ঠিতে নেই। বিপাকে পড়ে গ্রামে এসেছেন—দেশের কাজ এ ক'টা দিন স্থগিত থাকুক না, ভারতবর্ষ তাতে রসাতলে যাবে না। লড়াই মিটে যাক—ভালয় ভালয় কলকাতায় ফিরে সভাসমিতি যত খুশি করিস সেখানে।

মনে মনে অহরহ তিনি এই সব তোলপাড় করছেন, কিন্তু সুপ্রিয়ার কাছে প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না। মা-হারা মেয়ে, বড্ড অভিমানী। হরিহর ভয়ে ভয়ে থাকেন, আর সেইজন্য সে এত আস্কারা পেয়েছে। বিয়ে-থাওয়া হয়ে দুটো-একটা ছেলেপেলের মা যতদিন না হচ্ছে, এ ছটফটানি রোগ নিরাময় হবে না। এখানে বসে হরিহর অনুপমকে তিন-চারখানা চিঠি দিয়েছেন—চলে এস, যত কাজ থাকুক একবার এসে দেখে যাও আমাদের; দেখে যাও, কি হুজুগ লাগিয়েছে আবার খুকি···

সদর রাস্তা ও নদী—মাঝখানে বড় এক উলুখেত। প্যাণ্ডেল বাঁধা শুরু হয়ে গেছে সেখানে। ইতিমধ্যে সদর থেকে কনফারেন্স করবার অনুমতি এসে গেল। কাজে আরও জোর বাধল। হাটে নূতন তোলা বসল, যারা তরিতরকারি ও মাছ বেচতে আসবে, কনফারেন্সের দরুন সবাইকে দিতে হবে এক পয়সা হিসাবে।

কথা উঠল, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হচ্ছে কে?

ছেলেদের মুখে মুখে সুপ্রিয়া-দির নাম। কিন্তু সুপ্রিয়া বলে, এ অঞ্চলের প্রবীণ কোন চাষীর হওয়া উচিত, তাদেরই অনুষ্ঠান যখন। কেদার মোড়ল হলে কেমন হয়?

কেদারের সেই রাত্রির আতিথ্য বড় মনে পড়ে। গ্রামের সরল সংস্কৃতির মূর্তিমান একটি রূপ যেন কেদার। ঐ রকম আর দু-চারজনের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছে মাঝে মাঝে। অনেক শতাব্দী আগেকার বাংলাদেশের এক এক

অবিকৃত টুকরো যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে তাদের হাবে-ভাবে, আলাপ-আচরণে।

ছেলেরা মুখ বাঁকায় কেদারের নামে। কেঁশো রুগী—'ক' লিখতে কলম ভাঙে। বড বড় নেতারা আসবেন, তাঁদের সামনে হার্টফেল করবে যে বুড়ো! গ্রামের বদনাম।

একজন বলে, চাষীর ভেতর থেকে যদি নিতে হয়, দ্বারিক সর্দারকে দিয়ে হতে পারে বরং। তেজ আছে লোকটার। সব চেয়ে মানী ঘর; বয়সেও সে সকলের বড়।

ভূষণ দাসের নামেও প্রস্তাব ওঠে। হাটের ইজারাদার—হাটখোলায় দোকান করে লাল হয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজে নাম বেরুবে, এই লোভ দেখিয়ে মোটা রকম কিছু খসানো যাবে তার কাছ থেকে। টাকারও তো দরকার খুব!

এই রকম সব কথাবার্তা চলেছে। কনফারেন্সের দিন দশেক আগে অভাবিত ব্যাপার ঘটল। অনুপম এসে উপস্থিত। শেষ চিঠিতে হরিহর কি লিখেছেন জানা যায় নি,—কিন্তু এসেম্বলির অধিবেশন হচ্ছে, তা সত্ত্বেও সে চলে এল।

পৌঁচেছে দুপুরবেলা, বেলা পড়তেই কৃষক-নগরে বেড়াতে এল। বলে, প্যাণ্ডেল ছাইতে ছাইতে বন্ধ করে দিয়েছে, বৃষ্টি-বাদলার সময়—দক্ষযজ্ঞ হয়ে যাবে যে! ছ্যা-ছ্যা—এমন কাঁচা কাজ করে?

একটি ছেলে মুখ চুন করে বলে, ইচ্ছে তো ছিল গোলপাতা দিয়ে ঢাকবার। যোগাড় হয়ে উঠল না। শুধু প্যাণ্ডেলের খরচই তা হল পাঁচ-শর উপর পড়ে যাবে। সুপ্রিয়া-দি তাই বললেন, থাকগে—আরও কতরকমের কত দরকারী খরচ রয়েছে—

অনুপম দরাজ হুকুম দিয়ে দিল, টাকার জন্য ভেব না, আমি এসে গেছি যখন। কাজটা কিসে নিখুঁত হয় তাই দেখ। গোলপাতা কেনগে, নাও টাকা—

নোটের গোছা সে বের করল—টাটকা-ছাপা চকচকে নোট।

হরিহরকে পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপের দুপাশের দুটো কামরা বছর পনের কুলুপ দেওয়া আছে। দরজা খুলতে গিয়ে কব্জা গেল ভেঙে। ঝেড়েপুছে সাফ করা হল, দুয়ারে জানলায় নূতন পর্দা খাটানো হল, নেতারা এসে থাকবেন এই জায়গায়।

উৎফুল্ল মুখে সুপ্রিয়া অনুপমকে বলল, আপনি যে এত করবেন আশা করি নি—

অনুপম হো-হো করে হেসে ওঠে।

আমি আর আমার মত ভাই-ব্রাদার করে খাচ্ছি তো এই গণ্ডমূর্খগুলোর ভোটের জোরে। এদের নামে পয়সা খরচ করে একটু ফূর্তি করলামই বা! এ ও একরকম স্পেক্যুলেশন বলতে পার। লোকে শেয়ার কেনে, মাইকামাইন বন্দোবস্ত নেয়—আমরাও আগামী ইলেকশনের টোপ ফেলে বেড়াচ্ছি। লেগে যায় তো কেল্লা ফতে। না লাগে—মনে করব, ঘরের থেকে তো যাচ্ছে না, যা আসে ষোল আনা তার কখনো ঘরে তোলা যায় না। আর তা ছাড়া—

বলে সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে অনুপম স্তব্ধ হল।

সুপ্রিয়া শেষ কথার সূত্র ধরে প্রশ্ন করে, তা ছাড়া?

তুমি রয়েছ এর মধ্যে। তুমি যখন আছ, উচিত-অনুচিতের প্রশ্নই নেই। তোমার সঙ্গে খাটব, সেই লোভে এসেম্বলি ফেলে জংলি গাঁয়ে ছুটে এসেছি।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় সুপ্রিয়া আর কথা বলতে পারে না।

॥ ২ ॥

কৃষক-নগরের অফিসে বিনোদ দাস এসে হাজির।

দশটা টাকা এই বাবা পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, আরও কিছু দেবেন হাটবারের দিন।

অফিস-সেক্রেটারি বলল, বুঝে সমঝে দেবেন কিন্তু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করা হয়েছে অনুপমবাবুকে।

বিনোদ মুখ কালো করে চলে গেল। শোনা গেল, ভূষণ নাকি 'হায়' 'হায়' করছে। জেলার মধ্যে নাম হয়ে যেত, বড় বড় নেতাদের সঙ্গে নামটা কাগজে উঠত। টাকা রোজগার করে ভূষণের এখন নাম-যশে লোভ হয়েছে ভয়ানক।

কার্তিককে পেয়ে বিনোদ একদিন বলল, তোমাদের ঐ পদটা নিলামে তুললে না কেন, ওহে সর্দারের পো? আমরা একটু চেষ্টা করে দেখতাম। দোকান আছে, পৈতৃক গাঁতিও আছে একটা। দেখা যেত, কত টাকা আছে কোথাকার ঐ অনুপম ঘোষের। এক—চাষীদের মধ্য থেকে হত, তোমার বাবা হতেন—সে আলাদা কথা। বাইরের একজনকে সকলের মাথা ডিঙিয়ে আকাশে তুললে, অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ তোমরা।

প্যাণ্ডেল ছাওয়া হয়ে গেছে। তার সামনে বাঁশ পোতা। বাঁশের মাথায় দড়ি বেঁধে সঙ্গে পতাকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বিশিষ্ট নেতা শ্রীকণ্ঠ চৌধুরি বক্তৃতা সহযোগে দড়ি ধরে দেবেন টান—নিশান শূন্যে উড়বে।

ভলান্টিয়ারের দল তৈরি হচ্ছে অনুপমের নির্দেশে। খালি গায়ে চলবে না, হাফ-সার্ট চাই সকলের। এর খরচও অনুপমের। বউড়ুবির হাটখোলায় দুটো মাত্র দরজি, তারা কামিজের জোগান দিয়ে পারছে না। কার্তিক এক-দিন নীলমণি নিয়ে জলমা থেকে আড়াই ডজন কিনে নিয়ে এল। সমস্ত দিনই প্রায় তালিম দেওয়া হচ্ছে ভলান্টিয়ারদের। জি. ও. সি. কার্তিকের অধীনে নূতন কামিজ গায়ে লাঠি হাতে চাষার ছেলেরা এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে কুচকাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। চেঁচাচ্ছে—

জাপানকে—রুখতে হবে

রুখতে হলে—রাইফেল চাই

দাও আমাদের—রাইফেল দাও

দলের এক অল্প বয়সি ছেলে কার্তিককে জিজ্ঞাসা করে, রাইফেল কি ?

কার্তিক তৈরি ছিল না এরকম প্রশ্নের জন্য। অথচ পদমর্যাদার খাতিরে জবাব একটা দিতেই হয়। বলল, কিরিচ—

পুনরায় প্রশ্ন, কিরিচ কাকে বলে ?

বিপন্ন কার্তিক জবাব দেয়, বুঝতে পারলি নে ? উড়োজাহাজ থেকে ছুঁড়ে মারে আর কি !

কথাটা কি রকম ভাবে কানে গিয়েছিল অনুপমের। হাসাহাসি চলছিল নিজেদের মধ্যে।

সুপ্রিয়া বলে, ঠাট্টা নয়—ভেবে দেখুন অবস্থা। নূতন নূতন অস্ত্র বের করে দেশের পর দেশ ওরা নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে, আর এখানে কার্তিকের মতো সাহসী জোয়ান মানুষ রাইফেল কি জিনিস, জানে না।

অনুপম বলে, না-ই বা জানল। রাইফেল ছুঁড়ে সভ্যতা এগুচ্ছে না। কংগ্রেসি না হলেও মনে মনে মানি, গান্ধীজির পিছনে পিছনে চলেছি আমরা ভাবী-কালের নূতন সমাজে—দেশশুদ্ধ সবাই চলেছি। তাঁর নিন্দায় যারা পঞ্চমুখ,তারাও চলেছে। নিখিল জগৎকেও সঙ্গে নিয়ে চলব আমরা—অস্ত্রের হানাহানি সেখানে নেই।

সুপ্রিয়া বলে, পৌঁছে গেলে তারপর অস্ত্র অকেজো হবে বটে, কিন্তু পথের কাঁটা অস্ত্র দিয়েই তো সাফ করতে করতে যেতে হবে। কংগ্রেসও আজ এটুকু মেনে নিয়েছে। দেশের জন্য অস্ত্রের লড়াই করতেই ব্যাকুল আমরা। শুধু কায়ে নয়, কায়মনে। আজকের বিরোধ এই নিয়েই প্রভুদের সঙ্গে।

ভাবতে গিয়ে অধীর হয়ে ওঠে সুপ্রিয়া। পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেশ তৈরি হচ্ছে সমগ্র সম্পদ একীভূত করে। আর আমাদের ঘাড়ের উপর শত্রু। কিছু

করবার নেই এই চরম সময়ে! শুধু ঘুমানো? পাশাখেলা? চাষবাস করা? নেতৃত্ব, নামবাজানো আর বেপরোয়া মুনাফার লোভে নানারকম প্যাঁচ কষে বেড়ানো?

ভলান্টিয়ারের দল মার্চ করে যাচ্ছে মাঠের ওদিক দিয়ে। শুনতে পেল চিৎকার করছে তারা—

জাপানকে—রুখতে হবে

সুপ্রিয়ার চোখ জলে উঠল। আগুন জালাতে হবে শহরে গ্রামে সর্বত্র মানুষের মধ্যে। সাম্রাজ্যলোভীদের রুখব এক হাতে; আর এক হাতে ঘাড় ধরে বিদায় দেব সাম্রাজ্যভাগীদের।

ভূষণ দাসের দূরসম্পর্কীয় ভাগনে বিজয় মজুমদার। ত্রিসংসারে আপন কেউ নেই বলে ছেলেবেলা সে এখানে কাটিয়েছে, এখানকার পাঠশালায় তালপাতা লিখে আড়াই ক্রোশ দূরবর্তী ভোমরার মাইনর ইস্কুলেও পড়াশুনা করেছে কিছুদিন। তারপর ভূষণের দোকানে খাতা লিখত—মাইনে নয়, পেট-ভাতে। সাড়ে সাত টাকা তহ্‌বিল তছরূপের দরুন ভূষণ একবার বেহদ্দ মার মারে। দোকান ছেড়ে বিজয় চাকরির উমেদারিতে আছে। দশ-বিশ দিন কাজের চেষ্টায় নিরুদ্দেশ—ফিরে এসে যথারীতি আবার ভূষণের অন্ন ও গালিগালাজ খেয়ে শিস দিয়ে এপাড়া-ওপাড়া-ঘুরে বেড়ায়।

বিনোদ রেগে আছে। কনফারেন্সের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না তারা, উঁকি মেরেও তাকিয়ে দেখবে না। বিজয় বলে, তাই কি পেরে উঠবে বড়-দা? মামার ইষ্টদেব হরিহর রায়—তাঁরা রয়েছেন এর মধ্যে।

বিনোদ বলে, রায় মশায় নন, তাঁর মেয়ে। রায় মশাই কি খুশী মেয়ের পরে? চাষার চোখ ফুটলে তালুক নিলামে উঠে যাবে, এ তিনি বোঝেন।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আর থাকেনও যদি! বুঝতে পারছ না, ইংরেজ টাকা দিয়ে এ সমস্ত করাচ্ছে লড়াইয়ের লোক জোটাবার জন্যে। এর মধ্যে আমরা থাকতে পারি নে কখনো।

বিনোদ দাস অকস্মাৎ বিষম ইংরেজ-বিরোধী হয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

ভলান্টিয়াররা যাচ্ছিল বাড়ির সামনে দিয়ে—

জাপানকে—রুখতে হবে

রুখতে হলে—রাইফেল চাই

বিজয় বেরিয়ে এসে জিওলের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টিপ্পনী কাটছে, রুখতে হলে বঁটি চাই—

বাইরের আটচালা থেকে ভূষণ বলে ওঠে, শুধু বঁটি নয় রে বাবা, মাছ-কোটা আঁশ-বঁটি। মুরোদ কত!

কার্তিক আগে আগে যাচ্ছে। কোমরে বেল্ট-আঁটা, গায়ে কামিজ। কামিজের উপর দিয়ে পৈতের মতো ঝোলানো কনফারেন্সের ব্যাজ। রোদে মুখ রাঙা, রক্ত বেরুবে এই রকম অবস্থা। বেড়া দেখে কার্তিক মানল না—এক বাঁকা সজনেগাছ ছিল, তার গুড়িতে চড়ে বেড়া লাফিয়ে হাত ধরল বিজয়ের। বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মস্করা করলে চলবে না ভাই। এস—বিস্তর কাজ আছে, চলে এস।

বিজয় এঁকে বেঁকে হাত ছাড়বার চেষ্টা করে, পেরে ওঠে না। কার্তিকের বজ্রমুষ্টির নিচে তার কব্জি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবার দাখিল। হিড়হিড় করে বিজয়কে সে টেনে নিয়ে চলল।

রাগের বশে ভূষণ খড়মসুদ্ধ দাওয়া থেকে লাফিয়ে পড়ে। বেরোও—বেরোও বলছি আমার বাড়ির সীমানা থেকে।

কার্তিক হেসে বলে, বেরিয়েই যাচ্ছি তো? বিজয়কে নিয়ে যাচ্ছি। এক পাঠশালে পড়েছি, আমার এয়ার-বন্ধু লোক। আপনি এর মধ্যে কথা বলতে আসেন কেন দাস মশায়?

ভলান্টিয়ারের কর্তা হয়ে এ ধরনের আলাপ ইতিমধ্যেই চমৎকার সে রপ্ত করে নিয়েছে।

গোলমাল শুনে বিনোদও বাড়ির ভিতর থেকে দৌড়ে আসে।

বেরোও—বেরোও—

॥ ৩ ॥

কনফারেন্স শুরু হল। এ অঞ্চলে কাঁচা রাস্তা, মোটর আসতে অসুবিধা হয়—নৌকাপথই সুবিধা। কিন্তু জগদীশ আচার্যও ওই ধরনের কয়েক জন ছাড়া আর কেউ মোটর ভিন্ন আসতে চান না। দেশ-উদ্ধারের মহৎ কাজ কাঁধে নিয়েছেন, সময়ের এক তিল অপচয় করবার উপায় নেই। অগত্যা মোটরের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ধুলোয় ধুলোয় মানুষের রাস্তা চলা দায়।

শ্রীকণ্ঠ চৌধুরী পৌঁছে গেছেন। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, প্রশস্ত কপাল, ইয়া দশাসই চেহারা। পতাকা-উত্তোলন উপলক্ষে বক্তৃতা করলেন। যেমন ঈশ্বর-দত্ত গলাখানি তেমনি ভাষার ঝঙ্কার—

এই দেশ আমাদের, আজকের চরম দুঃসময়ে একথা মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারছি কি আমরা? দেশে দেশে জনগণ সর্বস্ব পণ করছে নিজের

ভূমি ও জাতির রক্ষার জন্য। আমাদের তার জন্য প্রস্তুতি কই? দেশরক্ষার কি ব্যবস্থা করছি আমরা?

জনতার মধ্যে থেকে কে-একজন বলল (বিনোদেরা যা সব বলাবলি করে তারই পুনরুক্তি আর কি!), গরজ যাদের তারাই করুক গে—

অগ্নিস্রাবী কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠ বলতে লাগলেন, আমাদের চেয়ে গরজ কার বেশি? ভারতবর্ষ জাপানের কবলে পড়লে পালিয়ে ওরা নিরাপদ দ্বীপে চলে যাবে, মরলে মরব আমরাই। দীর্ঘকাল পরাধীন থেকে এদেশ যে আমাদেরই অস্থিমজ্জায় গড়া, ওরা বিদেশি মাত্র—এই সত্য আমরা ভুলে যাই। দেশের নরনারী এত নির্যাতন সয়ে আসছে স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীন আমরা হবই। আসুন ভাই সব, এই পতাকা-তুলে মিলিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করি দেশরক্ষায় প্রাণ দেব আমরা…

সন্ধ্যার পর নেতারা ক্লান্ত হয়ে বসেছেন হরিহরের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে। মিছরির শরবত দেওয়া হয়েছে। তারপর বেতের টেবিল-চেয়ার সাজানো হল, টেবিলের উপর রকমারি জলযোগের ব্যবস্থা।

জগদীশ বললে, এ কি মশায়—কলকাতা থেকে এদ্দুর এলাম, কলকাতাও যে পিছু নিয়েছি দেখছি। কেক-পুডিং মায় ভীমনাগের সন্দেশ অবধি। এখানকার জিনিস নিয়ে আসুন না। চিঁড়ে-দোভাজা, খেজুরগুড়—মুখ বদলে যান এঁরা সবাই।

অনুপম হেসে বলে, তা-ও হবে বই কি! তিন দিন তো থাকতে হবে কষ্ট করে। কলকাতার জিনিস থাকবে বড জোর কাল দুপুর অবধি। তারপর ঐ ভরসা।

শ্রীকণ্ঠকে তারিফ করছে অনুপম—

যা আজকে বক্তৃতা করলেন মিস্টার চৌধুরী, শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছিল। এসেম্বলিতে হরদম তো বক্তৃতা শুনি—তার মধ্যে প্রাণ নেই।

রিক্তমুখে কুঞ্চিত দৃষ্টিতে অন্য দিক চেয়ে ছিলেন শ্রীকণ্ঠ। মুখ ফিরিয়ে বললেন, এঃ মশায়, ঐ কি বক্তৃতা? কলকাঠি বেহাত হয়ে গেছে। মিছরির পানায় কি আওয়াজ বেরোয়?

বুঝতে না পেরে অনুপম বোকার মতো চেয়ে থাকে।

শ্রীকণ্ঠ বলেন, স্টেশনে ওয়েটিং-রুমে আলো ছিলো না, আর মশাও তেমনি। সমস্ত রাত জেগে বসে থাকতে হল। অন্ধকারে আন্দাজ পাই নি, ঢালতে ঢালতে গলার মধ্যে পুরো বোতলই ঢেলে ফেললাম। তা মশায়, কাল যদি

আবার সভা চালাতে হয়—ইঞ্জিনে স্টীমের বন্দোবস্ত করুন। নাভিশ্বাসের অবস্থা—রাত কাটবে কি করে তাই ভাবছি।

অনুপম হেসে বলে, আচ্ছা—সব বন্দোবস্ত হবে। কাজে নেমেছি, দরকার হলে বাঘের দুধ পর্যন্ত যোগাড় করব।

জগদীশ আচার্য বুড়ো মানুষ—হাঁক-ডাক নেই, জনপ্রিয়তা শ্রীকণ্ঠের সিকির সিকিও নয়। হুগলি জেলায় দুর্গম একটা গ্রামে আশ্রমের মতো করেছেন, সেখানে কাজকর্ম নিয়ে থাকেন। জেলে যান, আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে আসেন। সভাসমিতিতে বড় একটা যান না, ডাকও আসে না। এবার এসেছেন—এই অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, তাই একটা অন্তরের টান রয়েছে বলে। আন্তরিক দুঃখিত হয়ে তিনি বললেন, ছি-ছি শ্রীকণ্ঠ, কি মনে করছেন বল তো এঁরা! কেন যে তোমরা গেলো এই সমস্ত ছাইপাঁশ—

শ্রীকণ্ঠ বলেন, নিজের পয়সায় বিষ কিনে খাব—কার তোয়াক্কা রাখি আচার্য মশায়? বলে রাখছি অনুপমবাবু, এর জন্য কেউ আপনারা সিকি পয়সা খরচ করেছেন তো এখুনি এই রাতের মধ্যে বিদায় হয়ে যাব।…গঞ্জ আছে, কোথাও কাছে পিঠে?

কার্তিক বলে, বউডুবির হাটখোলা—

ও সব গেঁয়ো হাটবাজারে হবে না। হেসে উঠলেন শ্রীকণ্ঠ। চিতানো বাঁ-হাতের খানিকটা উঁচুতে ডান-হাত উপুর করে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলেন, মিলবে?

মামা ও মামাতো ভাইয়ের আপত্তি না মেনে বিজয় সেই থেকেই আছে এদের সঙ্গে। দিনরাত পড়ে আছে, যাবে কোথায়? ভূষণেরা নাকি শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, বাগে পেলে অপমানের শোধটা তুলবে তারই উপর। তা সে গ্রাহ্য করে না দেশের কাজের খাতিরে। তুখড় ছোকরা, পাড়াগাঁয়ে এমন দেখা যায় না। কথা না পড়তে বুঝে নেয়। বলল, জলমায় পাওয়া যাবে স্যর, যে রকমের যত মাল দরকার। বাইক পেলে আমিই চলে যেতে পারি।

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছে বিজয়। ও-কামরা থেকে আর একজন হাত উঁচু করেন। কাছে এসে তার মুঠোয় দশ টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে বলেন, যাচ্ছেন যখন—গলাটা কাল থেকে খুস-খুস করছে, ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা? আমার জন্যেও না হয়—

উঠানে হোগলার চালা থেকেও দু-তিনটে মাথা বেরিয়ে এল: ডেলিগেট ওঁরা, এই জেলারই নানা স্থান থেকে এসেছেন। সবাই থামতে বলছেন বিজয়কে।

বাইক রেখে বিজয় করুণ কণ্ঠে অনুপমকে গিয়ে বলে, সাইকেলে অত আসবে কি করে বলুন? কার্তিককে পাঠান, নীলমণি নিয়ে চলে যাক। পুরো এক ভয়া লাগবে মনে হচ্ছে। কনফারেন্স দারুণ জমবে।

দাঁতে দাঁতে পিষে অনুপম বলে, শিক্ষা হচ্ছে বটে! এর পর যদি কিছু করতে হয় এই এদের সঙ্গে, লাইসেন্স নিয়ে আগেভাগে ভাঁটিখানা বসিয়ে তবে কাজে নামব।

জগদীশ আচার্যকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, আমার তো চেনা-জানা নেই তেমন। কোন্ পার্টি এঁদের বলুন তো—

পার্টি বলতে গেলে তো আপনাদেরই। উচিত-বক্তা জগদীশ কাউকে খাতির করে না। বলতে লাগলেন, পরাধীনতা মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। স্বদেশিয়ানা করে আপনারা টাকা রোজগার করছেন, এরা রোজগার করছে নাম-যশ। একই ব্যবসার রকমফের আর কি।

একটু পরে দেখা গেল, ক্যাম্প ছেড়ে জগদীশ পায়চারি করতে করতে নির্জন প্যাণ্ডেলে যেখানে নারিকেল-পাতা বিছিয়ে চাষারা এসে বসেছিল, সেখানটায় একাকী গিয়ে বসে রইলেন।

সুপ্রিয়ার কানে এসব খবর কোনক্রমে না ওঠে, এই আশঙ্কা অনুপমের। ওদের নির্মল মন দেশ-সেবার নামে মেতে ওঠে। বাংলাদেশে শিক্ষিত ছেলে-মেয়ের শতকরা নিরানব্বইটি এই রকম। দেশের কাজে যে-কেউ জেলে গেছে, সে-ই দেবতা। জেল থেকে বেরিয়ে যে এই রকম এদের চেহারা খুলছে, দেখতে পেলে মরমে মরে যাবে তারা। রক্ষা এই, কোটি কোটির মধ্যে নিতান্তই দশ-বিশ গণ্ডা এরা; গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে চরম অগ্নিপরীক্ষার দিন।

॥ ৪ ॥

শেষ দিন। রাত্রে গেরিলা-যুদ্ধের মহড়া। এক ছোকরা পাঞ্জাব না কোথা থেকে ওস্তাদ হয়ে এসেছে। রাতের অন্ধকারে যুদ্ধের অভিনয়। মনে হচ্ছে, সত্যিই বুঝি এসে পড়েছে কোন নির্মম নিদারুণ শত্রু। তাদের উৎখাত করতে হবে দেশ থেকে, বাঁচাতে হবে জাতির ইজ্জত। মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো ট্যাঙ্ক-এরোপ্লেন নেই, দেশপ্রেম আর প্রাণের প্রতি নিস্পৃহতা —এই হল আসল অস্ত্র গেরিলা-যুদ্ধের।

রায়দেরই সেকেলে বাগিচা। আম-কাঁঠাল গাছ, বাঁশঝাড়, বড় গাছের তলায় কালকাসুন্দে ভাঁট আর বিড়াল-আঁচড়ার জঙ্গল। সাদা কাপড়ে

একজন দ্রুত চলেছে জঙ্গল ভেঙে। ভ্রূক্ষেপ নেই—কোথায় কাঁটা, কোথায় খানাখন্দ! কি দেখল সে—এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল, তারপর সাঁ করে ফিরে এসে খবর দিল দলের মধ্যে। সকলে মিলে এবার চলল দুর্গম পথে। অতি-মৃদু এক সঙ্কেত—শুয়ে পড়ল সবাই। সাপের মতো সবাই বুকে হেঁটে নিঃশব্দে চলেছে। সবে রাস্তার উপর এসেছে—আবার সঙ্কেত। চুপচাপ—যে যে অবস্থায় আছে, পড়ে রইল মিনিট কতক। নিশ্বাসও বুঝি পড়ছে না।

বউডুবির হাটবার সেদিন, একদল হাট করে ফিরে যাচ্ছে। তাদের দেখেই নিঃসাড় হবার আদেশ হয়েছে বাহিনীর উপর। হাটুরে লোকেরা এই মহড়ার খবর রাখে না। অন্ধকারে দেখাও যাচ্ছে না, রাস্তার পাশে নির্জীবের মতো এরা পড়ে আছে। সামনে হাত মেলে এগোচ্ছিল, সঙ্কেত শুনে সেই হাত মেলানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একজন জুতো মচমচ করে চলে গেল কার্তিকের আঙুলের উপর দিয়ে। আঙুল ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল, তবু একটু শব্দ নেই। বুকে বুলেট বিঁধলেও কণ্ঠে আওয়াজ বেরুবে না, এই নিয়ম।

পরে হেরিকেন আলোর আঙুলের অবস্থা দেখে ওস্তাদ পিঠ ঠুকে বাহবা দিল কার্তিককে। এই রকম তো চাই। ধর, ঐ হাটুরে লোকগুলোই শত্রু। শব্দ করলে কি হত? শত্রু জানতে পারত, তখন বেয়নেট চার্জ করে নির্মূল করে ফেলত সমগ্র বাহিনী।

বাগিচার উত্তরধারে ভাঙা পাঁচিল, তার উপর দাঁড়িয়ে দেখছিল সুপ্রিয়া ও আর দু-তিনটি মেয়ে। মহড়া দেখবার আগে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা এক রকম আন্দাজ ছিল সুপ্রিয়ার। এ-ও আসল রণবৈচিত্র্যের কাছাকাছি যায় না। তবু তার মনে এক নূতন উপলব্ধি জাগছে। শহরে মানুষ—বড় লোকের মেয়ে। কিন্তু ভাল মেয়ে, হৃদয়বতী। মানুষের দুঃখে সে দুঃখ পায়, দশজনের কাজ করতে চায় প্রাণপাত করে। কিন্তু এ তো গরিবের মুখে ভাত তুলে দেওয়া নয়, মহামারীতে ওষুধের বাক্স নিয়ে ঘোরা নয়—নিজের প্রাণ ও সেই সঙ্গে ভাই-বন্ধু স্বদেশবাসী অপর দশজনের প্রাণ মৃত্যুর মুখে তুলে ধরা? এর মূলে সর্বমানুষে প্রীতি নয়—নিজের জাত ও নিজভূমির প্রতি দুর্বার ভালবাসা। মানুষকে ছাপিয়ে বড় এখানে মানুষের সম্মান-চেতনা। অনেক শতাব্দী এমন সমস্যা আসে নি আমাদের সামনে। আর দশটা জাতির সম্বন্ধে খবরের কাগজ আর বইয়ে যা পড়ে এসেছি, এবার আমাদেরই ঠিক ঠিক তেমনি পথে চলতে হবে।

কার্তিক ঠাট্টা করেছিল, যাত্রার মতো সেজেগুজে লড়াই আবার দেখানো

যায় না কি। কিন্তু চমৎকার লাগে তারও। শুধু ঘর-বাড়ী, আপনার জন, এই গ্রাম কখানা ছিল এদের দৃষ্টিসীমা ও জ্ঞানের পরিধি। খাওয়া-পরা এবং চাষবাসের বাইরে যে সব ব্যাপার তাতে কিছু করবার নেই, এই ছিল ধারণা, যুদ্ধের গল্প এই সেদিন মাত্র কার্তিকেরা শুনল হরিহর আর সুপ্রিয়ার কাছে। তার পরে অবশ্য আরও অনেকের মুখে শুনেছে। বিদেশি আক্রমণ—যেন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। জাহাজি ব্যাপারে আদার ব্যাপারির মতন এদের শুধু চুপচাপ থাকবার কথা। কিন্তু আজকে নূতন উপলব্ধি হল। যুদ্ধের এই অভিনয়ের মধ্যেই তার বীর-হৃদয় নেচে ওঠে। শত্রুকে নাস্তানাবুদ করব, এই দেশের মাটিতে পা রেখে স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে দেব না তাদের। ন্যায়-অন্যায় মানব না, দয়াধর্ম নেই—আমার দেশকে যারা নিগড়ে বাঁধবে, তারা কোন রকম মানবিকতার প্রত্যাশা করতে পারে না আমাদের কাছ থেকে। এমনি এক ভয়ানক সঙ্কল্প কার্তিক এবং আর সকলের মনে মনে।

সবশেষে ওস্তাদ বলল দু-চারটি কথা। সম্বলহীন মহাচীন একক বহু বৎসর কেমনভাবে লড়ছে জাপানের সঙ্গে। যুদ্ধে কেমনভাবে ছারখার হচ্ছে দেশের পর দেশ, তৈমুর আর নাদির শার বর্বরতা নিতান্ত ছেলেখেলা যার তুলনায়। কিন্তু অত্যাচারে বীর-জাতীর শিরদাঁড়া ভাঙে না। লড়ছে চীন ও অপর নির্যাতিতেরা; আর, তারা জিতবেও। বিদ্বেষ মনে মনে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, শোধ তুলবে সময় এলে। হাঁ—আসছে সেই প্রতিহিংসার দিন।

জগদীশ তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম একটু মন্তব্য করলেন, শোধ তুলব আমরাও—প্রতিজ্ঞা করে আছি। শত্রু-মানুষকে মেরে শেষ করে নয়, আদিকালের এই বিজীর্ণ হিংস্র মতবাদটাকেই নিঃশেষ করে মেরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

অনুপম ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়। বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে যাবে। খুব কাজের ছোকরা—এই কনফারেন্সের ব্যাপারে বোঝা গেছে। তা ছাড়া আত্মীয়-বন্ধু পরিত্যাগ করে তাদের মধ্যে এসে জুটেছে, তার ভবিষ্যতের জন্য একটা-কিছু করে দেওয়া দরকার। মনে মনে অনুপম এজন্য নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করছে।

কার্তিককেও সে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কার্তিক মাথা নাড়ে। ক্ষেত-খামার আর অত বড় সংসার বুড়ো বাপের উপর ফেলে সে যাবে কি করে?

সুপ্রিয়া কলকণ্ঠে বলে, আসল কথা ও নয়। আমি খবর রাখি। তোমার বিয়ে হবে কিনা সেই টুনটুনি পাখির মতো মেয়েটার সঙ্গে! তাই নড়বার জো নেই।

অনুপমকে বলে, অমন ছটফটে মেয়ে মোটে আপনি দেখেন নি। রাত্তিরবেলা তো ছিলাম সে বাড়ি—দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার গল্প শুনছিল। যে-ই তাকাই—ফুড়ুত করে অমনি কোথা উড়ে যায়, পাত্তা মেলে না। টিপি-টিপি আবার হাসে। বড্ড মিষ্টি চেহারা। কতক্ষণ বা দেখেছিলাম—হাসি-মুখখানা চোখের উপর জলজল করছে এখনো।

অনুপম কার্তিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি গো—সত্যি?

কার্তিক মুখ নিচু করল।

নেমন্তন্ন কোরো—চেনা-জানা তো হয়ে গেল, চলে আসব।

মৃদু হেসে অপ্রত্যয়ের সুরে কার্তিক বলে, হ্যাঁ—তাই আসবেন কখনো!

আচ্ছা, দেখোই না। হ্যাটকোট পরি আর যা-ই করি, বামুনের ছেলে তো বটে। ফলারের নামে জ্ঞান থাকে না।

সুপ্রিয়াকে দেখিয়ে বলে, ওঁর সঙ্গে তো কাজে লাগছ এবার থেকে। ওঁর মারফতে খবর পেয়ে যাব, টের পাবে মজাটা।

বিজয় বলে, সুপ্রিয়া-দিও চলে যাবেন যেন শুনছিলাম।

খড়ের আগুন তা হলে নিভে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তাই কিছু ছুটি মঞ্জুর করা গেল। গাঁয়ে বসে আগুনে কাঠ যোগাতে লাগুন এই কয়েকটা মাস—

বলে অনুপম কৌতুক-স্নিগ্ধ চোখে সুপ্রিয়ার দিকে চাইল।

হরিহর ও অনুপমের মধ্যে গোপন কথাবার্তা হয়ে তাই-ই সাব্যস্ত হয়েছে—দেখা যাক আরও দু-পাঁচ মাস। চারিদিকে আতঙ্ক, অনুপমেরও বিষম কাজের চাপ—কোথায় থাকে, কি করে, কিছু ঠিকঠাক নেই। আর গণ্ডগোল সত্যিই যদি ঘটে, শত্রু এসে পড়ে—কে কোথায় ছিটকে পড়বে, পাত্তা পাওয়া যাবে না। বিশেষত অনুপমের কিছু মিলিটারি-কণ্ট্রাক্ট আছে—বেনামিতে; বিপজ্জনক এলেকায় হামেশাই তাকে যাতায়াত করতে হয়। এ অবস্থায় শুভকর্ম আপাতত স্থগিত রাখাই স্থির হয়েছে।

কনফারেন্স চুকে যেতে মেয়ের প্রতিও হরিহরের মন নরম হয়েছে। বস্তুত এসব ছেলেখেলারই সামিল, এখন ভাবছেন তিনি। কেন যে এত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, চটেও ছিলেন মনে মনে, এমনকি নিরুপায় হয়ে অনুপমকে

জরুরি চিঠি দিয়েছিলেন—ভেবে তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন। হৈ-হল্লা করে বেড়ায় সুপ্রিয়া—আহা, করুকগে। এ বয়সেরর রীতিই এই। বিয়ে-থাওয়া হলে ঘর-গৃহস্থালি নিয়ে থাকত। গ্রামের এই সঙ্কীর্ণ পরিধিটুকু মাত্র—পাশের গ্রামেও সে যায় না, মান-ইজ্জতের খাতিরে হরিহর যেতে দেন না, ওদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি—বক্তৃতার তুবড়ি ছড়িয়ে কি-ই বা করতে পারে এইটুকু জায়গায়! চাষার ছেলেপেলে নাচিয়ে একটু আমোদ করছে, কটা মাস পরে ধান-কাটার মরশুম পড়লে কাউকে আর পাওয়া যাবে না। লম্বা লম্বা কাজের ফিরিস্তি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে তখন, চিহ্ন মিলবে না।

বরঞ্চ হরিহরের মনে মতলব জাগছে, রাজনীতির সংস্পর্শহীন কিছু কিছু সত্যিকার সৎকাজ তিনি করে যাবেন এই অঞ্চলে। সুপ্রিয়ার জয়-জয়কার শুনে আর এই অল্পদিনের মধ্যে এখানে প্রতিপত্তি দেখেই হয়তো বাসনা জেগেছে। স্বর্গীয় মায়ের নামে একটা ইস্কুল ও একটা দাতব্য হাসপাতাল করে দেবেন তিনি, একটা টিউব ওয়েল বসাবেন, একটা পাকারাস্তা বাঁধিয়ে দেবেন বাঁকাবড়শি থেকে বউডুবির হাট অবধি—বর্ষাকালে গ্রামের লোকের যাতে কাদা ভাঙতে না হয়। সুপ্রিয়ার উপরই ভার চাপিয়ে দেবেন। কাজ পেলে স্ফূর্তিতে থাকে, রাজনীতি ছেড়ে এই সমস্ত নিয়ে সে মশগুল হয়ে থাকুক। পরাধীনতা-মোচন সমাজ-সেবার মধ্যে সমাধি-প্রাপ্ত হোক।

॥ ২ ॥

গড়ভাঙায় কেদার মোড়লের বাড়ি হয়ে কার্তিক মনের আনন্দে ফিরছে। আলগা হাতে বোঠে ধরেছে, নীলমণি দুলে দুলে চলছে। পথে শোনে আজব খবর। রতন সর্দার আ'লে দাঁড়িয়ে চেঁচোঘাস কাটছিল। বলে—থানায় গিয়েছিলে নাকি দাদা? না—যাচ্ছ এখন?

কেন—থানায় কেন?

ম্লানমুখে রতন বলে, যেতেই হবে। আজ হোক আর দু'দিন পরে হোক।

কার্তিক বলে, চোর না ডাকাত—থানায় যাবার গরজটা কি হল শুনি?

নৌকো-সাইকেল যার যা আছে, থানায় লিখিয়ে দিতে হবে। ঢোল পিটিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বলে গেল। নৌকো নাকি নিয়ে যাবে থানাওয়ালারা।

থানার বড়বাবুর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল বটে। তাই হয়তো সাব্যস্ত হয়ে গেছে। হাটবাজার করতে দু-চারটে লাগতে পারে—কিন্তু সারা অঞ্চলের নৌকো কি করবে তারা? কি হবে অত সাইকেল?

লোকের মুখে মুখে নিত্য গুজব রটে। একগুণ খবর দশগুণ হয়ে ছড়িয়ে

যায়। দু'জন চাষী এক জায়গায় হলেই ঐ কথা। উপায় কি আমাদের? বাঁধের মাটি আনব কিসে? যখন ধান পাকবে, ক্ষেতে তখনো এক বুক জল—নৌকোয় বসে পাকা শীষ কেটে আনি, এবার ধান কাটায় হবে কি? আর হাটবাজার, লোক-লৌকিকতা?

সদ্য গেরিলা-যুদ্ধের কায়দা শিখে হাত নিশপিশ করছে কার্তিকের। তারা ঠিক করছে, শত্রু এলে এই বউডুবির বিলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারবে। সমস্ত আয়োজন পণ্ড। এরা কিছু করবে—থানাওয়ালারা চায় না তা হলে?

আরও শোনা যাচ্ছে, কোন অঞ্চলে নাকি উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রামকে গ্রাম। থালা-ঘটি-বাটি পোঁটলা বেঁধে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে কাঁধে তুলে মেয়ে-পুরুষ কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় উঠেছে। কি কাণ্ড—কোন পুরুষে কেউ যা শোনে নি! আজকে গল্পের মতো শোনাচ্ছে—কালই হয়তো ঢোল পিটিয়ে এদিকে দিয়ে যাবে ঐ হুকুম। দিলেই হল!

আরও ক'দিন কাটল। সেই স্ফূর্তিবাজ কার্তিক আধখানা হয়ে গেছে। মাছ মারে না ভুলেও কেদারের বাড়ির দিকে যায় না, ভাল করে কথাই বলে না কারও সঙ্গে। নীলমণি নিয়ে ছপছপ করে খালে বিলে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ায়।

বিয়ের কথা নিয়ে রতন রসিকতা করতে গিয়েছিল, কার্তিক আগুন হয়ে ওঠে।

বিয়ে না হাতি! না-না-না—হেঁটে যাব কি বিয়ে করতে? সাত বছর বয়সে বোঠে ধরেছি, তারপর কি হেঁটেছি কখনো? নীলমণি আমার পা। পা দু'খানাই কেটে দিয়ে যাচ্ছে, তার বিয়ে!

বিলের উপর খালের পাশে তাদের বাড়ি। জোয়ার বেলা গুড়ের নৌকো, তামাকের নৌকো, পুবদেশি বালাম-চালের নৌকো খালে ঢোকে, হাল বেয়ে যায়—তার মচমচানি, খরস্রোতে নৌকোর চারিপাশে জলের কলহাস্য। ভাঁটার টানে জেলে-ডিঙি বড় গাঙে নেমে যায়, বৈঠার আঘাত লাগে জলে আর ডিঙির গায়ে—সে আওয়াজ আর এক রকম—একেবারে আলাদা। রাত্রিবেলা ঘরে শুয়ে শুয়ে জানতে পারে কখন জোয়ার এল, কখন ভাঁটা সরছে। নৌকো কথা বলতে পারে; গাঙ আর নৌকোর মধ্যে কথাবার্তা হয়, গাঙ-কিনারে যাদের বাড়ি এ ভাষা বুঝতে পারে তারা।

নদী-খাল এখন নিরাভরণ বিধবার মতো। ঘাটে ঘাটে এত ঠেলাঠেলি, মোটে জায়গা হত না, এখন যেন ভেল্কিতে অদৃশ্য হয়েছে—নৌকো জমা দিয়েছে, কিম্বা সরিয়ে ফেলেছে। দু-একজনের থাকেও যদি, তারা নৌকো

বায় না, মনমরা হয়ে ঘরে শুয়ে থাকে। ধরণীর স্নায়ু-শিরার মতো গাঙে-খালে ভরা এই অঞ্চল ক'দিন শ্মশানভূমি হয়েছে।

একদিন কার্তিক খুব গোপনে রতনকে জিজ্ঞাসা করল, এত যে নৌকো আটকেছে থানাওয়ালারা—নজর রাখে? যত্ন করে?

খুব, খু-উ-ব। দিন ভোর চান করাচ্ছে তোমার মতো। গর্জন তেল মাখিয়ে চাটাই মুড়ে রাখছে।

হো-হো করে রতন হেসে উঠল। হাসি অথবা কান্না।

কার্তিক বলে, জলে রাখছে না ডাঙায়?

ইস্কুলের যে মাঠটা আছে না—দেখগে রয়েছে সেখানে। যেন কুমির মেরে মেরে এনে ফেলছে।

কার্তিকের নীলমণি কিন্তু কুমীর নয়—চঞ্চল কোমল একটি নীলপাখি। তাকেও হয়তো নিয়ে ফেলবে ওর মধ্যে। আলগোছে জল ছুঁয়ে উড়ে বেড়ায়, তার নিষ্প্রাণ কাষ্ঠদেহ শুকনো ডাঙায় পড়ে রইবে।

বাঁকাবড়শি থেকে দাসু এল একদিন। কার্তিককে সুপ্রিয়া ডেকে পাঠিয়েছে। বড্ড জরুরি।

কার্তিক গিয়ে দাঁড়াতে সুপ্রিয়া বলে, দেদার বক্তৃতা তো শুনলে কনফারেন্সে। আসল কাজের কতদূর কি হচ্ছে শুনি? তোমাদের গাঁয়ের খবর কি?

কার্তিক হাহাকার করে ওঠে, কিচ্ছু করছি নে দিদি। নৌকো বন্ধ করেছে, হাত দু'খানাই কেটে নিয়েছে। কাজ আমরা করব কি দিয়ে?

সুপ্রিয়া চমকে উঠে কাতর চোখে তাকাল। বলেছে সত্যি, নৌকো এদের হাত-পা, নৌকো এদের পরিবারেই একজন যেন। নৌকো হারানো যে কি ব্যাপার নৌকোর উপর যাদের দিন কাটে, তারাই বোঝে—অন্য মানুষের আন্দাজে আসে না। ওদের মর্মদাহী শোকে মামুলি সরকারি কৈফিয়ত শোনাতে লজ্জা বোধ হয় সুপ্রিয়ার! কথা তো মোটের উপর এই পরাধীন অন্ত্যজ জাতি—আস্থা করা চলে না আমাদের উপর? জাপান এসে নৌকো যদি কেড়ে-কুড়ে নেয়, কিম্বা আমাদেরই কেউ কেউ নৌকো যদি দিয়ে দেয় তাদের? খেটেখুটে এত বাধা-বিপত্তির মধ্যে তারা কনফারেন্স করল, যুদ্ধের তালিম দিয়ে উদ্দীপনা জাগাল গ্রামের নর-নারীর মনে। সুপ্রিয়ার মনে হচ্ছে নেহাতই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করেছে লোকজন জড় করে। টাকার লোভে, ভাল খাওয়া, ভাল পরা ও ভাল থাকবার লোভে গোলামের মতো নয়, মানুষের মান ইজ্জত নিয়ে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে চাই—কংগ্রেসের এ প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বারম্বার। সারা পৃথিবীতে ভারে ভারে অস্ত্র তৈরী হচ্ছে, অস্ত্রের আঘাতে হাজার হাজার বছর ধরে গড়েতোলা সভ্যতা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ ডুবতে ডুবতে অতল সমুদ্রে চড়া পড়ে এল, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ডুবিয়ে দিল মানবতার বাণী, অস্ত্রের ভাঙা টুকরোয় পৃথিবীর পথ হল কঙ্করময়—আর কোটি কোটি আমরা কাস্তের অধিক অস্ত্র পাব না, নৌকো-সাইকেলও আমাদের হেপাজতে রেখে বিশ্বাস নেই। সকল জাতি মেতে উঠেছে—কেউ নিজের ঘর ঠেকাতে, কেউবা পরের ঘর ভাঙতে। এই বিচিত্র ভাঙাগড়ার মধ্যে এত বড় ভারতবর্ষ নিষ্কর্মা নিরাসক্ত দর্শকের মতো। যুদ্ধের কাজে যোগ দেবার যে আহ্বানপত্র বেরোয় তাতে থাকে বিনামূল্যে পরিচ্ছদ, পুরোবেতনে ছুটি, ভাল বেতন, বিনামূল্যে বাসস্থান—কতরকম লোভনীয় প্রতিশ্রুতি! দেশের জন্য এগিয়ে এস, যুদ্ধান্তে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হবে—এমন কথা দেখতে পাই না কেন।

সুপ্রিয়া ভাবে, ভুলের পরে ভুলের পাহাড় জমে উঠেছে। ওদের তো স্বদেশ-রক্ষার ব্যাপার নয়, সাম্রাজ্য-রক্ষা। তফাত সেইখানে। জাপানকে চাই নে, চাই নে, চাই নে। মাঞ্চুরিয়া চীন আর আবিসিনিয়ার উপর আক্রমণের সময় তোমরা ছিলে দারুভূত-জগন্নাথের মতো; স্পেনের গৃহযুদ্ধে তামাসা দেখছিলে দর্শক হয়ে, আর মুসোলিনি-হিটলারের তোয়াজ করছিলে; —সমদুঃখী পরাধীন ভারত সর্বশক্তিতে সেদিন প্রতিবাদ করেছে, আলিঙ্গন করে এসেছে স্বাধীনতায় সর্বসমর্পিত মহাচীনকে, দেশবাসীর মুখের অন্ন জাহাজ বোঝাই করে পাঠিয়েছে, বিপন্ন স্পেনের গণতন্ত্রীদের বাঁচবার জন্য। শিকলের কালো দাগ দু-শ বছরে আমাদের হাড়-মাংস কেটে মর্মে গিয়ে পৌচেছে। হাজারে হাজারে আমরা আত্মদান করে আসছি, পুরাতনের বদলে আনকোরা এক নূতন বেড়ি পরবার জন্য নয়। জাপান মুক্তি দিতে আসবে না, আমরা জানি। তোমাদের ওয়াটস—ক্লাইবও তো একদিন মুক্তি দিচ্ছিল তরুণ নবাবের শাসন-বন্ধন থেকে। সে মুক্তির কি চেহারা ফুটেছে শেষ অবধি? কিন্তু মুক্তি নিয়ে এই ছলা-কলা তোমাদেরও আর চলবে না বেশিদিন।

দাসু খবরের কাগজ দিয়ে গেল। আজকের ডাকে এসেছে। সর্বনাশ, সর্বনাশ! আগুন ধরে গেছে নিখিল ভারতবর্ষে। কংগ্রেস বেআইনি। গান্ধী-আজাদ-নেহরু—সকলে বন্দী। দেশের স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার নরনারীকে যেন ছেঁকে নিয়ে জেলে পুরেছে। কি সর্বনাশ! জার্মান আর জাপানির সারা পৃথিবীতে যাঁর চেয়ে বড় শত্রু নেই, সেই নেহরুকে আটকে রাখার চেয়ে বড় কাজ এই সঙ্কট সময়ে এরা পেল না। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

মুখে লম্বা লম্বা বাণী আওড়াচ্ছে, কিন্তু নিষ্ঠুর আর বিশদৃশ এই সব কাজকর্মের খবর যেদিন জগতের কানে পৌঁছবে, সেদিন মুখ দেখাবে ওরা কেমন করে ?

পড়ছে, তবু নিজের দুচোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সুপ্রিয়া। আর বীরপুরুষ কার্তিক তখন ছেলেমানুষের মতো দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

সন্ধ্যাবেলা মন্থর পায়ে কার্তিক মাদারডাঙায় ফিরল।

হেঁটে এলি যে ? নৌকো জমা দিয়েছিস ?

উঁহু — ডুবে গেছে।

কেউ বিশ্বাস করে না। সাত বছর বয়স থেকে নৌকো বাই। ঝড় নেই, বাতাস নেই, ডুবলেই হল ! ডুবিয়ে দিয়েছে হয়তো। তার নীলমণি জলতৃষ্ণায় আকাশের দিকে হাঁ করে থাকবে—তার চেয়ে জলশয্যায় তাকে শুইয়ে রেখে এল। কাদা লাগবে এই ভয়ে কত সতর্কতা—সবাই ছি-ছি করেছে, বাপ ধরে মেরেছে পর্যন্ত—এখন কোন্‌খানে পাতালতলে নীলমণির নীল রং চটে যাচ্ছে, শুঁদি—কচ্ছপের বাসা করছে, শেওলা আর বালি জমছে খোলের মধ্যে···

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ঝড়ের লক্ষণ ভারতের আবহাওয়ায়, জেলে থাকতেই খবরের কাগজ আর নূতন নূতন বন্দীদের মুখে পান্নালাল আঁচ পেয়েছিল। বাইরে এসেও দেখল তাই—আসমুদ্র-হিমাচল স্তম্ভিত প্রতীক্ষায় আছে।

করব অথবা মরব

শহরে-গ্রামে সর্বত্র যেন তারে তারে খবর হয়ে গেল। মানুষের মুখে মুখে বাড়ির দেয়ালে, রেলগাড়ির কামরায়, রাস্তার বটগাছে, ইস্কুলের ছেলের পাঠ্য বইয়ের মলাটের উপর তিনটি কথা—অবমাননার নৈষ্কর্ম থেকে প্রবুদ্ধ ভারতবর্ষ তিনটি কথায় তার অমোঘ সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছে—

ডু অর ডাই—করব অথবা মরব

মারব আর মরব, কিল অ্যাণ্ড ডাই—অতি-বড় উত্তেজনার মুখেও ভারত ভাবতে পারে না জিঘাংসা অন্যান্য জাতির মতো। তার শুদ্ধ প্রজ্ঞা এক সুস্থ শান্তিময় জগতের ছবি আঁকে, কারো সঙ্গে হানাহানি না করেও মানুষ বেঁচে থাকবে সেখানে, মরবে শুধু মানুষের দুর্বার লোভ। ভারত ছাড়ো—জরুরি দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। বিশাল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত

অবধি এক দাবি—ভারত ছাড়ো, ভারত ছাড়ো, ভারত ছাড়ো তোমরা। সেই বিদেশি ছোকরা নিজে থেকে যে কথা একদিন বলেছিল পান্নালালের কাছে। বিচিত্র এই ভাঙাগড়ার সংঘর্ষে পুতুল হয়ে থাকবে না কোটি কোটি নরনারী; কিছুতে থাকবে না। জাতির বোঝা বইবে জাতীয় গবর্নমেণ্ট। দর-কষাকষির দিন আর নেই। বধিরতা আর ভাঁওতাবাজি চলে যদি এখনো, তার জবাবে অনিচ্ছার সঙ্গে কংগ্রেস তার অহিংস-শক্তি সংহত করবে। মহাত্মাজি বলবেন, বড়লাটের কাছে এই শেষ একবার আমি দূতিয়ালি করতে যাব।

কিন্তু সে পর্যন্ত সবুর সইল না। কারাগারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন তাঁরা।

পান্নালাল এখনো আছে অনুপমের তেতলায়। কণ্ট্রাক্টরি কাজে অনুপমকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, পান্নালালের উপর বাড়ি ফেলে নির্ভয়ে সে ঘোরাঘুরি করে। মার্কা-মারা স্বদেশি মানুষগুলোর সরকারের সঙ্গে যে সম্পর্কই হোক—সর্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় তাদের!

ইদানীং পান্নালাল কেমন মুষড়ে যাচ্ছে। যেন কাণ্ডারীহীন ভেলায় ভেসে চলেছে। উমা আছে; সুপ্রিয়ারা চলে যাবার পর ইস্কুলের হোস্টেলে গিয়ে উঠেছে। সুপ্রিয়া চিঠির পর চিঠি দিচ্ছে ছুটি নিয়ে অথবা কাজে ইস্তাফা দিয়ে তার ওখানে গ্রামের কাজে যোগ দেবার জন্য। চিঠির সে জবাব দেয় না; সুপ্রিয়ার প্রস্তাব ভেবে দেখবারই সময় নেই যতদিন পান্নালাল রয়েছে এখানে। জেলে থাকলে তবু নিশ্চিন্ত থাকা যায়, বাইরে থাকতে শান্তি নেই। কখন কিসে মেতে ওঠে, সেই ভাবনা। বিকাল হলেই উমা অনুপমের বাড়ি চলে আসে, খানিকটা রাত অবধি থেকে পান্নালালকে সামনে বসে খাইয়ে তবে সে ফিরে যায় হোস্টেলে।

মহেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। মাংসের দোকান সেই বন্ধ করেছিল, আর খোলে নি। কি করছে কে জানে—রকম-সকম দেখে মনে হয় চলছে তার খারাপ নয়। ইদানীং খুব এখানে আসা-যাওয়া করছে। কিন্তু উমার কি হয়েছে···খাপ্পা হয়ে ওঠে মহেশকে দেখলে।

পান্নালাল উমাকে বলে, বেশ তো দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি, খবরের কাগজ পড়ছি, কথার তোড়ে রাজা-উজির মারছি লড়ায়ের ম্যাপ দেখে দেখে। তবু দেখি সোয়াস্তি নেই তোমার—

কিন্তু মুশকিল যে খবরের কাগজেও। সারা ভারতে গোলমাল, আর আমেরি সাহেব সগৌরবে বলছেন চিরকেলে বজ্জাত বাংলা দেশ কেমন ঠাণ্ডা এবারে দেখ!

মহেশ আগুন হয়ে বলে; অসহ্য !

চা পরিবেশন করতে এসে উমা দু'জনের মাঝখানে দাঁড়াল। মহেশ তবু বলতে লাগল, কি লজ্জার কথা ভাই। রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগারের দেশ—বাঘেরা নির্বংশ হল নাকি ?

পান্নালাল ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক তাই। সুন্দরবনে অতি-সুন্দর ধানের আবাদ হচ্ছে। যেখানে বাঘ ডাকত, চাষারা সেখানে লাঙল ঠেলে।

তাড়াতাড়ি উমা রেডিও খুলে দিল। গানের গোলমালে এই সব বেয়াড়া কথার অবসান হোক। কিন্তু কপাল মন্দ, গান সে সময়টা নেই। রেডিওরও ঐ এক খবর—সুশীল সুবাধ্য ভক্তিমান বাংলা দেশ। মিস্টার আমেরি টিটকারি দিয়ে বলছেন—

মহেশ উঠে এসে রেডিওর চাবি বন্ধ করল।

অসহ্য, পাগল হয়ে যাবার দাখিল।

পান্নালাল সায় দিল, ঠিক !

উমার প্রদীপ্ত চোখ দুটি মহেশের মুখের উপর পড়ল। পান্নালাল বলে, এমনিতেই মানুষ এত কথা বলে যে টেকা মুশকিল। তার ওপর আবার এক-একটা কথা এই রকম যদি লাখ বার ছড়ানোর বন্দোবস্ত হয়, উপায় কি পাগল না হয়ে ?

মহেশ বলে, আর কথাটাও ভাবো দিকি ! পরশুরাম একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন তবু জড় মারতে পারেন নি। এরা এমন বাহাদুর যে, দু-চার মাস জেলে দিয়ে, কি দু-দশ ঘা বেতের বাড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা করবে চারিদিক ?

উমা টিপ্পনি কেটে বলে, বাহাদুর—সে কি মিছে কথা ? পরশুরাম শুধু ডান-হাতেই কুড়ল চালিয়েছিলেন, তাই পেরে ওঠেন নি। সব্যসাচী এরা ডান-হাত বাঁ-হাস সমানে চালাচ্ছে। জেল, জরিমানা অথবা মিলিটারি-কণ্ট্রাক্ট, প্রকাশ্য ও গোপন চাকরি—

চারিদিকে নানা গুজব। ছাপানো ও সাইক্লোস্টাইল-করা নানারকম কাগজ হাতে আসছে। কোন্ আদালতে নাকি জজকে সরিয়ে খদ্দরধারী কর্মী বিচার করতে বসেছে; থানায় কোথায় তিনটে কনেস্টবল গায়েব; কোন্ ইস্পাতের কারখানায় নাকি মাকড়সার জাল ঝুলছে—জাতীয় গভর্নমেণ্ট না হওয়া পর্যন্ত হাপরে আর আগুন জ্বলবে না। উমা বিষম উদ্বিগ্ন হচ্ছে মনে মনে। ভিন্ন জাতের মানুষ এই পান্নালালেরা। এত যাতনা সয়েছে, তবু শান্ত হ'ল না। চড়কের সময় ঢাকের বাজনা শুনলে সন্ন্যাসীর পিঠ চড়চড় করে

ওঠে, এদেরও তেমনি। তার উপর সময় নেই, অসময়ও নেই, মহেশ 'ভাই' 'ভাই' করে আসছে।

দুপুর বেলা একদিন মহেশ টিপিটিপি এসে উঠল তেতলায়। উমা নেই। সোয়াস্তির শ্বাস ফেলে সে দরজায় খিল এঁটে দিল। চোখে কালো গগ্‌লস, চিনতে পারা যায় না। পুঁটলি থেকে বের করল চকচকে ছোরা একখানা।

আর ও টিনের ভিতর কি দাদা—অত যত্নে কাপড়ে মুড়ে এনেছ?

মহেশ বলে, এখন খালি। যাবার মুখে পেট্রোল ভরতি করে দেবে।

একটা যন্ত্র বের করে বলে, দেখে নাও—তার কাটতে হবে এই রকম করে। টেলিগ্রাফ-লাইন সাবাড় করে তারপরে কাজের আরম্ভ কিনা!

আর শুনেছ? ম্লানমুখে পান্নালাল বলে, আজ দুপুরেই একটাকে মেরে ফেলেছে রাস্তায় তার কাটছিল বলে।

মহেশ বলে—কাটছিল না, মেরামত করছিল টেলিফোন-কোম্পানির লোক। কারও মাথার ঠিক নেই ভাই—না ওদের, না আমাদের।

আরও অনেক পরে বেলা পড়ে এলে উমা এল। ঝালর-দেওয়া একটা বালিশ-ঢাকা সে নিজের হাতে বুনে নিয়ে এসেছে পান্নালালের জন্য। এসে খিল-দেওয়া দরজা ঝাঁকাচ্ছে। খুলে দিতে মহেশের দিকে সে কটমট করে তাকাল।

পান্নালাল বলে, বিশ-পঁচিশটা টাকার দরকার পড়ে গেল যে!

কি হবে?

কলকাতায় থাকা যাচ্ছে না।

উমা অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বলে, তাই চল পানু-দা, আমাদের সঙ্গে সুপ্রিয়াদের গাঁয়ে। তোমার বিশ্রামের দরকার।

পান্নালাল হেসে উঠে বলে, বিশ্রামের তো তোফা জায়গা রয়েছে। পাকা বাড়ি, পরের খরচ।

গান্ধীজির ছোট্ট একটা ছবি টেবিলে, ডাণ্ডির সত্যাগ্রহে চলেছেন সেই সময়কার। হিমালয়ের প্রত্যন্ত থেকে বঙ্গের সমুদ্র-বিস্তার অবধি নিখিল মানব-মানসের সত্য ও দুঃখের পথে বিজয়-যাত্রা চলেছে যেন। ছবির দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস পড়ল পান্নালালের। বলে, যেমন ওঁরা হাজারে হাজারে বিশ্রাম করছেন আজকে। জবরদস্তি করে বিশ্রাম করাচ্ছে।

উমা পাংশু হয়ে উঠে। বলে, শোন পানু-দা, দরজায় শত্রু—হুজুগের সময় নয়। গান্ধীজির শেষ কথাগুলো মনে রেখো।

পুণ্য বৈদিক মন্ত্রের মতো পান্নালাল গান্ধীবাণী আবৃত্তি করল—

অহিংসায় স্বাধীনতা যদি না আসে, আমি মরব। আমি মরলে দেশ যেন যে উপায়ে পারে স্বাধীনতার চেষ্টা করে।

মহেশ বলল, তা গান্ধী তো-মারাই গেছেন।

উমা চমকে ওঠে। বলেন কি?

মরা নয় তো কি! যাকে বলে সিভিল ডেথ।

সহসা ভীষণ হৈ-চৈ উঠল রাস্তায়। অসংখ্য ভারী জুতোর সমবেত ধ্বনি। ছুটে তারা বারাণ্ডায় বেরিয়ে এল।

পান্নালাল উৎকট হাসি হেসে উঠল। বলে দিব্যচক্ষে দেখছি জেলের দুয়োর খুলতে হ'ল ব'লে। বিক্ষুব্ধ কোটি কোটি মানুষকে ঠেকাতে পারে গুর্খা বা গোরা সার্জেন্ট নয়—বেঁটে ওই বুড়ো মানুষটি ও তাঁর দুঃখজয়ী দলবল।

উমা ওদিকে ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে বিছানা করছে। বালিশ-ঢাকা চাপা দিল পান্নালালের আধময়লা বালিশের উপর।

॥ ২ ॥

হাজার হাজার ছেলেমেয়ের নিঃশব্দ শোভাযাত্রা। ইস্কুল-কলেজ সব বন্ধ। দিনের পর দিন চলবে নাকি এই রকম? নানাপথ ঘুরে সবাই জমায়েত হচ্ছে পার্কের সামনের রাস্তায়! পার্কের দুয়োর আঠকে আছে লাল-পাগড়ির দল। তারা পেরে ওঠে না, এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে রেলিং টপকে টপাটপ ভিতরে গলিয়ে পড়ছে। সার্জেন্টগুলো মোটর-বাইকে বেপরোয়া ছুটোছুটি করছে জনতার মাঝখানে! পালাচ্ছে না কেউ. বড জোর পাশ কাটায় একটু। এত মানুষ যেন অলক্ষ্য সূত্রে পায়ে পায়ে বাঁধা, মনে মনে বাঁধা।

ধূলোর ঝড তুলে তীরবেগে লরির পর লরি আসছে। লরি থামতে না থামতে লাফিয়ে পড়ল গুর্খারা এবং আরও পুলিস। এদিক-ওদিক দৌড়চ্ছে, এলোপাথাডি পিটছে যাকে সামনে পায়, ছুঁড়ে মারছে হাতের লাঠি।

জনতাও ক্ষেপে গেল। রাস্তার খোয়া আর জুতো ছুঁড়তে লাগল। এক পানওয়ালা ডাব ছুঁডছে তার দোকানে যতগুলো আছে। তখন হুকুম হল, টিয়ার গ্যাস রিভলভারে পুরে ছাড়তে হবে। গ্যাসে চারিদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অন্ধ হয়ে গেছে যেন সবাই।

পিছন ফিরলে চলবে না, সামনা-সামনি তাকিয়ে জনতা আস্তে আস্তে হঠছে। প্রবল আক্রমণ হঠাৎ সেই সময়। নাঃ, যুদ্ধ জানে এরা—বর্মায় হেরে পালাক আর যাই করুক, বিপক্ষের হাতে অস্ত্র না থাকলে সত্যিই এরা

অপরাজেয়। বিশৃঙ্খলা ভিড়ে ঘা-গুঁতো খেয়ে অনেকে পড়ে যাচ্ছে, ভারী বুটজুতো বীরদাপে পেষণ করে যাচ্ছে তাদের। শোনা গেল, নিদারুণ লাথি ঝেড়েছে নাকি একটা মেয়ের মুখে, ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে মেয়েটার নাক দিয়ে।

ট্রামে চলেছে পান্নালাল আর মহেশ। বড় রাস্তার মোড়ে থামতে জন আষ্টেক উঠল গাড়িতে। বলে, নামুন তো মশায়রা। শিগগির নেমে যান, শিগগির!

ট্রলির দড়ি কেটে দিল একজন।

দেশলায়ের কাঠি ফুরিয়েছে যে, ও সোনা-দা! কণ্ডাক্টরকে বলল, দাও তো ভাই তোমারটা, সিগারেট ধরাই।

কণ্ডাক্টর বুঝছে সব। বিনাবাক্যে তবু দেশলাই বের করে দিল। দাউ দাউ করে গাড়ির সামনেটা জ্বলে উঠল দেখতে দেখতে। পিছনে সারি সারি আরও খান দশেক দাঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত জ্বালিয়ে দেবে, লঙ্কাকাণ্ড চলবে নাকি শহরের রাস্তায় রাস্তায়?

রাত হয়েছে তখন। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার বিদীর্ণ করে মাথার উপরে অকস্মাৎ আগুনের গোলা লোফালুফি শুরু হল। বর্মার পাহাড়ে জঙ্গলে যে কাণ্ড চলেছে, এই কলকাতার বুকের উপর এ-ও প্রায় তেমনি। বড বাড়ির দোতলার বারাণ্ডা—কংক্রিটের বেষ্টনী। তারই আড়াল থেকে অগ্নিপিণ্ড একের পর এক এসে পড়ছে অবিরল ধারায়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিসের দল গুলি ছুঁড়ছে—কিন্তু মানুষ দেখা যাচ্ছে না, দেওয়ালের বালি খসিয়ে গুলি নিচে পড়ছে।

ফটক গলির মধ্যে, ভিতর থেকে বন্ধ। লাথির উপরে লাথি মারছে—সেকেলে ভারী দরজা একটুও নড়ে না। রাস্তার ও-পারের পুরানো লোহার দোকান থেকে একটা জয়েস্ট নিয়ে আসে সাত-আট জনে। তারই আঘাত দিতে দিতে খিল ভেঙে পড়ল।

বারাণ্ডায় তখন কেউ নেই—কা কস্য পরিবেদনা। পড়ে রয়েছে অর্ধেক-ভরাত কেরোসিনের টিন আর অজস্র পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি। আর গোটা-কুড়িক ন্যাকড়ার পুঁটুলি একদিকে—এক-এক টুকরা দড়ি ঝোলানো তাতে। এই এক নূতন অস্ত্র বের করেছে। সরল সনাতন পন্থায় অগ্নিক্ষরণের ব্যবস্থা। একজন দড়ি ধরে পুঁটুলি ভিজায় কেরোসিনে, পাশের মানুষ দেশলাই জেলে দেয়, জলন্ত গোলা অবিরাম নিচে পড়তে থাকে।

প্রহর দেড়েক রাত্রি। পান্নালাল আর মহেশ হাঁটতে হাঁটতে এসে

পৌঁছল শহরের বাইরে বটতলায়। সবসুদ্ধ বাইশজন হাজির ; ভোরের ট্রেনে রওনা হবে। নীরন্ধ্র আঁধার—মুখ দেখা যায় না। ফিসফিস করে তালিম দেওয়া হচ্ছে, কে কোথায় নামবে, আত্মগোপন করে কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে। আঠারোই আগস্ট—মঙ্গলবার। নিশিরাত্রে চাঁদ ডুবে গেলে ছোট-লাইনের সমস্ত স্টেশন একসঙ্গে জ্বলে উঠবে। কাগজ-পত্র পুড়বে, লাইন তছনছ হয়ে যাবে, তোলপাড় হয়ে যাবে অঞ্চলটা জুড়ে। সকালবেলা লোকে দেখবে ছাইয়ের গাদা ; মাইলের পর মাইল পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রের মতো।

খুব স্ফূর্তি পান্নালালের। আজকে এই রাত্রেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত সৈন্য যুদ্ধে যাচ্ছে। এরাও যেন তেমনি একটা দল। কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নেই, একযাত্রায় চলেছে মৃত্যু-আকীর্ণ রাস্তায়।

পান্নালালের হাতে ছোট সুটকেশ ! তাতে নানারকম জিনিসপত্র—আর আছে গান্ধীজির ছবিখানা—ওখানা সঙ্গে থাকে তার। ভরসা পায়, সত্যের আগ্রহে দুঃখ ফুলের আঘাতের মতো লাগছে—এই অনুভূতি জাগে। মনে মনে জপমন্ত্রের মতো আবৃত্তি করছে, আঠারোই—রাত্রি যখন ঠিক একটা। কেন চলেছে, পান্নালাল তা জানে না। সে সৈনিক, জানবার গরজ নেই। শুধু এক দুরন্ত ক্ষোভ কালকূটের মতো দেহ-মন আচ্ছন্ন করে আছে। লক্ষ কোটি নর-নারীর চিত্তবিজয়ী ষাট বছরের ত্যাগ আর দুঃখ-বরণে মহামান্বিত কংগ্রেস রাজার আইনমতে আর জীবিত নেই। নির্লোভ নির্মোহ তার নেতৃবৃন্দ—শ্বেত-শুদ্ধ খদ্দরে আবৃত দেহ, আলাপ করতে যাও—যা বলছ তাতেই হাসি, হাতজোড় করছেন কথায় কথায়, প্রবলের সঙ্গে শক্তি ও বুদ্ধির যখন মারপ্যাচ চলছে, তখনও প্রতি কথায় রসিকতা। বন্দী এঁরা চোর-ডাকাতের মতো। ভারতের নির্মল আত্মা কঠিন কারাগারে নিপীড়িত।

॥ ৩ ॥

কলকাতা থেকে অনেক—অনেক দূরে ছোট-লাইনের ছোট স্টেশনটি। দু'খানা আপ আর দু'খানা ডাউন—সাকুল্যে এই চারখানা গাড়ি দিনেরাত্রে চলাচল করে। বাকি সময় প্লাটফরমের প্রান্ত অবধি বিস্তৃত আশ্‌শ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গলে মশার গুঞ্জনটুকুও পরিষ্কার শোনা যায়। দিনেও কখন কখন শেয়াল ডেকে ওঠে।

স্টেশন-মাস্টার জয়চন্দ্র গাঙ্গুলির দশ বছর কাটল এখানে। অন্য লোক এসেই পালাই 'পালাই করে, তিনি কিন্তু দিব্যি আছেন। পেনশনের আর

দু'বছর সাত মাস বাকি, এর মধ্যে আর কোনখানে ঠেলে না দেয়—ভালয় ভালয় এই আড়াইটা বছর কেটে গেলে বাঁচেন।—স্ত্রী শহরের মেয়ে, অহরহ খিটমিট করছেন, সুবিধা পেলেই বাপের বাড়ি কিংবা মামার বাড়ি ঘুরতে যান, মেয়ে অণিমাও যায় সঙ্গে। জয়চন্দ্রকে নড়ানো যায় না, পয়েন্টস্‌ম্যান পুরন্দর সিং ঘর-গৃহস্থালীর ভার নেয় সেই সময়টা। কোম্পানির পেনশন কিংবা যমরাজের পরোয়ানা ছাড়া কেউ তাঁকে নড়াতে পারবে না এ জায়গা থেকে।

দুপুরের গাড়িতে ধবধবে পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক নামালেন। দেখতে পেয়ে জয়চন্দ্র ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁকে অফিস-ঘরে বসালেন। অণিমা জানালা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটার সাড়া পেলেই সে জানালায় এসে দাঁড়ায়। হাসিখুসি মেয়েটা। কিন্তু ভদ্রলোক এলেন দেখে মুখ অন্ধকার হল। সরে এল তাড়াতাড়ি জানালা থেকে।

এবং যা ভাবছিল—জয়চন্দ্র এসে স্ত্রীকে ডাকলেন,—শুনছ ?

এর পরে যা যা ঘটবে, তা-ও মুখস্থ অণিমার। খবর যাবে ছোটবাবুর বাসায়। ছোটবাবুর বউ এসে পড়বেন। তারপর অণিমাকে নিয়ে প্রাণপণে ঘষামাজা লেগে যাবে। কলো রঙে একটু চিকণ আভা ধরানোর চেষ্টা।

কিন্তু গিন্নির আজ মেজাজ খারাপ। তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ভাত চাপাতে হবে তো ? পারব না, পারব না আমি। যা করবার কর। কত বলছি, রেণুপদ আসব আসব করছে, মচ্ছব থামাও এখন কয়েকটা দিন। বলেছে যখন, নিশ্চয় আসবে। মিথ্যে বলবার ছেলে সে নয়।

অনুচ্চকণ্ঠে জয়চন্দ্র বলেন, যা ভেবেছ—ইনি তা নন গো !

আরও আগুন হয়ে গিন্নি বলেন, সকলে যা, উনিও তাই। বোকা পেয়ে গেছে তোমাকে। পথ-চলতি মানুষ স্টেশনে নেমে, মেয়ে দেখবার ছুতো করে ভালমন্দ খেয়ে সরে পড়ে।

আর কথা না বাড়িয়ে জয়চন্দ্র সরে পড়লেন। গিন্নিও গজর গজর করতে করতে সরু চাল বের করলেন এ-হাঁড়ি ও-হাঁড়ি হাতড়ে। মুখে যা-ই বলুন—ধুবড়ো মেয়ে যতক্ষণ ঘাড়ের উপরে, মেজাজ দেখিয়ে পরিত্রাণ নেই।

কুটুম্ব কোয়ার্টারেই এলেন না। স্টেশনে ভাত গেল, পুরন্দর সিং দিয়ে এল। মেয়ের বাপ হয়ে জয়চন্দ্র যেন যুক্তকর গরুড়পক্ষী হয়ে আছেন। ছেলেওয়ালারা এসে যা বলবে, তাতেই রাজি। খবর শুনে কাজের ফাঁকে ছোটবাবুর বউও একবার এসেছেন। গালে হাত দিয়ে তিনি বলেন, মেয়েটাকেও সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নাকি অফিস-ঘরে ? ওমা, কি ঘেন্না !

খাওয়াটা গুরুতর হল। কুটুম্ব এলে এইটে উপরি লাভ। জয়চন্দ্র গড়াচ্ছেন। অণিমা টিপি-টিপি এসে বাপের পাকাচুল তুলতে বসল।

সহসা অতি কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে, পারি না বাবা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আর আমায় টানাটানি কোরো না।

চমকে ঘাড় তুলে তাকালেন জয়চন্দ্র! মেয়ের দু-চোখে জল টলটল করছে।

কি বলছিস?

অণিমা বলে, গুরুঠাকুরের মতো এত খাতির-যত্ন কর, সবাই তো মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। রাস্তার লোক ডেকে ডেকে এত অপমান কেন সহ্য কর? আমায় দুটো পেটে খেতে দিতে হয় বলে?

জয়চন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠে বসলেন। এই দেখ কাণ্ড!

মেয়ের চোখ মুছে দিলেন কোঁচার কাপড়ে। তবু কাঁদে। বিব্রত হয়ে বলেন, সে সব কিছু নয়—তোকে দেখতে আসে নি। মানুষ এলেই মায়ে-বেটিতে তোরা আঁতকে উঠবি? এই এক মহাবিপদ হয়েছে।

বিশ্বাস করছে না দেখে বললেন,—শোন্, আজ রাত্রে বিষম কাণ্ড হবে এই স্টেশনে!

গলা খাটো করে বলতে লাগলেন, খবরদার, খবরদার! কেউ জানতে না পারে, তা হলে চাকরি থাকবে না। স্টেশন জালিয়ে দেবে স্বদেশিরা, লাইন ওপড়াবে!

চোখের জলের উপর রামধনু ঝিকমিক করে উঠল অণিমার মুখে। ছোটবাবু খবরের কাগজ রাখেন। তাঁদের পড়া হয়ে গেলে বিকেলবেলা সেটা নিয়ে এসে প্রতিটি ছত্র সে যেন গোগ্রাসে গেলে। আইন বাঁচিয়ে এবং নিজেদের ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা আখের বাঁচিয়ে যা লেখে কাগজওয়ালারা, তার ভিতর দিয়েও এতদূরে অণিমা দেশের দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পায়। এল বুঝি এত দিনে ভাঁট্‌-আশ্‌শ্যাওড়ায় আচ্ছন্ন স্টেশনে, পানা-ভরা নিঃস্রোত ভৈরবের ধারে দুর্মদ সৈনিক-দল—স্বাধীনতার স্বপ্ন অনারোগ্য ব্যাধি হয়েছে যাদের? লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চলার মতো নির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা জীবন! লাইন ওলটাতে আসছে—অণিমার মন কেমন নেচে ওঠে, লাইন-বাঁধা জীবনটাও উলটে যাবে বুঝি আজকে রাত্রির অন্ধকারে!

ছুটে সে জানালায় গেল। দেখবে একবার স্টেশনের ঐ মানুষটিকে। অনেকক্ষণ ধরে অনেক উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে। ঈজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন, ফরসা জামার হাতা আর মাথার খামিকটা মাত্র দেখা যাচ্ছে।

বড্ড রাগ হয় বাপের উপর। মেয়ে দেখার নাম করে যে আসে, তাকে তো স্বচ্ছন্দে বাসায় এনে তুলতে পারেন। এত আতঙ্ক এরই বেলা? বলে, মানুষ তুমি বাবা। স্টেশনে ঐ রকম রেখে তোমার চলে আসা কি উচিত হয়েছে? বাড়ি নিয়ে এলে কি হত? আনবে তো বিকেলবেলা? আলো থাকতে থাকতে এনো, ভাল করে দেখব।

কাছে এসে দেখে, জবাব দেবেন কি—জয়চন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আকাশ মেঘে থমথম করছে। স্টেশন নির্জন। পুরন্দর সিং অবধি ওজন-কলের পাশে চট পেতে পড়ে আছে। কেউ দেখতে পাবে না, একটিবার সে দেখে আসবে তাঁকে। শুধু একটু চোখের দেখা। যাচ্ছে আর তাকাচ্ছে এদিকে-ওদিকে।

কিন্তু ভদ্রলোকই অণিমাকে দেখে ফেললেন।

এস, এস মা। খবর কি? ভাল আছ?

অপ্রতিভ অণিমা তাড়াতাড়ি বলল, ঘুম ভেঙেছে কি না দেখতে এলাম কাকাবাবু। ডাব কেটে আনিগে যাই।

আসতে আসতে ভাবে, এই রকম পোশাকে এসেছেন! বেল্টে আঁটা রিভলভারটা ধপধপে ওই আদ্দির পাঞ্জাবির নিচে?

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে আলো মাত্র একটি। তিনটি জ্বালাবার কথা, মোটের উপর জ্বলছেও তাই। একটি এখানে, আর দুটো জয়চন্দ্র আর ছোটবাবুর কোয়ার্টারে। পুরন্দর সিং প্রতিদিনের মতো কেরোসিনের টিন নিয়ে হ্যারিকেন ভর্তি করতে এসেছে।

অণিমা জিজ্ঞাসা করল, কি করছেন রে এখন কাকাবাবু?

পুরন্দর বলে, চুল বাগাচ্ছেন হাত-চিরুনি দিয়ে, দেখে এলাম।

ঘণ্টা বাজল। অনেক দূরে অস্পষ্ট গুমগুম আওয়াজ। পানের ডিবা হাতে অণিমা এসে অফিস-ঘরে ঢুকল।

কাকাবাবু, পান—

গাড়ি আসবার সময়টায় এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েকে দেখে জয়চন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন আঁধারে লাইন পার হয়ে এলি, পুরন্দর সিংকে দিয়ে পাঠালেই হত।

অণিমা বলে, রেণু-দা আসছেন যে এই গাড়িতে। তুমি বেরিয়ে আসার পর চিঠি এল।

আসছে নাকি? উল্লাসে প্রায় আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি ফুটল জয়চন্দ্রের মুখে। আগন্তুকের কাছে পরিচয় দিতে লাগলেন, এর ন-মাসীর ভাশুরের ছেলে রেণুপদ—এম. এ. পড়ে। মাসতুতো বোনের বিয়েয় গিয়ে আলাপ-পরিচয় হয়েছে! তা এসেছিস—ভাল হয়েছে অণি, আমি তো চিনি নে তাকে।

গাড়ি এল চারিদিক কাঁপিয়ে। আবছা অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। অণিমা পাগলের মতো ইঞ্জিন থেকে শেষ গাড়ি অবধি ছুটছে। ছোট্ট স্টেশন —যারা ওঠা-নামা করে, তারা প্রায় সবাই আশেপাশের দু-তিনখানা গ্রামের। সকলের মুখ চেনা। এই রাত্রে বর্ষার জল-জঙ্গলভরা গ্রামে কাদা জোঁক আর কেউটে সাপের মধ্যে নূতন কেউ আসবে না, নিতান্ত যাদের কাঁধে ভূত চেপে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সেইরকম মানুষ ছাড়া।

পান্নালাল নামল। নেমে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সাব্যস্ত করে ফেলল, কোন্ দিক দিয়ে বেরুনো সুবিধা।

পিছন থেকে হাতে টান, আর উচ্ছ্বসিত হাসি।

এই যে রেণুদা, হাঁ করে দেখছেন কি?

সুটকেসের দিকে নজর পড়তে অণিমা সেটা ছিনিয়ে নেয়।

কি ওতে…কাপড়চোপড? দিন আমাকে, আমি নিয়ে যাচ্ছি। থাক-থাক, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে না। থাকলই বা আমার হাতে। চলুন।

এক হাতে সুটকেস ঝোলানো, আর এক হাত দিয়ে যেন সে পান্নালালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলল। এমন বিপাকে পান্নালাল কখনো পড়ে নি। গেটের দিকে গেল না, নিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে।

ঐ যে আমাদের বাসা। গুমটির ওখানে থেকে গুঁড়ি মেরে তার পেরুতে হবে। সত্যি রেণু-দা, ভাবতেই পারি নি, আপনি আসবেন এই জংলি পাড়াগাঁয়ে।

নিতান্ত অন্তরঙ্গের মতো গা ঘেঁষে চলেছে। হঠাৎ সামনে অণিমার কাকাবাবুটি—দুপুরের গাড়িতে যিনি এসেছেন। যেন সমস্ত দৃষ্টি পুঞ্জিত করে তাদের দিকে তাকাচ্ছেন। অন্ধকারে উজ্জ্বল হিংস্র চোখ দুটি।

কাছাকাছি গিয়ে অণিমা বলল, আমাদের কাকাবাবু ইনি। বড্ড ভালমানুষ আর বড্ড ভালবাসেন সকলকে। দাঁড়াবেন না রেণু-দা, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসে তারপরে আলাপ-টালাপ করবেন।

পান্নালাল যুক্তকরে ভদ্রলোককে নমস্কার করে অণিমার সঙ্গে চলল।

প্লাটফর্মের শেষে ঢালু জমি, এক-পেয়ে পথ। লাইনের তার ডিঙিয়ে শাপলা-ভরা ঝিলের কাছে অণিমা থমকে দাঁড়াল।

আপনার নাম রেণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. পড়েন। বুঝলেন তো?

মুগ্ধচোখে চেয়ে পান্নালাল বলল, বুঝেছি। হাওয়া খেতে এসেছি আপনাদের এখানে, কেমন?

এমন অবস্থায়ও মৃদু হাসির আভা খেলে গেল অণিমার মুখে। বলে, শুধুই হাওয়া খেতে নয় অবিশ্যি।...সে যাকগে। এখনই তো বিদায় নিচ্ছেন—

পান্নালাল বলে, রাতটুকু থাকতে পারা যায় না?

না। ঐ যাকে কাকাবাবু আর ভালমানুষ বললাম, ভালমানুষ উনি মোটেই নন। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর—পীরনগরের পথে খুব আসা-যাওয়া আছে এখানে। সকাল থেকে জাল পেতে বসে আছেন আপনাদের জন্য।

নজর পড়ল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে পান্নালাল। জিজ্ঞাসা করে, পায়ে ব্যথা নাকি?

পান্নালাল বলে, রাত্রে কাল আছাড় খেয়েছিলাম খেয়া-ষ্টিমার থেকে নামতে গিয়ে। হাঁটা যাচ্ছে না।

অণিমা বলে, কিন্তু হাঁটতেই যে হবে! ছুটতে হবে। মা রেণু-দাকে চেনেন; কি বলে নিয়ে যাই বাসায়?

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, খাওয়া হয়নি নিশ্চয়? একটু দাঁড়ান। দৌড়ে কিছু এনে দি।

পান্নালাল বলল, না থাক—

কেন?

পান্নালাল বলে, দেরি করলে ফ্যাসাদ বাধতে পারে। কিছু আছে আমার স্যুটকেসে। ওতেই চলবে। দুঃখিত হলেন?

অণিমা স্যুটকেসটা নিঃশব্দে তার হাতে তুলে দিল।

পালান। ঐদিক দিয়ে অমনি মাঠ ভেঙে জোর-পায়ে ছুটে যান যতটা পারেন।

মেয়েটিকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে পান্নালাল দ্রুতপদে চলল। আর কোনদিন জীবনে দেখা হবে না। মুখ ফিরিয়ে একবার বলল, নমস্কার!

পগার পেরিয়ে দূরবিস্তৃত খেজুরবনের আড়ালে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে গা কাঁপছে অণিমার। পুলিশ-লোকটার সন্দেহ হয়ে থাকে যদি! রেণুপদর সম্পর্কে যদি তদন্ত করতে আসে কোয়ার্টারে? তাকে ধরবে, বাপের চাকরিসুদ্ধ টান পড়ে যাবে, 'কাকাবাবু' বলে ত্রাণ পাওয়া যাবে না। আহা, নিপাট ভালমানুষ তার বাবা, বাংলা দেশের ছা-পোষা ভদ্রলোকেরা যেমন হয়।

কি হচ্ছে ওদিকে, আশাভঙ্গ ইন্‌স্পেক্টর কি করছে—একটু না দেখে বাসায় ফিরতে পারে না। গাড়ি চলে গেছে; স্টেশন চুপচাপ। বৃষ্টি এসেছে। ওয়েটিং-রুমের পিছনে বকুলগাছের নিচে ভিজতে ভিজতে অণিমা দেখতে লাগল। না, খাঁচা ভর্তি ওদের। একটা কোথায় সরে পড়েছে, অতি-আনন্দে সে খেয়াল নেই। তারার মেলা ওয়েটিং-রুমে। স্বাস্থ্যবান হাসিমুখ ছেলেগুলি কোমরে মোটা মোটা দড়ি। অনাহারে শুকনো মুখ রুক্ষ চুল উড়ছে, চোখের দৃষ্টিতে তবু বিদ্যুতের আলো। খবরের কাগজে যুদ্ধবন্দীদের ছবি দেখে থাকে, এরা যেন তাই! অব্যর্থসন্ধানী পুলিশ! এক-একটা স্টেশনে যেই-এক জন করে নেমেছে, যন্ত্রপাতি সমেত হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে অমনি। এবার এখান থেকে পীরনগর থানায় চলল। তারপর? এই তারপরের খবর আজকের দিনে একটা অপোগণ্ড শিশুও জানে। পরবর্তী কালে কোনদিন হয়তো খবর বেরিয়ে পড়বে, কি ঘটে থাকে এইসব জেলের অন্তরালে।

মহেশও এদের মধ্যে। অণিমা তাকে চেনে না, কাউকেই সে চেনে না। বয়স্ক এই দাদা-স্থানীয়টি দলের মধ্যে থেকেও দলছাড়া। পোষা-মানা হাতী জঙ্গলে ঢুকে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে দলসুদ্ধ এনে খেদায় ঢোকায়। এ মানুষটাও তেমনি যেন। কিন্তু পোষ মেনেছে এ কবে থেকে? লোভনীয় কোন্ খাদ্য খেয়ে?

দিন তো আর একটা সিগারেট—

ইন্‌স্পেক্টর তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেস এগিয়ে ধরে। একটা তুলে নিয়ে বিজয়ীর মতো মহেশ ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে অণিমার মনে। রেণুপদ সত্যিই যদি আসে, বিয়ে হয়ে যায়—স্বর্গ হাতে পাবেন তার গরিব বাবা-মা। সুন্দর পাত্র, ভাল অবস্থা এম. এ. পড়ছে কলকাতার হোস্টেলে থেকে। বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে তপস্যা করছে এমন বরের জন্য। কালো মেয়েটা কিন্তু আর একরকম চায়। যাকে রেণুপদ বলে ডাকল, সত্যি সত্যি যদি এই-ই হত তার রেণু-দা! কপালের ঘামের মতো জীবন থেকে সুখ-দুঃখ যারা মুছে ফেলেছে, দুটো দিন শান্তিতে ঘরে থাকবার জো নেই, যুদ্ধের সৈনিক—প্রিয়তমার সঙ্গে হেসে কথা বলার সময় কখন?

পান্নালাল ছুটছে, ছুটে পালাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে অণিমার কথা। দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু চোখ দুটো ভারি উজ্জ্বল। খনির মধ্যে হঠাৎ-দেখা একজোড়া দামি হীরের মতো। অন্ধকারের মধ্যে চোখের আলো ছড়িয়ে সাবধান করে দিচ্ছে—

পালান—চলে যান জোর পায়ে—

ক্লান্ত পান্নালাল এক পুকুর-ঘাটে জিরিয়ে নিচ্ছে। শান্তিতে বসা যায় না, কানের কাছে সমুদ্যত চাবুকের মতো কালো মেয়েটার কণ্ঠ, পালান—পালান—

সুটকেসটা খুলল। রুটিখানা চিবিয়ে নেওয়া যাক। খেতে খেতে সে গান্ধীজির ছবিখানা দেখে। তপঃক্লিশ একখানি শান্ত মুখ—দূর-দূরান্তর পুণ্যনগরে আগার্খার প্রাসাদ-কারা থেকে মমতা-মাখা চোখে যেন চেয়ে আছেন। পান্নালালের দুচোখ অকস্মাৎ জলে ভরে যায়। মনে মনে বলতে থাকে, পথ আমাদের অন্ধকাব, আলো দেখতে পাচ্ছেন। কিছু বুঝতে পারছি নে। কি করব আমবা ? কোন পথে চলব ?

যখন বছর আঠারো বয়স, লাঠির বাড়ি আর কারাগারে সে জীবন শুরু করেছে। সামনে অনির্বাণ স্বাধীনতাব শিখা, পথের দিকে দেখেনি তাকিয়ে। যখন জেলে থেকেছে, দু-চার মাস, তখনই যা একটু অবসর। তখন পডাশুনা করেছে, খোঁজখবব নিয়েছে, অপরাপর দেশের জনগণের অভ্যুত্থানেব বিচিত্র কাহিনী পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি গভীরতর হয়েছে কংগ্রেসের প্রতি। কালের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে কংগ্রেস, শুধু ভারতের নয়—বিশ্ব-মুক্তিরও দায় চেপেছে আজ তার কাঁধে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

পান্নালাল পালিয়ে বেড়াচ্ছে জানা-অজানা নানা জায়গায়। ধ্বংসেব তাণ্ডব চলছে, তার চিহ্ন সর্বত্র। বিক্ষুব্ধ জনগণ আর সরকারি লোকেব মধ্যে পাল্লা চলেছে যেন। পান্নালালও যে নিরপরাধ, তা নয়। শান্ত মুহূর্তে বারম্বার তার মনে হচ্ছে, মহাবীরত্বশালী ঐ সৈন্যদের সত্যিকার কামান-বন্দুকের সামনা সামনি পাঠিয়ে দিয়ে জেলের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হ'ত যদি ! এত পায়তারা ভাঁজবার কোনই আবশ্যক হত না তা হলে।

মাস দুই পরে উত্তেজনা কিছু ঠাণ্ডা হয়ে এল। পান্নালালের দেহ যেন ভেঙে পড়ছে। সন্দেহ হয়, রাত্রিবেলা জ্বর হচ্ছে একটু একটু। এতদিন সময় ও সুযোগ হয় নি এদিকে মনোযোগ দেবার। কিন্তু আর চলে না। এক মাইল না চলতে হাঁপ ধরে ; বসে পড়তে হয়। বসলেই ঝিমুনি আসে। বিশ্রাম

দরকার। বিশ বছরের উপর নিষ্ঠুর খাটনি খাটিয়েছে—শরীর এবার বিদ্রোহের লক্ষণ দেখাচ্ছে।

রঞ্জনলাল দাসের বাড়ি গেলে কিছুকাল নিশ্চিন্তে থাকা যায়। অতি দুর্গম জায়গা—যেতে হলে এমন যান নেই, যা চড়তে না হয়। আর পায়ে-হাঁটা তো আছেই। ট্রেন-সালতিডোঙা-গরুরগাড়ি-মোটরবাস—পথের এত টানা-পোড়েনের ভিতর কোন পুলিশ তার পিছু নেবে না নিঃসন্দেহ। এর চেয়ে অনেক কম হাঙ্গামেই বহু জনকে পাকড়ে প্রোমোশন আদায় করতে পারবে। রঞ্জনলাল পাড়াগাঁয়ে লোক, এক কাজের কাজি, সুদীর্ঘ কালের বন্ধু—আন্তরিক যত্ন মিলবে তার বাড়িতে।

বৃষ্টি, বাতাস আর অন্ধকার। মোটরবাস গর্জন করে ছুটছে! লক্কড় ইঞ্জিন—এখানে দড়ি-বাঁধা, ওখানে রাং-ঝালাই করা। অনেক বছর কাজ দিয়েছে, গতির চেয়ে আওয়াজ বেশি হয় এখন। আরোহীর কানে তালা ধরে মনে হয় পৃথিবীতে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে।

আজকের পক্ষে অবশ্য মিথ্যা নয় সেটা। সমস্তটা দিন বৃষ্টি হচ্ছে, সন্ধ্যা থেকে বাতাস যোগ দিয়েছে সেই সঙ্গে। বাসে তাই ভিড় নেই, সাধ করে কে বেরুচ্ছে বল এমন দুর্দিনে?

তেমাথার ধারে পান্নালালকে নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল। রঞ্জন নামকরা লোক, তার বাড়ি যাবে শুনে তটস্থ কণ্ডাক্টর জলের মতো করে পথ বুঝিয়ে দিয়েছে। চোখ বুঁজে যাওয়া চলবে, এই রকম ভাবে। এই তেমাথা থেকে সোজা উত্তরে রশিখানেক গিয়ে ডাইনের মোড় নাও। তারপর আম-বাগানের ভিতর দিয়ে সরু একপেয়ে পথ চলতে চলতে চলতে—রঞ্জনের মাটির দেয়াল দেওয়া ঘর।

কিন্তু নেমে দাঁড়িয়ে মনে হল, অসীম সমুদ্রে পড়েছে। অন্ধকার—সে যে কি অন্ধকার, গাড়ির খোপে বসে কল্পনা করা যায় না। সোঁ-সোঁ করে বাতাস বইছে, বৃষ্টি পড়ছে তীরের ফলার মতো। গাছপালা—বিশেষ করে, সুপারিগাছগুলো নুয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাচ্ছে যেন। বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, তাতেই সে এ সমস্ত দেখতে পাচ্ছে। আর খানিকটা করে পথও দেখে নিচ্ছে সেই আলোয়। যতটা দেখে, দ্রুতবেগে চলে যায়—তারপর গতি ধীর হয়ে আসে, আন্দাজে পায়ে-পায়ে এগোয়। খানিকটা গিয়ে আর সাহস হয় না, পায়ের পাতা ডুবে গেছে জলে। ক্রমেই বেশি জল—সন্দেহ হয়, বিল কি গাঙের মধ্যে হয়তো পড়বে ঝপ্‌পাস করে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, আবার বিদ্যুৎ চমৎকাবে কখন।

এ কি! জল যে একহাঁটুর উপর। পান্নালাল দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত হয়ে। আগু-পিছু যেতে ভরসা হয় না, অতল জলে পড়ে যায় যদি! খরধারে জল চলেছে, ভয়াল কলকল আওয়াজ। অসম্ভব দাঁড়িয়ে থাকা—পায়ে যেন দড়ি বেঁধে টানছে। একবার পড়ে গেলে এক টুকরা কুটার মতো আবর্তিত জলের সঙ্গে সে ও নিখোঁজ হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎ চমকালে দেখল, খালের গর্ভে নেমে পড়েছে কূলপ্লাবী জল। বাঁশের সাঁকো ছিল, সাঁকোটা অদৃশ্য—হাতে ধরে চলবার জন্য উপরে যে বাঁশ বাঁধা, সেইটে মাত্র জেগে আছে কোন গতিকে।

খাল পার হবার কথা কিছু বলল না তো কণ্ডাক্টর। তা ছাড়া ঐ নগ্ন-সাঁকোয় নির্ভর করে পার হওয়া চলবে না। পায়ের বাঁশটাই হয়তো ভেসে গেছে স্রোতে। চুলোয় যাক রঞ্জনের বাড়ি, আপাতত যে-কোনখানে মাথা গোঁজার দরকার। কোথায় যায় সে? নীরন্ধ্র আঁধারে অজানা জায়গায় কোথায় সে এখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াবে?

অতি অস্পষ্ট—ঢাকের আওয়াজের মতো শুনে একটু ভরসা হল। আশ্বিন মাস, পূজোর সময়—পূজো-বাড়ির ঢাক। অনেক দূর থেকে আসছে, ক্রোশ খানেক তো হবেই। চলল আওয়াজ আন্দাজ করে।

ঝড় বইছে এখন দস্তুরমতো। বাঁশ-ঝাড় আলোড়িত হচ্ছে, নুয়ে আসছে বাঁশের মাথা। মনে হচ্ছে, দুরন্ত দৈত্যদল ঝুটোপুটি লাগিয়েছে এ-ঝাড়ে ও-ঝাড়ে। আক্রোশটা যেন তারই উপর—বাঁশ নুইয়ে তার মাথার উপরে চেপে ধরবে এই মতলব।

রক্ষা এই, ঘন ঘন এখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এক সরু পথ সামনে। সেই দিকটা উঁচু, কলকল করে জল নেমে আসছে। খানিকটা দূরে ঝুপসি-ঝুপসি ঘরের মতো দেখা গেল। দৌড় দিল এবার। লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। বিদ্যুতের আলোয় দেখে নেবে, কোন দিকে দরজা, বাড়ির উঠানে ঢুকবার পথ কোনটা।

বাড়ি নয় তো, পানের বরজ। সর্বনাশ, পথঘাট নিশ্চিহ্ন, দুর্গম জঙ্গল। মড়মড় করে কাছেই কোথায় গাছ ভেঙে পড়ল, শেয়াল একটা ছুটে পালাল সামনে দিয়ে।

দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। গাছ আরও পড়বে না এবং ঘাড়ের উপরেই পড়বে না—তার নিশ্চয়তা কি? জঙ্গল ভেঙে ছুটল। বরজ রয়েছে যখন খুব সম্ভব মানুষের বসতি নিকটেই।

তাই-ই। খোড়োঘর, ছিটের বেড়া, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আর

পরমাশ্চর্য ব্যাপার—যুদ্ধের বাজারে অতি-দুর্লভ কেরোসিন, তা সত্ত্বেও ভিতরে আলো জ্বলছে, আলোর রেশ বেরিয়ে আসছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

পান্নালাল কাতর হয়ে ডাকাডাকি করে, কে আছেন, দুয়োর খুলুন।

সাড়া না পেয়ে দুয়োর ঝাঁকায়। ভিজে ভিজে অসহ্য হওয়ায় দুয়োরে লাথি দিতে লাগল শেষটা।

ধাক্কাধাক্কিতে হাঁসকল খুলে কবাট ঝুলে পড়ে। ভিতরে হ্যারিকেনের আলো দপ করে উঠল বাতাসের ঝাপটা লেগে। পাকা-চুল প্রবীণ মানুষ একটি—চোখে পিচুটি, একেবারে জংলি চেহারা। কিন্তু নবাবি আছে লোকটার—তক্তপোষের উপর গোটা তিনেক তোষক ও তার উপর সদ্য পাটভাঙা চাদর পেতে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে দিব্যি গদিয়ান ভাবে পিট-পিট করে চোখ তাকাচ্ছে।

পান্নালালের এমন রাগ হয়েছে, নিতান্ত অজানা জায়গা না হলে দিত এই লোকটাকে থাপ্পড় কষিয়ে। বলে, আচ্ছা মানুষ মশায়! মারা পড়ছিলাম, আর উঠে দুয়োরটা খুলতে পারলেন না?

লোকটা লজ্জিত হল না। বরঞ্চ ঝাঁঝাল স্বরে জবাব দেয়, শুনতে পাই নি কি করব?

কালা নাকি? এখন তো খাসা শুনতে পাচ্ছেন।

খোলা কবাটে জলের ছাট আসছিল। তক্তাপোষের বিছানাতেও দু-এক ফোঁটা পড়ে থাকবে! আদেশের স্বরে লোকটা বলে, হুড়কো ভেঙেছে, দুয়োর চেপে দাঁড়াও গিয়ে। দাঁড়াও বলছি। ভিজে গেলাম, দেখতে পাচ্ছ না?

পান্নালাল বলল, আচ্ছা দাঁড়াচ্ছি। আমার অবস্থাটা দেখুন। একখানা শুকনো কাপড় এনে দিন তো অনুগ্রহ করে। কাপড়টা ছেড়ে ফেলি।

নিরুত্তর লোকটি।

শুনেছেন? আবার কালা হয়ে গেলেন নাকি? কানে ঢুকছে না, ও মশায়?

রাগে রাগে কাছে এসে তার কনের কাছে মুখ নিয়ে পান্নালাল চিৎকার করে বলে, একখানা শুকনো কাপড় আর গামছা। শুনতে পাচ্ছ না?

সম্ভ্রম করে কথা বলা চলে না এ রকম মানুষের সঙ্গে। বলতে লাগল, ছিটে-ফোঁটা গায়ে লেগেছে না লেগেছে—অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, আর জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আমার সর্বাঙ্গে। কাপড় এনে না দাও তো ওঠ। ওঠ, এখনি, তোমার ঐ বিছানার চাদর তুলে নিয়ে পরব।

ঝনাত করে পিছন-দরজার শিকল খুলে মাঝ-বয়সি বধূ একজন ঘরে

ঢুকলেন। পান্নালালকে দেখে সরে গেলেন না, মাথার কাপড়টা ঠিক করে দিলেন বাঁ-হাতে।

পান্নালাল বলল, অতিথি আমি মা, এই রাতটুকুর জন্যে। একেবারে ভিজে গেছি। শুকনো কাপড়—

দিচ্ছি, দাঁড়ান।

মুখে বললেন, কিন্তু মনোযোগ বুড়োর দিকে। তার পাশে বসে ফর্সা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে দিলেন।

খাবার নিয়ে আসি দাদু?

কুইনাইন-গেলার মতো মুখ করে লোকটা বলে, কি করেছ? রুটি না লুচি?

বধূ হেসে বললেন, কাল যা হেনস্থা করলেন—ও বাবা, আবার রুটি! এই এতক্ষণ ধরে লুচি ভাজলাম বেশি করে ময়ান দিয়ে—

আন—

পান্নালাল সকাতরে বলে, কাঁপছি এই দেখুন। একটু যদি তাড়াতাড়ি—

আনছি। খোলা দরজার দিকে নজর পড়ে বধূ ব্যস্ত হয়ে বললেন, দিচ্ছি এনে আপনার কাপড়। দুয়োরটা বন্ধ করুন, দাদুর ঠাণ্ডা লাগবে।

পরনে মোটা খদ্দরের শাড়ি, অলঙ্কারের মধ্যে একজোড়া মাত্র শাঁখা আর কপালে টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা—দ্রুত পায়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তখনই। এক হাতে জলের গেলাস, অপর হাতে বড় থালা; থালার উপর থরে থরে বাটি সাজানো। তক্তাপোষের লাগোয়া তারই চেয়ে অল্প উঁচু এক ছাপ-বাক্স। থালাটা সেখানে নামিয়ে রেখে বাটিগুলো পাশে পাশে সাজিয়ে বধূ ডাকলেন, দাদু—

বুড়ো আড়চোখে একনজর দেখে যেমন ছিল তেমনি রইল মুখ বেজার করে!

পান্নালাল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, আমার কাপড় হল না বুঝি?

বধূ লজ্জা পেয়ে বললেন, এক্ষুনি আসছে, বলে এসেছি।

বলে যেন দায় সেরে আবার মিনতি করতে লাগলেন, ঘুরে বসুন, ও দাদু।

বুড়ো ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, কি হবে ঘুরে? শুধু ডাল দিয়ে খাওয়া যায়? মাছ কই?

শুধু ডাল কেন, খোকার ডালনা রেঁধেছি। আপনি যা বড্ড ভালবাসেন। মাছ আনা যায় নি, এই অভদ্রায় কে যায় বলুন? কোথায় বা মিলবে?

বাটি থেকে তরকারির একটুখানি বধূ পাতে ঢেলে দিলেন আর অনুনয়

করছেন, মুখে দিয়েই দেখুন না—খারাপ লাগবে না। কত যত্ন করে রেঁধেছি।

লোকটা করল কি—হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বাটিসুদ্ধ সমস্ত তরকারি ছুঁড়ে দিল তাঁর মুখে। কাপড়-চোপড়ে মাথার চুলে লেপটে গেল। চোখ মেলে চাইতে পারেন না, এমনি অবস্থা।

এমন সময় শুকনো কাপড় হাতে এসে ঢুকল—ও হরি, রঞ্জনলাল যে! ঠিকই এসেছে তবে, রঞ্জনের বাড়ি এটা।

পান্নালালকে দেখে সোল্লাসে রঞ্জন চেঁচিয়ে ওঠে, তুই?

সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। হয়েছে কি লীলা?

বৃত্তান্ত শুনে স্ত্রীর উপরই সে রাগ করে উঠল।

মাছ নেই তা চুপ করে ছিলে কেন শুনি? ঝড়-বৃষ্টি—তাতে কি হয়েছে? যেমন করে পারি আমি যোগাড় করতাম। কি করি এখন? তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান হল না এতটা বয়সে?

অপরাধী লীলা শুকনো মুখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পান্নালাল লীলার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেঃ সর্বনাশ, কি রকম বড়মানুষের মেয়ে—তাঁর এই দশা করেছে রঞ্জনটা!

॥ ২ ॥

মাটির দেয়ালে ভীমবেগে ঝড় প্রতিহত হচ্ছে। ঘুম যেন রঞ্জন সাধনা করে অভ্যাস করেছে, শুতে পারলেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ। পান্নালাল পাশে পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। ভাবছে, সেই লীলা এই? আহা, আজকে বোধ হয় উপোস করতে হল ওঁর। আবার কি রান্না করতে গেছেন তার জন্য এই দুর্যোগের মধ্যে?

ছড়-ছড় করে গায়ে বৃষ্টির জল পড়তে লাগল।

রঞ্জন, ওরে রঞ্জন!

ধড়মড়িয়ে রঞ্জন উঠে বসল। চক্ষু বোঁজাই আছে।

চাল দিয়ে যে বিষম জল পড়ছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রঞ্জন বলে, হচ্ছে বৃষ্টি—তা পড়বে কি সোডা-লেমনেড?

ঘরের ভিতর সমুদ্দুর হয়ে গেল। চোখ মেল।

চোখ মেলতেই হল, যেহেতু জল গড়িয়ে তারও দিকে ধাওয়া করেছে। উপর দিকে চেয়ে বলল, ছাউনি একদম উড়িয়ে নিয়ে গেছে। গেল আয়েশের ঘুমটুকু—দুত্তোর!

বিছানা গুটিয়ে দেয়ালের ধারে তারা সরে গিয়ে বসল। রঞ্জন আপন মনে বলল, এক ছিলিম তামাক পেলে বড্ড জুত হত এই সময়। কোথায় বা টিকে-আগুন, কেই-বা ধরিয়ে দেয়? তুই এসেছিস, ঘর কম বলে লীলা দিদির সঙ্গে শুয়েছে।

পান্নালাল বলে, সত্যি কথা বল তো রঞ্জন, পুলিশের অনেক মার খেয়েছিস—তারই বুঝি শোধ তুলছিস বাড়িতে?

কেন, কি করলাম পুলিশের?

এখনো তাদের রাজত্ব—তাই পুলিশকে না পেয়ে পুলিশের এক যে অবোলা মেয়ে পেয়েছিস মুঠোর মধ্যে—তার উপরে জুলুম।

লীলা? রঞ্জন হো-হো করে হেসে উঠল। বলে, বিশ্বাস কর ভাই, কিচ্ছু হুকুম করি নি তাকে। সমস্ত সে নিজের ইচ্ছেয় করে।

তোর করে, তোর গুরুদেবটিরও করে?

গুরুদেব? রঞ্জন বুঝে উঠতে পারে না। কার কথা বলছিস?

চোখে পিচুটি-পড়া মৎস্যবিলাসী ঐ যে মহাপ্রভুটি জুটিয়েছিস। যে রকম নিষ্ঠা তোদের, ও-লোক গুরুঠাকুর না হয়ে যায় না।

হেসে বলে, দেশোদ্ধার ছেড়ে এখন প্রাণায়াম ধরেছিস ঠেকছে। অতঃপর আশ্রমে পালাবার পালা। দেখছি কি না, এ পোড়া দেশে শেষ অবধি সকল উৎসাহ নির্বিকল্প সমাধিতে উপে যায়।

রঞ্জন জবাব দেয় না, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর বলল, পরিচয় জানলে এসব বলতিস না তুই।

গলা অত্যন্ত খাটো করে বলল, কাউকে বলিস না—উনি সূর্যকান্ত।

সূর্যকান্ত মানে—

রঞ্জন গভীর কণ্ঠে বলে, হাঁ—তিনিই। বাবার সাজানো সংসারে যিনি ফাটল ধরালেন। গতিক দেখে তাড়াতাড়ি তাই আমার বিয়ে দিলেন বিশেষ করে খুঁজে পেতে ঐ পুলিশের মেয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ কাঠে ঘুন ধররার মতো হলে সাবধানী সংসারী মানুষ যেমন আলকাতরা মাখিয়ে দেয়। ঠেকাতে পারলেন না অবশ্য, শ্বশুরের সঙ্গেই একদিন মুখোমুখি ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়লাম সূর্যকান্তর পিছু-পিছু।

পান্নালাল এত সব শুনছে না। তার মনে বিদ্যুতের মতো খেলে গেল এক রাত্রির চকিত স্মৃতি। জীবনে একটিবার সূর্যকান্তকে নয়—তাঁর ছায়া সে দেখেছে। হোস্টেলে থাকত সে আর রঞ্জন। এক ঘরে পাশাপাশি। গভীর

রাত্রে রঞ্জনের ঘুসি খেয়ে সে লাফিয়ে উঠল। কানের কাছে মুখ এনে রঞ্জন বলল, সূর্যকান্ত—

উঠানে তাকিয়ে দেখল, জমাট অন্ধকারে তৈরি দীর্ঘ-মূর্তি, একখানা হাত ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন।

কি বলতে যাচ্ছিল পান্নালাল। রঞ্জন তর্জন করে উঠল, চুপ!

এক গ্লাস জলের দরকার।

চোরের মতো টিপিটিপি রান্নাঘরে গিয়ে নারিকেল-পাতা জেলে পান্নালাল অনেক কষ্টে জল গরম করে আনল। বাহান্ন মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন, ঘোড়া আর পেরে উঠছে না—কিন্তু সূর্যকান্ত পারবেন। গরম জল খেয়ে তখনই সেই মাঘমাসের শীতে অন্ধকারে এবার তিনি পায়ে হেঁটে চললেন। আর মাত্র মাইল কুড়িক বাকি আছে। চলা নয়—দৌড়চ্ছেন সূর্যকান্ত। ঘোড়া আর কত বেগে ছুটতে পারে?

পান্নালাল বলল, সূর্যকান্ত মরে গেছেন শুনেছিলাম।

রঞ্জন সায় দিল। তা মরেছেন বই কি! দেখলি তো, মরা মানুষ নন উনি?

একটু থেমে বলে, তবু আলো খুঁজে পাই মৃতদেহ যত্ন করে আগলে রেখে।

কিন্তু চোখ ধাঁধানোর আলো যে ওঁদের! ভুল-পথে নিয়ে চলছিলেন।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রঞ্জন বলে, ছি-ছি—কি বলিস তুই পান্নালাল?

তা ছাড়া কি? সূর্যকান্ত—যিনি ডাকাতি করেছেন, গুপ্ত-সমিতিতে নিয়ে এসে ছেলেদের মাথা গুলিয়ে দিতেন, মনিহারি দোকানের আড়ালে অস্ত্র যোগাতেন দলের মধ্যে—

রঞ্জন বলল, ওঁদেরই পথে আজও চলেছি সকলে।

অহিংসা-বাদী নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্ত এই রঞ্জনেরা—নির্মম নির্যাতনের মধ্যে কি প্রশান্তি। পান্নালাল কতদিন স্বচক্ষে দেখেছে! অবাক হয়ে সে রঞ্জনের কথার পুনরাবৃত্তি করে, ওঁদেরই পথে চলেছ—ওঁদেরই রক্তাক্ত পথে?

রঞ্জন বলল, স্বাধীনতা অস্ত গেছে রক্তের সমুদ্রে। উদয়-পথও তার রক্ত-সমুদ্রে ভাই।

তোরাও চাস, দেশের লক্ষ লক্ষ ঘর-গৃহস্থালি রক্ত-বন্যায় ভেসে যাবে?

শান্ত কণ্ঠে রঞ্জন বলল, আমরা চাই, লক্ষ লক্ষ মরা গৃহস্থালি রক্তস্পন্দনে নেচে উঠবে।

একটু স্তব্ধ থেকে বলে, সেই রক্ত-ধারার ভগীরথ হলেন সে যুগের সূর্যকান্ত থেকে আজকের গান্ধীজী এবং যাঁরা যাঁরা আত্মবলি দিচ্ছেন সকলে। হিংসা

থেকে অহিংসা নীতিতে পৌঁচেছি, কিন্তু পথ একটাই—সাহস ও বীরত্বের পথ, দুঃখ ও লাঞ্ছনার পথ, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার পথ।

বাতাসের দাপটে বিষম জোরে জানালা খুলে গেল।

লীলা ডাকছেন, ত্রস্তকণ্ঠে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছেন, সর্বনাশ—বাইরে এস গো। বান ডেকেছে—

বেরিয়ে দেখে, সে কি প্রলয়-দৃশ্য! বাঁধ ভেঙেছে। রাত্রির অন্ধকার বিচলিত করে প্রমত্ত বেগে স্রোতের পর স্রোত আসছে। হাহাকার শোনা যাচ্ছে নিকটে দূরে।

রঞ্জন হতভম্ব হয়ে ছিল মিনিটখানেক। লীলার আর্তনাদে তার সংবিৎ ফিরল।

দাদুর কি করবে কর শিগগির। সময় নেই।

রঞ্জন বলে, চলে আয় রে পানু। আমার কাঁধে ওকে তুলে দিবি। রাহাদের দোতলা বাড়ি—সেখানে নিয়ে তুলব।

আর জিনিসপত্তোর, গোরু-বাছুর?

লীলা আর দিদি যা পারেন করবেন। আয়— আয় তুই—

সজোরে সে হাত ধরে টানল পান্নালালের।

উঠোন দিয়ে দ্রুত ছুটছে। হাঁটুজল এরই মধ্যে। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘরখানিতে সূর্যকান্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন, এত তোলপাড়েও চেতনা নেই। ছাপা-বাক্স টেনে এনে হুড়কো ভাঙা দরজাটা কায়েমি ভাবে বন্ধ করা হয়েছে, আর এখন ছাট আসছে না। শিয়রে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা গেল লীলার অবস্থা। জলে কাদায় মাখামাখি—সে কি শঙ্কিত চেহারা! সূর্যকান্তকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন, দাদু, জাগুন। ভাল জায়গায় যেতে হবে। ও দাদু—

চোখ মেলে উঠে বসলেন সূর্যকান্ত।

রঞ্জন বলে, কাঁধে আসুন আমার। এ পাশে আয় দিকি পানু, বেশ জুত করে তুলে দিবি। সামাল, খুব সামাল—

রুক্ষদৃষ্টিতে সূর্যকান্ত এক নজর পান্নালালের দিকে চেয়ে চাদর-ঢাকা যেমন ছিলেন, স্থির হয়ে বসে রইলেন তেমনি।

লীলা ব্যাকুল হয়ে বললেন, হল কি দাদু? জল যে ঘরে এসে পড়ল।

হুঁ! গাঙের জল কখনো ঘরে ঢোকে?

বলে সূর্যকান্ত আরাম করে আবার শোবার উদ্যোগ করলেন।

তাঁর চোখে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন লীলা। পান্নালালকে বললেন,

আপনি যান তো। একা একা দিদি কি করছেন, তাঁকে সাহায্য করুন গে।

পান্নালাল কান দিল না। রঞ্জনকে বলে, একা তুই পেরে উঠবি নে রঞ্জন। বড্ড জলের টান, দু-জনে থাকি। আমি নিয়ে যাই যতদূর পারি, তারপর তুই। কি বলিস?

রঞ্জনের অতি নিকটে এসে কানে কানে অনুনয় করে, তুলে দে ভাই আমার কাঁধে। কোন্ দেশান্তরে চলে যাব, এ ভাগ্য হয়তো হবে না কোনদিন—

কঠোর কণ্ঠে লীলা বললেন, না-না, আপনি যান—বাইরে যান। যান—

পান্নালালের রাগ হয়ে গেল।

যাব না। কক্ষনো না। অজানা জায়গা, পথঘাট চিনি নে, বানের মুখে পড়ে মারা পড়ব নাকি?

দৃষ্টিতে আগুন ছড়াচ্ছে সে লীলার দিকে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি তার হাত জড়িয়ে ধরে।

এস ভাই, চল—

বাইরে এসে রঞ্জন বলে, তুই থাকলে যে মারা পড়বেন এই জায়গায়। কারো ক্ষমতা নেই, সূর্যকান্তকে নড়াতে পারে।

পান্নালাল বলে, আমার অপরাধ?

মাথা খারাপ, কিন্তু ওঁর লজ্জাবোধ টনটনে রয়েছে। পা নেই, বাইরে এ খবর জানতে দেবেন না। মরে গেলেও নয়।

পান্নালাল স্তম্ভিত হয়ে যায়। পা নেই?

শীতার্ত অন্ধকারে দৃঢ় দুটি পা ফেলে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, অনেক-কাল আগেকার সেই ছবি সে স্পষ্ট চোখে দেখছে।

রঞ্জন বলছিল, গুলি খেয়েছিলেন। পা কাটতে হল। মাথাও খারাপ হয়ে ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেছেন সেই থেকে। দেখছিস না—লীলা প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে। হয়তো বা ওরই বাপের কীর্তি। সূর্যকান্ত গেলে জামাই ঘর লাগবে, মেয়ের জীবনে সুখশান্তি আসবে, এই আশায়।

রাহাদের দোতলায় সূর্যকান্তকে মোড়ার উপর বসিয়ে দিয়েছে। লোকারণ্য। পৃথিবীতে মহাপ্রলয় এসেছে যেন। রঞ্জনের সর্বস্ব ভেসে গেছে, দিদি এখন আর আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেন না, বাইরের দিকে চেয়ে বারম্বার চোখ মুছছেন। করাল স্রোত ঝিলিক দিচ্ছে অন্ধকারে। রঞ্জন আর লীলার ওদিকে খেয়াল নেই—সূর্যকান্তর শীত না লাগে, তিনি যেন আতঙ্কিত না হন কোন রকমে—এই নিয়ে ব্যস্ত। লীলা তাঁর চুলের ভিতরে আঙুল চালাচ্ছে,

হেসে হেসে বৃদ্ধ কণ্ঠে কি বলছে যেন। আশ্রয়চ্যুত নিঃস্ব নরনারীর হাহাকারের মধ্যে মোড়ার উপর বসে নিশ্চিন্ত সূর্যকান্ত—যেন পাষাণীভূত। চাদর ঢেকে বসে আছেন, ঠিক যেন একজোড়া পা রয়েছে চাদরের নিচে। পান্নালাল উপুড় হয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করল।

॥ ৩ ॥

সকালের আলোয় যে দৃশ্য দেখল, তাতে পান্নালালের আর তিলার্ধ থাকতে ইচ্ছা করে না এ অঞ্চলে। কিন্তু পালাবে কি করে? সাঁকো-পুল সমস্ত ভেসে গেছে, এত গাছ উপড়ে পড়েছে যে অসম্ভব রাস্তায় চলাচল করা। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক-বন্ধন ছিঁড়ে গেছে এই অঞ্চলের। আশ্রয় নিতে এসেছিল রঞ্জনলালের বাড়ি, সে বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। দু'দিন পরে দিদি গিয়ে গলা-কাটা কবুতের মতো গড়াতে লাগলেন শূন্য ভিটেয় মুখ থুবড়ে পড়ে। নিঃসম্বল রঞ্জনলাল—সপরিবারে আছে রাহাদের বাড়ি। আরও কদিন পরে রাহারা যখন বিদায় দেবেন, তখন গাছতলাও নেই—পঙ্কিল মাঠের উপর ফাঁকা আকাশের তলায় সংসার পাততে হবে। এই এক বিচিত্র ব্যাপার পান্নালাল ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, আশ্রয়ের লোভে যখনই সে কোন দিকে হাত বাড়ায়, একটা বিপর্যয় ঘটে যায় সঙ্গে সঙ্গে। উমার সঙ্গে যেবার বিয়ের পাকাপাকি হচ্ছে, সেবারই তাকে নির্বাসনে নিয়ে রাখল রাজসাহীর এক গ্রামে। বিশ্রাম তার কোনদিন কি ভাগ্যে হবে না—এক যখন জেলে থাকে, সেই সময়টা ছাড়া? কিন্তু জেলও বড় একঘেয়ে হয়ে উঠছে, ভাল লাগে না। এত বড় পৃথিবীর কোনখানে কারাগারের বাইরে একটু শান্তির জায়গা হবে না তার জন্যে?

দিন পাঁচ-সাত পরে কানে আসতে লাগল নানা ভয়ানক খবর। সাইক্লোনে উজাড় হয়ে গেছে দেশ-দেশান্তর—বিশেষ করে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনার বহু অঞ্চল। ঘর-বাড়ি খাদ্য-বস্ত্র খাবার জল পর্যন্ত নেই। অথচ খবরের কাগজে না রাম না গঙ্গা—টু শব্দটি হচ্ছে না এত বড় সর্বনাশের; দু'সপ্তাহ পরে একটু-আধটু বেরুল। এ নাকি সামরিক সতর্কতা। শোনা গেল, একদল সেবাব্রতী গিয়ে নাজেহাল হয়ে ফিরে এসেছেন; থানায় আটকে রেখেছিল—'বাপ' 'বাপ' বলে ফিরতি-টিকিট কিনে বাঁচেন তাঁরা। গোরু, ছাগল আর মানুষের মৃতদেহ পচে দুর্গন্ধ হয়েছে, শিয়াল শকুনে খেয়ে শেষ করতে পারছে না। নৌকাগুলোও থাকত যদি এ সময় কত লোক ভেসে বেড়াতে পারত, কত পরিবার বাঁচত।

পান্নালাল পালাচ্ছে। স্টেশনের সেই মেয়েটির মুখ মনে পড়ে, পালান— ছুটে পালান জোর-পায়ে—

এখন সে পালাচ্ছে পুলিশের ভয়ে নয়। শ্মশানের বিভীষিকা চোখের উপর। রাতে ঘুম নেই, আকাশ-বিদারী আর্তনাদ ঘুমুতে দেয় না। সেই রাত্রে যা শুনেছিল, কানের কাছে তাই যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় রাত্রি হলেই! ভাতের থালার সামনে বসে মনে পড়ে যায়, অর্ধেক শিয়ালে-খাওয়া উলঙ্গ-দাঁত শবগুলি—মাঠে-ঘাটে খানাখন্দে যা পড়ে থাকতে দেখেছে। মুখে আর ভাত তুলতে পারে না।

পালিয়ে যাবে সে দূরে, অনেক দূরে—যেখানে এই অঘ্রাণে পচা ধানগাছের পঙ্কিল নিঃসীম শূন্য মাঠ দেখতে হবে না। সোনালি ধানে যে অঞ্চলে ক্ষেত ভরতি, ঘরে ঘরে মাচার উপরে ডোল ভরতি, পূজো-পার্বণ বিয়ে-থাওয়ার ঢোল বাজছে এপাড়া-ওপাড়ায়।

আছে কি এমন কোন জায়গা দুর্যোগের ছোঁয়া লাগে নি—আগস্টের ভারতব্যাপ্ত তাণ্ডব আর এই সাইক্লোনের আক্রোশ পৌছয় নি যেখানে? বাংলাদেশের সন্তুষ্ট শান্ত পল্লী যা ঝলমল করছে পান্নালালের ছেলেবয়সের স্মৃতিতে—বেঁচে আছে কোথাও আজো?···

ঘুরতে ঘুরতে পান্নালাল জলমার বহু-বিখ্যাত হাটখোলায় এসে পৌছল। হাটবার, হাট জমেছে। এমন আশ্চর্য কাণ্ড কেউ শুনেছ, মানুষ বিক্রি হয় এই তেরো শ উনপঞ্চাশ সনেও? মাছ-শাক-তরকারির মতোই দস্তুরমতো মানুষ বিক্রি।

.কালীবাড়ির পিছনে বিস্তীর্ণ হাট। লম্বা চাটাই পাতা, তার উপর জোয়ানগুলো সারবন্দি বসে আছে। এদেরই জন্য খদ্দের আসছে দূর-দূরান্তর থেকে। ঘাটে নৌকো রেখে ঘুরে ঘুরে তারা মানুষ পছন্দ করে বেড়ায়।

উঠে দাঁড়াও গো ভালমানুষের ছেলে। একটুখানি হাঁটো দিকি।

ভদ্রলোকের ঘরে মেয়ে দেখানো আর কি!

দর কত? ঠিকঠাক বলে দাও বাপু, ফাঁকাফুকো বোলো না।

যে লোকটা বিক্রি হতে এসেছে, ভেবেচিন্তে সে বলল, দেড় কুড়ি টাকা আর তিন শলি ধান—

দেড় কুড়ি? এই মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছি, মাথায় একটা বাড়ি মার না বাপু। আমি বলি শোন। ধানের কথা যা বললে—তিন শলিই থাকল, আর টাকা নাওগে—

হাত তুলে আঙুল বিস্তার করে বলে, এই পাঁচটা—নগদ—

দরদস্তুর করে যা হোক একটা রফা হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। কিষাণ তুলে নিয়ে একের পর এক চাষীরা নৌকো ভাসায়।

ধান পেকেছে, ধান কেটে ঝেড়ে তোলার মরশুম এখন। পনের-বিশ দিনের মধ্যে সব সারা না হলে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। চাষীরা তাই কিষাণের চেষ্টায় বেরিয়েছে দলে দলে। ডাঙা-অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক এরা—ধান কাটায় মজুরিগিরি করবে বলে বছর বছর আসে এই সব অঞ্চলে। এসে এই রকম হাটে এসে বসে। এ কাজে পাওনাগণ্ডা ভাল। সকালে দুপুরে রাত্রে ভরপেট তিনটে খাওয়া আছেই, তা ছাড়া কাজ চুকিয়ে দেশে ফিরিবার সময় ধান ও নগদ পাবে যার সঙ্গে যে রকম চুক্তি হল সেই অনুযায়ী। ধান সম্বন্ধে চাষীদের কড়াকড়ি নেই। উঠোনের ইঁদুরগুলো অবধি মুটিয়ে যাচ্ছে ধান খেয়ে। ধানও যে টাকা—কার্তিক-অঘ্রানে কোন্ চাষীর মনে থাকে, বল? আহা, জলে কাদায় দাঁড়িয়ে ধান কাটবে, জোঁক রক্ত খাবে, হাত পা হেজে যাবে,—বাড়ির জন্য চারটি খোরাকি ধান চাচ্ছে—তার উপরে কথা বলতে সরমে বাধে চাষীদের।

কুতূহলী পান্নালালও গিয়ে বসেছে চাটায়ের উপর ওদের মধ্যে। খরিদ্দারেরা সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকায়। চেহারাতেই মালুম হচ্ছে, সে ভিন্ন দলের মানুষ। কেউ দরদস্তুর করতে আসে না তার কাছে। তখন পান্নালাল নিজেই খদ্দের ডাকে, এই যে, ইদিকে, ও মোড়ল মশাই—

শেষে একজনের হাতই ধরে ফেলে। বলে, আমায় নিয়ে যাও না কেউ।

যাকে ধরেছে সসম্ভ্রমে সে জবাব দিল, পণ্ডিত গিয়েছেন আজ্ঞে আমাদের গাঁয়ে। পাঠশালা তো বসে গেছে।

এ কাজও তো মন্দ নয়—গ্রাম্য পাঠশালার চাকরি। বেমালুম মিশে থাকা যাবে চাষীদের সঙ্গে। বিশ্রাম হবে, আর দেখতে পাব বাংলাদেশের নির্ভেজাল চেহারা। বাংলার সত্যরূপের পরিচয় নেওয়া যাবে।

তখন নিজেই সে এর-তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, পণ্ডিত চাই নাকি তোমাদের? ভালো পণ্ডিত আমি—চাই?

পণ্ডিতেরা হাটে আসেন না, তাঁদের সম্ভ্রম বেশি, সোজাসুজি গ্রামে গিয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে পাঠশালা শুরু হয়ে গেছে প্রায় সর্বত্র। এই সব পাঠশালা আরও জমে উঠবে ধান কাটা শেষ হবার পর। গোলায় আউড়িতে ধান তুলে চাষীদের গায়ে তখন যোল আনা জুত, অবসরও প্রচুর। বিদ্যাতৃষ্ণা অকস্মাৎ বিষম বেড়ে যায়, ছেলেগুলোকে টানতে টানতে তারা পাঠশালায় হাজির করে।

বিদ্যে না শিখলে চক্ষু থেকেও অন্ধ। বাড়ি বসে থেকে করবি কিরে হারামজাদারা? পড়্—লেখ্।

নিষ্কর্মা বুড়োদেরও কেউ বা পাঠশালায় এসে বলে, কয়ে' র-ফলা দেখিয়ে দাও তো পণ্ডিত। আঁকড় উপরমুখো না নিচেমুখো?

কিষাণেরা ঘরে ফিরে যায় ধানকাটার মরশুম কাটিয়ে। আর পণ্ডিতেরা ফেরেন বৈশাখের শেষে ধান যখন গোলা-আউড়ির তলায় এসে ঠেকে। নূতন চাষের জন্য ছেলে-বুড়ো-জোয়ান সকলের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। বিদ্যাচর্চা মুলতুবি থাকে আবার আগামী মরশুম অবধি। ধান খেয়ে ইঁদুরগুলো ঘরে-উঠোনে ছুটোছুটি করত, তারাও গর্তে ঢুকে পড়ে—আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

চাকরি জুটল পান্নালালের, যা চেয়েছিল—পাঠশালার পণ্ডিতি! কথাবার্তা পাকা করে সে এক নৌকোয় উঠে বসল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

বাংলা উনপঞ্চাশ সন শেষ হয়ে এল। ঘরে ঘরে অসুখ-বিসুখ। শোনা যাচ্ছে, খুব বসন্ত হচ্ছে ওদিককার কখানা গ্রামে। হরিহর রায় সর্বদা টিকটিক করেন, কিন্তু আদুরে মেয়েকে সামলাতে পারেন না। এই যেমন আজ ক'দিন ধরে পড়েছে—মাদারডাঙায় গাজনের মেলা হয়, খুবই নামডাক, তিন দিন ধরে হৈ-হল্লা চলে—সুপ্রিয়া যাবে সেই মেলা দেখতে।

মেয়েছেলে যাবে ভিন্ন গ্রামে ছোটলোকের ভিড়ের মধ্যে—ছি-ছি! এ অঞ্চলে এ-সব রেওয়াজ নেই, নিন্দে রটে যাবে। হরিহর কড়া সুরে মানা করলেন।

সুপ্রিয়া মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ঠোঁট দুটো চেপে অশ্রু সামলাবার চেষ্টা করে।

মা-মরা মেয়ে—মনটা অমনি নরম হয়ে গেল হরিহরের। বলেন, শুনেছ তো—মা-শীতলার অনুগ্রহে চারিদিক উজাড় হয়ে যাচ্ছে। সেই সব জন্যে বলি। নইলে লোকে কি বলল আর না বলল, কি যায় আসে? এখানকার মানুষ নই তো আমরা।

ইদানীং ভারি একটা সুবিধা, পান্নালালের সঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। সেই দুর্বাসা মুনিটি এখন পাঠশালার নিরীহ পণ্ডিত। পাঠশালা মাদারডাঙায়।

গোড়ায় সেখানকার বারোয়ারী বটতলায় বসত; দৈবাৎ যদি বৃষ্টি হত, সেদিন পাঠশালার ছুটি। এদিককার মরশুমি পাঠশালাগুলোর রীতিই এই। কিন্তু তালুকের মালিক স্বয়ং গ্রামে এসে রয়েছেন, ইস্কুলের কোন ভাল ব্যবস্থা করা যায় কিনা—এই দরবারে একদিন পান্নালাল ও কয়েকটি ছোকরা এসেছিল বাঁকাবড়শিতে। হরিহর রায়কে চিনতে পারল তখন, সুপ্রিয়াকেও দেখল।

দরবার করতে এসে আশাতীত ফল ফলেছে। হরিহর খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন এই সম্পর্কে। বড় রাস্তার ধারে ইতিমধ্যেই ইটের দেয়াল-দেওয়া এক খোড়ো দোতলা তৈরি করে দিয়েছেন। এক পাঁজা ইট পুড়িয়ে ওরই পাশে গোটা তিনেক পাকা কুঠুরি করে দেবেন, খেলার মাঠ হবে, এই পাঠশালাই মাইনর ইস্কুলে উন্নীত হবে, ইস্কুলটা হবে তাঁর স্বর্গীয় মায়ের নামে—কিছুকাল থেকে গ্রামোন্নতির যে সব পন্থা হরিহর ভাবছেন, সমস্ত ব্যক্ত করেছেন পান্নালালের কাছে। চাষার ঘরের ধান ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাদারডাঙার পাঠশালা উঠে যাবে না এবার—বারো মাস চলবে। এতকাল ছেলেদের মাইনে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল টাকা-পয়সায় না—ধান-চাল দিয়ে; সে নিয়ম হরিহর রায় রদ করে দিয়েছেন। কোন ছাত্রের মাইনে দিতে হবে না, তিনিই খরচ চালাবেন। লোকে শুনে ধন্য-ধন্য করছে। বড়লোকেরা গ্রামে এলে কত সুবিধা পাওয়া যায় এই রকম!

স্বদেশি বলে হরিহরের আর শঙ্কা নেই পান্নালালের সম্বন্ধে। জেলের ঘানি ঘুরিয়ে মনের গরম জুড়িয়ে গেছে, দজ্জাল কালকেউটে নির্বিষ ঢোড়া হয়ে ফিরেছে। নইলে পণ্ডিতি করতে আসবে কেন এত রকমের কাজ থাকতে? এই পণ্ডিত-মাস্টারের কাজ যাদের, আগে ভাগে তাদের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে তো ভাল—, নইলে টের পেলে কেউ মেয়ে দিতে চায় না—তা মেয়ে যত সুলভই হোক না বাংলাদেশে।

পান্নালালের প্রায়ই নিমন্ত্রণ হয় হরিহরের বাড়িতে। পাঠশালা ঘরে সে শোয়, ঘরের দাওয়ায় হাত পুড়িয়ে দুবেলা রান্না করে। নিমন্ত্রণ পেলে তার আনন্দ হয়। জনতার থেকে বহু দূরে বিশ্রামের জন্য পালিয়ে আছে, আরাম চাই—খুঁটিনাটি বাছবিচার করবে না দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে ছুটির এই ক'টা দিন। হরিহর তার সঙ্গে ডাক্তারখানা, টিউব-ওয়েল, পাকারাস্তা আর ইস্কুল সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। খুশী হয়ে মনে মনে তিনি আঁচ করে রেখেছেন, বিদ্যা-দানে একমুখী নিষ্ঠার জন্য পান্নালালের পাঁচটাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবেন আগামী মাস থেকে।

খুশী হবার কারণ আছে আরও। অনুপমের চিঠিতে বড় ভাল খবর

রয়েছে। বাইশে ডিসেম্বর সেই যে বোমা পড়েছিল কলকাতায়, তারপর থেকে সমস্ত ঠাণ্ডা। এত আন্দোলন-আলোচনা হচ্ছিল বোমা নিয়ে, কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা বড় রকমের পটকাফাটার চেয়ে হয়তো কিছু বেশি। পর্বতের মূষিক-প্রসব। গ্যাসপোস্ট দু-একটা ছেঁদা হয়েছে, প্রচুর কাচ ভেঙেছে, মহিষ ও মানুষ মরেছে গুটিকয়েক, পার্কে আর রাস্তায় গর্তও হয়েছে দু-দশটা। ব্যস—এদের তাড়া খেয়ে সেই যে বোমাওয়ালারা পালিয়েছে, আর কোনদিন হয় নি এমুখো। শহরে মানুষ-জন ফিরে আসছে, লোক-চলাচল বেড়েছে রাস্তায়। হরিহরের পাঁচটা বাড়ির মধ্যে দুটোর ভাড়াটে জুটে গেছে ইতিমধ্যে। কম ভাড়া অবশ্য—তা হলেও জুটছে তো!

অনুপমকে হরিহর লিখেছেন পত্রপাঠ মাত্র চলে আসবার জন্য। তার মুখে সবিস্তারে শুনে এবং আলোচনা করে সম্ভব হয়তো এবার এক সঙ্গেই সকলে কলকাতা ফিরবেন। আতঙ্ক গা-সহা হয়ে গেছে। তার উপর এইসব খবরে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছেন হরিহর। আর কি—ইংরেজ ধাক্কা সামলে নিয়েছে। অর্ধেক-পৃথিবী জুড়ে যাদের রাজ্য, জাপানীরা এইবার টের পাবে তাদের প্রতাপ। সম্ভব হয় যদি, সুপ্রিয়ায় বিয়েটা হয়ে যাক সামনের বৈশাখে। বুড়ো হয়েছেন, কবে মারা যাবেন—মেয়েটার একটা গতি না করা পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। অনুপমকে চেপে ধরতে হবে, কোন অজুহাত শোনা হবে না এবার। আর ওদিকে বর্মার কারবার তো একেবারে গেছে, কলকাতারটা ঝিমিয়ে আছে, ফিরে গিয়ে জাঁকিয়ে তুলতে হবে কলকাতার ব্যবসা। যত দেরি হবে, ততই লোকসান।

তা বলে গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কে তিনি ছাড়বেন না কোনদিনই। আজকেও পান্নালালের নিমন্ত্রণ। চড়কের জন্য পাঠশালার ছুটি, তাই সে বেলাবেলি এসে গেছে। নানারকম যুক্তি-পরামর্শ হচ্ছে। তিনি চলে যাবেন, সুপ্রিয়াও যাবে। ভরসা আছে, তাঁদের অনুপস্থিতিতে পান্নালাল এ সমস্তর ভার নিতে পারবে। ইংরেজ তাড়ানোর বেয়াড়া কথাবার্তা এবং জেল-পুলিশ হাঙ্গামাগুলো যদি বাদ দিয়ে চলে, তা হলে স্বদেশী লোকগুলোকে দিয়ে সত্যি কাজ পাওয়া যায়।

চঞ্চল পায়ে সুপ্রিয়া এসে ডাকল, বাবা—ও বাবা—

হরিহর বলেন, আর দেখ বাপু, এই এক মুশকিল। তোমাদের ঐ গাঁয়ে গাজনের মেলা হচ্ছে, পাগলী মা ক্ষেপে উঠেছে···মেলা দেখতে যাবে।

সুপ্রিয়া আবদারের সুরে বলে, আজকেই—

বিব্রত ভাবে হরিহর বললেন, সে কি! বেলা পড়ে এসেছে—

হাসির হিল্লোলে সুপ্রিয়া বাপের আপত্তি উড়িয়ে দিল।

তুমি বাবা কি রকম যেন! দিল্লি-লাহোরে যাচ্ছি নাকি। যেতে-আসতে কতক্ষণ লাগবে!

কাছে এসে আহ্লাদি মেয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে। বলে, তিন দিনের মধ্যে আজকেই জমজমাট সব চেয়ে। যাই বাবা কি বল?

হরিহর তবু বলেন, গাড়ি-পাল্কি কিছু হয় নি। যাবি কিসে?

সুপ্রিয়া হেসে বলে, রক্ষে কর! যা এখানকার পাল্কি আর গোরুর গাড়ি—গোলাকার হয়ে বসতে হয়।

দাসুকে জিজ্ঞাসা করে, ও দাসু, কদ্দুর রে? মাঝ-বিলে ঐ যে সব খেজুরগাছ দেখা যাচ্ছে—ঐ তো?

দাসুকে হামেশাই মাদারডাঙায় যেতে হয়। কতবার পান্নালালকে ডাকতে গিয়েছে। সে বলল, গাছ ছাড়ি আরো যেতে হবে দিদিমণি!

হোকগে। হেঁটে যাব—হাঁটতে আমি খুব পারি। উড়ে চলে যাব দেখিস।

শেষ পর্যন্ত হরিহরকে মত দিতে হয়। পান্নালালকে বলেন, তুমিও যাও বাবা, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এস। তোমার সঙ্গে গেলে নির্ভাবনায় থাকব। আসানসোলে যা করেছিলে—

সুপ্রিয়া বলে, ওঁকে পাচ্ছি বলেই তো যেতে চাচ্ছি আজকে অত করে। ওখানে থাকেন, ভাল করে সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন।

যাবার মুখে হরিহর আবার সতর্ক করে দেন, বেলাবেলি ফিরবি কিন্তু খুকি।

পান্নালালকে বললেন, মেঘ-মেঘ করছে আকাশে। যে জন্য ডেকেছিলাম, কিচ্ছু তো হল না। বিস্তর কথাবার্তা আছে—দেরি কোরো না তোমরা।

যাব আর আসব বাবা—

বাপকে নিশ্চিন্ত করে সুপ্রিয়া রওনা হল পান্নালালের সঙ্গে। দাসুও টেরি কাটছিল। কিন্তু না—দরকার কি? গেলে অসুবিধা হবে, কর্তার চা করে দেবে কে?

পান্নালাল দেখাচ্ছে কেলেপাড়া এটা—আর ওদিকে উ-ই আমার অট্টালিকা। ছুটির দিন বলে দেখাতে পারলাম না, একেশ্বর সম্রাট আমি এই সাম্রাজ্যে।

চালে-চালে বসত জেলেদের। তারই প্রান্তে নূতন চুনকাম-করা পাঠশালা-ঘর বিকালের পড়ন্ত আলোয় ঝকমক করছে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে সুপ্রিয়া বলে, বাঃ বাঃ—চমৎকার তো! ছবি যেন একখানা।

পান্নালাল বলে, তা সত্যি। বিশ্রামের জায়গা এতকাল ছিল এক জেলখানা। নতুন বলে আমারও চমৎকার লাগছে; মুখ বদল করে দেখা যাচ্ছে, এ-বিশ্রামই বা কি রকম!

কালীতলায় মেলা বসেছে। বট অশ্বত্থ নিম ও কয়েকটা আমগাছ জায়গাটাকে ছায়াচ্ছন্ন করেছে। সুপ্রিয়া মশগুল হয়ে গেল। মাটির পুতুল, রকমারি বাঁশী, লোহার হাতা-খুন্তি-বঁটি, চিত্র-বিচিত্র হাঁড়ি-সরা, কদমা-ক্ষীরখণ্ড, চিনির আতা—কিনছে তো কিনছেই। কি কর্মে লাগাবে এই সমস্ত, আর কে-ই বা নিয়ে যাবে—

পান্নালাল বলে, আসুন, ফেরা যাক—

একদিকে সামিয়ানা খাটানো। সারি সারি কলার তেউড় বসাচ্ছে তার নিচে। প্রতি তেউড়ের মাথায় এক একটা সরা।

মেলার একজনকে ডেকে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করে, এখানে কি?

কবি-গানের পাল্লা হবে দুই দলে। মুখে ছড়া কেটে এ ওকে ফাঁদে ফেলবে, ফাঁদ কেটে বেরিয়েও আসবে ক্ষমতার জোরে।

ভাল মজা তো! কখন হবে গান?

রাত্রে—

মুখ শুকনো করে পান্নালালকে সুপ্রিয়া বলে, রাত্রি অবধি তো থাকা চলে না। কি বলেন মাস্টার মশায়? বাবা খুব ভাববেন তা হলে—

পান্নালাল বলে, চলুন, চলুন,—যাই এবার! সন্ধ্যে হয়ে এল। মেঘ হয়েছে, বৃষ্টি হবে হয়তো।

চড়কগাছ ঘুরছে বন বন করে। আর ওদিকে নাগরদোলা। পান্নালালের কথার জবাব না দিয়ে বাইশ বছরের সুপ্রিয়া ছুটল ছোট খুকিটির মতো সেদিকে। ভিড় জমেছে, জুতো-পরা সুশ্রী মেয়েটার কাণ্ড দেখে মানুষ-জন তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে পান্নালাল বলে, কথা মোটে কানে নিচ্ছেন না। বৃষ্টি এল বলে, দেখছেন?

ভিজব মাস্টারমশায়, ভিজব। খু-উ-ব মজা লাগে ভিজতে।

অবহেলা ভরে ঘাড় ফিরিয়ে যে-লোকটা নাগরদোলা চালাচ্ছে তাকে বলে, থামাও—আমি চড়ব।

এক লাফে একটা খোপে উঠে বসল। পান্নালালকেও ডাকে, আসুন—আসুন না—

পান্নালাল বলে, পাগল হই নি তো। গ্রামের পণ্ডিত—কত সম্ভ্রম আমার এখানে!

বটে! তড়াক করে নেমে সুপ্রিয়া তার হাত ধরে ফেলল।

চড়তে হবে—হবেই—

টপ-টপ করে বড় বড় ফোঁটা পড়ল। সেই সঙ্গে বাতাস। বড় বাদাম-গাছটার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। বৃষ্টি—বৃষ্টি—মুষলধারে বৃষ্টি। কয়েক-জনে সামিয়ানার দুই কোণের দড়ি তাড়াতাড়ি খুলে দিল; এতে কম ভিজবে জিনিসটা। মেলার জন্য অস্থায়ী চালা বাঁধা হয়েছে। যেখানে দশ জনের জায়গা, পঞ্চাশ জন মাথা ঢুকিয়েছে সেখানে। রশিখানেক দূরে চাষীপাড়া, কলাবনের আড়ালে খড়ের চাল দেখা যাচ্ছে। এরা ছুটল সেদিকে।

॥ ২ ॥

গিয়ে উঠল এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি। টিনের ঘর, দুটো গোলা পাশাপাশি। বাইরের দিককার দাওয়ায় তারা উঠেছে। মাটির দেয়াল দিয়ে অন্তঃপুর আলাদা করা। খানিকটা জায়গায় দেয়াল নেই, বর্ষা এসে পড়ায় দেবার অবকাশ হয় নি হয়তো। সেখানটায় সুপারি-পাতার বেড়া। পান্নালাল বলে, দ্বারিক সর্দারের নিশ্চয় নাম শুনেছেন। তার বাড়ি এটা। বিষম মানী চাষীদের ভিতর। মেয়েদের সূর্যের আগোচরে না হোক, মানুষের চোখের আড়ালে রাখবেই।

কাপড় চোপড় ভিজে জবজবে, মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। দ্বারিক গামছা হাতে ছুটতে ছুটতে এল। জলচৌকিটা ঝেড়ে দিয়ে বলে, এস মা, এস পণ্ডিতমশায়, জলটা মুছে ফেল আগে। কি করা যায়। আমাদের ঘরের কাপড় তোমাদের দিই কেমন করে?

সুপ্রিয়া বলে, একটুখানি ভিজেছে। ও গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যাবে।

দ্বারিকের তবু সোয়াস্তি নেই। শীত করছে, আগুন পোহাবে মা? আনব আগুনের মালসা?

সুপ্রিয়া হেসে তাড়া দেয়, আপনি ঘরে যান দিকি। কিচ্ছু লাগবে না আমাদের।

মাঝে মাঝে বৃষ্টিটা একটু কমে, এরা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, তখনই আবার চেপে আসে। মেঘান্ধকার, বিদ্যুৎ-চমক, টিনের চালে জলপড়ার আওয়াজ—চারিদিক তোলপাড় করে তুলেছে।

আলাপটা ভাল জমল কার্তিককে দেখে। উল্লসিত হয়ে সুপ্রিয়া বলে,

তোমাদের বাড়ি—এ তো নিজেদেরই জায়গা। কতদিন আসব-আসব করি। বাবার জ্বালায় নিজের গাঁয়ে বেরোবার জো নেই, এ তো ভিন্ন গ্রাম। ভেবেছিলাম মেলার ভিতর দেখা হয়ে যাবে, তা বৃষ্টিই এনে তুলেছে তোমাদের এখানে।

মুচকি হেসে কার্তিককে জিজ্ঞাসা করে, তারপর?

লজ্জিত কার্তিক মুখ নিচু করল।

সুপ্রিয়া বলে, খবর রাখি গো—বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেছে। আমরা নেমন্তন্ন পেলাম না। তোমাদের সঙ্গে কথা বলব না তো—না তোমার সঙ্গে, না সেই দুষ্টুটার সঙ্গে।…বউ এখানেই তো, না বাপের বাড়ি?

ঘাড় নেড়ে কার্তিক তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। একটু পরে জল ছপ-ছপ করতে করতে উঠান পার হয়ে এসে খবর দেয়, রান্নার যোগাড় হয়ে গেছে। আসুন।

রান্না? ভালো রে ভালো—রান্না এখন কে করতে যাচ্ছে?

উপোস করে থাকবেন, সে হবে না।

পান্নালাল বলল, বৃষ্টি থামলেই আমরা চলে যাচ্ছি। আমার আবার নেমন্তন্ন ওঁদের বাড়ি। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করগে যাও—

হঠাৎ দ্বারিক বেরিয়ে আসে। যেন আগের মানুষ সে নয়। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, নাম তোমরা দাওয়া থেকে। নেমে যাও পণ্ডিত—

পান্নালাল অবাক হয়ে বলে, এই বৃষ্টির মধ্যে? সে কি?

ছেলে-পিলে নিয়ে ঘর করি। ভিটেয় উপোস করে পড়ে থেকে অকল্যাণ ঘটাবে?

সুপ্রিয়া করুণ চোখে তাকাল কার্তিকের দিকে; চুপি চুপি কার্তিক বলে, বাবার রাগ খারাপ—রাগের মাথার সব করতে পারে।

যে রকম তেড়ে এসেছে, এরপর তর্ক করলে ঘাড় ধরে উঠানে নামিয়ে দেবে—নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। সুপ্রিয়া ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল দ্বারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, যাচ্ছি কর্তা, যাচ্ছি। এক্ষুনি গিয়ে রান্না চাপাব।

পান্নালাল নির্বিকার, টিপিটিপি হাসছে মনে হয়।

দ্বারিক চলে যেতে সুপ্রিয়া বলে, ভারি বেয়াড়া মানুষ তো! টুঁটি চেপে ধরে আতিথ্য করবে, এ কি বিপদ! আর একদিন হয়েছিল কেদার মোড়লের ওখানে, সে-ও নাছোড়বান্দা। সবাই যেন এরা এক ছাঁচের।

পান্নালাল বলে, সবাই—গোটা দেশটাই এই রকম। এত দুঃখেও জ্ঞান হল না। সাত সমুদ্র পার থেকে পেটের দায়ে বিদেশীরা দোকান করতে এল,

সেদিনও সমাদরে তাদের ডেকে বসিয়েছিলাম। তারই ভোগ ভুগছি। সেদিন আতিথ্য-বৃত্তি সঙ্কুচিত করলে ইতিহাস অন্য রকম হয়ে যেত।

মাদুরের উপর পান্নালাল লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরে দেখা গেল, পা নাচাচ্ছে।

সুপ্রিয়া বলে, স্ফূর্তি যে গায়ে ধরে না!

রাঁধা-ভাত যেদিন জোটে, বড্ড আমোদ হয়। হাত পুড়িয়ে রাঁধতে রাঁধতে হাতে কালসিটে পড়ে গেছে। ভাত বেড়ে ব্যঞ্জন সাজিয়ে আপনি আমায় ডাক দেবেন—

সুপ্রিয়া বিপন্ন ভাবে বলে, আচ্ছা, বলুন তো রান্না কি জানি, না করেছি কোনদিন ? রান্নাঘরে উঁকি মেরেও কখনও দেখতে দেন না বাবা।

আবদারের সুরে সে বলল, আমি পারব না। আপনার অভ্যাস আছে, আপনি যা হোক করুনগে মাস্টারমশায়।

পান্নালাল শিউরে ওঠে। সর্বনাশ, মেয়েমানুষ উপস্থিত থাকতে পুরুষে রাঁধবে, এক্ষুণি হৈ-হৈ পড়ে যাবে। পাড়ার যত বউ-ঝি দেখতে আসবে আজব কাণ্ড।

সুপ্রিয়া বলে, বলে দিন আমার অসুখ আছে। আগুনের ধারে যেতে ডাক্তারের মানা।

পান্নালাল জিভ কেটে বলে, সবাই জেনে ফেলেছে জাতে আমি কায়েত। আর রায় মশায়ের জাতও অজানা নেই কারো। আপনার রান্না স্বচ্ছন্দে খেতে পারি, খাবও তাই। কিন্তু আপনাকে রেঁধে খাইয়ে পাপের ভাগী কি করে হব বলুন ?

পা নাচাতে নাচাতে এবার পান্নালাল গুনগুনিয়ে গান ধরল।

বিরক্ত কণ্ঠে সুপ্রিয়া বলে, গান থামান। ভাল লাগছে না।

পান্নালাল বলে, জাতে ছোট হওয়ারও কত সুবিধে দেখুন!

রাগে গরগর করতে করতে সুপ্রিয়া বলে, বাজে কথা রাখুন। জাতের ছোট-বড় নয়, কায়দায় পেয়ে গেছেন তাই। নইলে কলিমদ্দি মিঞা হোক, আর গদাধর মহান্তই হোক—কার কান্না কবে বদহজম হয়ে থাকে আমাদের ?

মুখে আঙুল দিয়ে পান্নালাল বলে, চুপ—চুপ! এসব শুনতে পেলে আর কিন্তু ঢুকতে পাবেন না এ-পাড়ায়। কনফারেন্স করে জমিদারের বিরুদ্ধে কিংবা ইংরেজের বিরুদ্ধে যা বলেছেন, সে সব বরদাস্ত করেছে। কিন্তু ওর মধ্যে সমাজ-সংস্কার আনতে গেলে সর্বনাশ। একেবারে পাশ-ঠেলা করে দেবে।

সংস্কার তো কোটা ভাগ করে হয় না। রাজনীতি আর জীবন-নীতির সংস্কার—সবই কি মানবতার মুক্তির জন্য নয়?

পান্নালাল বলে, সবাই সেটা ভেবে দেখে না, তাই দলে এত মানুষ পাওয়া যাচ্ছে। মনে মনে আন্দাজ, নূতন বিধান আমার অসুবিধাগুলো দূর করে দেবে, আর আমি যে শোষণ করছি সেটা অব্যাহত রইবে চিরকাল। ভেবে দেখুন, কংগ্রেসের পত্তন হল এক ঝুনো সিভিলিয়ান আর এক লাট সাহেবের উদ্যোগে। তাঁরা ভাবলেন, ইংরেজ-রাজত্ব কায়েমি তো থাকবেই—তার ভিতটা পোক্ত হোক রাজা-প্রজার সৌহার্দ্যে। কোথায় এসে পৌঁচেছে সে কংগ্রেস? কোন্ বাণী তার কণ্ঠে? আজ স্বায়ত্ত-শাসনেও কুলোবে না, পূর্ণ-স্বাধীনতা চাই।··· ব্যস্ত হবেন না, খুঁটিনাটি ভাবতে হবে না, মানুষের সত্য-চেতনা উদ্বুদ্ধ হোক—বিপ্লবের স্রোতে খড়-কুটো সমস্ত ভেসে যাবে।

দ্বারিক আবার এল, হাতে লণ্ঠন আর প্রকাণ্ড আয়তনের এক কলসি। বলে, চল মা, ঘাট দেখিয়ে দিচ্ছি। তালের খেটে—বড্ড পিছুল, কলসি নিয়ে সাবধান হয়ে উঠতে হবে।

অসহায় ভাবে সুপ্রিয়া বলে, ও বাবা! এত বড় কলসি টানতে পারব না তো। জলটা কেউ আপনারা তুলে দিন।

দ্বারিক বলে, পোড়া কপাল! ব্রাহ্মণ সেবার জল আনব, সে কপাল করে এসেছি কি মা? জল-চল জাত হলে তোমায় কষ্ট দিতাম না।

পান্নালাল উঠে বলে, আচ্ছা, আমি—আমি না হয় এনে দিচ্ছি। অসুখ থেকে উঠেছেন কিনা, দেহটা বড্ড দুর্বল—

এক ঝাঁকিতে সুপ্রিয়া কাঁখে তুলল কলসি। ঘুরে দাঁড়িয়ে পান্নালালকে আড়াল করে বলে, আলো তুলে ধরুন কর্তা, দেখা যাচ্ছে না।

উঠান জলে ভর্তি। জুতো খুলে শাড়ির আঁচল দো-ফেরতা কোমরে জড়িয়ে সুপ্রিয়া শীতে হি-হি করতে করতে ঘাট থেকে জল নিয়ে এল।

ভাত চেপেছে, টগবগ করে ফুটছে, সেই অন্ধকারে পান্নালাল এসে উঠল রান্নার জায়গায়। করুণা হয়েছে সুপ্রিয়ার অবস্থা দেখে; তাকে বাঁচাতে এসেছে। বলে, অত বড় অসুখ থেকে উঠেছেন—আগুন-তাতে বেশি থাকবেন না। ভাতে-ভাতই বেশ। মাছ-টাছের দরকার নেই সর্দার মশায়, ও সব আমরা ভালবাসি নে। আর অসুখ অবস্থায় ওঁর উচিতও নয় অত সাত-সতের রান্না করা।

ঘাড় দুলিয়ে সুপ্রিয়া বলে, থাক—কাজে ভণ্ডুল দেবেন না বলছি।

আগে ছিল অভিমান, এখন এই একটা দিনের গৃহিণীপনার সত্যি সত্যি তার খুব আমোদ লাগছে। খুন্তি উঁচিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, যান বলছি, চলে যান যেখানে ছিলেন—

ঘরের ভিতর কার্তিকের বোন পুঁটি আর যামিনী-বউয়ের মধ্যে খুব হাসাহাসি হচ্ছে তখন। যামিনী পুঁটিকে টানতে টানতে বেড়ার ধারে নিয়ে এসেছে। বলে, ও দিদি, রান্নার শ্রী দেখে যাও একবার। ওঁর আবার নাকি বড্ড অসুখ। তিনটে কুমির খেয়ে উঠতে পারে না—অসুখে তিনি মরে যাচ্ছেন। হি—হি—হি—

মর পোড়ারমুখী, হেসেই খুন হলি। চঞ্চল বউটার গাল টিপে দিয়ে পুঁটি নিজের কাজে গেল।

সেই বেড়ার ধার থেকে যামিনী নড়ল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সুপ্রিয়ার কাণ্ডকারখানা। আবার ননদের কাছে ছুটে গিয়ে হেসে লুটোপুটি। বলে, দেখে যাও দিদি—দেখে যাও দিদি। জুতো পায়ে গট-মট করে বেড়ায়—ইদিকে বেড়ি ধরতেও জানে না।

মুখে আঁচল দিয়ে যামিনী হাসে। হাসির রেস ঠেকাতে পারে না।

চুপ কর—শুনলে কি মনে করবে, চুপ-চুপ! বলতে বলতে পুঁটিও হেসে ফেলে। সে-ও কিছু কিছু দেখেছে। তারপর বউকে যুক্তি দেয়, পুড়িয়ে জালিয়ে ফেলছে—আহা, মুখে দেবে ওরা কি করে! ওখানে গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিগে যা—

যামিনী জিজ্ঞাসা করে, যাব দিদি? দোষ হবে না?

তাতে আর দোষ কি? পুরুষমানুষ কেউ নেই ওদিকে—

যাই তা হলে? যামিনী ছুটল।

পুঁটি সামাল করে দেয়। চালের নিচে যাস নে কিন্তু—খবরদার! ভাত মারা যাবে।

গোলগাল বউটা ঝুম-ঝুম পালং-পাতা মল বাজিয়ে রান্নার জায়গার খানিকটা দূরে এসে দাঁড়ায়।

সুপ্রিয়া চোখ তুলে চেয়ে ডাক দিল, এস—এস। কেমন সুন্দর ঘর-বর হয়েছে! দিদি এসে অতিথি হয়েছে, তা দেখাও দিলে না একটিবার!

মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, চিনতে পারছ না আমায়?

প্রথমটা যামিনী চিনতে পারে নি। একনজর তো দেখা! সে রাত্রে ঘরের মধ্যে সে যায় নি,—কার্তিক ছিল, তার উপর এর বাবা সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি—যাবে কি করে? ভাল ভাল গল্প হচ্ছে শুনে একবার কেবল

দাঁড়িয়েছিল দোর-গোড়ায়। সুপ্রিয়া তাকাতেই দৌড়ে পালাল। সেই চঞ্চল মেয়েটা কেমন ধীর হয়ে গেছে এখন, বউ হয়ে ভারিক্কি হয়েছে। সুপ্রিয়ার এত কথা কানেই গেল না যেন! চুপচাপ দেখে, আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

সহসা বলে উঠল, কি করছেন? মাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেল যে, গন্ধ বেরুচ্চে। জল ঢালুন শিগগির—

সন্ত্রস্ত হয়ে সুপ্রিয়া হুড়হুড় করে জল ঢেলে দিল।

ঘটিসুদ্ধ ঢাললেন? নাঃ—রান্নার কিছু জানেন না। মুখে বলে বা কি করব, হাত ধরে দেখিয়ে দিলেও আপনার হবে না।

সুপ্রিয়া হেসে বল্লে, তা দেখিয়ে দিয়ে যাও না ভাই হাতটা ধরে। দাও না—

যাঃ—বলে যামিনী আর একটু সরে দাঁড়ায়।

বেশ লাগে বউটিকে। কথায় কথায় হাসে, আর ভঙ্গিটি এমন—যেন কত বড় গিন্নি! সুপ্রিয়া দেবী—বড় বড় ছুটো সমিতির সেক্রেটারি, একটার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট—আর এখানে কত বড় কনফারেন্স করল, সেজন্য কলকাতার কাগজে কত প্যারা বেরিয়েছে তার নামে—চাষাবউ তাকে একজন অপদার্থ ভেবে বসেছে।

(৩)

খেতে বসেছে পান্নালাল। মুচকি হেসে সুপ্রিয়া চুপিচুপি বলে, মেয়ে-বউরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ঠিক হচ্ছে তো—দেখুন, গেরস্ত-বাড়ির মেয়েরা যেমন সামনে বসিয়ে খাওয়ায়?

পান্নালাল ভদ্রতা করে বলে, আপনিও বসে যান না। সেই কখন খেয়েছেন দুপুরবেলা। সন্ধ্যেয় চা-টা হয় নি।

সুপ্রিয়া বেড়ার ও-ধারে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ও মা, কি ঘেন্না! মেয়েমানুষ পুরুষের সামনে বসে খাবে, কি যে বলেন!

পান্নালালের সামনে মাটির উপরেই সে চেপে বসল। বলে, ডালটুকু ঢালুন বলছি। ফেলতে পারবেন না, মাথা খান।

বলে ফিক করে সে হেসে ফেলল।

মুখ তুলে পান্নালাল বলে, নুনে পুড়ে যবক্ষার হয়ে গেছে, গলায় উঠছে না। জল ঢেলে নিন; গ্লাসে তো জল রয়েছে। নোনতা কেটে যাবে।

তারপর মাছের ঝোলের বাটি থেকে এক হাতা কেটে দেয়। জিজ্ঞাসা করে, এটা?

পানসা। মোটেই নুন দেন নি।

নুন মেখে নিন। পাতে দিয়ে দিইছি।

একটা হাতপাখা ছিল ওদিকে, কুড়িয়ে এনে সুপ্রিয়া জোরে জোরে বাতাস করে।

কি করছেন—আহা করছেন কি? ঠাণ্ডা বাদলার হাওয়া, তার উপর··· জমে গেলাম যে!

সুপ্রিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ঠিক হচ্ছে না? গেরস্ত-বাড়ি যে রকম করে থাকে?

সহসা গম্ভীর হয়ে পান্নালাল প্রশ্ন করে, বলুন তো সুপ্রিয়া দেবী, এই যে পরিপাটি করে ভাত বেড়ে এত যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন, এ কি লোক-দেখানো অভিনয় শুধু?

জবাব দিতে সুপ্রিয়ার যেন গলা আটকে আসে। বলে, কি মনে হয় আপনার?

কি জানি, আদর-যত্ন তেমন ভাবে পেলাম কবে যে বিচার করে বলব? উমা আঁকুপাকু করে, কিন্তু তারও পরের জায়গায় চিরজীবন কেটে গেল— সাধ মেটাতে পারল কই। জেলের একটা মুসলমান কয়েদি রান্না করত খুব ভাল—আপনার চেয়েও অনেক ভাল, তুলনাই হয় না, কিন্তু সে সামনে বসে খাওয়াত না—

টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ল। অনেকগুলো মানুষ উঠানে। দুনো ভাড়া কবুল করে হরিহর একখানা পালকিও পাঠিয়েছেন, রাত্রিবেলা মাদারডাঙা থেকে মেয়ে পায়ে হেঁটে ফিরবে—এ তাঁর ইচ্ছা নয়। আর এ কি ব্যাপার—এদের মধ্যে অনুপম—মাথায় ছাতা দিয়ে সে দ্বারিক সর্দারের দাওয়ায় উঠল। জুতো এবং প্যাণ্টলুনের হাঁটু অবধি জলে কাদায় জবজবে।

বলে, গোরুর-গাড়ির পইয়ে জল বেধেছে। ছিটকে লেগে এই দশা। তোমরা বেরোবার পরই এসে পৌঁছলাম। তোমার বাবার গ্রামোন্নতি-স্কীম শোনা গেল অনেকক্ষণ ধরে। ঘুরে ঘুরে তিনি দেখালেন ডাক্তারখানা হবে যে জায়গায়। এই আসছে, এই আসছে—সন্ধ্যা থেকে আমরা পথ তাকাতাকি করছি। শেষকালে বুঝতে পারলাম, আটকা পড়ে গেছ! বিপদেই পড়েছ হয় তো। শিভ্যালরি চেগে উঠল। উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভোজনরত পান্নালালের দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে বলল, বাঃ রে, তুমি রান্না করতে জান দেখছি, হাওয়া করতে করতে খাওয়াতেও জান।

পান্নালাল বলে, আর রেঁধেছেনও একেবারে অমৃত। ওঁরটা আছে এখনো চেখে দেখবেন নাকি?

রূঢ় কণ্ঠে অনুপম বলে, আপনি কবে এসে জুটলেন? আমি বাড়ি ছিলাম না, দুটো দিন সবুর করেও ডুব দিতে পারতেন। তা হলে ভদ্রতা হত।

পান্নালাল বলে, রাগ করে করবেন কি? অত কাণ্ডজ্ঞান থাকলে আপনাদের মতো দশের একজনই হয়ে উঠতাম এদ্দিনে। দুর্দিনের আশ্রয়দাতা আপনি—এঁটো হাত ধুয়ে এসে নমস্কার করছি, দাঁড়ান।

॥ ৪ ॥

মেঘ কেটে ঘোলাটে জ্যোৎস্না উঠছে। এবার এরা বাড়ি ফিরবে। সহসা ঢপাঢপ ঢোলে ঘা পড়ল। ঝমর-ঝমর কত্তালের আওয়াজ। কো-কো করে বেহালা বাজছে, শোনা গেল।

দুর্যোগের মধ্যে সুপ্রিয়া ভুলে গিয়েছিল, কালীতলার কবি-গান হওয়ার কথা। দলওয়ালাদেরও সন্দেহ ছিল, ঐ অবস্থায় গান হবে কি না হবে! এখন মেঘ কেটে যাওয়ায় স্ফূর্তি হয়েছে সকলের। পাড়ার সকলে আসরমুখো চলেছে। সুপ্রিয়াও ঘুরে দাঁড়াল।

শুনে গেলে হত খানিকটা। কক্ষণো আমি শুনি নি।

অনুপম বলে, দূর—কি শুনবে এই সব গেঁয়ো চেঁচামেচি? মাথা ধরবে, কানে তালা লেগে যাবে? কত ভাল ভাল গানবাজনা শুনেছ শহরে—

তা হলে আপনি চলে যান বরং। দাসু থাক, আর যদি কারো ইচ্ছে হয় থাকুন।

পান্নালালের দিকে সুপ্রিয়া অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

দ্বারিকও নাচিয়ে দেয়। বেশ তো—এসে পড়েছ যখন মা, আমাদের আমোদ-আহ্লাদ দেখে যাও একটুখানি বসে। কোন রকম অসুবিধে হবে না। আলাদা চৌকি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। প্রসন্ন ঘোষ আর আমাদের কানা-কোদার লড়াই। শুনবার মতো জিনিস একখানা।

ভিজে চুল শুকিয়ে গেছে, চুলের বোঝা মাথায় ঝুঁটি করে জুতো পায়ে সুপ্রিয়া বাড়ির ভিতর এসে দেখে, যামিনী-বউ তাদের পাতের এঁটো কুড়োচ্ছে।

কি রে? গান শুনতে যাবি নে?

যামিনী বলে, বড়রা যাবে। আমি বউমানুষ, আমায় যেতে দেবে কেন বাইরে?

সুপ্রিয়া বলে, বাইরেটা হল কোনখানে? উঠানের উপর বসলে হয়! এইটুকুও যেতে দেবে না?

বউমানুষ কিনা—

দেখতে ইচ্ছে করছে না?

একটু ইতস্তত করে মৃদুকণ্ঠে যামিনা বলে, করছে তো। কিন্তু নতুন বউ যে! বাপরে বাপ—এমন কড়া পর্দা!

কিন্তু যামিনীর মুখে দুঃখের ছায়া দেখা যায় না। চিরকালের রীতি—এর শাশুড়ী কিম্বা শাশুড়ীরও শাশুড়া যিনি ছিলেন, এই বয়সে রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে যান নি। সকালবেলা সূর্য ওঠার মতোই অলঙ্ঘ্য এ নিয়ম রাগ বা দুঃখ করবার এতে কিছু নেই।

গান একটু বেশি রাত্রে শুরু হয় এসব অঞ্চলে। শ্রোতারা খাওয়া-দাওয়া সেরে, এবং গিন্নিরা তারও পরে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসে। বাদলার জন্য আরও বেশি দেরি হয়ে গেছে আজ। বেলেমাটির জায়গা বলে সুবিধা হয়েছে, বৃষ্টির জল শুষে নিয়েছে। তার উপর তুষ ছড়ানো হল, প্যাচ-পেচে কাদা হয়ে যাতে গাইয়ের অসুবিধা না ঘটে! সেই যে কলার তেউড় ও সরা বসানো হচ্ছিল, ঐ সব সরার মধ্যে তুষ আর কেরোসিন দিয়ে জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চারিদিক আলো-আলোময়। আসরের ঠিক সামনে আড়বাঁশের একদিকে ঝকঝকে এক পিতলের কলসি কানায় দড়ি বেঁধে ঝোলানো হয়েছে, আর একদিকে পাকা মর্তমান-কলা এক কাঁদি।

কার্তিককে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করে, এর মানে?

সগর্ব হাসি হেসে কার্তিক বলে, বলেন কেন দিদি, বাবার মাথায় কত আসে। বারোয়ারি গান তাঁরই উদ্যোগে কিনা! তিন মাস ধরে কেরোসিন তেলের জোগাড় চলছে, জলমার হাট থেকে পছন্দ করে কিনে এনেছেন ঐ কলসি। দুই কবিতে পাল্লা হবে, যে জিতবে পিতলের কলসি তার। হারলে পাবে কলার কাঁদি।

প্রসন্ন ঘোষ জাতে গোয়ালা, উত্তর অঞ্চল থেকে এসেছে। গলা থেকে মেডেলের মালা খুলে দ্বারিকের হাতে দিল। মেডেল একুনে খান কুড়িক হবে। খানিকক্ষণ হাতে হাতে ঘোরে, সকলের অজ্জব লেগে যায়।

আর বসে আছে এক কোণে মুখ নিচু করে লম্বা-চুল, শনের মতো সাদা-

দাড়ি, লাজুক কাণা-কোদা। একটা চোখ কাণা—নামের সঙ্গে কাণা বিশেষণটা তাই কায়েমি হয়ে জুড়ে আছে। এত বয়স হয়েছে, কিন্তু লজ্জা তার কমল না। আসর ছাড়া আর কোনখানে সে গায় না। দেমাক করে যে গায় না, তা নয়—ফরমায়েসি গান গাইবার ক্ষমতাই তার নেই। ভূষণ দাসের বাড়ি বিনোদের বিয়ের বউভাতের সময় সকলের অনুরোধে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গলা খুলল না। কেশে মুখ লাল করে এমন কাণ্ড করেছিল যে ধার্মিক ভূষণ তাকে রেহাই দিল; দয়াপরবশ হয়ে বলল, থাক ওস্তাদ। আনন্দের দিনে তুমি যে নাকের জলে চোখের জলে ভাসবে, তার কাজ নেই। তুমি থাম।

অথচ জমজমাট গানের আসরের মধ্যে প্রতিপক্ষ যখন এই কাণা-কোদাকে বেড় দিয়ে গান ধরে, তখন তার আর এক মূর্তি। চোখটি পিটপিট করে, ঘন ঘন তাকায় সে মেয়েদের মধ্যে যেখানে তার বউ আতরমণি বসে আছে। যেখানে কাণা-কোদার গান, আরতমণি সেখানে যাবেই। অঞ্চলের বাইরে কোথাও কাণা-কোদা যায় না—লোকে বলে, দূরের জায়গায় আরতমণির পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই সে যায় না! কি ভাষা থাকে বুড়ি আতরমণির দৃষ্টিতে, তার দিকে চেয়ে কি ভরসা পায়—তখন আর কাউকে পরোয়া করে না কাণা-কোদা। প্রতিপক্ষের কথা শেষ হলে মাথা নাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়, লম্বা চুল সিংহের কেশরের মতো ফুলে ওঠে। কাণা-কোদা—প্রতিদিনের জীবনে দীনাতিদীন অতি-নম্র মূর্তি, আসরে সে বজ্রগর্ভ। এ-মানুষ আর সে-মানুষের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না!

দ্বারিক সর্দারের কিছু রাগ ও অবহেলা আছে কাণা-কোদার উপর। দুজনে প্রায় একবয়স, খালের ওপারে কাণা-কোদার বাড়ি, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। সে যে একজন গুণীলোক হয়ে উঠেছে, কিছুতেই দ্বারিক ধারণায় আনতে পারে না। কিন্তু ছোকরার দল গর্ববোধ করে তাদের অঞ্চলবাসী কবি কাণা-কোদার জন্য। তারা বলাবলি করছে, হুঁ—এক কুড়ি মেডেল না আরো কিছু! ওসব গড়িয়েছে প্রসন্ন ঘোষ। সেকরা ডেকে আমরাও গড়াতে পারি অমন দশগণ্ডা।

মেডেলের মালা গলায় ঝুলিয়ে প্রসন্ন ঘোষ উঠে দাঁড়াল। আলো ঠিকরে পড়ছে মেডেলের উপর! হাঁ, গাইতে জানে বটে! ভবানী-বিষয় সেরেই অমনি বিষম আক্রমণ—

এ যে বিষম কলি, কি-ই বা বলি
যত সব নাদাপেটা চাষার বেটা—

সাত পুরুষের কুলকর্ম হঠ্‌-হঠ্‌-হঠ্‌ লাঙল চষা।
কোকিলের গান শোনাবেন এঁদো আস্তাকুড়ের মশা—
হায় হায় হায়, কাল যে বিষম কলি
কি-ই বা বলি—

হঠ-হঠ্‌-হঠ্‌ আওয়াজ করে প্রসন্ন গোরু তাড়াবার ভঙ্গিমা করে, আর হাসির হুল্লোড় পড়ে যায় আসরে। কাণা-কোদার ভক্তেরা চোখ টেপাটেপি করে বলে, সত্যি কথা, কোকিলই তুমি প্রসন্ন। রঙে তো বটেই।

কিন্তু গলাখানিও প্রসন্নর কোকিলের মত মিষ্ট। রাত শেষ হয়ে আসে। এক কবির পরে আর-এক কবি উঠছে। ঢুলি আসরের এক-প্রান্ত থেকে লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে পাক খেয়ে ঢোল বাজাচ্ছে, আর মুখে মুখে বোল আবৃত্তি করছে—

ঘিউর-ঘিজা ঘিউর-ঘিজা গিজা-ঘিনি-তা
তা-তা-তা—
শেয়ালে খেলে মা-থা-আ—

উৎসাহে উত্তেজনায় মেয়ে-পুরুষ কারো চোখে ঘুম নেই। গানের মতো গান হচ্ছে বটে এতকালের পর। এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে যারা সব এসেছে—অনেকে তাদের মধ্যে উসখুস করছে, আসরটা ভাঙলে হয়—বায়না দেবে, তাদের গ্রামেও নিয়ে যাবে এই দল দুটো।

পান্নালালেরও যেন নেশা ধরে গেল। শুনতে শুনতে মনের মধ্যে গান জাগছে অনেক দিন পরে। সে অস্থির হয়ে ওঠে। জীবনের সর্বভোগবঞ্চিত সৈনিক—কিন্তু নির্যাতনে অন্তরের কবিতা মরল কই? এত বড় যুদ্ধ চলেছে, দ্বার-প্রান্তে ধ্বংসের হানাহানি—কিন্তু এরা কেমন মশগুল হয়ে গানের রস উপভোগ করছে, কোন সমস্যায় জীবন পীড়িত নয়। ঠকেছে না জিতেছে এরা? চিরদিন এমনি তো হয়ে এসেছে এদেশে। রাষ্ট্রীক রদ-বদলের ধাক্কা স্বয়ংপূর্ণ সমাজ-দেহে পৌছয়নি। কিন্তু সর্বনাশ এবারও কি সেই রকম থমকে দাঁড়িয়ে থাকবে এদের এই কবির আসরের সামনে অবধি এসে? গান শুনে আর পান খেয়ে ভদ্র হয়ে ফিরে যাবে শত্রু?

ভোর হল। গান তখনও চলছে। সভার আলো নিভেছে। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে জোয়ান চাষীরা, আউশ-ক্ষেতে লাঙল জুড়তে যেতে হবে। মেয়েরাও উঠছে, উঠানে ছড়াঝাঁট দেওয়া আছে, গোয়াল-বাড়ানো আছে। আর তাড়াতাড়ি পান্তা বেড়ে দিতে হবে মরদদের—তারা খেয়ে লাঙল-গোরু নিয়ে নামবে বউডুবির বিলে।

সুপ্রিয়া পালকিতে উঠতে যাচ্ছে, দ্বারিক আর কার্তিক এসে দাঁড়াল।

দ্বারিক বলে, গুহক চণ্ডালের ঘরে রামচন্দ্র এসেছিলেন মা, আমাদের হল সেই বিত্তান্ত। আমি একদিন যাব তোমাদের গাঁয়ে, রায়-কর্তার চরণ-ধূলো নিয়ে আসব।

সুপ্রিয়া বলে, কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি আমরা। বাবার কারবারের ক্ষতি হচ্ছে—আর এখন কোনরকম গণ্ডগোলও নেই সেখানে। অনুপমের দিকে কটাক্ষ করে বলে, যেতেই হবে—ভগ্নদূত এসে উপস্থিত। চিঠিতে জপাচ্ছিলেন, এবার নিজে এসে পড়েছেন। ছেড়ে যাবেন, সে রকম তো মনে হচ্ছে না।···তা আপনারা একবার চলুন না কেন কলকাতায়। যাবেন?

রূপদাসী ঘাড় নেড়েছিল কলকাতার কথায়, দ্বারিকের কিন্তু চোখ জল-জল করে ওঠে। একবার গিয়েছিল কি না, তাই। আজব শহর। কল টিপলে আলো জ্বলে, কল ঘোরালে জল পড়ে। অমাবস্যার রাতেও অন্ধকার নেই, ভারি স্ফূর্তির জায়গা কলকাতা।

এক খড়ের ব্যাপারির সঙ্গে দ্বারিক সর্দার কলকাতায় গিয়েছিল তিন দিন। আজ তিন বছরেও তার গল্প শেষ হল না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বারিক মাদুর বিছিয়ে শোয়, যামিনী-বউ শ্বশুরের পায়ে তেল মালিশ করে দেয়, পুঁটি তামাক সেজে আনে। বুড়ো ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানে আর শহরের গল্প করে সেই সময়টা।

অনুপমও বলল, নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি। যেও সর্দার। ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।

দ্বারিক উল্লসিত হয়ে বলে, যাব বই কি, ঠিক যাব। শহর তো নয়, সগ্‌গোধাম। আউশ বুনে নিশ্চিন্ত হয়ে দিনকতক ঘুরে আসব।

সুপারি-পাতার বেড়ার আড়ালে যামিনী। মল আর কাচের চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুপ্রিয়া তার কাছে গেল। আলগোছে প্রণাম করে যামিনী বলে, কথাবার্তা শুনেছি। আমিও কিন্তু যাব দিদি—

যাবি, নিশ্চয় যাবি। তুই, তোর বর, তোর শ্বশুর—তোদের বাড়িসুদ্ধ সবাই যাস আমাদের শহরে।

এদিকে-ওদিকে চেয়ে চুপিচুপি বলে, টুপি-পরা সাহেব ঐ যে—ওর সঙ্গে

আমার বিয়ে এই বোশেখে। তোদের বিয়ের ফাঁকি দিয়েছিস, আমি নেমন্তন্ন করে গেলাম।

যাবার মুখে আর শুনল না সুপ্রিয়া। বউকে জড়িয়ে ধরে আদর করে পালকিতে উঠল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)

আউশ বোনা হল না বীজধানের অভাবে। আমনের সেই অবস্থা হয় বুঝি। চষা-ক্ষেত ধূ ধূ করছে—নূতন বর্ষার জলে মাটি সরস ও স্নিগ্ধ হবে এইবার। জল বাড়লে তখন আর রোয়া চলবে না। পাগল হয়ে চাষারা ডোল-আউড়ির তলায় যায় যে কটা খোরাকি ধান ছিল, সমস্ত বীজতলায় ছড়িয়ে দিল। কাল কি খাবে, সম্বল নেই। ভরসা আছে উপায় একটা কিছু হবে। ধানের চালান এসে পড়বে সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে—প্রথম চৈত্রে গাড়ি গাড়ি এদের ধান কিনে যেখানে রওনা করে দিয়েছে। ধানের পালায় পালায় উঠানে পা ফেলা যেত না—অত ধান আজকে একেবারে অদৃশ্য।

লোকে ভয় দেখিয়েছিল, ধান ঘরে রাখলে বিপদে পড়বে তোমরা। শত্রু এসে কেড়ে নেবে, আর গলাটা দুইখণ্ড করে কেটে দিয়ে যাবে সেই সঙ্গে। থানার লোক দল বেঁধে গোলা-আউড়ি হাতড়ে গেল একবার। দরকার বোধ করলে শহরের মন্ত্রীরাও এসে নাকি গৃহস্থের তক্তাপোশের নিচে ধানচাল খোঁজাখুঁজি করবেন। তার উপর দরটা এমন ছিল—যা সাতপুরুষে কেউ কখনো কানে শোনে নি। সকল চাষা তাই ধান বেচে দিয়েছে। অগুনতি নোট—সিকেয় ঝোলানো লক্ষ্মীর হাঁড়ির মধ্যে এনে এনে রাখত, নোটে নোটে স্তূপাকার হয়ে উঠল। ভেবেছিল, আউশ উঠবার মুখে দর তো নেমে যাবে—টাকার কাঁড়ি রইল, সেই সময় ধান কেনা যাবে যার যেমন দরকার! ক্ষেতের ধান এনে রাখাও যখন অপরাধের ব্যাপার, এ ছাড়া উপায়ই বা ছিল কি?

সেই নোটের বোঝা শুকনো পাতার মতো বাতাসে উড়ে গেল দেখতে দেখতে। একজোড়া কাপড় কিনবে তা শুনে দাও এক গাদা নোট। নুন কিনবে, কেরোসিন কিনবে—দাও এক এক মুঠো। আর এমন হয়েছে, আজকে নোটের পাহাড় ঢেলে দিলেও সমস্ত অঞ্চলে এক খুঁচি ধান কেউ দেবে না। ধান-চাল ভেল্কিতে উড়ে গেছে।

আবোধ নিরীহ চাষী—এরা না জানুক, পান্নালাল কিছু কিছু জানে ঐ

ভেড়িওয়ালাদের। এখন খুলে বলা চলে না—কেউ মুখ ফুটে বলবে না, খবরের কাগজে ছাপবে না, ভারত-শাসনের কড়া আইনে শুনতেও ভরসা পাবে না কেউ—কিন্তু সে জবানবন্দি দেবে, যখন হিসাব-নিকাশের দিন আসবে সেই সময়। ইস্কুল উঠে গেছে, তবু সে গ্রাম ছাড়ে নি। সারা দেশে মন্বন্তরের আগুন—পালাবে কোথা? শান্তিতে বিশ্রাম করা তার ভাগ্যে নেই—চুপচাপ মাথা ঠাণ্ডা রেখে এর মধ্যে সে থাকবে কেমন করে? ক্ষেত-খামার ঘর-গৃহস্থালি, নৌকো-গাড়ি, মেলা-কবিগান, সৌজন্য-আতিথেয়তার বাংলাদেশ চোখের উপর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ভূষণ্ডী-কাকের মতো ধ্বংসের সে সাক্ষী হয়ে রইল।

এই ফাল্গুনে পান্নালালের ভীষণ বসন্ত হয়েছিল। পাঠশালা ঘর থেকে অচেতন অবস্থায় দ্বারিক তাকে বাড়ি নিয়ে তুলেছিল। আহা, বিদেশি মানুষ—আপন-জন কেউ নেই এখানে! প্রাণের আশা ছিল না: দ্বারিকের টিনের আটচালার দক্ষিণের কামরায় এক মাসের উপর পড়ে পড়ে সে ভুগেছে। কি করে যে বাঁচিয়েছে ওরা! হিংস্র ব্যাধি সমস্ত মুখের উপর দংষ্ট্রা-চিহ্ন রেখে গেছে। পান্নালাল অনেক সময় ভাবে, তখন তার মারা গেলেই ভাল হত—এই অসহ্য দৃশ্য দেখতে হত না তা হলে। হাত-পা থেকেও যাদের কিছু করবার নেই, বেঁচে থাকা অভিশাপ তাদের পক্ষে।

হরিহর রায় শুধু নন—যত সজ্জনেরা গ্রামে এসেছিলেন, কেউ আর এখন নেই। পাঠশালা মাইনর-ইস্কুলের আভিজাত্য লাভ করবে, নূতন পাকা-রাস্তা, টিউব ওয়েল আর দাতব্য হাসপাতাল হবে, সোনার গ্রাম গড়ে তুলবেন সকলে মিলে চেষ্টাচরিত্র করে—এই সব সাধু সঙ্কল্প মুলতুবি রইল আপাতত। জল-জঙ্গল, সাপের ভয়, ম্যালেরিয়া, তার উপর জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায় না—এর চেয়ে বোমার ঘা খেয়ে মরতেও যদি হয়, তার আরাম অনেক বেশি। শহরের মানুষরা পাগল হয়ে সব গ্রামে পালাচ্ছে।

পালাচ্ছে গ্রামের মানুষরাও। পেটের ক্ষিধেয় যে যেদিকে পারে ছিটকে পড়ছে।

চার কুড়ি বছর বয়স দ্বারিকের। বছরের পর বছর এই সব জোত-জমি করেছে, ঘরবাড়ি-গোলা বেঁধেছে, সোনার সংসার সাজিয়ে তুলেছে। ছেলে-মেয়ে, বউ-ভাইবউ, নাতি-নাতনি, নিকট ও দূরসম্পর্কের আত্মীয়কুটুম্ব—সকাল থেকে রান্নাবান্না, মানুষজনের আনাগোনা, কর্মকোলাহল—বাড়িতে একটা কাক পড়তে পারে না। কিন্তু এখন এই কিছুদিনের মধ্যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, পোষ্যের দল কে কোথায় পালাল, এতগুলো ঘর হা-হা

করছে, চারিদিকে চুপচাপ। রূপকথায় আছে পাতালপুরীর কথা—রাক্ষসে লোকজন খেয়ে সাতমহল অট্টালিকা ফাঁকা করে ফেলেছে—এ ও অবিকল তাই।

সকালবেলা দাওয়ায় বসে দ্বারিক ফড়-ফড় করে হুঁকো টানছে, আনাচে-কানাচে এ-ঘরে ও-ঘরে এই আওয়াজটুকুরও স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এ রকম শান্তিতে তামাক খাওয়া কোনদিন কপালে ঘটে নি—কত উৎপাত, কত উপদ্রব!

ঘরের মধ্যে সেই সময় এক কাণ্ড। যামিনী বিছানা সরাতে গিয়ে দেখে বালিশের নিচে তার মল দু-গাছা। রাগ করে কার্তিককে বলে, একটা সত্যি কথা তোমার মুখে নেই। এই যে বললে, স্যাকরাবাড়ি রেখে এসেছ, গালিয়ে দেখে হিসেব করে তারা টাকা দেবে—

কার্তিক বলে, খুব টাকা চিনেছিস বউ। রাতদিন কেবল টাকা—টাকা টাকা—

যামিনী অপ্রতিভ হল না। বলে, তা কি করব বল। মেয়ের মা—ছেলেমানুষটি তো নই।

নূতন বউ হলে কি হয়, এমনি পাকা কথা। এত কষ্টেও মুখের হাসি মরে নি। সবাই সরে পড়েছে, বাইরের মধ্যে আছে কেবল মা-বাপ-মরা ছোট্ট একটি মেয়ে! এখন অবশ্য আর বাইরের নয়, কে শিখিয়ে দিয়েছে—খুকি যামিনীকে মা বলে ডাকে।

ম্লান হেসে অভিমান-ভরা কণ্ঠে যামিনী বলতে লাগল, এমন দাম আর পাওয়া যাবে না। মাথা ভেঙে মরছি—তা একটা কাজ কি হবে তোমাকে দিয়ে? আমার একটা কথাও তুমি শোন না—

কার্তিক বলে, দাম পাওয়া যাচ্ছে অবিশ্যি—কিন্তু আমাদের কেউ কি দেবে? নিয়ে গিয়েছিলাম। গরজ বুঝে বলল মাত্র দশ টাকা।

দশটা পয়সাও দেবে না এর পরে। রূপো কতটুকু—কেবল তো কাঁসা।

তোর যে সাধের জিনিসটা বউ।

চোখ বড় বড় করে যামিনী বলে উঠল, ওমা—মা! মল পরা উঠে গেছে আজকাল—কেউ পরে না। আকাল চলে যাক—এই টাকায় আমার এক জোড়া কানবালা গড়িয়ে দিতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে বলে, এদ্দূর হেঁটে হাটখোলা অবধি গেলে দশটা টাকা দিচ্ছিল—তাই-বা কে দেয়? তা মান দেখিয়ে চলে এলে। মণখানেক চাল নিয়ে এলে তবু দিনকতক তো নিশ্চিন্ত।

দশ টাকায় মণ ?

না-হয় দশ-বিশ সের।

বাজারে টাকা-পয়সা পাওয়া যায় বউ, ধান-চাল কেউ দেয় না।

যামিনী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

কার্তিক বলতে লাগল, গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে যদিই-বা মেলে দু-এক সের, গঞ্জে ও-বালাই নেই। ট্যাডা পিটে দর বেঁধে দিয়ে গেল, সেদিন থেকে সামান্য যার যা আছে তা-ও সরিয়ে ফেলেছে, মাথা খুঁড়লেও বের করবে না।

মলজোড়া যামিনী কার্তিকের হাতের মুঠোয় জোর করে গুঁজে দিয়ে বলে, যাও—এক্ষুণি চলে যাও তুমি, যে ক-সের পাও, আনগে। খুকি খাব-খাব করে এসে পড়বে—

খুকি তখন মোচার খোলার-নৌকোয় কনে-পুতুল সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার উদ্যোগে ছিল। তার নাম উঠতে মুখ তুলে তাকাল।

যামিনী অধীর হয়ে বলে, তুমি কি চোখ বুজে থাক ? কিচ্ছু বোঝ না ? যা দাম দেয়, বেচে দিয়ে এস। বুড়ো-শ্বশুর আর ছোট্ট মেয়ে—দুই-ই সমান। এক্ষুণি এসে দাঁড়াবেন। আমি কি করব ? মরণ হয় না কেন আমার।

খুকি ছুটে এল। পুতুলটা কার্তিকের হাতে দিয়ে বলে, এটাও বেচগে। আমি আর খেলব না।

কি ? শব্দ কিসের ? বুড়ো দ্বারিক হুঁকো ফেলে দিয়েছে। হুঁকো কলকে গড়িয়ে উঠানে পড়ল। নাঃ—বাড়ি ছাড়তে হল এদের ঠেলায়। বাঁশের লাঠি তুলতে গিয়ে থরথর কাঁপছে দ্বারিকের হাত। লাঠি ঠুক-ঠুক করে সে চলল। চোখের কোটর জলে ভরে যাচ্ছে। এরা পণ করেছে, বাড়িতে তাকে থাকতে দেবে না। ছোট্ট ঐ মেয়েটা অবধি ঝাঁটা মারছে, পুতুল বেচতে দেওয়া—ঝাঁটার বাড়ি ছাড়া সে আর কি ? দাওয়ায় বসে বসে দ্বারিক আর তামাক টানবে কি করে ?

গ্রাম ছেড়ে বিলমুখো চলল। চাটুজ্জেপাড়ায় নারায়ণ-কোঠার পাশ দিয়ে পথ। কোঠার বারান্দায় কেবলি সে মাথা কুটছে, নারায়ণ, এই দুটো মাস—প্রথম কার্তিকে কার্তিকশাল কাটা হবে, ভাদ্র আর আশ্বিন এই দুটো মাস একবেলা আধপেটা খাবার যোগাড় করে দাও ঠাকুর—

ঠাকুরেরও ঠিক এই রকম বিপদ। যুধিষ্ঠির চাটুজ্জের প্রতিষ্ঠা-করা ঠাকুর, দুপুরে পাকা-ভোগ আর রাত্রে শীতলের জন্য বড় একটা গাঁতি দেবোত্তর করে গিয়েছে। বিগ্রহ শয়ন করবেন, তার জন্য পালঙ্ক ও গদি-মশারির বন্দোবস্ত।

সেই ঠাকুর ইদানীং মাসাবধি নিরম্বু উপবাসী। সেবাইত এখন যুধিষ্ঠিরের নাতি হরেকৃষ্ণ। বউ-ছেলে নিয়ে কোথায় সে গিয়ে উঠেছে।

ধানবনে আলের ধারে গিয়ে দ্বারিক বসল। ঝিরঝিরে বাতাস, সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে আসে। মনে বল পায়। আর কি, ভাদ্র আর আশ্বিন—দুটো মাস শুধু। আবার সব ফিরে আসবে। মানুষের ভিড়, কোলাহল, সচ্ছলতা—সমস্ত।

মরি মরি!—কি ফলন ফলছে এবার! পাঁচ বছরের ফসল এই একেবারে উঠে আসবে। গাঢ় সবুজ ধান-চারা—মেঘের রঙ। মেঘভরা আকাশটা কি উপুড় করে রেখেছে দূরবিস্তৃত বিলের উপর? কি কষ্টের চাষ এবার! উপোস করে রোদ আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ধান রুয়েছে, কত আদরের এই ধান! ছেলের মতো। ধানের এক-একটা গোছা জড়িয়ে ধরে চুমা খেতে ইচ্ছে করে। বুড়োমানুষ দ্বারিক, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে, মানুষ দেখে ঠাহর করতে দেরি হবে—কিন্তু ক্ষেতের মধ্যে কোন্ ঝাড়টা কি রকম সমস্ত তার নখদর্পনে। একটি ঝাড় থেকে আলাদা হয়ে যদি শুয়ে পড়ে, সেটাকে সযত্নে খাড়া করে দিয়ে তবে তার তৃপ্তি। এই এখানে জল ঝরছে ঝিরঝির করে, থলবল করছে কই-খলসে-নাটা-পুটি—মাছেরা উজানমুখো উঠতে চায়, ধানের ফাঁকে ফাঁকে বউটুবনি ফুল, কেউটে-ফণার ফুল, বিলঝাঁঝি, চেঁচোঘাস···

ক্ষেত ছেড়ে উঠে আসতে দ্বারিকের মন চায় না।

॥ ২ ॥

বউয়ের ঠেলায় কার্তিক ঘরে থাকতে পারল না, মল দু-গাছা গামছায় জড়িয়ে বেরুল। ফের হাটখোলায় চলেছে।

পিছনে পিঠের উপর প্রকাণ্ড থাবা। মুখ ফেরাতেই অট্টহাসি। বিজয়—ভূষণ দাসের ভাগনে বিজয় মজুমদার। অনুপম নিয়ে গিয়েছিল, তারপর বছর খানেক পরে এই দেখা হল। সে বিজয় নেই। পরনে কোট আর হাফ-প্যাণ্ট—তিনটে করে দু-হাতের ছয় আঙুলে ছ-টা আংটি।

বিজয় বলে, কোথায় চলেছ তাড়াতাড়ি? পরশু এসেছি, মামার ওখানে আছি। চল না আমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—কথা বলতে বলতে যাই। গামছায় কি?

থতমত খেয়ে কার্তিক বলে, চাল আনতে যাচ্ছি মজুমদার। ধান-চালের কি হয়েছে—লক্ষ্মী যেন অঞ্চল ছেড়েছেন। জেলে নিয়ে পুরবে সেই ভয়ে সমস্ত ধান বেচে দিয়ে এখন এই অবস্থা—

কার্তিকের হাত ধরে বিজয় গড়ভাঙায় ভূষণ দাসের বাড়ি নিয়ে এল। ভিতর-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বাইরের আটচালা এবং পাশের একটা কামরা নিয়ে বিজয় আছে। অনুপমেরা বিরাট এক কনস্ট্রাকশন-কোম্পানি খুলেছে, সেই সম্পর্কে বিজয় এসেছে।

দু-দিন মাত্র এসেছে, তা খুব জমিয়ে নিয়েছে বিজয়। আটচালায় লোকারণ্য। তাকে দেখে সকলে কোলাহল করে উঠল।

বিজয় বলে, বোসো তোমরা, এক্ষুণি আসছি।

কামরার দরজায় গিয়ে সে ডাক দেয়, ওরে শুকলাল, শোন—চাল বের কর দিকি—বেশ জুত করে বেঁধে দে চাট্টি এই গামছায়। গয়না নিয়ে যাচ্ছ কোথায় হে? এই মল?

কার্তিক সঙ্কুচিতভাবে বলে, বউয়ের পছন্দ নয় কিনা—মল ভেঙে কানবালা গডতে দিয়েছে।

হো-হো করে বিজয় হেসে উঠল। বটেই তো, কানবালা চাই, কঙ্কন চাই, হেনোতেনো কত কি চাই—বুঝবে বায়নাক্কা। কাল গিয়েছিলাম একবার মোড়ল-পাড়ার দিকে। কেদার মোড়লের মেয়েকে বিয়ে করেছে শুনলাম।

তারপর বলে, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি তো ফৌত। পেটকাটা ঘরে চামচিকে উড়ছে দেখে এলাম।

কার্তিক প্রতিবাদ করে বলে, কি যে বল! ফৌত হবে কেন? মামাশ্বশুর কাকিনাড়ার কলে কাজ করেন, সেখানে নিয়ে গেছেন ওঁদের। মামাশ্বশুরের আপন বলতে আর কেউ নেই। ওঁরা আছেন খুব ভাল, রাজার হালে রয়েছেন। খবরাখবর পেয়ে থাকি। পয়সা দিলেও চাল মেলে না এ পোড়া জায়গায়। যার সুবিধে আছে সে থাকতে যাবে কি জন্যে?

শুকলাল চাল এনে দিল।

বিজয় দেখে তাড়া দিয়ে ওঠে, বেশ হাড়কিপ্পন, এই কটা দিয়েছিস? তোর বাপের ঘর থেকে দিচ্ছিস নাকি? ছোটবেলার এয়ার-বন্ধু—ওর নৌকোয় কত মাছ মেরে বেড়িয়েছি, হা-ডু-ডু খেলে একদিন ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছিল হতভাগা—মনে আছে হ্যাঁ রে কার্তিক?

এবার পালি-ভরতি চাল এনে ঢালল শুকলাল—সের দশেকের কম নয়। প্রসন্নমুখে কার্তিক বলে, দাম দিয়ে যাব। কাল-পরশু যেদিন হোক—

বিজয় বলে, দামের ভাবনায় তো ঘুম হবে না? তোমায় দিয়ে যেতে হবে না ভাই, আমি যাব তোমাদের বাড়ি। গিয়ে বউ দেখে আসব।

কার্তিক নিমন্ত্রণ করল, যাবে তো বটেই, রান্নাবান্নাও সেদিন ওখানে করতে হবে। কবে যাচ্ছ? কাল-পরশুর মধ্যে—

ঘাড় নেড়ে বিজয় বলে, কাল নয়—পরশুও নয়। এ হপ্তায় হবে না। গাঁয়ে গাঁয়ে বৈঠক চলেছে। মনে মনে হিসাব করে বলে, আচ্ছা মঙ্গলবার—সকালবেলার দিকে বাড়ি থেকো।

আটচালার জনতার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, মরবার সময় নেই ভাই। দশ গ্রামের মানুষ এসে বলছে, উপায় করে দাও। তা দিচ্ছিও। সেদিন এক চালানে পাঠিয়ে দিয়েছি—বাষট্টি জন। আট ঘণ্টা ডিউটি—মজুরি দেড় টাকা, ওভারটাইম আছে। এর উপর কোম্পানি রেশন দিচ্ছে চাল সাড়ে-ছটাকা দর, সরষের তেল চার আনা—

কার্তিকের দিকে চেয়ে প্রস্তাব করে, তুমিও চল না কেন। গাঁয়ে পড়ে থাকলে উপোস করে মরতে হবে। চাল আর এ তল্লাটে নেই, সরিয়ে ফেলেছে। আমার ফ্রেণ্ড তুমি, তাই বলছি। আচ্ছা, যাচ্ছি তো মঙ্গলবারে—সেই দিন কথাবার্তা হবে।

আটচালার দিকে সে চলল।

॥ ৩ ॥

বিজয় আজকাল সাহেব লোক—কথার ঠিক রাখে। মঙ্গলবারের দিন যথাসময়ে এল। খাতির করে কার্তিক জলচৌকি এগিয়ে দেয়। মহাব্যস্ত বিজয় ঘাড় নেড়ে বলে, মরবার সময় নেই ভাই, কখন বসি? রান্নাবান্নাও আজকে নয়। নারায়ণ-কোঠার রোয়াকে তোমাদের গাঁয়ের সকলে এসে বসবার কথা।

কার্তিক বলে, সে তো একটুখানি জায়গা। আর বৃষ্টি এসে পড়ে তো চিত্তির। তাদের ডেকে এনে বসাই না আমাদের টিনের ঘরের দাওয়ায়।

তখন যামিনী পুকুরঘাট থেকে জল নিয়ে আসছে। বিজয় বলে ফুটফুটে বউখানা তো! বাঃ—বাঃ, ভাগ্যি ভালো তোমার।

যামিনীর উদ্দেশ্যে ডাক দেয়, শোন ও নতুনবউ! আহা, আমায় দেখে ঘোমটা কেন? তোমাদের গাঁয়ে মামার কাছে মানুষ। এসে উঠেছিও সেখানে। ছোটবেলা কতবার তোমাদের বাড়ি গিয়ে খেজুর রস খেয়ে এসেছি, কেদারখুড়ো বলে ডাকতাম তোমার বাবাকে। চিনতে পারছ না? এই—এক গ্লাস জল দিয়ে যাও তো।

যামিনী ভিতরে চলে গেল। একটু পরে জল নিয়ে এল—সে নয়, কার্তিকের

মা বগলা দাসী। হাঁপানি রোগ আছে বুড়ির ; হাঁপানি বেড়েছে তবু তাকে পাঠিয়েছে। যামিনী এল না।

বিজয় বলে, উঃ—স্বপারি-পাতায় ঘিরে কি অন্তঃপুর বানিয়েছে বাবা! বন্ধুমানুষ আমার সামনেও বউয়ের দেড়হাত ঘোমটা ?

হেসে উঠল। তারপর বলে, কাজের কথা হোক। তুমি চল। আমার ফ্রেণ্ড—মেট করে দেব তোমায়। দু টাকা হিসাবে রোজ—মাসে ষাট। তা ছাড়া আরও পুষিয়ে দেব এদিকে-সেদিকে। মানুষজন জোটাও দেখি।

এখানকার পাট একেবারে তুলতে হয় যে তা হলে—

বেশ তো—

ক্ষেতখামার, মা-বাপ-বউ—

বিজয় হেসে বলে, কোম্পানি আমাদের পিঁজরাপোল নয়। বুড়োবুড়ি যাবে কোন কর্মে ? বউকে নিয়ে চল বরং—খাসা বউটা। বড় মেজো সেজো অনেক রকমের অনেক মেজাজের বাবুরা আছেন, টাকা তো খোলামকুচি, ওদিকে—ধাঁ করে তোমার উন্নতি হয়ে যাবে।

কি রকম করে হাসছে, কার্তিকের খারাপ লাগে। বিজয় টাকা করেছে, উদারও বটে—কিন্তু মুখের যেন আড় নেই। ঠাট্টা করে বলছে অবশ্য, কিন্তু বড্ড বিশ্রী ঠাট্টা।

নারকেল-কোঠায় রোয়াকে যারা জমায়েত হয়েছিল, তাদের ডেকে আনা হয়েছে। তামাক সাজতে কার্তিক বাড়ির ভিতর গেল। যামিনীকে বলে, সত্যি বউ, অমন করে ছুটে আসা মোটেই উচিত হয় নি তোর!

আমার ভয় করে।

বাঘ তো নয়—মানুষ। ভালোমানুষ। কি উপকারটা করলে সেদিন!

কিন্তু কেমন করে তাকায়—

তোদের গড়ডাঙাতেই ছিল এতটুকু বয়স থেকে—চেনাজানা বলে তাকায়। উঁহু, উপকারী মানুষটা—চটে যাবে শেষকালে। জলটল যদি চায়, নিজের হাতে দিস বউ। খুশী হবে।

এদিকে দাওয়ার উপর বিজয় মুখ-হাত নেড়ে বলছে, ঘোষ ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন-কোম্পানির ঐশ্বর্যের কাহিনী, দু-হাতের ছ-টা আংটি ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। এই এখানে এক ছটাক চাল পাচ্ছ না কেউ—কোম্পানির গুদাম-ভরতি পর্বতপ্রমাণ চালের বস্তা, পিপে-ভরতি তেল কেরোসিন। বে-দরদে নেবে, খাবে, যার যেমন দরকার।

পান্নালাল এসেছে, কেউ ডাকে নি—নিজেই এসেছে। সে মৃদু মৃদু হাসছিল।

চটে গিয়ে বিজয় বলে হাসছেন কেন?

পুরুষ মানুষ, কাঁদতে যে লজ্জা করে।

তার মানে?

মানুষ জোটাতে পারছেন না, কি মুশকিল! না খেয়ে মরছে, তবু কেন যে যায় না আপনাদের পিছু-পিছু।

বিজয় বলে, যাবে—এখনো হয়েছে কি? কাটুক না আরো দু-এক মাস। আপনি পিছন থেকে টিপুনি দিলে কি হবে মশায়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা —'বাপ' 'বাপ' করে গিয়ে পড়বে।

পান্নালাল বলে, চাল-তেল-কেরোসিনের লোভ দেখাচ্ছেন বিজয়বাবু, একথা কই বলতে পারছেন না তো—দেশের জন্য আমাদের ভাইরা লড়াইয়ে গেছে, তাদের সুখ-সুবিধার দায়িত্ব আমরা যারা ঘরে আছি—আমাদের উপর। বুঝতে দেব না যে তারা পরিবারের বাইরে, আমাদের স্নেহ-যত্ন অহরহ তাদের ঘিরে রাখবে। এই সার্বিক যুদ্ধে নিষ্কর্মা কেউ নয়—আপনারা গ্রামের চাষী-মজুর, আমরা ঘোষ ব্রাদার্স কনষ্ট্রাকশন-কোম্পানি—নানা ফ্রন্টের কর্মী আমরা সকলেই। চলুন আমাদের সঙ্গে, স্বাধীনতা-সৈনিকদের জন্য নতুন নতুন ব্যারাক গড়তে হবে। যৎসামান্য কিছু ভাতা পাবেন। আপনারাও দেখুন, সিকি পয়সা মুনাফা করছি না—কায়ক্লেশে খরচটা মাত্র তুলে নিচ্ছি।...বুকের উপর হাত রেখে, পারেন তো, এমনি ভাবে আহ্বান করুন দিকি দেশের মানুষকে—

পান্নালাল স্তব্ধ হয়ে মনে মনে যেন রোমাঞ্চ অনুভব করল এক অনুরূপ কল্পনায়। স্বাধীন দেশের নরনারী যেন আমরা—আহ্বান আসছে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য। গভীর কণ্ঠে সে বলতে লাগল, সত্যি সত্যি তাই যদি হত কেমন হত ভেবে দেখুন। চেঁচিয়ে গলা ভাঙতে হত না। মানুষ পাগল হয়ে ছুটে আসত যদি আপনাদের কোম্পানি ও উপরওয়ালারা দেশের নামে সকলকে ডাক দিতে পারতেন। আমাদের মতো এমন ত্যাগী দরদী আপনভোলা জাত বড় বেশি জগতের মধ্যে—

পান্নালাল চলে গেলেও রুষ্টমুখে বিজয় খানিকক্ষণ তার পথের দিকে চেয়ে থাকে। ছিঁড়ে-যাওয়া আলোচনা কিছুতেই আর জোড়া লাগে না।

কার্তিককে দেখিয়ে সাহসা সে বলে উঠল, এই দেখ তোমরা—এত বড় মানী ঘরের ছেলে, এ-ও যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

যাচ্ছে নাকি কার্তিক ?

উঁহু, ধান পাকবে যে—আমাদের বাইশ বিঘে জমির ধান—

বিজয় রাগ করে বলে, যাবে না তুমি ?

যাই কি করে মজুমদার ? ধানের কি গতি হবে তা হলে ? সংসার-ধর্ম উচ্ছন্নে যাবে যে !

বৈঠকে সুবিধা হচ্ছে না। প্রথম দলে অনেক কষ্টে যাদের পাঠানো হয়েছিল, কেউ তারা পৌছা-খবর অবধি দেয় নি। নানা রকম গুজব রটছে বিজয়ের সম্বন্ধে। পান্নালাল বলেছে ঠিক—কিছুতে মানুষ জোটানো যাচ্ছে না। বুড়োরা তো প্রায় তাকে ছেলে-ধরার সামিল জ্ঞান করছে। না খেয়ে মরছে, তবু বাড়ির ছেলেদের বিজয়ের বৈঠকে আসতে চুপি-চুপি মানা করে দেয়।

মেঘ নেই, প্রখর রোদ। শুকনো মুখে বিজয় গড়ভাঙা ফিরছে। পিছনে কার্তিক। ফাঁকায় এসে সে বউয়ের মল বিক্রি-করা টাকাগুলো বিজয়ের হাতে গুঁজে দিল।

কি ?

সেদিনকার চালের দাম। আজকেও আর কিছু দিতে হবে মজুমদার।

হঠাৎ গলা খাটো করে বলল, তুমি বলেই বলছি—খাওয়া জুটছে না।

বিজয় নোটগুলো মাটিতে ছুঁড়ে দেয়। আগুন হয়ে বলে, আমার কোম্পানি চাল বিক্রি করে না। ভিক্ষেও দেয় না। মর—শুকিয়ে মরে থাক তোমরা সব। হিত কথা বললে যাদের কানে যায় না তাদের মরাই উচিত।

পরদিন কি মনে হল—একটা ঠোঙায় করে বিজয় নিজে চাল বয়ে নিয়ে চলল সর্দার-বাড়ি। বাপ-ছেলের কেউ নেই, বগলা দাসী ও-ঘরে পড়ে হাঁপানিতে ধুঁকছে।

বিজয় ডাকল, শোন নতুন বউ—ওহে, ও কেদার-খুড়োর মেয়ে, কার্তিক বলে এসেছিল—চাল এনেছি, নিয়ে যাও।

যামিনী এল।

বিজয় তার দিকে চেয়ে বলে, সোনার বর্ণ কালি হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া জুটছে না তো—আহা !

হঠাৎ প্রশ্ন করে, রাতে কি রান্না হয়েছিল ? বল—বল—ভাইয়ের মতো আমি, লুকেবে না—

বয়স আর কিই-বা যামিনীর। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। ঝরঝর করে দু-গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল।

বিজয় বলে, যত বেটা কুয়োর ব্যাং কুয়ো ছেড়ে নড়বে না। কাঁহাতক চাল দিয়ে পুষব আহাম্মকগুলোকে? তা কার্তিক না যায়, তুমি যাবে? শুকিয়ে মরে থাকলে কোন পরমার্থ হবে শুনি?

বুকের কাছে ঢিব-ঢিব করছে যামিনীর। এসব কি বলে! বিজয় ফিক-ফিক করে হাসছে, মোলায়েম কণ্ঠে বলছে, তাই চল। খেতে দেব, পরতে দেব। ভাত-লুচি শাড়ি-গয়না—যা চাইবে তাই।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিজয়। ধরবে নাকি? যামিনী ছুটে ঘরে ঢুকে দরজা দেয়। এই হল ভালমানুষ! তার স্বামী ঠেলে দিতে চায় তাকে এই বাঘের মুখে।

বিজয় বলে গেল, শোন রসগোল্লা পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি শুকলালকে দিয়ে। খেয়ে নিয়ে প্রাণটা বাঁচাও। তারপর ভেবে দেখো। তাড়া নেই, আছি আমি আরও দু-পাঁচ দিন।

রসগোল্লা পৌঁছাবার আগেই কার্তিক এসে পড়ল। হাত খালি—চালের ধান্দায় এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ঘুরে চোখ হয়েছে আগুনের ভাঁটা। যামিনীর কাছে দু-এক কথা শুনেই কার্তিক তার চুলের মুঠি ধরে শুইয়ে ফেলল। পিঠের উপরে দমাদম লাথি।

তুই নিজে নষ্ট। আস্কারা না পেলে বাড়ির মধ্যে আসে? মর—মরে যা—সংসারে নুড়ো জ্বালিয়ে দিয়ে আমিও বেরোই—

দ্বারিক ছুটে এল। বাপের সামনে থেকে কার্তিক সরে পড়েছে। পাগলের মতো দ্বারিক বুক চাপড়াচ্ছে। লক্ষ্মীমন্ত বলে অঞ্চলের মধ্যে নাম—সেই সংসারে আজ ঘরের লক্ষ্মীর শতেক খোয়ার! হায়-হায়, হায়-হায়-হায়।

কাঁদছে আর মাথা চাপড়াচ্ছে দ্বারিক। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। দুটো মাস—ভাদ্র আর আশ্বিন—সে অনেক দিন! যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছে, ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড ভাউলের মতো সংসারটাকে কাছির পর কাছি বেঁধে ঠেকাতে চাচ্ছে দ্বারিক, কাছি কট-কট করছে, ছিঁড়ে গেল বলে! আশি বছর ধরে দিনের পর দিন সাজানো গোছানো—সমস্ত যেন বানচাল হয়ে যাচ্ছে।

শিথিল দেহে অসুরের বল এসেছে। ছুটল বুড়ো তিন ক্রোশ দূরে বউ ডুবির হাটখোলায় ভূষণ দাসের কাছে।

দাস মশায়, পয়সা তো দেদার পিটছ এবার—

কোথায়? পাঁচশালার নজর পড়ে, পুলিশ লেলিয়ে দেয়।

দোকানে টিনের চাল দেবে নাকি বলছিলে?

তাই তো ইচ্ছে। হিংসেয় জলে-পুড়ে মরছে শালারা, খোড়োচালে হয়তো বা আগুনই ধরিয়ে দেয়। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে টিন অমিল—

আমার টিনের ঘর—

বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল দ্বারিকের।

বেচবে? অ্যাঁ—বল কি!

গলা ঝেড়ে নিয়ে দ্বারিক বলল, সংসার উচ্ছন্নে গেল, ঘর সাজিয়ে রেখে করব কি? চাল ভেঙে এনে তুমি দোকান-ঘর বাঁধ।

ভূষণ বলে, বেশ। আড়াই শ টাকা দিতে পারি—

দ্বারিক বলে, যা তোমার খুশি। টাকা নয় কিন্তু, ধান—ধান—

তার চেয়ে বাঘের দুধ চাও না কেন সর্দার?

দ্বারিক সর্দারের মতো মানুষ হাত জোড় করে সামনে দাঁড়ল।

দিতেই হবে। তোমার ভাল হবে দাস মশায়। শালিখানেক অন্তত ধান দাও আমাদের। তোমার অনেক আছে।

ভূষণ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। অনেক আছে? কোন্ শালা রটাচ্ছে এসব কথা? বদনাম দিয়ে বাড়ি-ছাড়া করবে আমায়।

খপ করে দ্বারিক তার হাত চেপে ধরে। আবার পা ধরতে যায় দেখে ভূষণ পা তুলে আসন পিঁড়ি হয়ে বসল।

দ্বারিক বলে, কত যত্নের ঘর আমার! বাদা থেকে কাঠ আনা, দক্ষিণি কারিগর এনে খুঁটির উপর পল-তোলা। দেখেছে তো—কত বছর লেগেছিল ঐ ঘর বাঁধতে। সমস্ত ভেঙে-চুরে নিয়ে এসগে তুমি। আমার বাগান নাও, পুকুর নাও—ভাদ্র আর আশ্বিন এই দুটো মাস কেবল চালিয়ে দাও ভূষণ। বুড়োমানুষ—বলছি, তুমি আজ্যেশ্বর হবে, ছাইমুঠো ধরলে সোনামুঠো হবে, আমাদের আশীর্বাদ।

তার মুখের দিকে চেয়ে ভূষণ আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল। বলে, আচ্ছা, আচ্ছা,—তামাক খাও দিকি। সুলুক-সন্ধান দিচ্ছি, নির্ঘাত পেয়ে যাবে। ধান নিয়ে তো কথা—

॥ ৪ ॥

মানুষ ধান-চালের অভাবে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে, গাঁয়ে টিকতে পারছে না। ভূষণ দাসের আছে। তা সত্ত্বেও তার ঐ অবস্থা। পালাতে হবে; না পালিয়ে উপায় নেই।

দুপুরবেলা রান্নাঘরে ভূষণ আর বিজয় খেতে বসেছে।

কারা গো, ধুপধাপ করে আসছে কারা ?

উঁকি মেরে দেখল, পাড়ার দশ-বারোটা ছেলেমেয়ে—বিনোদের ছোট ছেলে পটলের খেলুড়ে।

ভূষণ ধমক দিয়ে ওঠে, খেলার সময় নাকি এটা ? যা-যা—চলে যা বাড়ি—

তারা দাওয়ার ধারে সরে দাঁড়ায়, বকাবকি কানেই যাচ্ছে না যেন। পা বাড়িয়ে ভূষণ দুয়োর ভেজিয়ে দিল।

কিন্তু পারবার জো নেই বিন্দু-বউর জন্য। দুয়োর খুলে সে বাইরে গেল। বলে, বোস্ বাছারা—সারি দিয়ে বসে পড়্ দিকি। পাটালির পায়েস রেঁধেছি, খেয়ে যা দুটি দুটি।

দাওয়াটা জুড়ে তাদের পাতা পেতে বসাল। এতগুলো প্রাণী—কিন্তু সাড়াশব্দ নেই, চোরের মতো খেয়ে যাচ্ছে।

ভূষণ রাগ করে ওঠে, দিলে তো লুটিয়ে-পুটিয়ে ? তুমি কি খাবে ? মূলোর ডাঁটা ?

বিন্দু বলে, কি করব বল ? আমার পটল খাচ্ছে, আর ওরা সব শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াবে—চোখ মেলে দেখা যায় ?

হুঁ, টিকতে দিল না ভিটের উপর। বিজয়ের দিকে চেয়ে ভূষণ হুমকি দিল, তুমি সরে পড় দিকি, তোমার জন্যই যত গণ্ডগোল।

আমার কি দোষ মামা ? আমি কি ডেকেছি ওদের ? আমার মানুষজন আসে তো বাইরের আটচালা-অবধি। চাল নিয়ে সেখান থেকে বিদায় হয়ে যায়।

ভূষণ বলে, যত হাঘরে বাড়ির পথ চিনে যাচ্ছে যে! বড়লোক বলে নাম রটে যাচ্ছে চারিদিকে। তোমার—সেই সঙ্গে আমারও।

এবার বিজয় হাসতে লাগল।

ভূষণ বলে, হাসি নয়। কবে যাচ্ছ বল। তোমার জন্য ডাকাত এসে না পড়ে এ বাড়ি!

বিজয় বলে, আর দু-চারটে দিন মাত্তোর—

দু-চারদিনেই বা কি হবে ? আরো কিছু মড়ক জমবে বটে! কিন্তু মড়া বয়ে নিতে পাঠায় নি তো তোমার কোম্পানি ? দেখলে তো হদ্দমুদ্দ, জ্যান্ত থাকতে কেউ তোমার ফাঁদে পা দিচ্ছে না।

বিজয়ও ঠিক এই কথা ভাবছে কদিন ধরে। এ ভাবে সুবিধা হবে না। পান্নালাল যেমন বলছিল—সেই ধরণেরই একটা প্যাঁচ কষে দেখবে নাকি—দেশ-উদ্ধার আর জাপানি-শত্রুর সম্বন্ধে জ্বালাময়ী গোটাকতক বক্তৃতা ছেড়ে ?

কৃষক-কনফারেন্সে এত মানুষ মাতিয়েছিল, আর এখন চাল ছড়িয়ে এত যে টোপ দিচ্ছে—চাল নেবার বেলা ভিড় খুব, কাজের কথা উঠলে আর কারো টিকি দেখা যায় না।

খাওয়া সেরে ভূষণ ছাতাটা হাতে নিল। দেরি হয়ে গেছে, বিনোদ দোকান আগলাচ্ছে, বাপ গিয়ে পৌছলে তবে সে খেতে আসবে। চালানি কারবার জোর চলেছে। টাকা হরিহর রায়ের—কলকাতা থেকে তিনি মনিঅর্ডারে টাকা পাঠান, মালপত্র এখান থেকে তাঁর উল্টাডাঙার গুদামে গিয়ে ওঠে। সম্প্রতি এক চালান পাট যাচ্ছে, তিনটে বড় ভাউলে বোঝাই হচ্ছে নদীর ঘাটে। ভূষণের এখন নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই।

বেরোবার মুখে দেখে, আটচালা ঘরে বিদেশি কে-একজন। গায়ের ফতুয়াটা খুলে ফেলে তাই নেড়ে লোকটা বাতাস খাচ্ছে। গলায় পৈতের গোছা। ভূষণকে দেখে বলল, একটুখানি জিরিয়ে যাচ্ছি বাবা। রোদ পড়লেই চলে যাব। এক ঘটি জল আর একটা মাদুর পাঠিয়ে দিয়ে যান—

ভূষণকে কিছু বলতে হল না। মাদুর আর তেলের বাটি পটলের মারফত চলে আসছে। অর্থাৎ খবর পৌচেছে ইতিমধ্যেই বিন্দুর কানে। পটলকে ডেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিন্দু বলছে, ঠাকুর মশায়ের সেবা হয় নি নিশ্চয়। উনুন পেড়ে দিয়েছি পটল, চান করে দুটো ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিতে বল্—

চাদর নেবার উপলক্ষ করে ভূষণ ফিরে আসে। এসে তর্জন করতে লাগল, রাস্তার মানুষের সঙ্গে লৌকিকতা করবে। মেয়েমানুষ—ঘরে বসে খাও—জান না, দিনকাল কি হচ্ছে—

বিন্দু বলে, তা বলে ব্রাহ্মণ উপোস করে থাকবেন গেরস্ত বাড়ি?

ব্রাহ্মণ বলে কথা কি—দুনিয়ার কেউ উপবাস করবে, তুমি থাকতে হবার জো নেই। চুল পেকে গেল, তবু ধাত বদলাল না। তদ্বির-তাগাদা করে যা এক-আধ বস্তা চাল আনি, কর্পূর হয়ে উড়ে যায় তোমার এই রীতের দোষে—

সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে ভূষণ দেখল, বিজয়ের যথারীতি পাত্তা নেই,—বাইরের ঘরে টেমি জ্বলছে, ব্রাহ্মণটি সেই রকম বসে।

চলে যান নি ঠাকুরমশায়?

অতিথি ঘাড় নাড়ল।

কেন শুনি?

রাগে রাগে সে দাওয়ায় উঠল। জিজ্ঞাসা করে, কেন—হলকি আপনার? রোদ পড়ল না এখনো?

জবাব নেই। ঠাহর করে দেখে, আহ্নিকে বসেছে। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি

—বিনা উপচারেই চলছে। আহ্নিকের মধ্যে কথা বলতে নেই, আর যতক্ষণ ভূষণ এখানে আছে এ আহ্নিক সারা হবে না কিছুতে।

গলা শুনে বিন্দু চলে আসে! হাত নেড়ে ভূষণকে নামিয়ে নিয়ে চলল। বলে, চেঁচামেচি করছিলে কেন? রোদ লাগিয়ে এসেছেন বুড়ো মানুষ—বললেন, মাথা টিপ-টিপ করছে। রাতটুকু থেকে সকাল হলেই চলে যাবেন—

ভূষণ বলে, হুঁ—যাচ্ছেন! সকালবেলা পা টনটন করবে এই বলে রাখলাম। করে কিনা মিলিয়ে দেখো।

উঠোনে এসে আবার থমকে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর বিস্তর মেয়েলোক। এই পাড়ারই সব। মনের আনন্দে আলাপনাদি হচ্ছিল, ভূষণ এসে পড়ায় থেমে গেছে।

ওঁরা?

বিন্দু বলে, বিষ্যুৎবারে আজ লক্ষ্মীর ব্রত কিনা…সবাইকে ডেকেডুকে আনলাম।

সারা হয় নি?

পূজো-আচ্চা তো হয়ে গেছে। ওঁদের যেতে দিই নি, একেবারে প্রসাদ পেয়ে চলে যাবেন।

মুখ কালো করে ভূষণ বলে, আর ও-বেলা যে প্রসাদ পেলে গুচ্ছের খানেক—তখন কোন বাবব্রত ছিল?

চাপা গলায় বিন্দু বলল, চুপ, চুপ। শুনতে পাবেন। তাদেরই মা-খুড়ি এঁরা তো সব—

ভূষণ বলে, আর বাপ-খুড়োরা জুটেছেন কখন, বল তো? কাল সকালে? তাঁরাই বা ছাড়বেন কেন?

বিন্দু পা-ধোওয়ার জল এনে দিল। পায়ের ধাক্কায় ঘটি উলটে দিল ভূষণ। আপন মনে গজর-গজর করতে লাগল, দেখছি শেয়াকুলের কাঁটা দিয়ে ঘিরতে হবে বাড়ি ঢোকবার রাস্তা। তা ছাড়া রক্ষে নেই। আর পরকেই বা দুষি কেন, বাড়ির গিন্নি যখন এই রকম—

অন্ধকারে এই সময় দুটো ছায়া-মূর্তি ছুটতে ছুটতে এল। মতি সর্দার আর তার ভাইপো।

দাস মশায়, কোঁচ মেরেছে, তোমাদের বিজয়কে। গোঙাচ্ছে সর্দারদের পগারে পড়ে। রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।

ভূষণ লাফিয়ে ওঠে, বলিস কি?

ছেড়ে-বুড়ো সকলে ছুটল মাদারডাঙা-মুখো। দ্বারিক সর্দারের গোলার

পিছনে—জায়গাটা লোকারণ্য হয়ে গেছে। ভূষণ কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বলে, কই? কোথায়?

তখন পগার থেকে বিজয়কে রাস্তার উপর তোলা হয়েছে। কোঁচ বিঁধে আছে ডান-উরুতে, বাঁ-দিকে কাত করে তাকে শোয়ানো হয়েছে। দ্বারিক ছুটে ঘর থেকে বালিশ এনে গুঁজে দিল তার ডান পায়ের নিচে, আহত জায়গায় যাতে নাড়া-চাড়া না লাগে।

ভূষণ আর্তনাদ করতে লাগল, ওরে বাবা, একি হল রে!

দ্বারিক নাড়ি পরীক্ষা করছিল। বলে, আছে এখনো। সদরে এক্ষুণি রওনা করবার ব্যবস্থা কর, দাস মশায়। নৌকো তো নেই—ডোঙার উপর চালি করে একে শুইয়ে দিতে হবে।

মতি সর্দারের বাড়ি বাঁকাবড়শি, হরিহর রায়ের বাড়ির কাছেই। সে আর তার ভাইপো কুটুম্ববাড়ি থেকে ফিরছিল। নিজেরা না খেয়েও কুটুম্বর মুখে দুটো ভাত দেবার জন্য লোকে আঁকুপাঁকু করে, কুটুম্বর কাছে সহজে ছোট হতে চায় না—সেই ভরসায় কুটুম্ববাড়ি যাতায়াত বড্ড বেড়ে গেছে ইদানীং অবশ্য মুনাফা নেই—সেই কুটুম্বরাও আবার বেরিয়েছে তো! তারাও পাল্টা হাজির হচ্ছে এ-পক্ষের বাড়ি।

এই অবস্থার ভিতর মতি সর্দার সবিস্তারে গল্প করছিল, কি আর বলব দাদা, আগে থাকতে তারা বোধ হয় খবর পেয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, ভোঁ-ভোঁ—দরজায় শিকল-তোলা। ভাইপো বলে, কি হবে খুড়ো মশায়? আমারও পিত্তি জ্বলে গেছে। বললাম, কুটুম্ব হয়ে এই রকম যখন ব্যাভার—জলস্পর্শ করব না হারামজাদারের এখানে। ফিরলাম ধুলো-পায়েই। এই অবধি এসেছি, ভাঁটবনের ভিতর শুনি গোঁ-গোঁ করছে। কি রে? কেঁদো ভেবে ভাইপো তো জড়িয়ে ধরেছে আমায়…

খবর শুনে বিনোদও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ছুটতে ছুটতে এল। বিজয় তখন একটু সামলেছে, কথা বলছে চিঁ-চিঁ করে।

বিনোদ বলে, এখানে এসেছিলে কি করতে হে? তোমার মাদারডাঙার বৈঠক তো কবে সারা হয়ে গেছে।

কিচ্ছু জানি নে বড়-দা, কেমন করে এলাম। টের পেলাম, যখন পিছন থেকে ঘ্যাঁচ করে বিঁধিয়ে দিল। আমি বাঁচব না বড়-দা—

হাউ-হাউ করে সে কাঁদতে লাগল।

ভূষণ বলে, এই—গেরিলা-যুদ্ধের প্রাকটিশ শুরু হল এইবার। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে, দেখ। চাষা ক্ষেপিয়ে দিয়ে তারা তো দিব্যি সরে

পড়েছে—এখন সামলাও ঠেলা। পই-পই করে মানা করেছিলাম, কানে না নিয়ে তখন যে বড় মাতব্বরি করতে গিয়েছিলে! ঠিক হয়েছে। এখন কাঁদলে কি হবে বাপধন?

দ্বারিকের যুক্তিই ঠিক। কোঁচ খুলে ফেলতে ভরসা করা যায় না এ জায়গায়। যদি হাড়-মাংস বেরিয়ে আসে, রক্ত-স্রোত বন্ধ করা না যায়! সালতি-ডোঙায় বিজয়কে সদরে রওনা করা হল, বিনোদ গেল সঙ্গে।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। নারিকেল-পাতার কাড়ু জ্বালিয়ে গ্রামের আট-দশটা মানুষ আগু-পিছু নিয়ে ভূষণ বাড়ি ফিরল।

বিন্দু সভয়ে বলে, কাঁপছ যে তুমি ঠক-ঠক করে?

শীত লেগেছে। আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে। লেপ পেড়ে দাও বউ, গায়ে দেব।

॥ ৫ ॥

ভূষণ সেদিন দ্বারিককে চুপি-চুপি বলে দিয়েছিল খাঁ-বাজারের কথা। অনেক দূর—আর একটা জেলা; জলমা থেকেও তিনটে জোয়ার ও দেড়-পো ভাঁটি লাগে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে কিম্বা ডোঙা বেয়ে চলে যাও জলমা অবধি। তারপর স্টীমারে দেবগ্রাম। সে অঞ্চলে নৌকো আটক নেই। দেবগ্রামের ঘাটে বড় বড় সাঙড় থেকে টাপুরে ডিঙি—সকল রকম নৌকো ভাড়ায় পাওয়া যায়। অত্যন্ত চুপি-চুপি নৌকো ঠিক করতে হবে, নয় তো টের পেয়ে গেলে বিস্তর ভাগিদার জুটে যাবে। ধানের জন্য সবাই মরীয়া—কে কি তদ্বির করছে, কাউকে ঘুণাক্ষরে বলবে না। মন্বন্তরে মানুষ স্নেহ-প্রীতি-আত্মীয়তা ভুলে গেছে।

এদিককার লোকে খবর রাখে না—বিস্তর ধান ওঠে খাঁ-বাজারে, যত চাও। তিন হাট আগে ভূষণ নিজে কিনতে গিয়েছিল। অতএব খাঁটি খবর।

খাঁ-বাজারের যত কাছাকাছি আসছে, নানা অঞ্চলের নৌকো আগে-পিছে জুটছে। সবাই একমুখো চলেছে, ত্রিশ-চল্লিশখানা হয়ে দাঁড়াল।

খালের ভিতর দিয়ে ভাঁটি বেয়ে হাটে পৌছতে হয়। হৈ-হৈ চিৎকার উঠল। পোশাক-পরা সিভিক গার্ডের দল ছুটছে খালের দিকে। ভারী বুটজুতোর খটখট শব্দ। ধান এক কণিকা জেলার বাইরে যাবে না। তা হলে যা এখনও পাওয়া যাচ্ছে এদিকে-ওদিকে, সমস্ত শুষে নিয়ে যাবে মন্বন্তর-অঞ্চলে। তেঘরার বাঁক থেকে এই সব নৌকো ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল; মস্ত বড় গাঙ, ঠেকানো যায় নি—কে কোন্ দিক দিয়ে বেরিয়ে এল।

এখানকার এই খালটা ছোট, পুল আছে—কংক্রিটে তৈরি, ফোকরওয়ালা। পুলের ফোকরের মুখ আটকে দাঁড়াল লাঠি হাতে কনেস্টবল আর সিভিক গার্ডের দল।

বাঁক ঘুরে নৌকো দেখা দিল। খালের জল ঢেকে গেছে, প্রকাণ্ড বহর সাজিয়ে আসছে। নৌকোওয়ালাও দেখতে পেয়েছে। তারা পাল্টা চেঁচিয়ে ওঠে, আয়—এগিয়ে আয় সুমুন্দিরা, গেঁথে ফেলব এক-একটা সড়কির মাথায়—

সত্যিই সড়কি এনেছে, মাঝিরা উঁচিয়ে ধরেছে—তীক্ষ্ণ ফলার উপর রোদ পড়ে চকচক করছে। দাঁড়িরা দাঁড় খুলে এক একখানা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়েছে মাঝিদের পিছনে।

থানা কাছেই। খবর পেয়ে দারোগা বন্দুক নিয়ে ছুটে এলেন! কিন্তু বন্দুকে ভয় পায় না, পেটের ক্ষিধে এত সাহস এনেছে মানুষের মনে। আর বন্দুক শুধু দেখবার কথা—বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ছুঁড়বার হুকুম নেই। ছুঁড়তেও মায়া লাগে, বুকের পাঁজরা একটা-দুটো করে গোনা যায় ঐ মহাবীরগুলোর—ছুঁড়বে কোথায়?

খানিকটা হল্লা করে দারোগা চলে গেলেন। চাকরি বাঁচানো নিয়ে কথা—তা এতেই ঢের হয়েছে। গঞ্জের লোক দেখছে, চেষ্টার তিনি কসুর করেন নি। মনে মনে একবার হয়তো ভাবলেনও ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে হাতি গলে যাচ্ছে—কে নয় চোর? শিরে সর্পাঘাত, তাগা বেঁধে বিষ আটকাবে কোনখানে? আহা পেরে ওঠে তো হতভাগারা খাক না দু-এক গ্রাস চুরি-চামারি করে।

তিন-চার দিন ধরে ঢ্যাড়া দিচ্ছে, দশ টাকা মনের বেশি ধান কেউ বেচতে পারবে না। বেচলে জেল হবে, অথবা জেল-জরিমানা দুই-ই হতে পারবে—

শুনছ হে, কি বলে গেল?

বলুকগে। কতই তো বলছে ও-রকম। তেলের দর বাঁধছে, আটা-ময়দার দর বাঁধছে, মস্ত দরের ফিরিস্তি ছাপিয়ে টাঙিয়ে দিচ্ছে। ওদের মতো ওরা করে যাচ্ছে, আমাদের মতো আমরা কিনে-বেচে যাই—

কিন্তু সেদিন সত্যি সত্যি বিষম কাণ্ড হয়ে গেল একটা। নদীর ধারে বটতলা গোবর-মাটি দিয়ে নিকানো। ব্যাপারিরা ধান এনে ঢালে সেইখানে। দুপুরের পর থেকেই বেচা-কেনা জমে। সকালবেলা এখন জন কুড়ি-পঁচিশ মাত্র ধান এনেছে, খদ্দের পত্তোরেরও ভিড় নেই। দ্বারিক ভরসা করে বিকাল

অবধি থাকতে পারে না। বিক্রির জন্য ধান এনে এনে নামাচ্ছে, দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। তাড়াতাড়ি তারা বস্তা নিয়ে নৌকো থেকে নেমে এল। ধান ঢালছে, কয়াল খুব ব্যস্ত—কাঁধের গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে আর ধান মেপে চলেছে, রামে এক—রামে দুই—রামে তিন—কই হে ঢাল ব্যাপারি, আরও লাগবে—খুঁচি পুরল কই ?

তুখড় কার্তিক বিড়ি বের করে কয়ালের হাতে দেয়। বলে, একটু জিরিয়ে নাও কয়াল মশায়। ঘেমে নেয়ে উঠছ, ছেলের হাতে দাও না খুঁচিটা—মাপতে লাগুক। শোন--

হাটের বাইরে একটু দূরে ডেকে এনে বলে, দেখে-শুনে কিনে দিতে হবে। শ' দুই টাকার মাল।

কয়াল প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে। ধান এখন সোনার চেয়ে মাগ্যি। ও আমি পারব না। মার খেয়ে মরবে কে ?

পেটে খেলে পিঠে সয়। ধর—

দুটো টাকা তার হাতে গুঁজে দিল। কয়াল বলে, দু-শ টাকার কর্ম নয় রে দাদা—

দু-টাকার নয়, দশ টাকারও নয় ?

কয়াল রাগ করে বলে, তোমাদের কি আক্কেল-বিবেচনা আছে ? পাঁচ টাকার ধান ষাট টাকায় কিনতে এসেছ, আর আমাদের বেলাতেই তখন হাত শুকনো—

মীমাংসা একটা হল শেষ পর্যন্ত। মাপের মুখে কয়াল ভাল করে পুষিয়ে দেবে। আড়াই-সের খুঁচিতে ধান মাপ হয়, টেনে মাপলে অতে তিন সেবের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া যায়।

হাণ্টার নিয়ে দারোগা দেখা দিলেন এই সময়।

দশ টাকার বেশি মন বেচতে পারবে না। বে-আইনি।

ব্যাপারি বলে, কেনা যে হুজুর সাড়ে বারো—

কেন, কেন ? কেনাও অপরাধ, জেল হয়ে যাবে।

আচ্ছা হুজুর। বুঝতে পারি নি। যা হয়েছে—আজকের দিনটা বিক্রি করে যাই।

যাদের ধান তখনো হাটে নামায় নি, গতিক দেখে ছুটোছুটি করে তারা পালায়।

দারোগা বললেন, সমস্ত ধান সীজ করা হল। যারা কিনতে এসেছ, লাইনবন্দি হয়ে দাঁড়াও। এদের গুনে ফেল তো করালীচরণ—

এগারো জন হল।

দ্বারিক এগিয়ে এসে বলে, আমারও কি দাঁড়াতে হবে হুজুর? আমার কেনা হয়ে গেছে, ঐ ছোট গাদাটা আমার। হুকুম হয় তো নৌকোয় তুলি। অনেক দূরের পথ—

কত দূর?

অনেক দূর হুজুর, পাইকঘেরি থানা—সেখান থেকেও ক্রোশ তিনেক। দুঃখের কথা কি বলব—হাজার টাকা খরচ করে ও-বছর টিনের ঘর বেঁধেছিলাম, আড়াই শ' টাকায় বেচে দিয়ে ধান কিনছি।

দারোগা বললেন, ভিন্ন জেলায় ধান সরাবে আর এখানকার মানুষ মরবে উপোস করে?

কয়ালকে হুকুম দিলেন, এ ধান তোমার জিম্মায় থাকল মহাদেব। এর এক চিটেও যেন না নড়ে।

দ্বারিক হাহাকার করে ওঠে, হুজুর পেটে খাব বলে সাধের ঘর বেচে এলাম। ঘর গেল, পেটেও দানা পড়বে না? যাবেন না, চলে যাবেন না, বলে দিন কি হবে—

দারোগা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, দশ টাকা দরে এখানকার ঐ এগারো জনের মধ্যে ভাগ হবে এই ধান। বিদেশি মানুষ, ভালোয় ভালোয় সরে পড়, নয় তো প্যাঁচে পড়ে যাবে—

হাণ্টার আস্ফালন করে বললেন, পালা—পালা বলছি—

বিকেলবেলা বেচাকেনা যখন জমজমাট হবার কথা—দেখা গেল, হাটের সেই নিকানো বটতলা খাঁ-খাঁ করছে। একটা ব্যাপারি নেই, খদ্দেরের পর খদ্দের এসে মাথায় ঘা দিচ্ছে দারোগাকে গালিগালাজ করছে মনে মনে।

আমবাগানে গা-ঢাকা দিয়ে কে যাচ্ছে ওদিকে?

আমি গো আমি। মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরছি এখন।

কাঁধে কি ওটা? বস্তা? ধান? কোন্ নবাবের ঘরে মেয়ে দিয়েছ, মেয়ে ধান দিয়েছে বাপের কাঁধে তুলে?

দিয়েছে চুরিচামারি করে; কেন নজর দিচ্ছ বাপু?

কোথায় পেয়েছে এ ধান, লোকটা কিছুতে ভাঙতে চায় না। কার্তিকও তেমনি নাছোড়বান্দা। শেষে ভয় দেখায়, থানায় ধরে নিয়ে যাব এই ধানসুদ্ধ। বুঝবে মজা। এই বেলা বল শিগগির—

বিল দেখতে পাচ্ছ, ঐ যে একটানা ধানবন—ডিঙি বা ডোঙা নিয়ে ঘুরলে কিংবা নজরে খুব জোর থাকলে দেখতে পাবে, ধানের মাথা ছাড়িয়ে এক-

একটা লগি উঁচু হয়ে উঠছে এক-এক জায়গায়! ভাল করে নজর করতে না করতে লগি ডুবে যাচ্ছে। এই হল সঙ্কেত, এর থেকে বুঝে নেবে বৃত্তান্ত। ধানের জন্য মানুষ জল-কাদা ভেঙে বিল ঝাঁপিয়ে ছুটছে ঐ সব লগি নিশানা করে। সৌভাগ্যবান যারা দু-পাঁচ খুঁচি জোটাতে পেরেছে, সন্ধ্যার আঁধারে অপথে-বিপথে চুপি চুপি তারা গ্রামে ওঠে। আগে বিক্রি হচ্ছিল থাঁ-বাজারে প্রকাশ্য বট-ছায়ায়, এখন বাজার বসে গেছে দিগন্তব্যাপ্ত বিলের সর্বত্র।

জমাদার এসে রিপোর্ট করছিল দারোগার কাছে—এই এক আচ্ছা কায়দা বের করেছে হুজুর। আমাদের কারো গন্ধ পেলে তক্ষুণি লগি নামিয়ে নেয়। কসাড় ধানবনে কোন্ ব্যাপারি কোথায় ঘাপটি মেরে আছে—কার সাধ্য খুঁজে বের করে! আইনকে ফাঁকি দিচ্ছে এই ভাবে।

দারোগা বললেন, তোমাদের বলে রাখছি, একা-দোকা ওসব জায়গায় গোঁয়ার্তুমি করতে যেও না কেউ। ক্ষিদেয় হন্যে হয়ে গেছে। দেশি মানুষ এরা—কিনুকগে ধান যে ভাবে পারে, তবে বিদেশি নৌকোর উপর খুব কড়া নজর রাখবে। এক চিটে ধান বাইরে চলে যেতে না পারে—

হল্ট—খাড়া রও—

মড়া হুজুর, বল হরি, হরিবোল—

খোল্ মড়া। দেখব।

মেয়েছেলে হুজুর—

অর্থাৎ, মেয়েছেলে মরে গেলেও যেন তাদের আবরু থাকে! মেয়েছেলের কথা বললে দেখতে চাইবে না, ছেড়ে দেবে।

বজ্রকণ্ঠে জমাদার বলে, নামা বলছি।

তখন কাঁধের বোঝা ফেলে দিয়ে বাপ-বেটা দৌড় দেয়। দফাদারের লাঠি পড়ল সটান দ্বারিকের মাথায়।

বাবা গো!

রক্ত দরদর করে পড়ছে, তবু দ্বারিক দৌড়চ্ছে। দৌড়—দৌড়—। দু-খানা পা শুধুই সম্বল আজকে পৃথিবীতে, পা চালাচ্ছে পুরোদমে—আর যে চলে না! ঠক-ঠক করে কাঁপছে, আশি বছরের অতিপুরানো জীর্ণ হাড় দু-খানা বিশ্রাম চাচ্ছে। রাস্তা, রংচিতের বেড়া, ওপরে অড়হর-ক্ষেত। লাফিয়ে পার হতে গিয়ে সে পড়ে গেল বেড়ার পাশে। কাশবন আর কাঁটাঝিটকের ঝাড়—বাঃ, খাসা জায়গা তো! কি সুন্দর তুলোর গদি পেতে রেখেছে! আ-হা-হা—

কার্তিক কিন্তু ধরা পড়ে গেল। সে ছুটছিল সদর রাস্তা বেয়ে। না খেয়ে যত দুর্বল হোক, কেউ তার সঙ্গে ছুটে পারে না। কিন্তু খাল সামনে পড়ে

গেল। খালে সাঁকো-পুল কিছু নেই। পিছনে চার জন ধর্‌-ধর্‌ করে আসছে। কার্তিক ফিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হাত দু-খানা একত্র করে দাঁড়িয়ে আছে। এসে বাঁধুক ওরা, উপায় কি?

রাত্রি হল। কার্তিককে লক-আপে নিয়ে রেখেছে। এখন দিব্যি আরাম লাগছে। বাঁচা গেল, পেটের ক্ষিধেয় আর এদেশ-সেদেশ করে বেড়াতে হবে না। ঝিমোচ্ছে···

বাড়িতে যামিনী আর মা। যেন স্বপ্নের ঘোরে কার্তিক হেসে উঠল। ভাতের হাঁড়িতে জল চাপিয়ে বসে আছিস নাকি তোরা? থাক বসে। যাচ্চে, যাচ্ছে ধানের ভরা। গাঙের ঢেউয়ে দুলে দুলে যাচ্ছে—

ওদিকে জমাদার হেসে হেসে দারোগার কাছে কৃতিত্বের কাহিনী বলছে, শুনুন স্যর, কি রকম বুদ্ধি বের করেছিল। নৌকো থেকে মাদুর নিয়েছে, পালের বাঁশ খুলে নিয়েছে। ধান ছোট ছোট বস্তায় পুরে মাদুর জড়িয়ে বাঁশে বেঁধে এমনভাবে গাঙের ঘাটে নিয়ে আসছিল—ঠিক যেন মড়া। আমরাও তক্কে তক্কে ছিলাম···

নটা বাজল ঢংঢং করে। ঘুমের আবিল কেটে কার্তিক তড়াক করে উঠে বসল। চেঁচিয়ে ওঠে, ভাত দেবে কখন তোমরা? দু-দিন খাই নি, জান?

যেন এখানে আগাম পয়সা চুকিয়ে দিয়ে রেখেছে—এই রকম ভাব।

লোহার রেলিঙের ওদিক থেকে করালী দফাদার জবাব দেয়, পোনামাছের কালিয়া চাপানো হয়েছে বাবাজি। সবুরা দিয়ে ভাত-ব্যঞ্জন সাজিয়ে নিয়ে আসছেন তোমার শাশুড়ি—

সাত চোরের মার খেয়েছে কার্তিক, মাথায় গোলমাল লেগেছে, ঠাট্টা বুঝতে পারে না। বলে, তা হলে এক ঘুম ঘুমিয়ে নেব না কি? কি বলেন?

আঃ—বলে ধুলোর উপর মাদুর-মোড়া সেই ধানের বস্তাগুলো মাথায় দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে কার্তিক চোখ বুজল।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

বাইরে গেরিলা-আতঙ্ক, ঘরের মধ্যে বিন্দু-বউর লক্ষ্মীপূজা এবং শিশু ও ব্রাহ্মণসজ্জনের সেবা। পৈতৃক বাড়ি ছাড়তেই হবে।

সন্ত্রস্তভাবে দিন পনের কাটিয়ে একদিন দোকান থেকে ফিরবার সময় ভূষণ গণ্ডা তিনেক তালা নিয়ে এল।

বিন্দু হেসে বলে, এই বুদ্ধি করেছ বুঝি ? বাড়ির রাস্তায় কাঁটা না দিয়ে বাড়ির গিন্নিকে তালা আটকাবে ?

ভূষণ বলে, তালা দুয়োরে দিয়ে বেরুব। যেখানে যাচ্ছি, শেয়ালকুলের চেয়েও জবর বেড়া সেখানে।

কোথায়।

হরিহর রায়ের বাড়ি। কেউ নেই—অন্দর-বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। রায় মশায়কে তাই চিঠি লিখেছিলাম। জবাব এসেছে। ওখানে গিয়ে আমাদের থাকতে বলেছেন।

বিন্দু রাগ করে বলে, ছি-ছি-ছি ! ভাতের কাঙাল দু-চার জন আসে—ভিটে ছেড়ে পালাচ্ছ তাদের ভয়ে।

উঁহু, প্রাণের ভয়ে। গলা খাটো করে ভূষণ বলতে লাগল, মেয়েমানুষ—বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই, অবস্থা তাই তোমার নজরে আসছে না। এত বড এই গাঁয়ের মধ্যে ভরপেট দুবেলা খাচ্ছি কেবল আমরা। শালাদের হিংসে হচ্ছে। বিজয়কে মেরেছিল—সে অবশ্য ধরি নে। কু-নজর দিত নাকি মেয়েছেলের উপর। তা হলেও সামাল হয়ে থাকা দরকার। যত বেটা হেলো-চাষা কাঁচ-সড়কি শানিয়ে বসে আছে শত্রু-বধের জন্য। কি কাণ্ড করে গেছে রায় মশায়ের মেয়ে ! কনফারেন্স না গুষ্টির পিণ্ডি ! তারা তো দিব্যি শহরের তেমহলায় পা দোলাচ্ছে, এখন মর্‌ শালারা যারা গাঁয়ের জল-জঙ্গলে পড়ে আছিস।

বিন্দু বলে, তা এই পথটুকু ভেঙে ওরা বুঝি বাঁকাবড়শি অবধি যেতে পারবে না ?

ভূষণ হেসে বলে, তারও এক বেড়ে কায়দা হয়েছে। লঙ্গরখানা খুলেছে রায় মশায়ের মণ্ডপ-বাড়ি। রেগেমেগে যায় তো যাবে তো সেই অবধি। তারপর চার চার হাতা খিচুড়ি। রাগ জল হয়ে গিয়ে ভরা-পেটে সব জকার দিতে দিতে ফিরে যাবে। অন্দরবাড়ি অবধি কেউ এগুবে না।

নিশুতি গ্রাম শ্মশানের মতো। ভূষণ, বিনোদ আর বউ-ছেলেমেয়েরা চলেছে। দিনমানে যাওয়া যায় না, দশকথা উঠবে, দশরকম জবাব দিতে দিতে হিমসিম হতে হবে। লোকে চোখ ঠারাঠারি করবে, ভূষণ দাস আর কাজিপাড়ার সখিনা বিবিতে তা' হলে তফাত রইল কোনখানে ?

বাঁকাবড়শি গ্রামের ভিতর এসে মনে হল, সাঁ করে কারা আমবাগানের ছায়ায় অন্ধকারে সরে গেল।

বিনোদ চড়া গলায় প্রশ্ন করে, কে ?

জবাব নেই। ভূষণ বলে, চল—চল। চোর-ছ্যাচোড় হবে হয়তো বিনোদ তবু হ্যারিকেন উঁচু করে কয়েক পা চলল সেইদিকে।

মতিরাম যেন! কি হচ্ছে ওখানে?

মতি বলে, গাঁ ছেড়ে চললাম—

চলবে তো রাস্তা দিয়ে—জঙ্গলের মধ্যে কেন?

মতি এগিয়ে এল খানিকটা।

যাচ্ছিলাম। তা মেয়ে তুটোও যাচ্ছে কিনা, তোমাদের দেখে সরে দাঁড়াল।

ভূষণ আশ্চর্য হয়ে বলে, রাত্তিরবেলা এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে মেয়েছেলে নিয়ে যাচ্ছ?

দিনমানে যাব কি করে?

নিজের পরণের কাপড়ের দিকে তাকাল মতি। পরিধেয়ের যে অবস্থা—পুরুষমানুষ, বুড়োমানুষ—তার পক্ষেই এদের সামনে হ্যারিকেনের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। কিছু আর ব্যাখা করে বলতে হয় না।

ভূষণ কোমল কণ্ঠে বলে, যাচ্ছই বা কেন মতি? বাড়ির পাশে এমন তোফা লঙ্গরখানা হয়েছে। রায় মশায় আদেশ করেছেন, আমি নিজে তদারক করব কাল থেকে। এদ্দূর থেকে জুত হবে না বলে সবসুদ্ধ চলেছি রায়বাড়ি। তোমাদের জন্যেই যাচ্ছি, এই দেখ, নিজের বাড়ি ঘর-দোর ছেড়ে।

এই যুদ্ধ ও আকালের দিনে অনেক বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে 'লঙ্গরখানা' নামক নূতন কথা এবং নূতন অনুষ্ঠানটির সম্বন্ধে সম্প্রতি পরিচয় ঘটেছে গ্রামবাসীদের। বিনামূল্যে হাতা চারেক গ্রুয়েলের বন্দোবস্ত—তা সত্ত্বেও দলে দলে এই রকম যাচ্ছে, প্রায় প্রতি রাত্রেই। এতবড় অঞ্চলটা দিনমানে যেন মরে থাকে, বিবস্ত্র মানুষ পথে-ঘাটে বেরোতে পারে না,—কিন্তু সকালবেলা খোঁজ নিয়ে দেখগে, খাঁ-খাঁ করছে এবাড়ি-ওবাড়ি।

ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, তা, চললে কোথা তোমরা?

মতি বলল, ঠিকঠাক নেই সে রকম কিছু; শহরে-বাজারে কোনখানে—

ভূষণ আগুন হয়ে ওঠে। বড্ড কুলীন হয়েছ—না? রায় মশায়ের মণ্ডপে খেতে সরম লাগে, আর শহরে বুঝি থালা সাজিয়ে নিয়ে বসে রয়েছে? যাও—টের পাবে মজা।

সেটা অবশ্য আন্দাজ করতে পারে মতি। শহরের খবরও কিছু-কিছু এসে গেছে গ্রাম অবধি। তবু শহরে যা চলবে, গ্রামে বাপ-পিতামহর ভিটেয় বসে তা চালায় কি করে? কটা বছর আগেও তার বাড়ি দুর্গোৎসব হয়েছে, তিন জন ঢাকি ঢাক বাজিয়েছে অহরহ। কত লোকের পাতে ভাত দিয়েছে সে সময়।…

পূবপাড়ার শীতল সামন্ত রওনা হচ্ছে। বোঁচকা বেঁধে কাঁধে নিয়েছে। পিছনে শীতলের মা-বোন, সেজ ছেলেটা আর কোলের মেয়ে। উনুন ভেঙে দিল, আর কেউ এসে না রাঁধে—গৃহস্থের উনুনে পথের মানুষ কেউ এসে রাঁধাবাড়া করবে, বিষম অলক্ষণ সেটা! কিন্তু কে-ই বা আসবে, আর রাঁধবেই বা কি! চিরকালের সংস্কার—মন বোঝে না তাই।

যেতে যেতে শীতলের ছেলে বলে, দাঁড়া, পিসি, দোরঘুড়িটা রয়েছে মাচার উপর—নিয়ে আসি। পিসিরও মনে পড়ে যায়, তাই তো—মাচা-ভরতি তোলা রইল তার মশালের গাদা। পাটকাঠিতে গোবর দিয়ে সমস্ত মাঘ মাস সে মশাল-বানিয়েছিল বর্ষাকালে পোড়াবে বলে।

কাজি-পাড়ায় শোন, গলা ফাটিয়ে কাঁদছে সখিনা বিবি, ধূলোয় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। ওদের যে আমি এক কুড়ি বছর চোখে-চোখে চৌকি দিচ্ছি—কার কাছে রেখে চলে যাব? বছর কুড়ি আগে সখিনার একটা চুল পাকে নি, দেহে কুঞ্চনরেখা পড়ে নি—তিন দিনের আগ-পাছ তার বর ও ছেলেটা মরে যায়। উঠানের ধারে তেঁতুলতলায় তাদের কবর। বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে অনেক দুঃখে এতদিন ভিটেয় ছিল—শুধু ভিটের মাটি চিবিয়ে থাকবে আর কেমন করে?

॥ ২ ॥

মতির দলটা আর খানিক এগিয়ে মাঠের ধারে কাঁকায় এসে দেখে—পান্নালাল। হাতে লাঠি, পান্নালাল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। মনের বিশ্বাস আলগা হয়ে যাচ্ছে যেন এতকাল পরে। কি রকম সে হয়েছে আজকাল! লোকের ধারণা, পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভূষণও হরিহর রায়কে এক চিঠিতে তাই লিখেছিল।

শ্মশান-রক্ষীর মতো রাত্রে, কদাচিৎ বা দিন-দুপুরে, দীর্ঘ পদক্ষেপে পান্নালাল এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। নিরীহ নিষুপ্ত এই এদেরই জন্য সে সর্বত্যাগী। অদৃষ্টকে গালি দিয়ে এবং যে-দোকানি একটা দেশলাই এক আনা দামে বিক্রি করেছিল একমাত্র তাকেই দায়ী করে নিঃশব্দে এরা বিদায় হচ্ছে। ঐ দোকানদার-মজুতদার ছাড়া আর কারো নামটা উচ্চারণ করবার উপায় নেই পরাধীন দেশে। কোথায় কোন্ দূর-সমুদ্রে বোঝাই জাহাজ নিঃশব্দে নিঃসীম দিগন্তে বিলীন হচ্ছে, আমাদের কোন শাসক কর্ণধার লাখ লাখ ঘুষের টাকা কোথায় রাখবে, জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না—এ সব খবর কেউ কেউ জানেও যদি, কে বলবে মুখ ফুটে? হাঁ করে আছে আইন, গ্রাস করে বিলুপ্তির অন্ধকারে

অমনি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। বেপরোয়া যারা বলতে পারত, তাদের জেলে পুরে পিশাচ-নৃত্য চলেছে দেশ জুড়ে। রণক্ষেত্রের প্রান্তবর্তী বাংলাদেশে অটুট শান্তি—কর্তৃপক্ষের গর্ব করবার কথাই বটে। কিন্তু সমস্ত জেনে শুনে পান্নালাল কি করবে এখন? রাগে শুধু হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। জেলের কয়েদির মতো কিছুই করতে পারছে না, দাঁড়িয়ে চোখ মেলে এই ভয়ান? ধ্বংস-স্রোত দেখা ছাড়া!

মতিদের দেখে সে থমকে দাঁড়াল।

তোমরাও চললে তা হলে তীর্থিধম্মে?

মতি চুপ করে রইল।

বেরোও বেরোও। আপদ-বালাই যত আছ, দূর হয়ে যাও গ্রাম থেকে। দূর—দূর—

লাঠি তুলে এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ায় যে মাথায় একটা বাড়ি মেরে বসেই বা! কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর পান্নালাল চেয়েও দেখল না, ছুটে চলল। অনতিদূরে কানা-কোদার রাড়িব দিকে।

আতরমণির আর্তনাদ আসছে, খেয়ে ফেলল—ও বাবা, আমায় যে খেয়ে ফেলল একেবারে!

কানা-কোদা মরে গেছে না খেতে পেয়ে। লাজুক কবি—আসরের মধ্যে ছিল সিংহের মতো দুর্বার। মরবাব দিনও সকালবেলা বটতলায় ছাপা অতিজীর্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণখানা পড়েছিল। যদি আবার গাওনা হয় কোনখানো প্রতিপক্ষ বেকায়দায় ফেলে—পুবাণ-প্রসঙ্গ জানা না থাকলে ব্যূহভেদ করবে সে কেমন করে?

যে-আসরে কানা-কোদা, সেখানে আতরমণি। হাতে কাঁসার খাড়ু, কপালে বড় সিঁদুরের কৌটা - খাঁচার পাখির মতো কানা-কোদার গান নাকি সে বন্দী করে রেখেছিল। তার চোখের ইসারা পেলে তবে পাখি পাখা মেলত। এই নিয়ে লোকে কত ঠাট্টা করেছে তাকে আর কানা-কোদাকে। সেই আতরমণি ছটফট করছে। তিন-চারটে শিয়াল কামড় দিচ্ছে জ্যান্ত মানুষের গায়ে। জ্বর এসেছে—প্রায় বেহুঁশ জ্বরের ঘোরে, তারই মধ্যে চেঁচাচ্ছে।

পান্নালাল এসে পড়ল। ঘরে বেড়ার হাঙ্গামা নেই—বর্ষায় মাথা গুঁজবার জন্য চাল একখানা চাই, তা-ই কোন রকমে এখনও খাড়া আছে গোটা আষ্টেক খুঁটির উপর। শুধু পিছন দিকে কানা-কোদার নিজের হাতে পোতা একটা ঝুমকো-জবার গাছ। অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে।

শিয়ালগুলো লাফিয়ে পড়ল ভিটের কানাচে। পান্নালাল লাঠি উঁচিয়েছে শিয়াল লক্ষ্য করে নয়,—আতরমণির দিকে। বলে, মাথা ভেঙে দেব বুড়ি। পেটের ভাত গেছে, মানুষের রাতের ঘুমও নিয়ে নিবি নাকি?

আতরমণি কাতরে বলে, রক্ত পড়ছে বাবা, এই দেখ—

পড়ছে তো পড়ছে—পান্নালালের মাথাব্যথা নেই। তা ছাড়া দেখবেই বা কি করে? অন্ধকার—এখানে বলে নয়, এত বড় অঞ্চলে কেরোসিন আলোর বিলাসিতা এখন তিনটে-চারটে বাড়িতে মাত্র। যেমন একটা ঐ দেখা যাচ্ছে খাল-পারে হরিহর রায়ের দোতলার উপর। এতকাল অন্ধকার থেকে আজই কেবল আলো জ্বলছে। ভূষণেরা গিয়ে জ্বালিয়েছে।

উঠোনে হুটোপুটি, শিয়ালে ঝগড়া বাধিয়েছে। বোঁও ও করে পান্নালাল লাঠি ছুঁড়ল। শিয়েলের দিকে কিম্বা হরিহর রায়ের বাড়ির আলোর দিকে। লাগল না অবশ্য। শিয়ালেরা সরে গেল।

বুড়ি থেমেছিল একটু—শিয়ালের সাড়া পেয়ে আবার চেঁচাচ্ছে, ও বাবা, বাবা গো! পান্নালালকে বলে, নিয়ে চল বাবা, তুমি যেখানে আছ। বড্ড ভাললোক তুমি!

পান্নালাল বলে, খুন করে ফেলব ভাললোক বললে।

ভয় পেয়ে আতরমণি একটু চুপ করে থাকে। আবার কাতরায়, নিয়ে চল পণ্ডিতমশায়, এখানে থাকলে খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলবে।

চল—

আতরমণি বলে, উঠবার জো নেই বাবা, ধরে তুলতে হবে।

বয়ে গেছে তবে আমার—বলে পান্নালাল পা বাড়াল। হঠাৎ ফিরে এসে এক ঝটকায় কাধের উপর তুলে নিল তাকে।

হন-হন করে চলেছে। নামাল বাঁধানো মেজের পাকা সানের উপর।

এ কোথা নিয়ে এলে বাবা? এ যে মস্ত বাড়ি!

পান্নালাল বলে, মস্ত মস্ত কাণ্ড হয়ে থাকে এখানে। দুপুরে-সন্ধ্যায় ভিখারি-ভোজন হয়, গন্ধ পাচ্ছিস না? খেসারির ডাল আর ক্ষুদসিদ্ধ করে খাওয়ায় হরিহর রায়। ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেছে।

ভিতর-বাড়িয় জানলার আলোর দিকে তাকিয়ে পান্নালাল রুক্ষ হাসি হেসে ওঠে। বলে, চেঁচা দিকি সোনামানিক, এইবার যত পারিস। সমস্ত রাত চেঁচা—ছাত ভেঙে ফেল চেঁচিয়ে।

আতরমণি কেঁদে ওঠে, চলে যেও না বাবা, ফাঁকা মণ্ডপে ফেলে রেখে। মরে যাব।

বেঁচেই বা কার কি করবি ? মর, পারিস তো মরে যা দিকি। তাতেও খানিকটা মুশকিলে পড়বে, মড়া ফেলতে মানুষ ডেকে ডেকে বেড়াতে হবে ওদের।

রাত্রির উন্মত্ততার পর সকালবেলা পান্নালাল শূন্য পাঠশালা-ঘরের দাওয়ায় পড়ে আছে। রোদ এসে পড়েছে মুখের উপর।

দাদা, দাদা গো, শুনছ ? আমার শ্বশুর ফিরে এসেছেন।

রোগের যন্ত্রণায় দিনের পর দিন সর্দার-বাড়ির কামরার মধ্যে পান্নালাল ছটফট করত, যামিনী সে সময় পাখা নিয়ে বাতাস করেছে, ডাব আর পাকা-পেঁপে কেটে সামনে এনে ধরেছে। আরোগ্য-স্নানের দিন নিম-হলুদের ব্যবস্থা করেছে, আনন্দ সেদিন ঝলমল করছিল শান্তশ্রী বউটির মুখের উপর। তবু সে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলে নি পান্নালালের সঙ্গে। আজকালই বলে থাকে—পান্নালালের পাগল হয়ে যাবার গুজব রটনার পর থেকে। এখন আর বাধা নেই কিছু। টিনের ঘর নেই, মাটির পাঁচিলটা খাড়া আছে—কিন্তু খসে খসে পড়ছে, সর্দার-বাড়ির বউয়ের বেহায়াপনা নিয়ে পাঁচকথা বলে বেড়াবার মানুষও নেই পাড়ার মধ্যে।

যামিনী ডাকছে, কি বলছি, শুনতে পাচ্ছ ? ও দাদা—

এখন পান্নালাল আলাদা আর এক মানুষ। চোখ মেলে প্রসন্ন হাসি হেসে বলে, ফিরেছেন দ্বারিক ? বাঁচা গেল। তখনই বলছিলাম, ভাবনা কোরো না বোন, দূরের পথ—দেরি কিছু হবেই। দুপুরে তা হলে নেমন্তন্ন আমার কি বল ? চাট্টি ধান রোদে দিয়ে ভেনে কুটে নাওগে তাড়াতাড়ি। জাত তো মেরে দিয়েছ—রোগের সময় যখন বার্লি রেঁধে খাওয়াতে। এবারে পেট ভরাই।

যামিনীর মুখের দিকে নজর পড়ে পান্নালাল স্তব্ধ হল। যেন মরা-মানুষের মুখ। ব্যাকুল হয়ে যামিনী বলতে লাগল, চারদিন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁচেছেন দাদা। শুধু পাকা তাল খেয়ে আছেন এ কদিন। এসেই চেঁচামেচি করছেন 'খাব' 'খাব' করে। মেলতুক নিয়ে ঘুরছেন, ভাত না দিলে এক কোপে মাথা দু-ফাঁক করে দেবেন বলছেন। একদম মাথার ঠিক নেই!

আমার মতো—না ?

পান্নালাল উৎকট হাসি হেসে উঠল। বলে, মেলতুক কেড়ে নিয়ে তুমিই একটা কোপ ঝাড় গে না বুড়োর মাথায়। চুকে-বুকে যাক। ও—গায়ের জোরে পেরে উঠছ না বুঝি ? চল—আমি যাচ্ছি, ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসি।

লাফিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। যামিনী ভাল করে চিনেছে পান্নালালকে সেই

অসুখের সময় থেকে। তার কথায় ভয় পায় না। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল।

আমার কে আছে দাদা? বাপ-মা নিখোঁজ। শ্বশুর পাগলা। আর—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে পান্নালাল জিজ্ঞাসা করে, কার্তিক আসে নি?

কোথায় গেছে, শ্বশুরও তা বলতে পারছেন না। আবোল-তাবোল বলছেন। কখনো বলছেন, পালিয়ে বসে আছে গাছের মাথায়। কখনো বলেন, যুদ্ধের চাকরি নিয়েছে, গুডুম-গুডুম করে কামান ছুঁড়ছে—ফিরে আসবে লাটসাহেব হয়ে। যেখানে থাকুক দাদা, প্রাণে বেঁচে থাকলে রক্ষে পাই।

এসে দেখল, দ্বারিককে শাসন করবে কি—ইতিমধ্যে উঠানে পেয়ারাতলায় বেহুঁশ হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। বলি-রেখা এই কদিনের ভিতরেই জালের মতো সমস্ত মুখ ছেয়ে ফেলেছে; আশি বছর বয়সের ক্লান্তি সর্বাঙ্গে। একপাশে মেলতুক পড়ে রয়েছে।

তখন পান্নালাল চলল বাঁকাবড়শি, হরিহরের লঙ্গরখানায়। আতরমণি এখন গড়িয়ে গড়িয়ে দেয়ালের ধারে এসে ঠেশ দিয়ে বসেছে। সতৃষ্ণ প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে কতক্ষণে রান্না শেষ হবে, খেতে দেবে সকলকে।

না—ভূষণ দাস নেই এ জায়গায় হাটখোলায় চলে গেছে। এ বেলাটা সে লঙ্গরখানা দেখাশুনো করতে পারে না, বিনোদ দেখে।

দু-ক্রোশ পথ ভেঙে আবার পান্নালাল হাটখোলায় ছুটল। নিপাট ভালো-মানুষ হয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়ল ভূষণের দোকানে।

ভূষণ যথারীতি আকাশ থেকে পড়ে। সেই মামুলি কথা—

চাল? বাঘের দুধ যদি চাও—

পান্নালাল বলে, টিনের ঘরের দরুন তোমারই দেওয়া নোট এনেছি দাস মশাই। দ্বারিক সর্দার যেমন বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি প্রায় রয়েছে। কাজে আসছে না। একমুঠো দুমুঠো যা লাগে নোট দিয়ে দিচ্ছি। যত দর হয় হোকগে—চাল বের কর।

ভূষণ বুড়ো-আঙুল নেড়ে বলে, নেই বাপু, ঢনঢন। থাকলে উচিতদরেই দিতাম। ঢ্যাঁড়া পিটে দর বেঁধে দিয়ে গেল। বেশি নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ব?

পান্নালাল বলে, আগে যাও মিলত, ঢ্যাঁড়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উধাও! ফন্দিফিকির খুঁজতে খুঁজতে প্রাণান্ত সকলের।

ভূষণ বলে, তা ওরাই বা লঙ্গরখানায় আসে না কেন পণ্ডিত? কুলীন হয়ে থাকে তো মরুক শুকিয়ে।

বিরক্ত হয়ে সে দাঁড়াল। ভ্যানর-ভ্যানর কাঁহাতক ভাল লাগে? একজন-দু-জন নয়—খদ্দেরের পর খদ্দের আসছে। সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি অনবরত এই এক কথা।

পান্নালাল পথ আটকাল গিয়ে।

জবাবটা দিয়ে যাও। কি করা যাবে?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভূষণ বলে, পরের উপকার করতে বেরিয়েছ যখন, বেশ তো—তুমিই না হয় একবার খাঁ-বাজারে গিয়ে দেখে এস। মিছে খবর তো বলি নি। সেরে-সায়নে না আনতে পারলে হবে কেন?

পান্নালাল বলে, খাঁ-বাজার নয়—কালাবাজারের খবর বল।

নিস্পৃহকণ্ঠে ভূষণ বলে, কি জানি—দেখ সুলুক-সন্ধান করে।

কোথায় সে বাজারটা?

কথা না বাড়িয়ে ভূষণ পিছনের কামরায় সশব্দে খিল এঁটে রোকড়-খতিয়ান নিয়ে বসল।

দোকানের লোকজনকে উদ্দেশ করে পান্নালাল বলে, তোমরা বলতে পার ভাই? চাট্টি ভাত না খাওয়ালে যে মরে যাচ্ছেন বুড়ো দ্বারিক।

দ্বারিক সর্দারের কথায় সত্যি কষ্ট হচ্ছে সকলের। তিনকড়ি জিরে-মরিচ মাপছিল। চোখ টিপে চুপি-চুপি সে বলে, রাত্তিরবেলা আঁধার হলে সাদাবাজারই কালাবাজার হয়ে দাঁড়ায়। কিছু জান না—তুমি কি আকাশ থেকে নেমে এলে পণ্ডিত মশাই?

পান্নালাল ফিরল, দুপুর গড়িয়ে তখন বিকাল হয়ে এসেছে।

কি হল দাদা?

পান্নালাল বলে, উনুন জ্বেলেছ বুঝি? জল ঢাল উনুনে, এ বেলাও ঐ পাকা তাল।

নজর পড়ল, যামিনীর ডান-পায়ে অনেকখানি কাটা। গাঁদা ফুলের পাতা বেটে দিয়েছে।

কাটল কি করে?

যামিনী বলে, পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম ঘাটে বাসন নিয়ে যেতে।

ঘরে ছুঁচোর তে-রাত্রির—বাসন লাগছে কোন কর্মে?

ছোট মেয়েটা ফাঁস করে দিল। না—পড়ে যায় নি তো মা। দাদু থালা ছুঁড়ে মেরেছে, তাই—

থালা ছোঁড়াছুঁড়ি কেন?

যামিনী চুপ করে থাকে। খুকিকে জেরা করার পর বেরুল, ঘুম ভেঙে

দ্বারিক থালা পেতে বসেছিল, আবার তোলপাড় করছিল 'ভাত' 'ভাত' বলে। না পেয়ে শেষে থালা ছুঁড়ে মারে। সেই থালা লাগে যামিনীর পায়ে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল! পান্নালাল মেলতুক সরিয়ে নিয়েছিল, নইলে মেলতুকই মেরে বসত নিশ্চয়!

কোথায় দ্বারিক?

জবাব না পেয়ে পান্নালালের সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করে, রায়বাড়ি গেছেন নাকি ভাতের তল্লাসে?

যামিনীর দিকে চেয়ে সে বোমার মতো ফেটে পড়ল।

বুদ্ধি দিয়ে তুমি পাঠিয়েছ বোধ হয়। তা তোমরাই বা রয়েছ কেন? চলে যাও এক-একটা থালা হাতে করে। সুখের পায়রার দল, বড়লোকের মণ্ডপে গিয়ে বক বকম করগে বসে—

তার চোখ ফেটে জল বেরুবে বুঝি! তেজস্বী দ্বারিকের কত কথা মনে পড়ে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে সেই যেদিন বর্ষারাত্রে এসেছিল এ-বাড়ি। আরো কতদিনের কত ঘটনা। দ্বারিককেও থালা হাতে বসতে হল ভিখারির লাইনে? সকলের শিরদাঁড়া ভেঙে গেল, সোজা মাথা একটা থাকতে দেবে না দেশে?

॥ ৩ ॥

সন্ধ্যা হয়েছে। সারাদিনের পর স্নান করে পান্নালাল ফের চলল বউডুবির হাটে, ভূষণের দোকানে। ঠারেঠোরে তিনকড়ি একটু সন্ধান দিয়েছে, কালাবাজারের সামান্য একটুখানি আভাস।

হাটবার, কিন্তু হাট জমে নি তেমন। আসল বস্তু ভাতেরই খবর নেই, মানুষ মাছ তরিতরকারি কিনবে কোন কর্মে? যত খদ্দের ভূষণের দোকানে এসে ভিড় করছে। আর সেই কাকুতি-মিনতি—আজ মাসখানেক অবিরাম যা চলছে।

ভূষণ নেই, পিছনের কামরায় পাইকারদের হিসাব মেটাচ্ছে। গদির উপর হাতবাক্সর সামনে বিনোদ ধমক দিয়ে উঠল, বলছি যে ফুরিয়ে গেছে চাল—

এত এত বস্তা ছিল, ফুরোল এর মধ্যে?

পাখনা গজিয়েছিল, উড়ে গেছে। আকাশে ঐ যে-রকম উড়োজাহাজ উড়ে যায় না? অমনি।

পান্নালাল দু-হাতে জনতা ঠেলে এগিয়ে আসে।

ইয়ার্কি রাখ বিনোদ। বের কর, কি আছে—

বিনোদ ঘাবড়ে গেল একটুখানি। সুর নরম করে বলে, কিছু নেই।

মিছে কথা বলব কেন? থাকলে—দোকান পেতে বসেছি, নিশ্চয় দিয়ে দিতাম।···বেরোও দিকি ভাইসব, ঝাঁপ বন্ধ করি এবার—

উচ্চকণ্ঠে আবার বলে, যাও, বাইরে চলে যাও তোমরা।

বেরুল অনেকে। পান্নালাল চক্ষের পলকে লাফিয়ে উঠল পাটের গাঁইটের উপর—যেগুলো কলকাতায় হরিহর রায়ের গুদামে যাচ্ছে ভাউলে বোঝাই হয়ে। গাঁইটগুলো ধাক্কা মেরে সে গড়িয়ে দিচ্ছে। চিৎকার করছে, যাচ্ছ কোথা তোমরা? সরাও এগুলো টেনে টেনে।

কতক মানুষ থমকে দাঁড়াল। এগোচ্ছিলও পায়ে পায়ে। বিনোদ পায়ের চটি খুলে দৌড়ে আসে।

ছুঁচো কাঁহাকা—এতবড় আস্পর্ধা?

পান্নালাল বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতের কাছে পাঁচসেরি লোহার বাটখারা তুলে ধরল বিনোদের দিকে।

চেঁচামিচিতে ইতিমধ্যে বিস্তর লোক ঢুকে পড়েছে। গতিক দেখে বিনোদ ছুটে বেরুল!

আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। হাতে দড়ি দিয়ে সব শ্রীঘরে পাঠাব, তবে আমি ভূষণ দাসের বেটা—

সে থানায় ছুটল।

আর যে দু-তিনটে দোকান ছিল, তারা ঝপাঝপ ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে ইতিমধ্যে। মাছ-শাক তরিতরকারিওয়ালারা জিনিসপত্র সামলে ধামা মাথায় দৌড়ল।

গোলমাল শুনে ভূষণ দাস দোকান-ঘরে চলে এল।

কর কি, আহা—কর কি তোমরা? কি হচ্ছে পণ্ডিত? মালপত্তোর ছড়িয়ে নৈরাকার করচ—চল বাবা সকল, আমার বাড়ি। খোরাকি চাল থেকে সেরখানেক করে দিয়ে দেব তোমাদের।

নিরীহ নিষ্কর্মা পাঠশালার পণ্ডিত পান্নালাল—সকলের বিশ্বাসভাজন, এমন কি ভূষণের চিঠিতে মাথা খারাপ হবার খবর না পেলে হরিহর রায়ই হয়তো লঙ্গরখানার ভার চাপাতে চাইতেন তার উপর। কতকাল পরে আজকে আবার অসুরের শক্তি সে গায়ে পেয়েছে। হাত দিয়ে পা দিয়ে সেই আড়াই-মণি তিন-মণি বড় বড় গাঁইট এদিকে-সেদিকে ফেলছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে। ঠেলে ঠেলে পারছে না—যেন শেষ নেই, সীমা নেই। যে লোকগুলো আশায় আশায় কাছাকাছি ঘনিয়ে এসেছিল, এখন অনেকেই তারা সরে পড়েছে।

গাঁইট সরাতে সরাতে অবশেষে অনেক নিচে—তিনকড়ি মিথ্যে কথা বলে নি, মিথ্যে সে বলতে যাবে কেন? বেচাকেনা করে বটে দোকানে, কিন্তু সে-ও তো চিনির বলদ—বোঝা বয়ে মরে, বোঝা বইতে বইতেই মুখ থুবড়ে মারা পড়বে একদিন।

ক্লিষ্ট ঘর্মাক্ত মুখের উপর আগুন জলে উঠল। মুখ তুলে বলে, কি দাস মশায়? এ সব কিসের বস্তা—এই পাটের নিচে?

কিন্তু কোথায় কে? ভূষণ সরে পড়েছে। একটা বস্তা ঘাড়ে করে দোকানের বাইরে ফাকা হাটখোলায় পান্নালাল দড়াম করে ফেলল। বস্তার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে, আর দোকানের দিকে দু-হাত আন্দোলিত করে উন্মত্ত উল্লাসে চিৎকার করছে—

চাল, চাল—ওরে ভাই, বস্তা বস্তা চাল রয়েছে ঐ যে—

লোকারণ্য! ধামা-পালি হাতে হাটুরে মানুষ বিষণ্ণ মুখে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ফিরছিল। মুখে মুখে রটে গেল খবর। রক্ত-হিংস্র নেকড়ে বাঘের মতো সবাই ছুটে এল। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে সকলের, এই দশটা মিনিট আগেও যে ছিল অত্যন্ত শান্ত, ঘাড় তুলে কথা কইত না, সে-ও পাগল হয়ে চাল-কাড়াকাড়ি করছে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে ভূষণের উদ্দেশ্যে।

অবাক কাণ্ড, ক্ষিদেয় এত সাহস দেয় মানুষের বুকে! পেট্রোগ্রাডে ক্ষুধার্ত নারীরাই রুটির দোকানে ঢিল মারে, দুর্জয়শক্তি জারের বিরুদ্ধে প্রথম সেই বিদ্রোহের সূচনা। বিনোদ হয়তো থানায় পৌঁছে গেছে এতক্ষণ, থানাওয়ালারা এসে পড়ল বলে, কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে এক্ষুণি—তা বলে ভ্রূক্ষেপ নেই; মানুষের মুখে মুখে যেন তারের খবর হয়ে গেছে। শুধু চাল নয় এখন—নুন-তেল ডালকলাই যা হাতের মাথায় পাচ্ছে, ফেলছে, ছড়াচ্ছে, ছোঁড়াছুঁড়ি করছে মুঠোমুঠো, পায়ের লাথিতে পাত্রসুদ্ধ গড়িয়ে দিচ্ছে এদিকে-সেদিকে।

আমবাগানের ওদিকে নিরাপদ দূরে থেকে জনকয়েক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, বেগতিক দেখলে বেমালুম গা-ঢাকা দেবে। তাদের দিকে নজর পড়তে পান্নালাল আরও চেঁচাতে লাগল, চাল পাওয়া গেছে রে—চাল চাল—

আরও খানিকটা পিছিয়ে দাঁড়াল লোকগুলো! সাবধানী চোখের দৃষ্টি। তখন পান্নালাল গালিগালাজ শুরু করছে, যা সামনে পাচ্ছে ছুঁড়ছে তাদের দিকে। বলে, লেজ নাড়াচ্ছ খেকি কুকুরের দল? পালা, পালা—

এত বড় দোকান—মালপত্র সাবাড় দেখতে দেখতে! শেষকালে তক্তাপোশ, বেঞ্চি, বাঁশের মাচা, জিনিসপত্র রাখবার কোটো-কাঠরা ভেঙে

তছনছ করছে। ডাকছে, কোথায় গেলে—ও ভূষণ, বাইরে এস একবার। চাল যে মোটে নেই! দেখে যাও।

ভূষণ তখন কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ে ছিটকিনি এঁটেছে, হুড়কো দিয়ে দুয়োরে চেপে দাঁড়িয়ে ইষ্টনাম জপছে। গুরু রক্ষে কর, আজকের রাতটুকু—আর কাজ নেই, পালিয়ে যাব আর কোন জায়গায়—

গোলমাল একটু শান্ত হয়ে এল। তা হোক—থানার লোকজন না আসা পর্যন্ত বেরুচ্ছে না ভূষণ। হঠাৎ—ও কিরে, ও? জানলার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে আগুন। রাত্রির আঁধার বিদীর্ণ করে লকলক করছে আগুনের শিখা। ঘরে আগুন দিয়েছে—জতুগৃহ-দাহের অবস্থা হল যে। ঘরের ভিতরেই পুড়িয়ে মারবে। পিছন-দরজা খুলে আমবাগানের দিক দিয়ে পালিয়ে যাবে বলে যেই বেরিয়েছে, একজন অমনি জাপটে ধরল ভূষণকে—

ছেড়ে···দে দোহাই! পাঁচ টাকা দেব···দশ টাকা···ধম্মবাপ তুই আমার—

টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল বাগানের বাইরে। অনেক মানুষ জুটে গেছে—এ মারছে, ও মারছে। ভূষণ হাতজোড় করে বলে, কালীর দিব্যি—ও আমার ক্ষেতে ফলেছিল, ও আমার খোরাকি চাল—

কে-একজন বলে উঠল, খোরাকি চাল—তা ওকে চাট্টি খেতে দে তোরা। খা—খা কত খাবি খা—

ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে ভূষণকে। মুঠো মুঠো চাল এনে ঠাসছে তার মুখে! আর খাবি? খা—খা—

মুখ ভরতি, ঠেসে ঠেসে তবু সেই কাঁচা চাল ভরছে মুখের ভিতর। চোখ লাল, দম আটকে আসছে। ঘূর্ণিত চোখে এক ভয়াবহ ভঙ্গি করে ভূষণ অসাড় হয়ে গেল।

ভয় পেয়ে সবাই স্তব্ধ হয়েছে।

সর্বনাশ, মেরে ফেললে নাকি? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করছ কেন তোমরা? পান্নালাল দৌড়ে এল এদিকে। নেড়েচেড়ে বলে, না—আছে। এস তোমরা, পালিয়ে এস। এই খেলা করছ, চাল ওদিকে সমস্ত ফুঁকে গেছে। ফাঁকি পড়ে গেলে, শিগ্‌গির চলে এস—

ভূষণ তেমনি পড়ে রইল, পান্নালাল টেনে নিয়ে এল সকলকে। নিজের সেই বস্তাটায় মুখ খুলে দু-হাত ভরে ভরে চাল দিল তাদের ধামায় কাপড়ে। সের পাঁচ ছয় কেবল রইল বস্তায়।

৪ ॥

চাল এসেছে, চাল নিয়ে এসেছে, উৎসব আজ অঞ্চল জুড়ে। শুধু চাল নয়, পিটুনি দিয়ে এসেছে ভূষণকে। আর যাদের ধরা পাওয়া যায় না, দো-মহলা-তেমহলায় শহরে-বাজারে থাকে, তাদের উপরেও খানিকটা আক্রোশ যেন মিটিয়ে এল ভূষণকে মেরে।

ধপাস্ করে দাওয়ায় চালের বস্তাটা ফেলে লাটসাহেবের মতো পান্নালাল যামিনীকে বলল, খোল—

যামিনী খুলে দেখে অবাক হয়ে বলে, কোথায় পেলে দাদা?

অতি কোমল কণ্ঠ পান্নালালের, একটু আগের সে মানুষ যেন নয়। বলে, ভাত রাঁধ—মনের সাধে হাঁড়ি ভরে চাপিয়ে দাও দিদি আমার—

যুঁইফুলের মতো পরিপাটি অন্ন—শেষ অবধি গলায় ঢুকবে যেন বিশ্বাসই হতে চায় না! কি একটা অঘটন ঘটবে এর মধ্যে, একটা অলৌকিক ব্যাপার কিছু।

সর্দার-বাড়ির সে আবরু নেই; পাঁচিল খসে খসে পড়ছে। তবু পাঁচিল আর সুপারি-পাতার বেড়া বজায় আছে এখনো একরকম। পান্নালাল পাঁচিলের দরজায় কষে খিল দিয়ে এল।

ভাত বাড়ো। দ্বারিক নেই বুঝি! এ বেলাও? বেশ হয়েছে। থাকলেও দিতাম না। ঠেসে ভাত বাড়ো দিদি, যতগুলো পাতায় ধরে। খুকির, তোমার আর আমার—

কলাপাতা নিয়ে এসেছে—তিনখানা বড় মাঝপাতা। দু-খানা পাশাপাশি পেতে ঠাই করল পান্নালাল আর খুকির। নিজের ভাত যামিনী ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

অর্ধেক আন্দাজ খাবার পর—যা ভয় করছিল, দরজায় ঘা দিচ্ছে।

চুপ! খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি···এই খুকি, খাবা-খাবা পুরে দে গালের ভিতর—শিগগির!

দরজার আঘাত আরও জোরে জোরে। খাওয়া শেষ করে পান্নালাল হাত ধুল। খিল খুলে সে অভ্যর্থনা করছে, আসুন দারোগাবাবু—

কোথায় দারোগা? চৈতন, রাখাল, কাশী, মেঘা—এরাই সব।

আগুন হয়ে প্রশ্ন করে, কি? কি চাই তোমাদের?

ভাত খাব চাট্টি? শুনলাম যে তুমি নাকি পণ্ডিত—

বুকে থাবা মেরে পান্নালাল বলে, ঠিক শুনেছ। রোজগার করে আনা ভাত। দানছত্তোর করবার নয়। যাও—যাও—

বুড়োমানুষ চৈতন। বলে, চারদিন আজ খাই নি।

খাবে কি? চাল আনে মানুষে, ভাত খায় মানুষে। মানুষ নও তো তোমরা—

যা বলবার বল গে বাবা। প্রাণে বাঁচাও চাট্টি ভাত দিয়ে। চৈতন একেবারে কেঁদে পড়ে।

বলি সত্যিকথা।—কুকুর-বিড়াল তোমরা—ভাত খাবে কি, খাবে এঁটো-কাঁটা। পাতের কোলে ঐ আমার যা পড়ে রয়েছে। কলকাতার হরিহর রায় ভূষণ শয়তানকে দিয়ে খাওয়াচ্ছে তার যে পাতের এঁটো। বেরোও—বেরোও—

কে শোনে কার কথা। চৈতন ছুটে গিয়ে ঘরে উঠল। ভাতের হাঁড়ি বাঁ-হাতে প্রাণপণে বুকের উপর বেষ্টন করে ধরেছে, আর হাঁড়ির ভিতর অবশিষ্ট যা ছিল গবাগব খেয়ে নিচ্ছে। বলে, মার, ধর, যা খুশি কর পণ্ডিত নড়ছি নে না খেয়ে—

পান্নালাল নিঃশব্দে দেখতে লাগল। নিরীহ পরম শান্ত এই মানুষগুলি—কোন অপরাধে অপরাধী নয়। শত্রু-ভয়ে রাতারাতি এদের মুখের অন্ন সরে গেল দূর-দূরান্তরে। আজকে খাদ্য নেই। খাদ্য পাঠাবার গাড়িও মিলছে না। অথচ ট্রেনে করে সাহেব আর বড়লোক জুয়াড়িদের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া অবধি আসছে নাকি কলকাতায়!

ভাত ছিল সামান্যই। খেয়ে শেষ করে পরম উল্লাসে চৈতন বলে, বাঁচালে বাপধন। তোমার এ দয়া ভুলব না—

পরদিন প্রহরখানেকের সময় দারোগা এল সর্দার-বাড়ি। পান্নালাল তার পাঠশালা-ঘরে ছিল, শুনতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল। খাতির করে বলে, বসতে আজ্ঞা হয়। খবর কি দারোগাবাবু?

খানাতল্লাস হবে এখানে। সবাই বলছে যে—

সঙ্গে অনেক লোক এসেছে। চৈতন-মোড়ল জমিদারের পিছনে।

পান্নালাল বলে, দয়া সত্যিই ভুলতে পারি নি দেখছি মোড়লের পো। আহা-হা, কুয়োর জলে ফেলে দিতাম যদি হাঁড়ির বাড়তি ভাতগুলো!

দারোগা বলে, কি হত তা হলে? খোতা মুখ ভোঁতা করে ফিরে যেতাম আমরা? ইনভেস্টিগেট করতে পারতাম না, মনে করেন?

পান্নালাল সবিনয়ে বলে, তা কেন। এত অক্ষম হলে রামরাজ্য জমিয়ে বসে আছেন কি করে? তবে এমন টাটকা-সাক্ষিটা পেতেন না তো! খেটেখুটে তৈরি করে নিতে হত!

হাত বেঁধে পান্নালালকে নিয়ে চলল। যামিনী আছড়ে পড়ল উঠানের উপর। শেষ সহায়টিও বিদায় হল। কোনদিন কেউ পান্নালালের চোখে জল দেখে নি, এইবার যেন চোখের পাতা ভিজে গেছে মনে হল। যামিনীকে বলে, আর যা কর দিদি—একটা অনুরোধ, বেইজ্জত হয়ো না, হরিহর রামের মণ্ডপে উঠো না কোনদিন। ওরা মানুষকে খাওয়ায় না, মানুষকে ভিখারি বানিয়ে তারপর খেতে দেয়। ইজ্জত নিয়ে বরঞ্চ মরে থেকো এই ঘরের মধ্যে, চৌকিদার লিখিয়ে দেবে, আমাশা হয়ে মরেছে। এমন কত লেখানো হচ্ছে।

থানা ক্রোশখানেক পথ। আপাতত পান্নালালকে তাই নিয়ে তুলল হরিহর রায়ের অন্দর-বাড়ি—একেবারে দোতলার উপর।

এত খাতির?

মস্তবড় ঘর—ঝকঝকে মেজে, মার্বেল-বাঁধানো। হরিহর রায় শুতেন এই ঘরে, এখন খালি থাকে। এমন ঠাণ্ডা—গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।

কিন্তু আরাম করে গড়াবার জন্য আনা হয় নি তাকে এ জায়গায়।

কে কে সঙ্গে ছিল, নাম বল—

পান্নালাল বলে, সত্যি কথাই বলছি মশায়, সে এক ঝড়ের মতো ব্যাপার। হুস্ করে ঘটে যায়, নজর রাখবার ফুরসত থাকে না। সাক্ষি দেখার জন্য আমবাগানে অনেকে ওত পেতে ছিল, খোঁজ করুন, তারা খাঁটি খবর দেবে। আমার কিছু মনে নেই।

রাগ সামলাতে না পেরে বিনোদ ঠাস করে মারল এক চড়। হাত-বাঁধা পান্নালালের। চেঁচাতে পারে অবশ্য, কিন্তু লাভ নেই—অত বড় মণ্ডপ-বাড়ি অতিক্রম করে দোতলায় এনে তুলেছে। চেঁচিয়ে আকাশ ফাটালেও বাইরের কারও কানে যাবে না।

পান্নালাল বলে, মার বিনোদ, দিন পেয়েছে—মেরে নাও যত পার। আমরাও দেখে নেব দিন এলে।

তা-ই চলল একটানা। কিল, ঘুসি, লাঠির গুঁতো—যে যেমন পারছে। ভূষণকে মারার শোধ তুলছে। আর এদের সন্দেহ, বিজয়কে কোঁচ মারার ব্যাপারেও পান্নালালের কারসাজি আছে। পান্নালাল চুপচাপ—প্রতিবাদ নেই, নড়াচড়াও করে না। শেষকালে গড়িয়ে পড়ল।

পায়া যায় না বিন্দুকে নিয়ে। সম্প্রতি এ-বাড়িরই বাসিন্দা তারা। উঁকি মেরে কোথা থেকে দেখছিল।

আহা রে, কোন ঘরের মানিক রে! বিদেশ-বিভুঁয়ে মরে যাচ্ছে—ঘরের লোক হয়তো পথ চেয়ে আছে তার জন্য!

জলের ঘটি নিয়ে বিন্দু ছুটে এসে ঢুকল। স্ত্রীলোক দেখে দারোগা সরে দাঁড়ায়। বিনোদ খিটিমিটি করছে মায়ের দিকে, কিন্তু বাইরের লোকের মধ্যে কি আর বলবে! বিন্দু মুখে-মাথায় জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

আঃ—বলে পাশ ফিরল পান্নালাল। হাঁ করছে ঘন ঘন।

কি?

চোখ মেলে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে পান্নালাল বলে, একটু জল খাব মা। জল আনো।

ব্যাকুল হয়ে বিন্দু জলের ঘটি মুখে ধরে।

খেতে গিয়ে পান্নালাল চারিদিকে তাকায়। জ্ঞান ফিরেছে, মনে পড়েছে সব। মুখ ফিরিয়ে নিল সে ঘটির থেকে।

থুঃ—থুঃ—

দশম পরিচ্ছেদ

(১)

যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছে। বান এসে মানুষ-জন ঘর-গৃহস্থলী ভাসিয়ে ভেঙে দিয়ে গেল। খাঁ-খাঁ করছে গ্রাম। বন্যা ধাওয়া করল কলকাতার শহর অবধি। বন্যার জলে মড়া ভেসে এসেছে—জীবন্ত মড়ার দল দেখতে দেখতে শহরের রাস্তা-গলি-পার্ক ভরতি করে ফেলল।

মহানুভব হরিহর। তাঁর টাকায় শুধু বাঁকাবড়শির লঙ্গরখানা নয়—এখানেও পাড়ার মধ্যে ফ্রি-কিচেন চলছে। রান্নার জায়গা হরিহরের নিচের দালানে, খাওয়ানো হয় পার্কে বসিয়ে। সুপ্রিয়া সর্বক্ষণ মেতে আছে এই সব নিয়ে; বাপের দেখাশুনা ছেড়ে দিয়েছে। এমন কি, নূতন বিয়ে হয়েছে এই তো মাস কয়েক—সমস্তটা দিনের মধ্যে অনুপমের সঙ্গেও ভাল করে দুটো কথা বলতে পারে না। রাত্রির কথা আলাদা, কিন্তু দিনের সঙ্গ-কামনায়ও অনুপম লোলুপ হয়ে বেড়ায়, রাগ করে কখন কখন।

সুপ্রিয়া নিজে খাটছে, আর যার কাছে যাচ্ছে সাহায্যও পাচ্ছে খুব। পাড়ার মেয়ে-বউরা এসে কাজকর্ম করছেন। চালের পারমিটও অতি সহজে

মিলছে। মহৎ কাজে মেমেছেন, গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে যতদূর যা করা দরকার নিশ্চয় করা হবে, একশবার করা হবে। বিশেষত সরকারি দলের এম. এল. এ.-র বউ যখন কর্মকর্ত্রী। সরকারী প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞাপনে ঢোকানো যাবে এই অনুষ্ঠানটি। ছবি ছাপানো যাবে কাগজে।

সুপ্রিয়া মেয়েদের বলে, টাইম-টেবিল তৈরি করে ফেলুন। সেই অনুযায়ী পালা করে নিজেরাই রাঁধা-বাড়া পরিবেশন করব। একটা পয়সাও যেন অপব্যয় না হয়। আর পাঁচটা মানুষ বাড়তি বাঁচানো যাবে রাঁধুনির মাইনে বাঁচিয়ে।

তা-ই হচ্ছে। রিস্ট-ওয়াচ দেখে কাঁটায় কাঁটায় কাজ চলেছে।

শহরের যত আলো ঠুলিতে মুখ ঢেকে আছে। ভাগ্যে ব্ল্যাক-আউট—তাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উলঙ্গ-গৃহস্থালী নজরের আড়ালে থাকে। হরিহর রায়ের চিরকালের অভ্যাস, ভোর থাকতে উঠে স্নান করা। কলকাতায় থাকলে গঙ্গাস্নানে যাবেনই ; পৌষের শীত, বর্ষার বৃষ্টিবাদল— কিছুতে অন্যথা হবার জো নেই। কিন্তু ইদানীং তা বন্ধ হয়ে গেছে। পায়ে পায়ে মানুষ বাধে, হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে হয়, পদপিষ্ট ঘুমন্ত মানুষ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে—যাবেন কি করে? ঘর থেকে তিনি বেরোনই না। গ্রাম থেকে পালিয়ে এলেন ভয়ে ভয়ে, কিন্তু চল্লিশ বছরের চেনা কলকাতাও যেন নূতন এক ভয়ানক জায়গা। ফুটপাথের উপর মেয়ে-পুরুষ—নানান বয়সি, বেহায়া বে-আবরু। অবোধ শিশু কেঁদে গলা ফাটাচ্ছে—কোথায় দুধ? মা গিয়ে রাস্তায় কলে আঁজলা-আঁজলা জল খাওয়ায়।

এত সহজ মানুষের মরা! দূর-দূরান্তরে যুদ্ধ করে মানুষ মরে মরে পড়ে যায়—বুকের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে ছোটে যান্ত্রিক-বাহিনী, মড়ার উপরও পড়ে বোমা, পড়ে মেসিন-গানের গুলি। নূতন রেজিমেণ্ট এগোবার পথে লাথি মেরে মড়া সরিয়ে দিয়ে যায় একপাশে। রোজ সকালে খবরের কাগজে পড়া যায়, মৃত্যু নিয়ে মানুষের ছিনিমিনির কাহিনী।

আর সকালবেলা উঠে চোখেই দেখা যাচ্ছে, অতি-সুলভ মড়া অজস্র পড়ে আছে শহরের এ-রাস্তায়, ও-রাস্তায়, বাড়ির রোয়াকে, স্টেশনের ধারে। ফ্রি-কিচেনের কাজে যাবার মুখে যেমন একটিকে আজ দেখতে পেল সুপ্রিয়া। কোন্ গ্রাম থেকে এসেছে, পরিচয় নেই, বাঁচবার লোভে ভিক্ষার ঝুলিটা নিয়ে এসেছিল। উলঙ্গ দু-পাটি দাঁত—খাদ্য নয়, মাছি ভনভন করছে তার ফাঁকে। মাথার কাছে লাঠি আর ঝুলিটা পড়ে। যে অপরূপ খিচুড়ি সুপ্রিয়ারা বিলি করে, হয়তো তারই আশায় অপেক্ষা করছিল। কখন সকাল

হবে, রোদ উঠবে, দিদি-ঠাকরুনেরা এসে পৌঁছবেন ক্রিম-পাউডার মেখে, চা-বিস্কুট খেয়ে, কখন বাজবে ঠিক সাড়ে আটটা···

অসহ্য হয়েছে, চোখ মেলে আর দেখা যায় না। গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছেন, এ জায়গা ছেড়েই বা যান কোথায় এঁরা? তাই আন্দোলন উঠেছে, আড়াল কর—লরি বোঝাই করে এদের ঢেলে দিয়ে এস শহরের বাইরে—শহরের নোংরা আবর্জনা যেমন বাইরে নিয়ে ঢালে।

সাব্যস্ত হচ্ছে, অতঃপর শহর থেকে দূরে দূরে লঙ্গরখানা খোলা হবে। সুপ্রিয়াদের এটাও উঠে যাবে, নূতন পারমিট আর মিলবে না। নবতম ব্যবস্থায় ক'জনের পেট ভরানো হবে, সে সম্পর্কে অবশ্য খুলে বলা হচ্ছে না কিছু। কিন্তু উৎপাতের দল মরেই যদি, বাইরে মররে, সে দুর্গন্ধ শহর অবধি আসবে না। নিরুপদ্রব হবে কলকাতা।

ঘুম ভেঙে শহরের কর্মব্যস্ততা জেগেছে এখন। রাস্তা-গলি ঝেঁটিয়ে সাফ করা হচ্ছে, করপোরেশনের ময়লা-গাড়ি ছুটেছে। ছুটে বেড়াচ্ছে এ, আর, পি, আর সিভিক-গার্ডের দল—এই একটা মড়া, ঐ যে ওখানে একটা, ঐ ঐ···ঐ। সুপ্রিয়া যেটা দেখছিল, সেটাকেও নিয়ে গেল তুলে।

মড়া সাফ-সাফাই হবার পর জ্যান্ত-মড়া সারাবার পালা।

হঠ্ যাও—এই, আরে ওঠ্ না হারামজাদি—পালা—পালা—

ভাঙা টিনের মগ কি মাটির মালসা হাতে কেউ ছুটল লঙ্গরখানায়, কেউ গৃহস্থ-পাড়ায়, কেউ বা গিয়ে দাঁড়াল ট্রাম-বাস যে-জায়গায় গিয়ে থামে সেখানে। পথচারীর পা জড়িয়ে ধরছে, গোরুর সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে আস্তাকুড়ে হাতড়াচ্ছে, তাড়া খেয়ে খেয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরছে।

হঠাৎ উমার সঙ্গে দেখা অনেকদিন পরে। সুপ্রিয়া তাকে জড়িয়ে ধরল। কত রোগা হয়ে গেছে, রং ময়লা—এ তো সে উমা নয়!

বেঁচে আছ তুমি? কলকাতায় রয়েছ? আছ কোন্‌খানে ভাই! কি করছ?

ম্লান হেসে উমা বলে, থাম। এ ক'টারই জবাব দিই আগে।

সুপ্রিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে,—কি রকম যেন হয়ে গেছ তুমি।

বিদ্যা-দানের পুণ্যকর্ম আরও এক বছর চলল যে! বারো বছরে পুরো গাধা হতে হয়। অতএব সিকি আন্দাজ হয়েছি এই তিন বছরের মাস্টারিতে।

সুপ্রিয়া প্রশ্ন করে, আর কি করছ? দেশের কাজকর্ম কিছু?

উমা কি জবাব দেয়, উৎসাহের আবেগে শুনলই না সুপ্রিয়া। বলে,

আমরা অনেক কাজ করছি। শুনলে খুশি হবে তুমি। বাড়ি চল। তোমাকেও ছাড়ব না ভাই, দলে আসতে হবে।

একরকম তাকে টেনে নিয়ে এল। সোজা দোতলায় নিয়ে তুলল। অনুপমও সেখানে।

সত্যিই খাটছে এরা। নানা ধরনের কাজকর্ম। সুপ্রিয়া নানারকম পোস্টার আর কাগজপত্র বের করল।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে উমা বলে, উঃ—দাবির ফিরিস্তি যে তোমাদের! কি কি চাচ্ছ, দেখি—

উল্লসিত সুপ্রিয়া একটার পর একটা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

করপোরেশনের ধাঙড়রা যখন স্ট্রাইক করেছিল, এটা সেই সময়কার। মাগ্‌গি ভাতা চাই।

ওখানা?

পাটের সর্বনিম্ন দর-বাঁধা চাই।

অনুপম বলে, বুঝলেন না? আক্রমণটা আমাদেরই উপর—আমরা যারা সরকারি দলের মানুষ। গবর্নমেণ্ট আর মালিক-উপরওয়ালাদের স্বস্তি পেতে দিচ্ছেন না, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছেন।

সুপ্রিয়া দেখাচ্ছে, আর এই দেখ, এই আর-এক গাদা। চাল চাই। কেরোসিন চাই। সস্তায় কাপড় চাই।

উমা বলল, তবু তো বাদ থেকে গেল অনেক-কিছু—

সুপ্রিয়া সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

উচ্ছে চাই, কাঁচকলা চাই, নিমতলার ঘাটে সস্তায় কাঠকুটো চাই—

ঠাট্টা? ভাবছ বোধ হয়, রাজনীতি এড়িয়ে সমাজ-সেবায় নেমেছি ভয় পেয়ে। এইটে দেখ তো—

সুরঞ্জিত বড় একখানা পোস্টার সুপ্রিয়া মেলে ধরল।

—রাজবন্দীর মুক্তি চাই—

পোস্টারটা টেনে নিয়ে উমা কালীর সুস্পষ্ট রেখায় 'রাজবন্দীদের' কথাটা কেটে দিল। বললে, মরে যদি মরুক না রাজবন্দীরা। মুক্তি চাই আমরা। যারা রাজবন্দী, তাঁদেরও এই মনের কথা। দোহাই তোমাদের, কুয়াশা তুলে আচ্ছন্ন কোরো না যে দাবী কণ্ঠে নিয়ে হাজার হাজার রাজবন্দী জেলে পচছেন—মুক্তি চাই পরাধীনতা থেকে।

হাসি ঝিকমিক করছে উমার মুখে—যেন ক্ষুরধার হাসি। একমুহূর্ত সুপ্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, সে তো সকলকারই কথা।

কিন্তু কাদের জন্য সে মুক্তি? সেই তারা মরে নিঃশেষ হয়ে গেলে কি অর্থ হবে বলো মুক্তির?

দালানে বিরাট উনুনের উপর বড় বড় ডেকচিতে টগবগ করে গ্রুয়েল ফুটছিল, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে সুপ্রিয়া বলে, ভাত দিয়ে, ঐ দেখ, যথাসাধ্য তাদের বাঁচিয়ে রাখছি।

ভাতের অপব্যয়—

সুপ্রিয়া রাগ করে বলে, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা—একে অপব্যয় বলছ?

উমা বলে, আর ঐ একটা প্রকাণ্ড নিরর্থক শব্দ তোমরা রচনা করেছ—দরিদ্র-নারায়ণ। নারায়ণ কখনো দরিদ্র নন। আর যারা দরিদ্র, তারাও নারায়ণ নয়—তারা পাপী। দারিদ্র্য মহাপাপ।

সুপ্রিয়া বলে, আচ্ছা—নারায়ণ না-ই বা হল, মানুষ তো বটে!

মানুষ নয়, ভিখারি। খেতে দিলে বাঁচবে, না খেতে দিলে মরে যাবে। মরা-বাঁচা সমান কথা ওদের পক্ষে।

সুপ্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে বলে, মানুষ মরবে—কিন্তু তাতে আসে যায় না?

ও-সব মানুষ মরেইছে অনেক দিন। মরে ভূত নয়—ভিখারি হয়ে গেছে। মারণ-ক্রিয়া নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয়েছে, টুঁ-শব্দটি হয় নি। ভিখারি বাঁচলে সমাজে উৎপাতই বাড়বে ভাই, উপকার হবে না।

সুপ্রিয়া বলে, প্রাণে বাঁচিয়েই কাজ আমাদের শেষ হচ্ছে না। ওদের ঘরে পৌঁছে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হবে। আর যাতে কোনদিন মন্বন্তর না আসে—হাসছ যে! লাভ নেই, মনে করছ?

উমা বলে, লাভ আছে বই কি! ওরা মরুক কিম্বা বাঁচুক—মন্বন্তর ঠেকানোয় যারা উদ্যোগী, তাদের অন্তত তিনপুরুষ মন্বন্তরের দায়ে ঠেকাতে হবে না, এ ব্যবস্থা অনায়াসে হতে পারবে।

হরিহর এলেন। অপমানে তাঁর মুখের উপর যেন কেউ কালি ঢেলে দিয়েছে। একখানা খামের চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, বিনোদ লিখেছে। বিজয়ের পর আবার ভূষণের কি অবস্থা করেছে দেখ। সাহস কতদূর বেড়েছে—বিজয়কে তবু রাত্রিবেলা, আর ভূষণকে ভরা-হাটের মধ্যে সকলের সামনে—

উমার দিকে নজর পড়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

শতমুখে যে ব্যাখ্যান করতে, অহিংস কংগ্রেসি মানুষ। গান্ধীর মতে চলে—মার খায়, মারে না।

উমা সহসা বুঝতে পারে না।

কার কথা বলছেন?

পড়ে দেখ। কীর্তিটা দেখ তোমার হাঘরে স্বদেশী দাদার।

বিনোদের চিঠির মর্ম—বাঁকাবড়শির লঙ্গরখানা অতি উত্তম চলছিল। কিন্তু সাধ্যের তো সীমা আছে—সমস্ত জেলার মানুষ খাওয়ানো যায় কেমন করে? বাছাই করে খাওয়ার টিকিট দেওয়া হচ্ছিল, গোলমাল বাধল এই নিয়ে। এবং তারই ফলে পান্নালাল-পণ্ডিত দল জুটিয়ে প্রকাশ্য হাটখোলায় তার ধার্মিক নিরীহ বাপকে—

অনুপমকে হরিহর বললেন, উচিতমতো শিক্ষা দিতে হবে, নইলে মুখ দেখানো যাবে না ও-অঞ্চলে। শান্তশিষ্ট হয়ে ছিল—তাই ইদানীং মনে করতাম, গুঁতোর চোটে দিব্যজ্ঞান হয়েছে! কিন্তু হাজার বার ধুলেও কয়লার ময়লা কাটে না। পুলিশ মামলা চালাচ্ছে, দলসুদ্ধ ধরে ওদের সদরে চালান দিয়েছে। তবু তুমি চলে যাও। পিঁপড়েগুলোর পাখনা ছেদন করে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে এস, তারা পিঁপড়ে মাত্তোর, শুধু চাপড়ের ওয়াস্তা। বেশ মোটা রকম যাতে ঠেসে দেয়, সেই বন্দোবস্ত করে এস।

অনুপম ইতস্তত করে। পার্টি-মীটিং রয়েছে সামনে; মেম্বার আর মন্ত্রীদের মাইনে ভাতা বাড়াবার জরুরি প্রস্তাব ঝুলছে।

হরিহর বলেন, অন্তত দু-তিনটে দিনের জন্য গিয়ে একবার ঘুরে এস। তুমি গেলে মন্ত্রের মত কাজ হবে। ছেলে হলেও তুমি, জামাই হলেও তুমি। তোমায় ছাড়া বলব কাকে, বল।

উমার দিকে আর একবার অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হরিহর চলে গেলেন। অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে উমাও বিদায় নিল।

সুপ্রিয়া আবদার ধরল, আমি যাব কিন্তু তোমার সঙ্গে।

উঁহু—এবার নয়। গিয়েই ফিরতে হবে। থাকতে পারব না তো স্থির হয়ে।

কিন্তু সুপ্রিয়া যখন ধরে বসেছে, কারো ক্ষমতা নেই রদ করবার। সে একা নয়, দাসু যাবে, উমাকেও নিয়ে যাবে। সদরে হরিহরের ছোট একটা বাসাবাড়িও আছে, অতএব অসুবিধা কি?

অনুপম বলে, সদলবলে যাচ্ছ, মতলবটা কি বল তো?

—পান্নালালবাবুরা বিনা দোষে বুড়োমানুষটাকে মেরেছেন, এ আমার কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছে না। পিছনে অন্য ব্যাপার আছে।

বিরক্ত হয়ে অনুপম বলে, অর্থাৎ আমাকে পাঠানো হচ্ছে জেলের তদ্বিরের জন্য, আর তুমি যাবে ওদের খালাস করে আনতে। সব ব্যাপারেই দেখছি উল্টো রাজনীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের।

শ্বশুরের আদেশ বলে নয়, নিজেও অনুপম পান্নালালের প্রতি প্রসন্ন নয়। তার সঙ্গে সুপ্রিয়া সমস্ত দিনের মধ্যে ভাল করে একটা কথা বলে না! রাতের শহর ভাগ্যে আলাদা রকম, নইলে রাত্রেও নিশ্চিত ঐ অবস্থা হত। আর এই সুপ্রিয়াই একদা ধারিক সর্দারের বাড়ি রান্না করে পাখা হাতে সামনে বসে খাওয়াচ্ছিল পান্নালালকে। নিজের চোখে সে দেখে এসেছে।

অনুপমের তিক্ত কণ্ঠ সুপ্রিয়া কানেই নিল না। অনুনয় করে বলে, আমার বড্ড পুরানো বন্ধু উমা। দেখলে না, মুখ চুন করে চলে গেল। যদ্দিন খুশি জেলে পাঠাবার বন্দোবস্ত কোরো, জেল তো ঘরবাড়ি ওঁদের— খালাসের কথা মুখ দিয়েও আমি বের করব না। কেবল একটা কথা—

কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে অনুপমের হাত ধরে সে বলল, উমার সঙ্গে পান্নালাল বাবুর একটা ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দিও তুমি। তুমি ইচ্ছা করলেই পারবে। কতদিন উমা দেখে নি তাঁকে; দেখতে পাবে না হয়তো আরো কত দিন!

॥ ২ ॥

রাত্রির কলকাতা একেবারে আলাদা। অন্ধকারে যেন নিরালম্ব প্রেতদলের আর্তনাদ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে—

মা, মাগো!

সুপ্রিয়া তো এদেরই কাজ করে যাচ্ছে অদম্য নিষ্ঠায়। কত মনোবেদনা ও ভরসা শহরে এসে-পড়া এই হতভাগাদের জন্য! কিন্তু সন্ধ্যার পর শহরের মতো সেও যেন অন্য একরকম হয়ে যায়। পথে-ঘাটে ধুঁকতে ধুঁকতে দিনভর যারা ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খুঁটে বেড়ায়, রাত্রি হলে তাদেরই কঙ্কালছায়া টকটকে রাঙা চোখ মেলে আঁধারে যেন মিছিল করে ফেরে সুপ্রিয়ার চোখের সামনে দিয়ে।

মাগো, রাজরানী মা আমার!

ভয়ার্ত সুপ্রিয়া অনুপমের কাঁধ ধরে নাড়া দেয়।

শুনছ? ঐ শোন—

কানে হাত-চাপা দিয়ে সুপ্রিয়া তার কোলের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে। অনুপমের দৃঢ় দুটি বাহু ছাড়া এখন এ জগতে তার কোন নির্ভর নেই। দিনের অবহেলার শোধ রাত্রিবেলা সুপ্রিয়া হাজার গুণ তুলে নেয়।

অনুপম সান্ত্বনা দিচ্ছে, ভয় কিসের? 'মা' বলে ডাকছে, 'মা'-ডাকের চেয়ে ভাল কি আছে?

কাঁদো-কাঁদো হয়ে সুপ্রিয়া বলে, সদরের বাসায় তুমি রেখে এস আমায়। কলকাতায় ফিরে আসব না—আমি বাঁচব না এখানে থাকলে—

ভয়ানক বিপর্যয় মূর্তি হয়ে গেছে সুপ্রিয়ার। শেড-দেওয়া আলোর নিচে মুখখানা পাংশু ও নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। দেখে অনুপমের বড় বেদনা লাগে।

বাইরে এসে রেলিং ধরে সে নিচে তাকাল। শহর সত্যিই যেন প্রেতভূমি। প্রথমটা নজরে আসে না, তারপর খানিকক্ষণ তাকিয়ে আবছা-আবছা ছায়ামূর্তি দেখতে পাচ্ছে, একটা-দুটো নয়—অনেকগুলি। যেন প্রেতের মেলা বসেছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে ডাকছে, মা—মাগো, ফ্যান, দাও, একটুখানি ফ্যান। ভাত চাইতে ভরসায় কুলোয় না, ভাত কে দেবে এমন দিনে? অবিরাম চেঁচাচ্ছে, ফ্যান—ফ্যান—ফ্যান—

পুরুষমানুষ অনুপম—তারও বুকের ভিতরে গুর-গুর করে ওঠে। সে চিৎকার করে ওঠে, শুনতে পাস না এই দাসু? এই—এই—

দাসুর অপরাধ নেই। খানিক আগে তার ভাত এমনি একটা দলকে দিয়ে আবার রান্না করতে হয়েছে। খেয়ে দেয়ে এই সবে সে একটুখানি চোখ বুঁজেছে—

ফ্যান—ফ্যান দাও—

সুপ্রিয়া ঘরের ভিতর থেকে অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে বলছে, ওরে দাসু, রক্ষে কর, বিদেয় করে দে ওদের—

দিচ্ছি—

ঘুমচোখে দুম-দুম করে দাসু রান্নাঘরে ছুটল।

বাবা রে, মেরে ফেলেছে রে!

তোলপাড় লেগেছে। উপর থেকে দাসু হাঁড়িসুদ্ধ গরম ফ্যান ঢেলে দিয়েছে মালসার ভিতর নয়, ওদেরই কারও মাথায়। কান্নায় চেঁচামেচিতে খণ্ডপ্রলয় বাধল। রাগের মাথায় কাণ্ডটা করে দাসু এখন বেকুব হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সে নিচে নামল। টর্চ জেলে অনুপমও ছুটল। সুপ্রিয়া বেরিয়ে এসে রেলিং-এ ঝুঁকে দেখছে।

একটি মেয়েলোক পোড়ার জ্বালায় ছটফট করছে গলা-কেটে-দেওয়া পাখির মতো। রাস্তার উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আর যারা চেঁচাচ্ছিল, এদের নামতে দেখে চক্ষের পলকে সরে পড়ে। হয়তো গরম ফ্যান আরও নিয়ে আসছে, কিম্বা নূতনতর কোন অস্ত্র।

অস্থিসার অশক্ত এক বুড়ো কেবল নড়ে না, 'হায়' 'হায়' করছে আর মাথায় ঘা দিচ্ছে।

টর্চের আলো পড়ল বুড়োর মুখের উপর। চেনা-চেনা মুখ। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে সুপ্রিয়া অনুপমের পাশে তার গায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। সুপ্রিয়ার দিকে কি রকম করে চাইছে বুড়ো। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে তার দিকে এগুচ্ছে। চিনতে পেরেছে—আর সন্দেহ নেই—গড়ভাঙার কেদার মোড়ল আর রূপদাসী।

পথ হারিয়ে বিলে বিলে ঘুরছিল, নাছোড়বান্দা ওরা ঘরে ডেকে তুলল। অজানা গ্রামের মধ্যে মিটমিটে টেমির আলোয় আতঙ্ক আর ঔৎসুক্য মিলিয়ে সে রাত্রে কি বিচিত্র অনুভূতি শহুরে মেয়ের! ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়, তাই বলেছিল শহরে আসতে। এদের বলেছিল, বলেছিল দ্বারিক সর্দারদের, আরও অনেককে অনেক ক্ষেত্রে বলে এসেছে। কলকাতা দেখবার ভারি লোভ ঐসব পাড়াগেঁয়ে চাষীর, পরম আগ্রহে সবাই স্বীকার করেছে—এক রূপদাসী ছাড়া। রূপদাসীর কাছে সকলের চেয়ে বড় তার সচ্ছল সংসার। সেই নিমন্ত্রিতেরা এতদিনে দলের পর দল বুঝি শুরু করল নিমন্ত্রণ রাখতে। রূপদাসী সকলের আগে,—যন্ত্রণায় সে ঐ ছটফট করছে হাঁড়িভরতি শহরের উষ্ণ আতিথ্যে। আরো সব আসছে এদের পিছনে পিছনে—দ্বারিক সর্দার, বগলা দাসী, যামিনী, কার্তিক—

রূপদাসীর যন্ত্রণা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে দু'খানা তরকারি সহযোগে সরু চালের গরম ভাত খেয়ে নিচের ঘরে দাসুর পেতে-দেওয়া তোষকের নরম বিছানায় আনন্দে তৃপ্তিতে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রি হয়েছে, সুপ্রিয়া ঘুমোয় নি। শুয়ে শুয়ে মনে পড়ছে রূপোর গোট কোমরে-পরা নিটোল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গড়াভাঙার ভরা গৃহস্থালীর অধিকর্ত্রীটির কথা। চলনে বলনে দেমাক সেদিন ফেটে ফেটে পড়ছিল। একটা রাত্রি তো ছিল, তার মধ্যে যে ক'টা কথা হয়েছে রূপদাসীর সঙ্গে, সমস্ত তাদের ঐশ্বর্যের গল্প। উঠানে আউশধানের পালা সাজিয়ে দিয়ে যায়, কখনও আউড়ির আমন ফুরায় না তাদের। বুধি, মুংলি আর রাঙি—তিনটে গাইয়ের দুধ কড়াই-ভরতি। কর্তার শরীর ভাল নয়, রোদ সহ্য হয় না—তাই দেখ, ছাতি কেনা হয়েছে, তালপাতার নয়—আসল কাপুড়ে ছাতি···

বিপাকে পড়ে তিনটি মাস সুপ্রিয়ারা গ্রামে গিয়েছিল। গ্রামকে ভালবেসেছিল। সেই ছবি সুপ্রিয়ার মনে ভাসছে—বাংলা দেশের সর্বকালের চেহারা। উঠানে পোয়ালগাদা, একটা বাছুর শুয়ে পড়ে আলস্যে পোয়াল চিবোচ্ছে। নারিকেলগাছের ফাঁকে দূর-প্রসারিত সবুজ বিল, পুকুর একটা—টোকাপানায় আর কলমি লতায় ভরা, লাউয়ের মাচা চলে গেছে

অনেকখানি জল অবধি। কলাগাছ, বনকচুর উপর দিয়ে ঝিঙে-ডগা লতিয়ে চলেছে, হলদে হলদে ঝিঙেফুল···ঘুঘু ডাকছে এদিকে-সেদিকে, ডাকছে মাছরাঙা, ফিঙেপাখি···পুকুরে মাছের লাফানি, পাতিহাঁস ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘোমটা-দেওয়া বউরা ঘাটে এসে বাসন মাজছে। নিরুদ্বিগ্ন শান্ত ঘরবাড়ি···বাইরের বারোয়ারিতে পিতল-কলসি আর কলার কাঁদি ঝোলানো আসরের উপর কম্পমান সরার আলোয় দুই কবিতে ওদিকে তুমুল ছড়ার লড়াই লেগে গেল।

আবার গিয়ে দেখতে পাবে সেই বাঁকাবড়শি-মাদারডাঙা-গড়ভাঙা? সকালে খবরের কাগজে থাকে যুদ্ধের খবর—বোমার আগুনে হাস্যোচ্ছল কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে! খবরের কাগজে বাঁকাবড়শি-মাদারডাঙা-গড়ভাঙার কথা কে লিখতে যাচ্ছে বল? তার চেয়ে পঞ্চম-বাহিনী আগস্ট থেকে কি কি নির্মমতা দেখিয়েছে—জবর করে সেই বিজ্ঞাপন ছাপলে টাকা মিলবে ভালো।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা হয়েছে। হাজতে চলেছে এরা দেখা করতে। লাল রঙের ইট-বের-করা এক-প্যাটার্নের সরকারি বাড়ি দু-ধারে। অঞ্চলটার নামই হয়েছে আদালতপাড়া।

ভাঙা সাইকেলের লোহা-লক্কর আছে একটা বারান্দা-ভরতি আর উঠানে ভাঙা নৌকার তক্তা—কাঠকুটো।

সুপ্রিয়া বিস্ময়ে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওরে বাবা—কত!

অনুপম বলল, কো-অপারেটিভ বিল্ডিং-এ ঐ যে পর্বতপ্রমান বস্তা সাজানো দেখে এলে—পচা আটা-ময়দা ও-সব। সস্তায় নিলামে বেচবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু এমন নষ্ট হয়েছে যে খদ্দেরই এল না।

উমা জিজ্ঞাসা করে, আর মড়ার খুলি-কঙ্কাল কোথাও গাদা দিয়ে রেখেছে নাকি অনুপমবাবু?

বিস্মিত চোখে চেয়ে অনুপম বলে, কেন?

মহাযুদ্ধের পুরোপুরি মিউজিয়াম হয়ে যেত তা হলে। সমস্ত রয়েছে—একটার কেন খুঁত রাখলেন আপনারা?

পৌঁছে দিয়ে অনুপম বলে, কথাবার্তা বলতে লাগুন। আমি ঘুরে আসছি, এসে বাসায় নিয়ে যাব!

লোহার গরাদের ওদিকে পান্নালাল, এদিকে উমা আর সুপ্রিয়া।

পান্নালাল বলে, কি উমা, মাস্টারি এই শহরেই জোটালে নাকি? কাজে যাবার মুখে দৈবাৎ এসে পড়েছ?

উমা বলে, গালি দিতে এসেছি গাড়ি ভাড়া করে। বড্ড একচোখা তুমি পান্না-দা।

স্বচ্ছ হাসি হেসে পান্নালাল বলে, কার দিকে পক্ষপাত করলাম, বল তো—

জেলের পাকা-ঘর আর দেশের খোলা-মাটি—যেন দুই সতীনে টানাটানি করে তোমাকে নিয়ে। কিন্তু জেলের দিকে ঝোঁক তোমার বেশি। অন্তত মাঝামাঝি করে নিলেও বিচার হত—যত দিন জেলে, ততটা দিন বাইরে।

পান্নালাল বলে, জেলের বাইরে যে আরও বড় জেল, বেশি কষ্ট।

সুপ্রিয়া বলে, কি বলছেন পান্নালালবাবু?

সত্যি কথা, সুপ্রিয়া দেবী। বিরাট বন্দী শিবির ভারতবর্ষ; সমুদ্র আর হিমালয়ের পাঁচিলে বিংশ শতাব্দীকে আটকে রাখা হচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ নিষ্কর্মা এই সঙ্কট-সময়ে। দেশকে ভালবাসা এখানে অপরাধ! অসওয়াল্ড মোসলের মতো ফ্যাসি-বন্ধু ও-দেশে মুক্তি পায়, আর নেহেরু এখানে পচে মরেন কারাগারে। বাইরের জেল বেশি ভয়ঙ্কর বলে ছোট্ট জেলে শামুকের মতো মাথা গুঁজে ঢুকতে আর লজ্জা পাই নে।

সুপ্রিয়া মিষ্টি জমা দিয়ে এসেছিল গেটে। বলে, কলকাতা থেকে বয়ে এনেছি। খাবেন কিন্তু। যদি কোন-কিছুর দরকার থাকে, বলুন।

পান্নালাল বলে, একখানা খাতা পাঠিয়ে দেন যদি অনুগ্রহ করে—

লিখবেন?

পান্নালাল ঘাড় নাড়ল।

সুপ্রিয়া বলে, কি লিখবেন—মহাশ্মশানের কাহিনী?

পান্নালাল বলে, পথের কথা থাকবে বই কি কিছু কিছু! কিন্তু পথটাই তো লক্ষ্য নয়! কোন্ মায়ের ছেলে রক্ত-স্রোতের মধ্যে জন্ম নেয় নি বলুন! রক্তের দাগ মুছতে কতটুকু সময় লাগবে? স্বাধীনতার আলোয় সোনার মানুষ, হাসিতে যাদের মুক্তা-মানিক ঝরে—আমি লিখে যাব অদূরকালের তাদেরই কথা

অনুপম হাসতে হাসতে এল। নাটকীয় ভাবে পান্নালালকে বলে, আপনি মুক্ত— বুধবার বেলা দশটা অবধি। সেইদিন মামলা। জামিন মঞ্জুর করেছে, হুকুমনামা এসে গেছে—

সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে বলল, যতুর যে ভাবে হোক, কয়াত্তেই হল। তুমি যে বলেছিলে! ইণ্টারভিউ চলুক এঁদের এই দেড়টা দিন সারাক্ষণ ধরে।

॥ ২ ॥

ঘোড়ার-গাড়ির ছাতে একদল ড্রাম-বিউগল ইত্যাদি বাজিয়ে সমস্ত শহর আলোড়িত করে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় সিনেমা-হলে 'দুর্ভিক্ষ' নামক নৃত্য-নাট্যের অভিনয় করছেন অভিজাত ছেলেমেয়েরা। ক'দিন ধরে চলছে। হৈ-হৈ ব্যাপার। টিকিট-বিক্রির সমস্ত টাকা খরচ হবে দুর্গতদের সাহায্যে।

উমা বলে, যাবে পানু-দা? চমৎকার হচ্ছে নাকি। যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে শুনলাম।

পান্নালাল বলে, চোখের উপর যা দেখে এলাম, চমৎকার তার চেয়েও?

উমা বলে, চলই না। কাল সন্ধ্যায় কাছে পাব না তোমাকে, কাল তো বলতে যাব না!

অভিমান-ভরা কণ্ঠ আর ঘাড়-দোলানোর ভঙ্গি কচি কিশোরী মেয়ের মতো তিরিশের কাছাকাছি বয়স—উমার মোটে মানায় না এ রকম।

নাচ-গান শুরু হল। হলের আলো নিভেছে। পান্নালালের ভালো লাগে না, উসখুস করছে। বেমানান মোটা আর অত্যন্ত ফর্শা একটি মেয়ে ছিন্ন-সজ্জায় সাজগোজ করে নেচে নেচে প্রাণান্তক প্রয়াসে বুভুক্ষার রূপ দেবার চেষ্টা করছে স্টেজের উপর। খুব হাততালি পড়ছে। পাশাপাশি মনে পড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে দলে দলে যারা গ্রাম ছাড়ল, বউডুবির বিলের ধারে এখানে-ওখানে ছড়ানো যে সব মানুষের কঙ্কাল।

হঠাৎ চেয়ে দেখল, উমার নিষ্পলক দৃষ্টি তারই দিকে। ধরা পড়ে উমা হেসে ফেলল। বলে, খাসা নাচছে, নয় পানু-দা?

নাচ দেখছ কি আমার মুখে?

উমা অপ্রতিভ হয় না। বলে, তা যদি বললে, বেরিয়ে যাই চল। মুখই দেখিগে ভাল করে।

পান্নালাল বলে, মনে পড়ে উমা, একবার লুকিয়ে সাঁকো পেরিয়ে আমরা যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম? কত ছোট তখন। আসরের বাইরে পোড়ো আমগাছের ডালের উপর দাঁড়িয়ে দু-জনে দেখে এলাম।

উমা মুখ টিপে হেসে বলে, কিছু আমার মনে পড়ে না।

পান্নালাল বলে চলেছে, পাশের খবর বেরুলে তোমার মা আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। সেদিনও মনের আশা, এক শান্ত সুখের সংসার হবে আমাদের।

গভীর স্বরে উমা বলে, সংসার যেদিন হবে—অশান্তি বা অসুখ হবে না, এ তুমি নিশ্চিন্ত জেনো পানু-দা।

যুদ্ধের সৈনিক—সুখ-শান্তি তো আমাদের জন্য নয়।

যুদ্ধ যখন মিটে যাবে?

তার আগে মৃত্যু-সম্ভাবনাই তো প্রতি পদে।

তা হলে পরজন্মে। বড্ড সেকেলে রোমান্টীসিজম—না পানু-দা? বলে উমা উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল।

পান্নালাল প্রশ্ন করে, পরজন্ম মান তুমি?

উমা বলে না। কিন্তু আশা তো চাই। জীবনে কিছুই যদি না পেলাম, পরজন্মের কথা না ভেবে উপায় কি বল?

একটু স্তব্ধ থেকে বলে, এদেশের মানুষ সব ব্যাপারে বঞ্চিত হলেই বোধকরি এমন বিশ্বাসী পরজন্মে।

সকালবেলা। বাঁকাবড়শির লঙ্গরখানার জন্য বেশি চাল-ডালের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সেজন্য অনুপম আর সুপ্রিয়া গেছে সাপ্লাই-অফিসারের বাড়ি তাঁর সঙ্গে খাতির জমাতে। দাসু বাজারে। ভাল হয়েছে, নিরালা বাড়িতে পান্নালাল আর উমা। সুপ্রিয়ার এর ভিতর কারসাজি আছে কিনা, বলা যায় না। আদালতের বিচারে যা হবে, সে তো আগে থাকতে বলা যায়।

উমার যেন বিশখানা হাত হয়েছে আজ। গল্প করছে পান্নালালের সঙ্গে। ছুটে গিয়ে চিরুনি নিয়ে এল।

চুলটা আঁচড়াও দিকি পানু-দা, একটু ভদ্র হও। ঝোড়ো-কাকের মতো দেখাচ্ছে যে!

এরই মধ্যে এক ফাঁকে নুন দিয়ে এল তরকারিতে। গুণ-গুণ করে গান গাইছে আবার।

পান্নালাল বলে, খুব যে ফূর্তি!

বীরাঙ্গনা আমি যে! এরকম দিন জীবনে তো এই প্রথম এল না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে উমা।

টং করে ঘড়ির আওয়াজ এল কোন্‌দিক থেকে। সাড়ে ন'টা। আর মিনিট পনেরর মধ্যে অনুপমের ট্যাক্সি এসে পড়বে। সেই গাড়িতে কোর্টে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ উমা বলে উঠল, না-ই বা গেলে কোর্টে! চল, পালিয়ে যাই।

তাতে রেহাই নেই। ওয়ারেণ্ট বেরুবে।

দূরে—অনেক দূরে যাব। যে কটা দিন বাইরে থাকা যায় ধরবার আগে।

এই বুঝি ?

উমা চোখের জলে আকুল হয়ে বলে, যা ইচ্ছে বলগে তুমি। যা খুশি লোকে ভাবুক। তুমি যেও না—যেও না—

পান্নালাল তাড়া দিয়ে ওঠে, ছিঃ।

উমা উদ্ধত অবাধ্য ভঙ্গিতে বার বার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, আমার মা তোমার হাত ধরে বলে গিয়েছিলেন, মরবার সময় নিশ্চিন্ত ভরসায় তিনি চোখ বুজেছিলেন—তোমার কোন কর্তব্য নেই আমার উপর ? নিষ্ঠুর পাষাণ তুমি, কেবল তোমার নাম বাজাবার শখ—

নিচে মোটরের হর্ন। অনুপম সুপ্রিয়াকে নামিয়ে দিল। সে আর উমা খাওয়া-দাওয়া সেরে পরে যাবে। পান্নালাল দ্রুত নেমে গাড়ির ভিতরে উঠে বসল।

জনশ্রুতি, হাকিমের বউ নাকি খদ্দর পরে, শালা জেল খেটেছিল কোন্-বারের এক আন্দোলনে। সরকারি উকিলের সুদীর্ঘ বক্তৃতার ফাঁকে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, আসামিদের গায়ে মাথায় এসব কিসের দাগ, রায় বাহাদুর ?

উকিল বললেন, যখন গারদে ছিল মশায় কামড়েছে।

হাকিম বললেন, বাঘের কামড়ের দাগ হয় এই রকম ! মানুষ শুকোচ্ছে, আর মশাগুলো যে বাঘ হয়ে উঠেছে খেয়ে-খেয়ে !

পান্নালালকে প্রশ্ন করলেন, কিসের দাগ, আপনি বলুন তো—

পান্নালাল হেসে বলে, কিচ্ছু নয়, একটু-আধটু জখমি ব্যাপার। মারা-মারিতে কত লেগে যায় এ রকম !

মারামারি যখন—মার খেয়েছেন, মেরেছেনও তা হলে ?

দুঃখিত স্বরে পান্নালাল বলে, মারতে আর পারলাম কই ! হাত বাঁধা ছিল—দড়িটা ছেঁড়া গেল না কিছুতে।

হাকিমের বয়স বেশি নয়, মজা লাগে কথার ধরনে। বললেন, দোকান লুঠের সর্দার নাকি আপনি ?

পান্নালাল বলল, সর্দার না হাতি। ভারি একটা ব্যাপার! গাল-ভরা নাম দিয়ে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?

যেহেতু লুঠপাট করেছেন, বিচারে জেল হয়ে যাবে আপনাদের—

নিস্পৃহ কণ্ঠে পান্নালাল বলল, হুঁ—

কিছু বলবার নেই ?

কি আর বলব, বলুন। কায়দায় পেলে কে কাকে ছাড়ে? আমরাও কায়দায় পেতাম যদি—

কৌতুক-ভরা মুখে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, বিচারটা কি রকম করতেন তা হলে?

মানুষ খেতে পায় না কেন, তার বিচার। কেন ভাত থাকে না ঘরে? কোথায় গেল, কারা নিয়ে গেল? জুত পেলে আমরাও জেল-দ্বীপান্তর দিতাম যারা আসল আসামি—তাদের ধরে ধরে।

কোর্ট ভাঙবার মুখে কয়েদির গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পান্নালাল বলল, রাগ করে মুখ ফিরিয়ে থেকো না উমা। চললাম। সুপ্রিয়ার দিকে হাত জোড় করে বলে, নমস্কার!

পান্নালাল জেলে ঢুকল। সত্যাগ্রহে নয়—দাঙ্গাহাঙ্গামার অপরাধে। ফুলের মালা নয় এদের জন্য। শান্তিভঙ্গ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে বাধা সৃষ্টি করেছে—পঞ্চম-বাহিনী নাকি এই পান্নালালেরা! মোটা মোটা গরাদ দেওয়া সুবৃহৎ ফটক বন্ধ হল তার পিছনে। পৃথিবীর নির্মমতম যুদ্ধের সময় বড-জেলে আটক ছিল সে। দেখেছে, দিনের পর দিন নৈষ্কর্ম থেকে মুক্তির জন্য প্রাণবান নরনারীর আকুতি; দেখেছে, বেঁচে থাকবার জন্য নিষ্প্রাণ মানুষ-গুলোর অক্ষম মর্মান্তিক প্রয়াস। বড়-জেল থেকে ছোট-জেলে এসে সে যেন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। এ-ও মুক্তি এক ধরনের।

॥ ৩ ॥

সুপ্রিয়া বলে, এদ্দুর যখন এসেছি, গ্রামে একবার না গিয়ে কেমন করে ফেরা যায়?

অনুপম অবাক।

এই বুঝি মতলব ছিল গোড়া থেকে? না, না—গ্রামে যাওয়া থাক এখন। জান তো, পার্টি-মিটিং—আমার কিছুতে যাবার উপায় নেই।

দৃঢ়কণ্ঠে সুপ্রিয়া বলে, আমাকে যেতেই হবে। লঙ্গরখানা নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে—কিন্তু গাঁয়ের মানুষ খারাপ নয়, আমি নিজে সেখানে থেকে দেখে এসেছি। বাবার যাবার জো নেই, তুমি পারবে না—গণ্ডগোল মিটিয়ে বিচার-ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

বলে সে আয়ত চোখে তাকাল অনুপমের দিকে। ব্যঙ্গ উছলে পড়ছে দৃষ্টিতে। বলে, সত্যিই তো! তোমার গেলে চলবে কেন? মাইনে আর ভাতা বাড়াবার প্রস্তাব যে তোমাদের—

অনুপম গ্রাহ্য করে না। লজ্জার কি আছে এতে? দুর্মূল্যের বাজার—মেম্বারদের যৎসামান্য যা দেওয়া হয়, তাতে খাটনি পোষায়? তুমিই বল।

ভ্রূ কুঁচকে সুপ্রিয়া বলে, ওঃ—খাটনি কত! এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘরে গদির উপর বসে ঝিমানো, ভোটের বেলা চেঁচিয়ে ওঠা, নয় তো বড় জোর গুনতি হবার জন্য গতর ডুলিয়ে নিজেদের খোয়াড়ের মধ্যে ঢুকে পড়া।

অনুপম হেসে বলে, আর কিছু নয় বুঝি!

আর বক্তৃতা লিখিয়ে নিয়ে রাত জেগে মুখস্থ করতে হয় যখন। সে আর কদিনই বা!

অনুপম, বলে, হল তাই। কায়দায় পেয়েছি যখন ছাড়ব কেন? কে ছাড়ছে বল এ বাজারে? বিরোধীরা পাঁয়তারা ভেঁজে বেড়াচ্ছে, মনে মনে জানে—মাইনে-ভাতা বাড়ালে তারাও বাদ যাবে না। গরম গরম বক্তৃতা বাজিয়ে ফাঁকতালে পশার বাড়িয়ে নিচ্ছে। ভাল আসলে কেউ নয়।

সুপ্রিয়া বলে, দু-দশ জন যাঁরা ছিলেন, ছুতোনাতায় জেলে পাঠিয়ে নিরঙ্কুশ হয়েছে।

অনুপম যাবে না সাফ জবাব দিয়েছে—সেজন্য অভিমান নয়, দস্তুরমতো রাগ হয়েছে সুপ্রিয়ার। বলতে লাগল, পান্নালালদের জেলে আটকে রেখে বড্ড স্ফূর্তি। সিকি পয়সার মুরোদ নেই, তবু এই যে তোমাদের লম্বা লম্বা মাইনে-ভাতা—মনে রেখ, সে কেবল ওঁদেরই লাঞ্ছনার মূল্যে। মজা করে আজকে প্রহসন জমিয়েছে, কিন্তু চিরদিন চলবে না—দেশের দুলালরা যেদিন বেরিয়ে আসবেন, খুনীদের বিচারের জন্য দাবি উঠবে।

খুনী কারা?

লাখ লাখ মানুষ মরল, আর শাসনের নামে দুর্নীতি-অব্যবস্থার চূড়ান্ত চলছে ওদিকে। খুনী নয় তো কি বলব তোমাদের? যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের আয়োজন হচ্ছে, এ অপরাধীদের বিচার করবে কে?—যাকগে। তোমাদের বড় বড় কাজ—তুমি চলে যাও, পার তো ভাল দেখে নৌকো ঠিক করে দিয়ে যাও একখানা। আমি আর উমা যাচ্ছি দাদুকে নিয়ে। যাবই।

এখন হুকুম হয়েছে, নৌকো চালাতে পার। কিন্তু কোথায় নৌকো—সবই তো গেছে! নূতন করে বানাবে কারা, আর চালাবেই বা কে?

তবু অদৃষ্ট ভালো, অনুপম জুটিয়ে দিয়ে গেছে একখানা—সেগুনকাঠের নয়, সুপারিকাঠের। এই গড়তেই কী মুশকিল! সুপারিগাছ ছুতারমিস্ত্রির অভাবে নিজেরাই কড়ুল দিয়ে কেঁড়েছে। পেরেক মেলে না, শেষকালে

ভাঙাচুরো দা-বঁটি খন্তা-শাবল যা যেখানে ছিল জড় করে এই শহরে এসে অনেক কষ্টে কামারকে দিয়ে পেরেক গড়িয়ে নেয়।

বাঁকাবড়শি বড়-গাঙের উপর, সুপারিকাঠের পলকা নৌকো নিয়ে সাহস হয় না সে-গাঙে ভাসতে। ছোট ছোট খাল দিয়ে ঘুর-পথে অনেক সময় নিয়ে অবশেষে নৌকো মাদারডাঙার ঘাটে পৌঁছল। বাঁকাবড়শি অবধি সেই পথটুকু হেঁটে না গিয়ে উপায় নেই। নয় তো অপেক্ষা করতে হবে—পুরো জোয়ারে বিলের দাঁড়াগুলোয় যখন জল ঢুকবে, তখনই লগি ঠেলে নৌকো নিয়ে যাওয়া যাবে।

সুপ্রিয়া বলে, বয়ে গেছে—খোঁড়া মানুষ নই তো আমরা! তুমি বরং জোয়ার অবধি এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোও মাঝি।

জেলেপাড়ার ঘাটে নৌকো লেগেছে। সুপ্রিয়া উমাকে দেখাতে দেখাতে চলেছে—এই একবছর আগেও যেখানে যা ছিল। চালে চালে বসত ছিল; খুব সমৃদ্ধিবানও ছিল কেউ কেউ। তিনখানা পূজো হয়েছিল সেই আশ্বিনে —শ্রীমন্ত পাড়ুই আর বুদ্ধিমন্ত পাড়ুই—দু-ভায়ের দু-খানা। আর একখানা বারোয়ারি কালীতলায় অস্থায়ী-মণ্ডপ বেঁধে। এখন খাঁ-খাঁ করছে পাড়াটা। মানুষজন নেই, তক্তা-খোলা অতি জীর্ণ ডিঙি একখানা খালের ধারে। ডিঙি নয়, ডিঙির কঙ্কাল। হরিহরের কাছে সুপ্রিয়া গল্প শুনেছে, বিশ তিরিশখানা নৌকো নাকি বারোমাস উপুড় করা থাকত এই ঘাটে। রেঁদা, হাতকরাত আর বাটালি চলত সমস্ত দিন। জ্যোৎস্না হলে রাত্রেও কাজ চলত। ঠুকঠাক দুড়ুম-দড়াম আওয়াজ সব সময়; কান পাতা যেত না। নিজেও সে একদিন এসে দেখেছিল, খোঁটা পুঁতে কত জাল মেলে দেওয়া ছিল এই জায়গাটায়! খোঁটাগুলো সারবন্দি খাড়া আছে এখনো। সেই যে গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে ঘাট বাঁধা হয়েছিল, জেলে-বউরা নেমে স্নান করত আর ক্ষারে-সেদ্ধ কাপড় আছড়ে আছড়ে ফর্শা করত, ভরা-কলসি বসিয়ে রেখে খানিক গল্প-গুজব করত—সেই ঘাট রয়েছে, কেউ এখন পা ফেলে না সেখানে। ঘাটের উপরে গাবগাছ। কাঁচা গাব পেড়ে গাবের কষ জালে মাখাতে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত, এখন ফল পেকে হলদে হয়ে তলায় পড়ে যাচ্ছে, গাঙ শালিকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

গভীর নিশ্বাস ফেলল উমা। দিনের পর দিন পান্নালাল এই মৃত্যুপুরী পাহারা দিয়ে ফিরেছে। কোমল আবেশ-স্নিগ্ধ তার মুখ কঠোর শিরাসঙ্কুল হয়েছে, কৈশোর থেকে যৌবন—যৌবনের উপান্তে এসে মৃত্যুতে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। কি শক্ত বাঙালি ছেলের মন, কিছুতে নিরাশ হওয়া তাদের

কোষ্ঠীতে লেখে না। তার পান্নু-দা এই শ্মশানে এখনো ফুল ফোটাবার স্বপ্ন দেখে।

সুপ্রিয়া দেখাল, পান্নালালবাবুর ইস্কুল-ঘর ঐ যে—

সাদা দেয়ালের উপর কোন্ বিদ্যাবাগীশ পড়ুয়া কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে বিদ্যে জাহির করে গেছে, ঝিকমিক করছে সে লেখা—'সুশীতল নদীজল'। খানিকটা ওপাশে ছবি আঁকা। শিল্পী বুদ্ধি করে নিচে চিত্র-পরিচিত লিখে রেখেছে—'ঝড়ু'। তাই বোঝা যাচ্ছে, ছবিটা মানুষের। নাক উহ্য একেবারে; নাকের শোধ কানে তুলেছে—অবিকল ঐরাবতের কান। এই অমন-চিত্র রচনা করে শিল্পী সম্ভবত ঝড়ু নামক কোন সহপাঠীকে জব্দ করেছে।

সেই আসন্ন সন্ধ্যায় একটা লোক পিছন ফিরে নিবিষ্ট মনে বিদ্যাভ্যাস করছে দেখা গেল। পান্নালালের জায়গায় নূতন মাস্টার কে এল আবার?

সুপ্রিয়া ডাকে, কে?

উস্কো-খুস্কো চুল-দাড়ি দ্বারিক সর্দার মুখ ফেরাল। জনশূন্য গ্রামে এই রকম পোড়ো পাঠশালা-ঘরে সন্ধ্যার আধ-অন্ধকারে গা কেঁপে ওঠে এদের। আতঙ্কিত সুপ্রিয়া বলল, কি করছ সর্দার মশায়?

বাজে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দ্বারিক মুখ ফিরিয়ে নিল। মনোযোগের ব্যাঘাত হওয়ায় এবার সে চিৎকার করে দুলে দুলে পাঠ অভ্যাস করতে লাগল, ক আর র—কর, খ আর ল—খল, ঘ আর ট—ঘট।

নিঃশব্দে চলেছে উমা আর সুপ্রিয়া। আপন মনে হঠাৎ সুপ্রিয়া বলে ওঠে, অথচ একটা বোমা পড়ে নি এদিকে কোথাও। কলকাতায় দু-চারটে পটকার মতো যা ফুটেছিল, তার আওয়াজও আসে নি এতদূরে। কিসে পুড়ল গ্রাম?

ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া অশ্বত্থগাছটা ছাড়িয়ে তারা ফাঁকায় এল। গাজনের মেলা বসত যেখানে, সে জায়গাটায় হাঁটুভরা উলুঘাস। দিগন্তদিসারী বউডুবির বিল সামনে, আর ডাইনে দ্বারিকের টিনের ঘরের প্রকাণ্ড ভিটা! শীতের বাতাসে ধান-ক্ষেত দুলছে ঝিলমিল করে। কী ফসল ফলেছে মরি মরি। ধরিত্রী সোনা ঢেলে দিয়েছে, বিশ বছরের মধ্যে এমন ফসল কেউ দেখে নি। ঐ রান্নাঘরের দাওয়ায় সুপ্রিয়া রান্না করেছিল, সামনে বসে খাইয়েছিল পান্নালালকে। কে দাঁড়িয়ে ওখানে—যামিনী নয়? যামিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। কিংবা তাদের হয়তো নয়—চেয়ে চেয়ে দেখছে দিগ্ব্যাপ্ত ধানবন। দাওয়ায় দাঁড়ালে সমস্ত বিলটা ওখান থেকে নজরে আসে।

ধান পেকেছে, ধান কাটার মানুষ নেই। খোরাকির শেষ দানা অবধি

বীজতলায় ফেলে উপোস করে করে যারা ক্ষয়েছিল, কোথায় তারা ছিটকে গেছে! কার্তিক মাস এসে কবে চলে গেছে, অগ্রহায়ণও যায় যায়। দ্বারিক সর্দার বিষম মনোযোগে বিড়াভ্যাস করছে। কিষানহাটা বসে না জলমার হাটে, কিষাণ কেনার মানুষ কই? আর ধানের রাশি এদিকে পাখি খেয়ে যাচ্ছে, ক্ষেতে ঝরে ঝরে পড়ছে—কে কুড়বে, কেটে ঝেড়ে আনবে? কে খাবে? কোথায় গেল তারা—একখুঁচি ধানের জন্য দেশ-দেশান্তরে পাগল হয়ে ছুটত, একমুঠো ভাতের জন্য কুকুরের মতো এসে পড়ত?

ঘরের মধ্যে বলগা দাসী পড়ে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। হাঁপানির কষ্টে বিকৃত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে ওঠে, বউমা, ও আবাগির বেটি, কি করিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? ...ক্ষ্যো দিবি নে ঘরে?

জেলের মধ্যে বিশ্রাম-আনন্দে পান্নালাল এখন হয়তো কাব্য লিখে চলেছে রূপসীর উদ্দেশে প্রেমোচ্ছ্বাসে নয়, আরও রোমাঞ্চক—আগামী দিনের নূতন সূর্য আর নূতন মানুষের গান। আর আজকের ও অতীত দিনের বিস্মৃত-নাম অপরাজিত সৈনিকদের অভিযান-কথা। এই মাদারডাঙা-বাঁকাবড়শিতে নূতন কালের নরনারী এসে ঘর বাঁধবে, নিভৃত গুঞ্জন উঠবে বর্ষামুখর রাত্রে ছ্যাঁচা-বেড়ার আড়ালে, ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া অশ্বত্থগাছ সবুজ পাতায় ঝিকমিক করবে। মড়ার হাড়পাঁজরা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধূলো হয়ে বাতাস উড়ে যাবে, মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, উর্বরা ঐশ্বর্যবতী করবে ধরণীকে। দু-শ বছরের পরাধীনতা শুধু স্মৃতি হয়ে রইবে ইতিহাসের কয়েকটি পাতায় এক প্রাণহীন অধ্যায়ে। সে দিনের তরুণ-তরুণী বিস্ময় আর অপরূপ উল্লাসে শুনবে বাঁকাবড়শি-মাদারডাঙা ও আরো লক্ষ লক্ষ গ্রাম-খচিত বিশাল ভারতবর্ষের মৃত্যুজয়ী বিচিত্র সংগ্রামের গল্প। ক্লেদ-পঙ্কিলতার তলে বেঁচে আছে যে অমর-জীবন, নবীন আলোয় সেদিন শতদল হয়ে ফুটবে।

রাত্রি-শেষের পাখির মতো, শুকতারার আলোর মতো কবি পান্নালাল লিখে যাচ্ছে, এই আসন্ন প্রভাতবার্তা—ঘরে ঘরে ম্লান মুমূর্ষুদের জন্য মুক্তির অভীঃমন্ত্র। সুন্দর পৃথিবী—তোমরা আশা কর, সাহস কর। বাঁকা মেরুদণ্ড আবার খাড় হয়ে উঠবে খাদ্য পেলে—সে খাদ্য স্বাধীনতা। তারই জন্য পাগল হয়ে দলে দলে ওরা পথে বেরিয়েছে—মাথায় নির্যাতনের শিলাবৃষ্টি, পেছনে টলমল অশ্রুসমুদ্র।

ভুলি নাই

(উপন্যাস)

(রচনাকাল ১৩৫০)

কুন্তল-দা, তোমাদের ভুলি নি। পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে নিরুদ্বিগ্ন মানুষগুলোকে দেখি, খাচ্ছেদাচ্ছে, অফিস করছে, রোগে ভুগে নির্বিবাদে মরে যাচ্ছে। দিব্যি আছে। আমিও ওদের একজন হয়ে থাকব, মল্লিকার মুখ চেয়ে কতবার ঠিক করেছি। কিন্তু পারি কই? নিঃশব্দ রাত্রে তোমরা এসে হাজির হও, ফিস-ফিস কথাবার্তা···আমার পাতানো বউ নিরু হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায়···অভিমানহত আনন্দ আসে···স্তব্ধমূর্তি সোমনাথের ছায়া দেখে তাড়াতাড়ি যুক্তকরে প্রণাম করি···জগৎ দত্ত, উমারানী, মায়া, সরোজ পাকড়াশি—জানা অজানা কত সাথী যেন যুগান্তরের ঘুম ভেঙে উঠে আসেন।

ভুলবার জো আছে তোমাদের?

আমার বাপ হলেন নীলকান্ত রায়। অমন ডাকসাইটের প্রিন্সিপাল তখনকার দিনে কোন মফস্বল কলেজে ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়, আমি তখন ছেলেমানুষ। মনে পড়ে, সেদিন রাখিবন্ধন—কোন বাড়ি রান্না হয় নি, অরন্ধনব্রত পালিত হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ছেলে-বুড়ো স্বদেশী গান করছে, এ ওকে হলদে রাখি পরিয়ে দিচ্ছে। আমরা কলেজ-সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকি। গোলমাল হবে মনে করে মা ইস্কুলে যেতে দেন নি, তাই স্ফূর্তির অবধি নেই। শত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠল; ছুটে সদর-দরজায় গেলাম।

প্রকাণ্ড মিছিল করে ছেলেরা বেরিয়ে যাচ্ছে। আচম্বিতে বাধা পড়ল, বাবা অফিস-ঘরের বারান্দায় এসে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, কুন্তল, শোন এদিকে—

সাড়ে চার-শ ছেলের মধ্যে কারও ক্ষমতা ছিল না, এ ডাক অমান্য করতে পারে। সেই আমি প্রথম দেখলাম কুন্তল-দাকে। বারান্দায় উঠে বাবাকে

প্রণাম করে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ালেন। আমার বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল, কী যে আছে ওঁর অদৃষ্টে! আজও মনে আছে সে ছবিটা।

ছাত্রের এ রকম বলিষ্ঠ ভঙ্গির সঙ্গে—বাবা বলে নয়, কলেজ-সম্পর্কিত কেউ কোন দিন পরিচিত নন। ভ্রূকুঞ্চিত করে বাবা বললেন, ব্যাপার কি কুন্তল?

আপনার কলেজ ভেঙে নিয়ে যাব বলে এসেছি। বন্দেমাতরম্ বলতে দেবে না, সার্কুলার দিয়েছে। প্রাণে এ অপমান সইছে না।

সকলে হতবাক্। এই ভয়লেশহীন ছেলেটার মাথায় বজ্রপাত হল বলে—দু-এক ঘণ্টার হোক বা দু-এক দিনের মধ্যে হোক—কারও এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রইল না। আর একটা কথাও না বলে বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন। গণ্ডগোল ও চিৎকার অতঃপর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, অনেক ছেলে সুড়-সুড় করে ক্লাসে ঢুকল। অবশিষ্ট বোধ করি জন পঞ্চাশ নিয়ে কুন্তল-দা দৃঢ়পদে বেরিয়ে গেলেন। কলেজ-সীমানার বাইরে অনেক রাত্রি অবধি সভা চলল, মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল।

পরদিন অভাবিত ব্যাপার—দেখি আমাদের বৈঠকখানায় কুন্তল-দা এসে বসেছেন। আর পাচ-সাত জন বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। সে সব কথার কিছু মনে নাই, মনে রাখবার বয়সও তখন আমার নয়। নানা ছুতোয় আমি ঘরের মধ্যে এসে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় ঐ প্রদীপ্ত-মুখ কিশোরটিকে বারংবার দেখেছিলাম। শেষ কথাটি মনে আছে, বাবা বলছেন, বড় কঠিন পথ—পারবে তোমরা?

পারব মাস্টার মশাই, আপনি আশীর্বাদ করুন।

একজনও যদি ফিরে এস, আমাকে পাবে না তোমাদের মধ্যে।

কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন স্থানীয় সরকারি উকিল। তিনি খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বাবাকে বললেন, আপনার মানা না শুনে বেরিয়ে গেল? বড় অন্যায় কথা—

বাবা বললেন, মানা করি নি। ব্যাপারটা শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, যাই হোক—মোটের উপর ঐ একই দাঁড়াল। দলের চাঁই ক'টার নাম লিখে দিন তো—

কাকে ফেলে কার নাম লিখি মশাই? ভীতু দু-চারটে হয়তো ক্লাসে গিয়েছিল, কিন্তু মনে মনে তারাও ঐ দলের। আর সত্যি বলতে কি—আপনার আমারই কি কম বেজেছে? নেহাৎ বুড়ো হয়ে পড়েছি বলে চেঁচাই নে—

সেক্রেটারি মুখ লাল করে বললেন, কলেজে ছেলে না থাকায় আপনি খুশি হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।

ছেলে নেই বলে আমার এদ্দিনের গোলামি খসে গেল, এর জন্যে সত্যি খুশি হওয়া উচিত। এতগুলো টাকার মায়া নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করা মুশকিল হয়ে পড়ত।

এক কথায় বাবা চাকরি ছাড়লেন; শপথ ভেঙে ছেলেরা ফিরে আসে কিনা, দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন না। স্ট্রাইক অবশ্য বেশি দিন টেঁকে নি, প্রায় সবাই কলেজে ফিরে এসেছিল—কুন্তল-দা পর্যন্ত। কিন্তু আর একটা পথে যে ঐ সঙ্গে যাত্রা শুরু হয়ে গেল, জীবনান্ত অবধি কারও ওঁদের ফিরে তাকাবার ফুরসৎ হল না।

জেলার কালেক্টর পর্যন্ত হাতে ধরে বাবাকে অনুরোধ করলেন, তিনি শুনলেন না। বাড়ির মধ্যেও তুমুল ঝড় উঠল। বাবা হাসিমুখে সকলকে নিরস্ত করতেন; বলতেন, আমার ছেলেরা জীবন দিচ্ছে—আর মাস মাস নগদ তঙ্কা গুনে নিয়ে কি করে আমি রাজভোগে থাকি বল।

সব জায়গায় এমনই এত খাতির, তার উপর চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে বাবা দেবতাবিশেষ হয়ে দাঁড়ালেন। যেখানে স্বদিশি সভা, সেখানেই তাঁকে যেতে হয়। নিতান্ত অপারগ হয়ে দু-এক ক্ষেত্রে যদি 'না' বলেছেন, পা জড়িয়ে ধরে একরকম জবরদস্তি করে পালকিতে তুলে নিজেরা তাঁকে বয়ে নিয়ে যেত। বস্তুত ছেলেরা একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল। কুন্তল-দা প্রভৃতিকে ভীষণ রকম শাস্তি দেবার জন্যে জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল, গতিক দেখে সেসব স্থগিত রইল। সেক্রেটারি একদিন কুন্তল-দাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি না যাওয়ায় শেষকালে উকিলবাবু নিজেই নাকি খুব গোপনে, তাঁর হস্টেল-ঘরে আসেন। এ কথা কুন্তল-দার কাছে শোনা—অতএব মিথ্যা হতে পারে না। শুভার্থী অভিভাবকের মতো স্নেহের সুরে তিনি বলেছিলেন, তোমরা রাজনীতি করতে যাচ্ছ, অন্যায় কিছু নয়, তার একটা কালাকাল আছে তো! এখন শিক্ষার সময়, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। বয়স হলে রাজনীতি কোরো—।

কুন্তল-দা জবাব দিলেন, আপনার রাজনীতি আর আমার রাজনীতি একেবারে আলাদা স্তর। আপনার রাজনীতির মানে টাকাকড়ি, মোটরগাড়ি, সরকারি খেতাব, সাহেবসুবোর কাছে প্রতিপত্তি, কাউন্সিলের মেম্বার হওয়া—আর আমাদের রাজনীতি হল অন্ধকার জেল, বেত খাওয়া, আপনার জনের সঙ্গ থেকে চিরবঞ্চনা, দ্বীপান্তর, হয়তো বা ফাঁসির দড়ি। আপনার ঐ বয়স অবধি টিকে থাকা কপালে নেই। যদি থাকে, তখন হয়তো আপনার রাজনীতিই করব।

বিপাকে পড়ে এমন কথাও উকিলবাবু হজম করে নিলেন, কোন উচ্চবাচ্য

করলেন না। কলেজের খাতায় যথারীতি কুন্তল-দার নাম রইল। পড়াশুনোর সময় নেই, সে ইচ্ছাও নেই—তবু নিতান্ত কাজের গরজে কলেজের আওতায় পড়ে থাকা। নূতন বছরে নূতন নূতন ছেলেরা আসে, দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে কুন্তল-দার সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব নানা কাহিনী ছড়িয়ে যায়, তাঁর কাছে যাবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য, এক ছত্র লেখা চিঠি পাবার জন্য সকলে ব্যগ্র। নূতন এক প্রিন্সিপ্যাল এলেন, কুন্তল-দাকে ঘাঁটাতে তিনি সাহস করতেন না—ছেলেদের সর্বদা কড়া শাসনে রাখতেন, যেন তাহা লেখাপড়ায় অধিক মন-সংযোগ করে, আড্ডা দিয়ে না বেড়ায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কুন্তল-দার সঙ্গে মিশতে মানা করে দেওয়া আর কি।

তখন কুন্তল-দা হস্টেল ছেড়ে কাছাকাছি গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে বাসা নিলেন, ছেলেদের যাতে অসুবিধা না ঘটে। একবার বামালসুদ্ধ ধরা পড়লেন। জেল হল। ঐ সঙ্গে কলেজ থেকেও নাম কাটা গেল।

সেই প্রথম ধরা পড়ে তিনি এক কীর্তি করেছিলেন, শুনেছি। পরবর্তী কালে ঐ প্রসঙ্গ উঠলে কুন্তল-দা হাসতেন, আর যাঃ—বলে আমাদের তাড়া দিতেন। তাঁকে হাজতে আটকে রেখেছিল। সারারাত্রি তিনি দেওয়ালে মাথা কুটেছিলেন। সকালে দেখা গেল, রক্তারক্তি ব্যাপার। বৃত্তান্ত কি? তিনি কানে শুনেছেন, কর্তাদের নাকি নানা রকম মিষ্টি ও তেতো ব্যবস্থা আছে —যার জন্য এর আগে অনেক ছেলে দলের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। সে যে কি ব্যাপার, কোন আন্দাজ ছিল না—পাছে তিনিও ঐরকম ফাঁদে আটকা পড়েন, তাই কুন্তল-দা মরতে চেয়েছিলেন···

স্বীকারোক্তির কথায় মনে পড়ে, আমাদের সরোজ পাকড়াশির কথা। গুলি-বেঁধা অবস্থায় সে ধরা পড়ে। প্রশ্ন হল, কি জান তুমি? দিনের পর দিন দলবদ্ধ হয়ে এসে তাকে উত্যক্ত করে, বল, তুমি কি জান?

অবশেষে একদিন সরোজ বলল, শুনবেন, না দেখবেন?

ওরা এ ওর মুখে তাকায়।

দেখুন তবে—শ্লথ হাত দু'খানা সরোজ বুকের উপর আনল—হয়তো কোন গোপন চিঠিপত্র আছে—নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ করে ওরা প্রতীক্ষা করছে। কি? ও কি? একটানে সরোজ ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত তীরবেগে ছুটেছে। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল; চেতনা আর ফেরে নি। •

ঐ সরোজের মা—কী হিংস্র মেয়েমানুষ! সরোজের মা বলে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত, মাথায় থাকুন তিনি—কিন্তু মোটেই সুবিধের লোক ছিলেন না, আমাদের যেন দাঁতে পিশে ফেলতে চাইতেন, অহরহ আঙুল মটকে বন্দেমাতরম্-

ওয়ালাদের উদ্দেশ্যে গালি পাড়তেন, চেঁচামেচি করে একদিন হিরণকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আর কি! অথচ তাঁর দু'টি ছেলে মেয়ে এই পথের পথিক হয়ে গেল, অত সতর্ক থেকেও মা-ঠাকরুন ঘরের আগুন সামলাতে পারলেন না···

শান্তিদিদির কথা মনে পড়ে। তাঁর স্বামী পুলিসের মধ্যে নামজাদা লোক; এদিকে অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র। তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতার দরুণ আমাদের হিরণ পালাবার সুবিধা পেয়েছিল। তাকে ধরবার জন্য ভদ্রলোক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল। নারায়ণতলায় গিয়ে শান্তিদিদিকে সেই সময় গোপনে বলতে শুনেছি, ধরলে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেবে ঠাকুর, যেন ধরা না পড়ে!

তোমার বরের চাকরী থাকবে না তা হলে।

শান্তিদিদি বললেন, একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকব ভাই···

আবার কুন্তল-দার মাকে দেখেছি, আমাদের দলসুদ্ধ সকলের মা। ছেলে চোখের সামনে তিলে তিলে মারা গেল, মায়ের মুখের স্নিগ্ধ হাসি কোনদিন নিষ্প্রভ হতে দেখলাম না। বরঞ্চ সুরমাই এসে এক একদিন রাগারাগি করত, আপনি পাষাণ—

আমরা অনেকেই সেখানে বসে, সুরমা বলেছিল, নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন কুন্তল-দা, সেখানে সবাই সুখী—সবাই ভোগী। কিন্তু আপনি নিজে কি ভোগ করে গেলেন, বলুন তো—

কুন্তল-দা চাপা মানুষ; কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিন কি হল—যেন মনের দরজা খুলে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, এর জন্য আমারও কষ্ট হয় বোন। অনেকের অনেক দিনের জমানো অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হল আমাদের উপর দিয়ে। সংসার আমার জন্য নয়—শান্তি বল, সুখ বল, কিছুই আমি নিলাম না—পথে পথে ভেসে গেলাম। এই ভেসে যাওয়ার বদলে তোমাদের লক্ষ লক্ষ সংসার যেন আনন্দে ভরে ওঠে। নইলে বৃথাই আমাদের আত্মবঞ্চনা।

শোন আর এক গল্প। জেলে ছিলাম সে সময়টা। ভোরবেলা মিষ্টি রিনরিনে কণ্ঠে শুনতে পেলাম, যাচ্ছি দাদা, আপনারা দোয়া করুণ। আর একজন বলছে নমস্কার—ভুলবেন না। স্বাধীন দেশে আবার আমরা জন্মাব।

দুই বন্ধু তারা, এর আগে চোখে চোখে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম! দুজনে দৌড় দিল, কে আগে ফাঁসের দড়ি গলায় পরতে পারে!···

এদের দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতার আজ অভিনব সংজ্ঞা পেয়েছি। পন্থাও নূতনতম। তবু কি ভুলতে পারি—ছবি হয়ে এরা মনের মধ্যে জল-জল

করে। বুড়ো হয়েছি, তোমরা দাদা বলে ডাক, উৎসুক মুখে বল, আগাগোড়া একটানা শুনতে চাও। কিন্তু বলি কি করে ভাই? প্রথম বয়সে স্বপ্ন নিয়ে পথে বেরিয়েছি, জীবনভোর তো প্রতীক্ষায় রয়ে গেলাম, আসছে···আসছে··· আসছে···। দিন যখন আসবে, স্মৃতি যদি তখন একেবারে মরে না যায়, দস্তুরমতো আসর করে জাঁকিয়ে সকল কথা শোনাব। সবুর কর সে ক'টা দিন।

রানী

রানীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই আমরা জানতাম। হয়েছেও তাই! বলছি শোন।

পুরী গিয়েছিলাম।

যাওয়ার কিছু ঠিক ছিল না, মেজমামাই যেতেন। তিনি রেলে কাজ করেন, পাশ পেয়েছিলেন। হঠাৎ বাতের অসুখ বেড়ে শয্যাশায়ী হলেন। তখন আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, তুমি যাও শঙ্কর, পাশটা নষ্ট হবে কেন! রেলের কেউ জিজ্ঞাসা করল স্রেফ আমার নাম বলে দাও—কে কাকে চেনে?··· আর আমাদের রায়বাহাদুর রয়েছেন সেখানে, গিয়ে দেখা কোরো—কোন রকম অসুবিধা হবে না।

রায়বাহাদুর হলেন অনন্তপ্রসাদ চক্রবর্তী। তোমাদের মনে পড়বে কিনা জানি না, তাঁর বুড়ো বয়সে বিয়ে করা নিয়ে সেবারে খবরের কাগজে অনেক টীকা-টিপ্পনী হয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে ঐ নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়, এবং রায়বাহাদুরের সন্দেহ—ঐ লেখালেখির ব্যাপারে তাদের যোগসাজস ছিল। এখন অবশ্য সব মিটে গেছে। এক রকম সেই থেকেই রায়বাহাদুর নূতন বৌ এবং আগের পক্ষের কচি ছেলে-মেয়েগুলো নিয়ে পুরীতে বাস করছেন। তাঁর এক ছেলে যতীশ্বর মেজমামার কলেজের বন্ধু—অভিন্নহৃদয় বললে হয়। এখন আবার এক অফিসে কাজ করছেন। ওঁদের কলকাতার বাড়িতে মেজমামার আড্ডা।

পুরী পৌছলাম সকালবেলা। একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিকালে রায়বাহাদুরের খোঁজে বেরিয়েছি। বহুকাল আছেন, অনেকেই চেনে দেখলাম। চক্রতীর্থের দিকে খানিকটা গিয়ে বাঁহাতি এক রাস্তা, সারি সারি বিস্তর ঝাউগাছ, তার মধ্যে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা দোতলা বাড়ি।

রায়বাহাদুর বাইরের ঘরে ছিলেন, বেরোবার তোড়জোড় হচ্ছিল। ইনভ্যালিড চেয়ার এসেছে, দু'জন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ছেলেপুলের পাল। একটি মহিলাও ছিলেন—নিশ্চয় দ্বিতীয় পক্ষের সেই স্ত্রী। আমায়

ঢুকতে দেখে তিনি ভিতরে চলে গেলেন—তবু দামী সেন্টের গন্ধে ঘর আমোদ করে রেখেছে। বুড়ো বয়সের বউ কি না! রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে আমার দিকে চাইলেন, অস্থিচর্মসার বিসদৃশ রকমের লম্বা মুখ—সাড়াশব্দ না দিয়ে এ রকম ভাবে ঢুকে পড়া উচিত হয় নি, বুঝতে পারলাম।

কি চাই তোমার ?

জবাব না দিয়ে যতীশ্বরবাবুর চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম।

চিঠি, খালি চিঠি···। বিড়-বিড় করে বকতে বকতে পকেট হাতড়ে চশমা বের করলেন। এক নজর পড়ে অবহেলার সঙ্গে ফেলে দিলেন। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি করতে হবে আমায় ?

কিছু না। বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেরিয়ে এলাম। বড্ড রাগ হল, এ ধরনের মানুষগুলোই এই রকম! আমি কি চাকরি চাচ্ছি, না ওঁর বাড়িতে অন্ন ধ্বংস করবার মতলবে এসেছি ? এমন জায়গায় মানুষ আসে, মেজমামার যেমন কাণ্ড!

আর ও-মুখো যাই না। হোটেলেই শুয়ে বসে গল্প করে কাটাই, সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। স্বর্গদ্বারের ওদিকে যে জায়গাটাকে গৌরবাটসাহি বলে, সেইখানে লোকজন বড় বেশি যায় না। আমি একদিন গিয়েছি সেদিকে। দেখি বালির উপর চেয়ার পেতে রায়বাহাদুর বসে আছেন। আমি হন-হন করে এগিয়ে গেলাম, তাকালাম না। ফিরবার মুখে দেখলাম, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন—বাড়ি ফিরবার উদ্যোগ হচ্ছে।

এর পর মাঝে মাঝে ওদিকে যাই। ঐ একটা জায়গাতেই তাঁরা রোজ এসে বসেন। সেই আমলের খবরের কাগজে লিখেছিল—'একটি পরমাসুন্দরী কিশোরী বৃদ্ধের লালসায় আত্মাহুতি দিল'···এমনি কত-কি! তাই মহিলাটিকে দেখবার ঔৎসুক্য আছে, আড়চোখে দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘোর হয়ে গেলে তবে তিনি আসেন, সুবিধা হয় না। একদিন অবশেষে দেখে ফেললাম। গাড়ি রাস্তায় রেখে বালি ভেঙে তিনি আসছিলেন; একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। এ মুখ যে আমার চেনা—খুব চেনা মনে হচ্ছে। অথচ ধরতে পারছি না, মনে পড়ে না যেন পূর্বজন্মের পরিচিতি কেউ, এ জন্মের নয়। মহিলাটিরও আমার দিকে নজর পড়ল, তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে মুখ ফিরিয়ে তিনি চলে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগলাম। তারপর মনে হল, রানীর মুখের সঙ্গে এঁর আশ্চর্য মিল। কিন্তু রানী কি করে হবে ? রানীর অপমৃত্যু হয়েছে। তার সম্বন্ধে সকল কৌতূহলের অবসান হয়ে গেছে।

আলো নিবিয়ে শুয়েছি, ঘর অন্ধকার। হঠাৎ অন্ধকারের পর্দা উঠে যায়···
কাল পিছুতে পিছুতে বছর-তিরিশ পিছিয়ে গেল। সেই যখন আমরা থাকতাম হস্টেলে। হস্টেল মানে গোলপাতার ঘর, মাটির মেঝে। শীতকালে মাটিতে শুতাম, বর্ষার সময় বাঁশের মাচা তৈরি করে নেওয়া হত—ঠাণ্ডার জন্য নয়, পিছনের জঙ্গল থেকে রাত্রিবেলা সাপ উঠত, সেই আশঙ্কায়। কুন্তল-দা ফোর্থ ইয়ারে পড়তেন—কি রকম 'পড়তেন' সে তো আগেই শুনেছ ভাই। ফোর্থ ইয়ারের খাতায় নাম ছিল, কয়েক বছর ধরেই ছিল। তাঁর বাড়ি থেকে টাকা আসত হস্টেলের ঠিকানায়, তখন তিনি হস্টেল ছেড়েছেন। ওখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে দ্বারিক চাটুজ্জে নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে থাওয়া-থাকা পান। বাড়ির লোক জানত, হস্টেলে আছেন, তারা তদনুযায়ী টাকা পাঠাত। সে টাকা দিয়ে কুন্তল-দা···না, যাকগে সেকথা। তখন আমার আশ্চর্য লাগত, দুঃখও হত। কত কষ্ট যে করতেন কুন্তল-দা! দ্বারিক চাটুজ্জের অবস্থা সুবিধের নয়—চাকর-বাকর ছিল না, খাওয়ার পর কুন্তল-দাকে এঁটো পাড়তে হত, বাসন মাজতে হত। আর সে কি খাওয়া! সমস্ত বসন্তকাল ধরে চলত সজনের খাড়া, তার পরেই কাঁঠালবিচি আর নটের ডাঁটা একেবারে আশ্বিন অবধি।

কলেজের পর আমরা প্রায়ই যেতাম কুন্তল-দার ওখানে, রবিবারের দিন তো নিশ্চয়ই। রানী অর্থাৎ উমারানীর সঙ্গে চেনাশোনা সেখানেই, সে ঐ বাড়ির মেয়ে। বয়স আঠার-উনিশ—তবু বিয়ে হয় নি। ওঁরা কুলীন, পালটি ঘর খোঁজ করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। আর সে রকম টাকা-পয়সা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

রবিবারে রবিবারে সেখানে নানা রকম বই পড়া হত—গীতা, আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ ও দেউস্করের বই—এই সমস্ত। কুন্তল-দার হুকুম ছিল, প্রত্যেক দিনই সবাইকে গীতা পড়তে হবে। যার যেখানে খটকা লাগত, দাগ দিয়ে রেখে দিত; রবিবারের দিন কুন্তল-দা তার মানে বুঝিয়ে দিতেন—একেবারে নিজের মতো করে, ছাপানো বাংলা ব্যাখ্যার সঙ্গে তা মেলে না। এসব পড়াশুনার মধ্যে আমরা এক এক দিন দেখতাম,—কুন্তল-দাও দেখেছেন নিশ্চয়—রানী কামরার মধ্যে বসে তদ্গত হয়ে শুনছে, তার যেন সম্বিৎ নেই। সে ছবি আজও মনে করতে পারি। মনে রেখ, পাড়াগাঁ জায়গা, আর রানীরাও কিছু বড়লোক নয়—সেজন্য পর্দার কড়াকড়ি ছিল না, সহজ ভাবেই সে আমাদের সঙ্গে মিশত। একেবারে বাড়ির গায়ে ভৈরব নদী, মাঝে মাঝে আমরা নদীর ঘাটে বসতাম। তখন লক্ষ্য করেছি, রানী জল আনা,

কাপড়-কাচা এই রকম নানা ছুতো করে বার বার সেখানে আসা যাওয়া করত।

বর্ষার সময়টা একদিন সকাল থেকে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আমার এ রকম হয়েছিল; কলেজ না থাকায় দুপুরবেলা হস্টেলে বসে কিছুতে সোয়াস্তি পেতাম না। ভিজতে ভিজতে গিয়ে উঠলাম সেই চালাঘর-খানায়, যেখানে কুন্তল-দার অনন্তশয্যা বারো মাস তিরিশ দিন পাতাই থাকত। একে মেঘলা দিন, তার উপর সে ঘরে জানালার হাঙ্গামা না থাকায় ভিতরটা আঁধার-আঁধার হয়েছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমটা শুধু কুন্তলদাকে দেখতে পেলাম—খুব গম্ভীর হয়ে বিছানার উপর বসে আছেন। তারপর অবাক হয়ে গেলাম—এ রকমটা আর কোন দিন হয় নি—দেখি মেজের উপর মুখ নিচু করে রয়েছে রানী, দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কুন্তল-দা বললেন, এই যে শঙ্কর এসে গেছিস। ভালো হয়েছে, বোস। পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। বসতেই আমার ডান হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিলেন। চুপ-চাপ, কথাবার্তা নেই—তিনি বিচলিত হয়েছেন বুঝতে পারছি।

এমন অবস্থায় আমি যে কি করব, বুঝতে পারি নে—কাকে কি বলব। একটু পরে কুন্তল-দা, বললেন, আচ্ছা শঙ্করই বলুক, তোমাকে দিয়ে আমাদের কি কাজ হবে? আমি তো ভেবে পাই নে। তুমি মিথ্যে দুঃখ করছ রানী।

উমারানী কান্নার স্বরে বলে, আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই বলুন। ভাবছেন, আমাকে দলে নিলে দেশের কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

কুন্তল-দা আমার দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা এক পাগল! একটু বুঝিয়ে দে তো শঙ্কর।

আবার নিজেই বোঝাতে লাগলেন, দেশ মানে কি খানিকটা মাটি আর দুটো গাছপালা? দেশ হচ্ছে তোমরা সকলে মিলে। স্বাধীন দেশে তোমরা স্বচ্ছন্দে থাকবে, তাই আমরা খেটে মরছি। বিনা লোভে কেউ কখনো কষ্ট করে···বল, তুমিই বল। তার চেয়ে শোন—যখন ছেলেপুলে হবে, একটা-দুটো আমাদের দিও। দেশ-উদ্ধার তো এক দিনে হয়ে যাচ্ছে না।

রানী তর্ক করে, আর তোমরা? তোমরা বুঝি দেশের মানুষ নও কুন্তল-দা? তোমরা যে না খেয়েদেয়ে জীবনের মায়া না করে এই রকম বেড়াচ্ছ—

কুন্তল-দা হো-হো করে হেসে কথা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, দেখ একবার। এই জন্যে তোমাদের নিতে চাই না। তোমরা এলে মহা আয়োজনে খাওয়াতে বসে যাবে, জীবনের সম্বন্ধে যাতে মায়া করি তার সদুপদেশ ছাড়বে। ঐ সব বুঝেই স্বামীজী কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন।

দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া পাগড়ি—বীরমূর্তি। কুন্তল-দা সেই দিকে হাস্যমুখে চেয়ে রইলেন। আমাকে বললেন, আর যে কাউকে দেখছি নে। বৃষ্টি-বাদলা সাহেবদের পরে রাগ হঠাৎ কমে গেল নাকি ?

উমারানী এই সময় কথা বলে উঠল। বলে, আমি আপনাকে একটা প্রণাম করব কুন্তল-দা ? তাতেও কি আপত্তি আছে ?

কুন্তল-দা যেন চমকে উঠলেন। আমার দিকে চেয়ে সহজভাবে বলতে লাগলেন, বুঝলি শঙ্কর, দেশ স্বাধীন হলে আমায় যদি তোরা রাজা করিস—এই সেন্টিমেণ্টাল মেয়েগুলোকে সকলের আগে আন্দামান পাঠাব।...শোন রানী, তোমার বাবাকে আমি বলে দেব কিন্তু—সত্যি বলে দেব। বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতকে প্রণাম করছ, জাত-জন্ম রইল না আর !

কিন্তু আমি কুন্তল-দার সঙ্গে হাসতে পারলাম না। রানী যে কি রকমভাবে কুন্তল-দার পায়ে মাথা রেখে নিস্পন্দ হয়ে রইল, সে কেমন করে বোঝাই ! অনেকক্ষণ পরে উঠে মুখ নিচু করে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল।

এরই দিন কয়েক পরে, দেখলাম, রানী আর হাসি ধরে রাখতে পারে না, যেন পাখির মতো হাওয়ায় উড়ছে। আমি উঠানে পা দিতেই ছুটে এসে কানে কানে বলে, শুনছ শঙ্কর-দা, কুন্তল-দা রাজি হয়েছেন, আমায় কাজ করতে দেবেন।

কুন্তল-দা বললেন, আগে পরীক্ষা দাও দিকি, তারপর সে-কথা।

বলুন, কি করব ?

রানী তখনই প্রস্তুত।

চট করে চাট্টি মুড়ি ভেজে আন। বর্ষার দিনে খাসা লাগবে।

রানী ছুটে চলল। কিন্তু সন্দেহ করেছে, মুখ ফিরিয়ে বলল, আমায় এখান থেকে সরাতে চান ?

কিছুক্ষণের মধ্যে গরম মুড়ি এল। অত তাড়াতাড়ি কি করে করল জানি না। মহানন্দে আমরা থালার চারপাশে বসে গেলাম।

কুন্তল-দা হেসে বললেন, দলের মধ্যে তোমার রইল এই মুড়ি-ভাজার কাজ। খুব বড় কাজ এইটে—জান ?

কিন্তু ওর চেয়েও বড় কাজ সে পেয়েছিল।

একদিন রাত্রে ঘুমচ্ছি, এমন সময় ধাক্কাধাক্কিতে দোর খুললাম। বাইরে কুন্তল-দা বাইকে করে এসেছেন, চোখ জ্বলছে। আমায় বললেন, শোন—খবর পেয়েছি, পুলিসে বাড়ি ঘেরাও করেছে, ভোর-রাতে সার্চ হবে—কিছু মাল

সরাবার দরকার। ওপারে জগৎ দত্তর ওখানে—পৌছে দিতে হবে। তুই আমাদের খালিশপুরের ঘাটে গিয়ে নৌকো ঠিক করে গাবতলায় দাঁড়িয়ে থাকবি। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে মাল পৌছবে—বুঝলি? আমি বাড়ি চললাম।

অতএব নৌকা ঠিক করে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অমাবস্যার কাছাকাছি একটা তিথি, তার উপর আকাশে মেঘ করেছে—বড় ভয়ানক অন্ধকার। ভৈরবে জোয়ার এসেছে, কোটালের টান। দেখতে দেখতে সেই গাবতলা অবধি জল এসে পৌছল। চেয়েই আছি—অনেকক্ষণ পরে দেখি, রাস্তা দিয়ে নয়—বাগানের ছায়ায় ছায়ায় ঘোমটা-ঢাকা আবছা মূর্তি দ্রুতপদে আসছে। কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় কোন্ দিক দিয়ে হঠাৎ জন দুই-তিন তার পথ আটকাল।

দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ?

আলো ফেলেছে মুখের উপর। আমার জায়গা থেকে যতটা দেখা যায়, দেখলাম—অতি নির্ভীক অপূর্ব উমারানীর মুখ। বলল, ঘাটে যাচ্ছি।

কেন?

ঝাঁঝালো স্বরে রানী জবাব দিল, একটু জিরোব বলে। বাবা বকেছে বড্ড। পথ ছাড়ুন।

তোমাকে থানায় যেতে হবে।

কিন্তু থানায় সে গেল না। তাদের পাশ কাটিয়ে চক্ষের পলকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোটালের টানে সুতীব্র স্রোত চলেছে, তার উপর একই রকম অন্ধকার! আমি গাবতলা থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম।

খবর পেলাম, সকালবেলা দ্বারিক চাটুজ্জের বাড়ি সত্যিই সার্চ হয়েছিল, কিছু পাওয়া যায় নি। পাওয়া যাবে না, সে তো জানতামই। বেলা একটা-দেড়টার সময় কুন্তল-দা হস্টেলে এলেন। আমায় বললেন, কলেজ যাচ্ছিস? আজ আর যাস নে শঙ্কর, কামাই কর্। চল্ দুজনে বেড়িয়ে আসি।

ঠিক দুপুরে বেড়াবার সময় নয়। আর কুন্তল-দার যে-রকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, বেড়াবার মতো অবস্থাও নয়, বুঝতে পারি। একটু দূরে খালের উপর একটা কাঠের পুল। তারই উপর কুন্তল-দা বসে পড়লেন, আমাকে বসালেন। বললেন, কি রকম সাহস আর বুদ্ধি মেয়েটার! দলটা তো সে-ই বাঁচাল। বাড়ি থেকে সাঁ করে বেরিয়ে গেল, তখন ওরা বুঝতে পারে নি। আর মেয়ে-মানুষের সুবিধা আছে, হঠাৎ কেউ ধরতেও পারে না।

আমি বললাম, রানীর বাবা খুব বকেছিলেন বুঝি?

কুন্তল-দা বললেন, সে তো হরদম চলেছে। আমাকেও নোটিশ দিয়ে

রেখেছেন ভাদ্র মাস কাটলে বিদায় হতে হবে। কিন্তু বকাবকির জন্য জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে, এরা কি সেই ধরনের মেয়ে? তোর হাতে যখন দিতে পারল না, রানী ঠিক ভেবেছিল—সাঁতার দিয়ে ও-ই জগৎ দত্তের কাছে যাবে। তা পারে নি, আমি ওপার থেকেই আসছিল। আহা, কাজের জন্য এমন করত বেচারি—গোড়াতেই চলে গেল!

অনেকক্ষণ ধরে এই সব কথাবার্তা হল। বলতে বলতে একবার কুন্তল-দা .চোখ মুছে ফেললেন। পাষাণে জল আছে, এই প্রথম দেখলাম।

রানীর কথা কতদিন ভেবেছি! পাড়াগাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিতা সাধারণ মেয়ে কা-ই বা বুঝত, কতটুকু জানত—আঁধার রাতে নির্ভয়ে ভৈরবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পুলিসের টর্চ-আলোয় তার শেষ মুহূর্তের চেহারা কেবল আমিই দেখেছিলাম সে আবার ভৈরবের জলশয্যা থেকে উঠেছে, এবং অন্ততপক্ষে দু-শভরি পরিমাণ জড়োয়ার-গহনায় সর্বাঙ্গ মুড়ে রায়বাহাদুরের ঘর আলো করে আছে, এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। অথচ নিজের চোখ দুটোকেই বা অবিশ্বাস করি কি করে?

পরদিন গিয়ে পথের উপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূর থেকে দেখছি, রায়বাহাদুর যথারীতি সমুদ্রের ধারে চেয়ারখানিতে উবু হয়ে আছেন। মহিলাটি এলেন—সে রানীই। আমায় দেখে একটু আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলে, শঙ্কর-দা, কবে এলে এখানে? কোথায় উঠেছ?

আমি বললাম, রানী, উমারানী, তুমি বেঁচে আছ?

রানী হেসে বলে, দস্তুরমতো, বেঁচে আছি। আমার স্বামী কত বড়মানুষ—যেমন টাকায় বড়, তেমনি বয়সে। মস্ত খেতাব, প্রকাণ্ড জমিদার।

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে চলেছি। রানী বলে, সেদিন এক নজর দেখেই চিনেছিলাম, তুমি কিন্তু চেন নি।

আমি বললাম, চিনলেও যার অপমৃত্যু হয়েছে জানি, তার সঙ্গে হঠাৎ কথা বলতে সাহস হবে কি করে?

রানী খিলখিল করে হেসে উঠল। বয়স হয়েছে রানীর, কত মোটা হয়ে গেছে, তবু আগেকার মতো হাসির সেই রকম মিষ্টি আওয়াজ, গালের উপর তেমনি টোল পড়ে। বলে, তা হলে আমি ভূত হয়ে চলছি তোমার সঙ্গে? তা সত্যি। আমি কি স্বপ্নেও জানতাম, এত সুখ আমার কপালে আছে!

গম্ভীর হয়ে গেল। আর খানিকটা এসে বলে, এবার সরে যাও শঙ্কর-দা। আমার সঙ্গে আর কেউ কথাবার্তা বলছে দেখলে রাগারাগি করবে। বুড়ো হয়ে মেজাজের ঠিক নেই। এমন ভাব দেখাবে, যেন আমাদের চেনাজানা

নেই। কাল সকালবেলা একবার আসবে এদিকে? অত্যন্ত করুণ চোখে চেয়ে সে বলতে লাগল, যদি আসতে পার শঙ্কর-দা—মন্দিরে যাবার নাম করে, আমি চলে আসি। কত কথা জমে আছে বুকের মধ্যে···বুক ফেটে বেরুতে চাচ্ছে।

সকালবেলা নিরিবিলি বসে অনেক কথা হল। রানীর বিয়ের কাহিনী শুনলাম। অনন্তপ্রসাদ তখন খুলনায় ডেপুটি। এরই আগে এক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, হঠাৎ কলেরা হয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সতীলোকে চলে গেছেন। থাকল একপাল ছেলেপুলে। অনন্ত সরকারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কে তাদের দেখে, তাঁকেই বা কে সেবা-যত্ন করে! ঝি-চাকর দিয়ে ঠিক হয়ে ওঠে না, মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন, ভেবে কূলকিনারা পান না। আত্মীয়েরা বিয়ে করতে বলেন, কিন্তু বিয়ে বললেই তো হয় না! তাঁরা শ্রোত্রীয়, এমনি সাধারণ ভাবে একবার বিয়ে করার মেয়ে পাওয়া কঠিন—তার উপর এতগুলো ছেলেপুলে থাকা অবস্থায়, এই বয়সে···চুল সমস্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। লোকে বলে বাংলা দেশে মেয়ে সস্তা; তবু তো কোনো মেয়ের বাপ এগোয় না।

কিন্তু ভগবদ্বিশ্বাসী লোক—সকল কাজের মধ্যেও তিন সন্ধ্যা আহ্নিক করতে ভুল হয় না—ভগবানই উপায় করে দিলেন। একদিন গিয়েছিলেন বাগেরহাট অঞ্চলে একটা তদন্ত করতে। নৌকা করে ফিরছেন। শেষ রাত। একজন দাঁড়ি দাঁড় তুলে আ-হা-হা করে উঠল।

কি, কি ব্যাপার?

মানুষ একটা ডুবে যাচ্ছে।

অনন্ত বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি টর্চ ফেললেন জলে। কে একজন জলে দাপাদাপি করছে, হয়তো নৌকার কাছাকাছি আসবার মতলব, কিন্তু পারছে না—তার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে এসেছে, সাঁতার দেবার জো নেই। দাঁড়িরা লাফিয়ে পড়ল। সেখানটা চরের মতো জায়গা, জল বেশি নয়। তোলা হল।

অনেক কষ্টে রানীর চেতনা হল। অনন্ত তাকে খুলনার বাসায় নিয়ে তুললেন। বিকেলের দিকে দ্বারিক চাটুজ্জেকে খবর দিয়ে আনা হল।

অনন্ত বললেন, গোলমালে কাজ কি বলুন। আপনার গ্রামের মধ্যেও তো নানা কথা উঠেছে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে। তার চেয়ে আমাকেই সমর্পণ করুন। কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না।

আপনাকে? দ্বারিক ইতস্তত করতে লাগলেন।

তা নইলে কিন্তু জেলে নিয়ে পুরবে। ওর কোমরের সঙ্গে রিভলবার বাঁধা

ছিল। জেলের চেয়ে কি আমার ঘর করা খারাপ হবে? বুঝে দেখুন ব্যাপারটা। মানী ঘরের মেয়ে—খবরের কাগজে নাম বেরুবে, আর এই প্রসঙ্গে সত্যি-মিথ্যে কত কি রটে যাবে।

বাপ নিরুত্তর হলেন। রানী বললে, হোক জেল, আমার জেলই ভালো।

মৃদু হেসে অনন্ত বললেন, তা হলে অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় শীলমোহর করে যে কাগজগুলো যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, তা-ও পুলিসের হাতে পড়বে। তাতে তুমি একা নও—দলসুদ্ধ জালে পড়বে।

রানী রাগে আগুন হয়ে উঠল।

সেটাও পেয়েছেন? আমি ভাবলাম জলে পড়ে গেছে। দিন আমাকে, দিন বলছি—

অনন্ত পাকা লোক—ছেলেমানুষের রাগ দেখে তাঁর হাসি আরও বেড়ে যায়! বললেন, তাড়াতাড়ি কি! আমার কাছে থাকা যা, তোমার কাছে থাকাও তাই।…আচ্ছা বউভাতের দিন দেব। অবশ্য সে পর্যন্ত যদি এগোয়। আর নইলে দিয়ে আসব থানায়।

বউভাতের দিনেও অনন্ত দেন নি সে কাগজগুলো। রানী মাঝে মাঝে চাইত, অনন্ত দেব-দেব করতেন। তখনও তাঁর ভয় ঘোচে নি, জিনিসটা হাতে পেলে রানী কি এই রকম সেবাযত্ন করবে! এখন অনেক বছর হয়ে গেছে, চাইলে হয়তো দিয়ে দেন, কিন্তু রানীরই খেয়াল হয় না। কী হবে তা দিয়ে? দেশের রাষ্ট্র-সংগ্রামে সে এক বিচিত্র অধ্যায়। কাগজগুলো হয়তো ছিন্ন বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছে আয়রন-সেফের এক কোণে। কিংবা হয়তো নেই।

গল্প শেষ করে রানী চুপ করে কী-সব ভাবে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, কুন্তল-দা কোথায় এখন?

বললাম, জানি না।

কথাটা মিথ্যা জেনেও বললাম না। কুন্তল-দা মারা গেছেন। কেউ জানে না, অমন বিরাট প্রাণ বরানগরের এক এঁদো গলির আধো অন্ধকারে কেমন করে আস্তে আস্তে মৃত্যুতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সে সব খবর দিয়ে লাভ কি? কুন্তল-দা পৃথিবীতে নেই—রানীর মনের মধ্যেও সে রকম ভাব নেই, বুঝতে পারছি।

তার পর আমার নিজের কথাও অনেক হল। রানী বলে, যতীশ্বরের চিঠি নিয়ে এসেছিলে, তবে আর কি! সেই সূত্রে আজকে আবার যেও আমাদের বাড়ি। আমি ওঁর সামনেই তোমার সঙ্গে আলাপ করব, তোমাকে রাত্রে

খাবার কথা বলব। সেই গরম-গরম মুড়ি ভেজে দিতাম। উঃ, কত দিন দেখি নি তোমাদের কাউকে। যাবে তো?

ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলাম। বিকেলে যেতে বলেছে, রানী নিমন্ত্রণ করবে। এখন বড়লোকের বউ—মুড়ি খাওয়াবে না, আয়োজন গুরুতর হবে নিশ্চয়। হোটেলের ঘ্যাঁট খেয়ে এই কদিনে অরুচি জন্মে গেছে। কিন্তু চলতে চলতে সাব্যস্ত করলাম, যাব না ওদের বাড়ি। বরঞ্চ আর যাতে দেখা না হয়, পুরী ছেড়েই চলে যাব। এই ক'টা দিন ভুলে যাই—রানীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই কথাই থাক আমার মনে। গাঢ় আঁধারের মধ্যে বিনা দ্বিধায় করাল ভৈরবে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—পুলিসের টর্চের আলোয় সেই ছবি দেখেছিলাম, সেইখানে রানীর কাহিনীর সমাপ্তি হয়ে থাক।

আনন্দকিশোর

এক সাধু মহারাজের গল্প বলছি এবার, আমাদের আনন্দকিশোর। তোমাদের হাসি পাবে, আবার চোখে জলও আসবে নিশ্চয়।

কুন্তল দা তখন তৃতীয়বার জেল খেটে বেরিয়ে এসেছেন। কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি চুকে গেছে। এবার শহরে আস্তানা গাড়বার ভয়ানক দরকার। বাবা তখন বেঁচে। তাঁকে বললাম, মফস্বল কলেজে পড়াশুনা কিচ্ছু হয় না। এতদিন যা হোক চলেছে, এখন বি-এ পড়ার সময় কলকাতা না গেলে নির্ঘাৎ ফেল হব।

বাবা হেসে সম্মতি দিলেন। ব্যাপারটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। মহাস্ফূর্তিতে শহরে এলাম। কলেজে ভর্তি হয়েছি। বিকেল বেলা প্রায় রোজই বরানগরে নদীর কাছাকাছি এক একতলা ভাড়া বাড়ির ছাতে গিয়ে সকলে জুটি। কখন বিকাল হবে, সে জন্য মন পড়ে থাকে। কেবল কুন্তল-দা নয়, ঐ বাড়িতে মা থাকেন। কুন্তল-দার মা—তোমার আমার সকলের মা—অসীম ধৈর্যের মূর্তি। হাসিমুখে মা আমাদের আহ্বান করতেন। তাই তো ভাবি, অমন মা না হলে কুন্তল-দার মতো ছেলে জন্মায়!

মাস দুয়েক পরের কথা। একদিন দেখি, সবাই এসেছে—কুন্তল-দা নেই। সন্ধ্যার পরে তিনি এলেন—সঙ্গে বছর কুড়ি বয়সের ফুটফুটে একটা ছেলে। অবাক হয়ে চেয়ে আছি। কুন্তল-দা বললেন, বড্ড নাছোড়বান্দা—কী করা যায় বল! কিন্তু খাসা বেহালা বাজায়!···বেহালাটা আন নি বুঝি আনন্দকিশোর?

বেহালা না এনে যেন মস্ত অপরাধ করে বসেছে, এমনিভাবে ছেলেটি ঘাড় নিচু করে রইল।

এই বেহালা পরে একদিন শুনেছিলাম। যতক্ষণ বাজনা চলছিল, চেয়ার ঠুকে ঘাড় নেড়ে কুন্তল-দার সে কী তারিফ! তারপর বললেন, কেমন, ভাল লাগল না? সত্যি বল—

হুঁ, এখন লাগছে—খুবই ভাল লাগছে। থেমেছে বলে।

কুন্তল-দা আনন্দকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। ওরা সব অসুর—সুরের কি বুঝবে?

হিরণ বলল, স্বদেশি ছেড়ে এবার যাত্রার দল খুলে দাও কুন্তল-দা, চৌরঙ্গি-পাড়ায় গাওনা শুরু কর, ইংরেজ ডাক ছেড়ে পালাবে।

বেহালা বাক্সবন্দি করে আনন্দ ম্লানমুখে নেমে চলল। কুন্তল-দা ডাকলেন, হল কি তোমার? শোন—শোন।

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে বলে আপনার সমস্ত ফাঁকি কুন্তল-দা। বাজনা খারাপ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বাজাতে তো আসি নি। কাজ চাচ্ছি, সে সম্বন্ধে একটা কথা নেই—

মজা লাগছিল বেশ। আমি গিয়ে আনন্দর হাত ধরলাম।

কাজ? কী কাজ করবে ভাই? গায়ে দেখছি তো হাড়ামাংস নেই, তুলো দিয়ে তৈরি বুঝি। কা কী করতে পার, বল—

কুন্তল-দা বললেন, পারে ঐ বেহালা বাজাতে আর ঝগড়া করতে।

দিন-রাত আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে, বলে—কাজ দিন, কাজ দিন—

আনন্দ বলল, ঝগড়া না করলে আপনি কি শায়েস্তা হন কুন্তল-দা? আপনি বড্ড একচোখো।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে থাকি, বলে কি! কুন্তল-দাকে এত বড় কথা বলবার সাহস ওর হল কি করে? কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, শুনলি শঙ্কর? কথার শ্রী দেখ। এই রকম যখন-তখন গালি দেয়।

অতএব বুঝে ফেললাম, ঐ হতভাগারও মরণ হয়েছে আমাদের মতো। নিতান্ত কচি নিষ্পাপ মুখখানার দিকে চেয়ে নিশ্বাস পড়ল। কুন্তল-দার মতো হই নি এখনো, চোখের জল বুকের নিশ্বাস একটু-আধটু আছে। বললাম, অন্যায় বলে নি কুন্তল-দা।

তোমাদেরও এই মত নাকি?

হ্যাঁ, সত্যি, তুমি একচোখা। এত বছর গুরুমান্য দিয়ে আসছি, আর আজ কোত্থেকে একরত্তি ঐ ননীর পুতুল জুটিয়ে আনলে, এনেই কোল বাড়িয়ে দিলে। এতে হিংসে হয় না?

কুন্তল-দা ভালোমানুষের মতো আমায় দেখিয়ে বললেন, আনন্দ, এই হল

সেক্রেটারি। ও যতক্ষণ না দেবে, কেউ কোনো কাজ পায় না। একে ধর, কিছুতেই ছাড়বে না, বুঝলে?

তাই বিশ্বাস করল ছেলেটা। তারপর সে যে কী মুশকিল, তোমাদের কী বোঝাই ভাই। সকাল নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন গিয়ে ধরণা দেয়। আর ঐ এক কথা, কাজ দিন।

অবশেষে কুন্তল-দাকে ধরে পড়লাম, আমি পারি না। দোহাই দাদা বাঁচাও—

কুন্তল-দা হেসে উঠলেন। কেমন জব্দ। নিন্দে করবি আমার? নাকে খত দে আগে!

ভাদ্র মাস পড়ল। খবরের কাগজে যথারীতি বন্যার খবর বেরুচ্ছে। নানারকম সমিতি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে—হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে বন্যাত্রাণ করে বেড়াচ্ছে। এই সময় কয়েকটা দিন আমি গ্রামে ঘুরে এলাম। কেন তা বলব না। যা হোক একটা আন্দাজ করে নাও। সবাই জানত, জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম। চাষাপাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। আলাপ করে দেখেছি, দুবেলা ভাত খাওয়া এবং আস্ত অখণ্ড কাপড় পরা মানবজীবনের চরম বিলাসিতা বলে তারা জেনে রেখেছে।

সেই সব কথাই হচ্ছিল। বললাম, মানুষ সব না খেয়ে মরছে।

কুন্তল-দা বললেন, মরুক।

বাড়িয়ে বলছি ভাবছেন? মোটেই নয়। চালের দর কত জানেন?

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কুন্তল-দা বললেন, আমি তো তাই বলছি। মরে যাক। খাওয়ার মানুষ না থাকলে চালের দর কমবে।

হিরণ রাগ করে বলে, তুমি পাষাণ —একেবারে পাষাণ—

সেটা কি আজ জেনেছ? বলতে বলতে কুন্তল-দা কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন, ও-কথা সকলের আগে বলেছিলেন আমার ঠাকুরমা। তিনি আমায় মানুষ করেছিলেন, দেখা হলেই কাঁদা-কাটা করতেন। সেই ঠাকুরমা মৃত্যুশয্যায়—খবর এল। আমি বাড়ি গেলাম না—চললাম কুঠির বস্তিতে।

আনন্দকিশোরও ছিল সেখানে, সে আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেল। চুপি-চুপি বলে, এইবার আমায় কাজ দিতে হবে শঙ্কর-দা, নয় তো আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।

হয়েছে কী?

আপনার ঐ চাষাদের ব্যবস্থা আমি করব।

মড়া পোড়াবার ব্যবস্থা?

জিভ কেটে আনন্দ বলল, ছি ছি—কী যে বলেন! ওদের বাঁচাব। কত টাকা আদায় করে আনব দেখবেন।

কুন্তল-দা কী সব বললেন—শুনেছ তো?

ও আমি মানি না! ওঁর জুড়ি ভূ-ভারতে নেই। ঐ কি ওঁর মনের কথা হতে পারে? কখনো নয়।

অবোধ ছেলে! মানুষটার মতো ভূ-ভারতে নেই, কিন্তু মনটি ধরে নিয়েছে তোমার আমার দশজনের মতো। বড বড চোখ মেলে পরম আগ্রহে আনন্দ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বলে, একটা বার বিশ্বাস করে দেখুন না। প্রাণের আমি পরোয়া করি না। শুধু একটা।

হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল। হাসি চেপে বললাম, রিভলবার?

দিয়ে দেখুন একবাব। কাজ করতে না পারি ফিরিয়ে নেবেন—

আনন্দ আমার পিছু-পিছু চলেছে। গলির মোডে এসে দোতলার ঘরটা দেখিয়ে দিলাম। আলো জ্বলছে, অর্গানের আওয়াজ আসছে। কানে কানে বললান, সোজা উপবে চলে যাবে, বুঝলে? ঝি-চাকরেবা নিচে। বাড়িতে আছে একটি মাত্র মেয়ে—আর সবাই নেমন্তন্নে গেছে। পারবে তো?

ঘাড় নেড়ে আনন্দ বলল, খুব-খুব…একটা তো মেয়ে! ও আর শক্ত কি? আপনি তবে এইখানে দাঁডান—

দাঁডাতে হবে? ফিরবার সময় ভূতের ভয় করবে বুঝি!

তার মুখ লাল হয়ে উঠল, গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলাম। বলে, যান, আপনি চলে যান শঙ্কর-দা—না, কিছুতেই থাকতে পারবেন না।

হাসতে হাসতে পার্কের কোণে বেঞ্চির উপর বসি। এই একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পার্কে জল জমেছে। মনে ভাবলাম, কাঁহাতক এ রকম ভিজে মরব। বাড়ি গিয়ে শুইগে। চেনা মানুষ—চেনা বাড়ি—জলে পড়ে নি তো।

বাড়িটা সরোজ পাকডাশির, সরোজের কথা আগেই বলেছি ভাই—আমাদের সেই সরোজ। মাস তিনেক আগে তাকে জেলে নিয়ে পুরেছে। নিরুপমাও প্রায় সেই সঙ্গে কলেজে ইস্তফা দিয়েছে। দাদার তাডনার ভয় নেই, হস্টেল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি এসে বসেছে।

পরের দিন ঐ গল্প হচ্ছিল। নিরু এসেছে—সে বড একটা আসে না—কিন্তু বিশেষ করে ঐ রোমাঞ্চকর স্বদেশি ডাকাতির গল্প বলবার জন্য এসেছিল। হেসে হেসে এবং রীতিমত ডালপালা সংযোগ করে সে বলছিল। যা মেয়ে নিরুপমা—কোনো কথা সহজ করে বলা তার কুষ্ঠিতে নেই। আর আনন্দের সঙ্গে এর আগে জানাশোনাও হয় নি—

নিরু বলে, জানতে লেগেছিল মোটে এক মিনিট। একটা কথায় বুঝে ফেললাম, ডাকাত নয়—অত্যন্ত ভদ্রলোক, সাধুসজ্জন অমায়িক ব্যক্তি। দোতলায় উঠে দম্ভ করে তো আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন···

আনন্দ বলল, অত গয়না পরতে নেই। দু-চারখানা দিয়ে দিন—

নিরু নাকি জবাব দিল, আপনি পরবেন ? সাধ হয়েছে ?

বিরক্ত-কণ্ঠে আনন্দ বলে, ও সব শুনতে আসি নি। চাঁদা চাচ্ছি দেশের জন্য—

চাঁদা তো লোকে দু-চার আনা আদায় করে হোটেলে গিয়ে চপ-কাটলেট খায়। আস্ত গয়না চাচ্ছেন আপনি, দালানকোঠা বানাবেন বুঝি ?

আনন্দ রিভলবার বের করে।

কী ওটা ? বেশ তো ! দেখি—দেখি—

নিরীহ মুখে নিরু এগিয়ে আসে। এসে একেবারে ঘাড়ের উপর পড়ে আর কি। অজানা অচেনা পরের বাড়ির এই রকম একটা কিশোরী মেয়ে—আনন্দের মুশকিলটা বোঝ একবার। সে পিছিয়ে যায়। পিছুতে পিছুতে ভিতরের দিককার দরজা অবধি গিয়ে পড়ে।

নিরু তবু রেহাই দেয় না। বলে, দুয়োর বন্ধ—যাবেন কী করে ?

আমি যাচ্ছি কে বললে ?

ওঃ যাবেন না, থাকবেন বুঝি ? তা হলে বসুন। বড্ড হাঁপিয়ে গেছেন, শরবত আনব ?

আনন্দ যথাসম্ভব কঠিন হয়ে বলে, এ-ঘর থেকে আপনার বেরুনো হবে না। বুঝতে পারছি, পুলিসে খবর দিতে চান—

নিরু খিলখিল করে হেসে ওঠে, হাসি আর থামতেই চায় না। বলে, রামোঃ ! আপনি ভালো লোক—সাধু মহারাজ—পুলিস ডেকে আপনাকে বিব্রত করব, আমার পরকালের ভয় নেই ?

যা ভাবছেন, আমি তা নই—

মনের ভাবনা বুঝতে পারেন ? কী ভাবছি বলুন না, সত্যি বলুন—

হতভাগা মেয়েটা করল কি একেবারে তার হাত ধরে বসল। এক রকম জোর করেই আনন্দকে সোফার উপর বসিয়ে দিল। বলে, গান শুনবেন ? চুপচাপ বসে শুনুন। নড়বেন কি চেঁচিয়ে পুলিসে ধরিয়ে দেব।

নিরু অর্গানের ধারে গিয়ে বসল। আনন্দ বলে, বাঃ রে, আমাকে বোকা বানাতে চান ?

না না। আপনাকে কি আর বানাতে হয় !

আনন্দ উঠে দাঁড়াল। রুক্ষ কণ্ঠে বলল, এ সবে আমায় ভোলাতে পারবেন না, বুঝলেন?

ভোলাতে যাব! বাপ রে, আমায় ভয় করে না বুঝি! এই চুড়িগুলোর পরে আপনার ঝোঁক তো! খুলে দিচ্ছি—পকেটে রাখুন। আর আমিও ঘর থেকে নড়ছি নে। তা হলে গান শুনতে আপত্তি নেই তো?

নিরু চুড়ি খুলে আনন্দের সামনে রাখল। বলে, এই দু-গাছা মাত্র দু-হাতে রইল। তাতে আপত্তি আছে? বলুন—

এবার আনন্দ সত্যিই চটে উঠল।

আচ্ছা মেয়ে তো আপনি! ভয় করেন না?

মুখ ভারী করে নিরু বলে, মিছিমিছি বকবেন না বলছি। ভয় না পেয়ে মেয়েলোক কখনো গায়ের গয়না খুলে দেয়? আমি ভয় পেয়েছি, সত্যি বলছি, দিব্যি করে বলছি—

আনন্দ বলে, ভয় পেতে আপনার বয়ে গেছে। টিপি-টিপি হাসছেন, আমি বুঝি না কিছু।

রাগ করে সে বেরিয়ে এল। পিছু থেকে নিরু ডাকাডাকি করে, চুড়ি পড়ে রইল যে! নিয়ে যান—

আনন্দ চেয়েও দেখল না।

গল্প শুনে সবাই হাসে, হিরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। বলে, এই রকম ঠাট্টা-তামাশায় মেতে যাচ্ছ শঙ্কর—জান, আমাদের এসব খেলা নয়।

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, নয়ই তো। তাই বলি কুন্তল-দাকে—ঐ সব সাধু মহাপুরুষ নিয়ে আসছেন, ওরা কি করবে শুনি?

কুন্তল-দা চুপচাপ বসেছিলেন। বললেন, না—সাধুমানুষ থাকবে কেন, কেবল তোমরা থাকলেই হবে। পৃথিবীর মাটি এখনো নরম আছে, আনন্দকে দেখলে সে-কথা মনে পড়ে যায়।

এমন সময় আনন্দ এল সেখানে। নিরুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। নিরু বলে, চিনতে পারেন?

আনন্দ রাগ করে বলে, না—

আমি তো দিব্যি চিনে ফেলেছি।

সে জানি। চিনতেন আগে থেকেই। এঁরা বলে দিয়েছেন। এ একটা ষড়যন্ত্র আমি ধরতে পারি নি।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ আবার বলে, রিভলবারের সামনে দেমাক

করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, সে মেয়ে আমাদেরই দলের। বাইরের কারো অত ভরসা হয় না। আমারই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

আমি বললাম, না আনন্দ, রিভলভারই আদপে নয়। তোমার হাতে যা ছিল, ও জিনিস মুর্গিহাটায় পাওয়া যায়। টাকা আড়াই দাম।

কুন্তল-দা হেসে বললেন, পরীক্ষায় হেরে গেছ আনন্দ-ভাই। আর কোনো দিন কিন্তু ও-সব ছাই-পাঁশ চাইতে পারবে না। ওদের মতো বাজে মানুষ কি তুমি! বুঝে দেখ, একটা মেয়েকেই তো ভয় দেখাতে পারলে না।

হুঁ মেয়ে! ভয়ানক মেয়ে! বলে আনন্দ গুম হয়ে বসে পড়ল।

নিরু আমাকে চুপিচুপি বলে, সাধু মহারাজের মুখখানা দেখ একবার। দুঃখ হয়েছে। হবারই কথা। সত্যিকারের রিভলভার কেন দিলে না শঙ্কর-দা—তাতেও বিপদ ছিল না, হলপ করে বলতে পারি। তোমারই অন্যায়—

আর তোমারও, নিরু। তুমি যদি একটুখানিও ভয় পেতে, এত কষ্ট ওর কখনো হত না।

তখন কুন্তল-দার সঙ্গে কথা হচ্ছে আনন্দর। কুন্তল-দা তাকে প্রায় বুকের মধ্যে এনে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, তোর খুব মনে লেগেছে—না?

না। বলে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আনন্দ প্রাণপণে চোখের জল সামলাতে লাগল।

কুন্তল-দা আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, তোমাদের সঙ্গে আর মিশবে না আমার এই ভাইটি। দুঃখকষ্টও নিজে বুক পেতে নেয়—কাউকে দুঃখ দিতে পারে না।

আনন্দ ফিসফিস করে কুন্তল-দার কানে কানে বলে, আর আপনিও—

বলিস কি! নতুন কথা শেখাচ্ছিস যে! পুলিসের রিপোর্ট দেখে আয় তো—

আনন্দ নিবিড় করে তাঁর হাত দুখানা ধরে। বলে, পুলিস মিথ্যে লিখেছে। আপনার কত মায়া! আমি জানি নে বুঝি!

কুন্তল-দা হো-হো করে তুমুল হাসি হেসে উঠলেন। বললেন, শুনেছ তোমরা? আমাকে নতুন সার্টিফিকেট দিচ্ছে—আমার নাকি ভয়ানক মায়া। আমার ঠাকুরমার গল্পটা শোনে নি বোধ হয়।

আনন্দ বলে, শুনেছি দাদা। কুঠির বস্তিতে মানুষগুলোকে জানোয়ারের মতো রেখেছিল। আপনার মতো দরদ কার! তাদের দুঃখে ঠাকুরমাকেও শেষ দেখা দেখতে পারেন নি।

জানোয়ারের জন্য মানুষের দুঃখ? কী যে বলিস—

হয় না?

কুন্তল-দা নির্মমকণ্ঠে বললেন, না। দরদ বলিস—যা বলিস, যদি কিছু আমার থাকে, সমস্ত আগামী দিনের সোনার মানুষের জন্য। শিরদাঁড়া-ভাঙা ভার-বওয়া গরু-গাধার জন্য আমি এতটুকু ভাবি নে।

উষ্ণ কণ্ঠে আনন্দ বলল, তবে ঠাকুরমার কাছে না গিয়ে বস্তিতে ছুটেছিলেন কেন?

হাঙ্গামা বেধেছিল, সেটা যাতে মিটে না যায়। আগুন আমি নেবাতে চাই নে।

দেশের বুকে দাবানল জ্বালিয়ে আপনার আনন্দ?

কুন্তল-দা হা-হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন, হ্যাঁ, ভাঙা ডাল ঝড়ে-নড়া গাছ সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাক। তারপর এই শ্মশান আবার সবুজ হয়ে উঠবে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে আনন্দ দু-হাতে মুখ ঢাকল। সে যে কী রকম অসহায়ের অবস্থা, তোমাদের বোঝাতে পারব না। কুন্তল-দা স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নিরুপমা ঠিক নাম দিয়েছে, সাধু মহারাজ। তুমি কোনো আশ্রমে চলে যাও আনন্দ। জানাশোনা আছে, আমি বলে দিতে পারি।

কুন্তল-দা ফেরারি হলেন এই সময়টায়। ও রকম অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছ কেন তোমরা? সে ভয়ানক কিছু নয়। নিরুদের দোতলায় দিব্যি পড়ে পড়ে ঘুমুতেন। নিরুর চোখের উপরে—কাজেই বুঝতে পারছ, অসুবিধা কোনো কিছুরই হবার জো ছিল না—মায় গদির বিছানা ও নেটের মশারি পর্যন্ত। কেবল এক-একদিন অনেক রাত্রে পালিয়ে বরানগরে চলে আসতেন। আমরা রাগারাগি করতাম, বলতাম, সুখে থাকতে তোমায় ভূতে কিলোয় দাদা। একদিন মরবে—

কুন্তল-দা মুখ শুকনো করে বলতেন, তাই তো—তোমরা ভাবিয়ে তুললে। সর্বনাশ! একদিন নাকি মরব। একেবারে আপ্তবাক্যের মতো শোনাচ্ছে হে—

আনন্দ সেই থেকে বড় একটা আসত না। এলেও কোণের দিকে মুখ নিচু করে চুপচাপ থাকত, কোনো রকম কাজের কথা উঠলেই সরে পড়ত। তারপর একেবারে ডুব দিল।

মাস আষ্টেক দেখি নি তাকে। একদিন খুব ভোরবেলা আমার ঘরে এল প্রেতের মতো একজন। কথা না বললে চিনবার জো নেই—কী বীভৎস চেহারা!

চমকে উঠলাম, আনন্দ—তুমি?

সে হাসতে লাগল।

এ কী হয়েছে রে? কোথায় ছিলে এদ্দিন?

হাসপাতালে ছিলাম শঙ্কর-দা। ভালো থাকলে কি দেখতে পেতেন না? আপনারা আমাকে যতই ঘৃণা করুন, ঠিক আসতাম।

আমি বললাম, ঘৃণা করি না ভাই। কিন্তু সোনার মতো মুখ পুড়ে যে—

হনুমান হয়ে গেছে, না? হাসিমুখে সে বলতে লাগল, আমি বড্ড খুশি হয়েছি। এই মুখের জন্য কত ঠাট্টা করেছেন। বলতেন, মেয়েমানুষ···আরও কত কি! এবার?

কি ব্যাপার বল তো?

বাজি তৈরী করতে গিয়েছিলাম।

কি বাজি, ঠিক করে বল—লুকিও না।

অভিমানের সুরে আনন্দ বলতে লাগল, সে যাই হোক—আপনাদের তা শুনে দরকার কি শঙ্কর-দা? আপনারা তো ভরসা করতে পারেন নি! আমি নিজে যদি কিছু করে থাকি। দেখুন—এবার আর মেয়েলি মুখ নেই তো?

আমি বললাম, মনটা তো বদলায় নি। তুমি যাও—লেখাপড়া কর গিয়ে। এ পথ ছেড়ে দাও।

আনন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল খানিক। তারপর কাছে এসে হঠাৎ পায়ের ধুলো নিল। বলে, তাই ঠিক। চললাম শঙ্কর-দা—আর কোনো দিন আপনাদের কাছে আসব না।

•

আবার ক-দিন ছিলাম না কলকাতায়। এসেই নিরুদের ওখানে গিয়েছি। কুন্তল-দা বললেন, আমি যে মরে গিয়েছি শঙ্কর। আজকের কাগজে দেখিস নি?

সে কি?

এই দেখ—

কাগজে কুন্তল সরকারের মৃত্যু-সংবাদ পড়লাম। শ্যামবাজারের এক বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে স্বদেশিওয়ালাদের গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হয়—ফলে কয়েকজন মারা পড়ে, তার মধ্যে কুন্তল সরকারও আছে।

সন্ধ্যাবেলা সমস্ত খবর নিয়ে ফিরলাম। নিরু বলে, আমাদের সেই সাধু মহারাজ, শঙ্কর-দা?

হ্যাঁ। কোত্থেকে কুন্তল-দার নামে ক'খানা চিঠি যোগাড় করেছিল। তাই পকেটে রেখে দিয়েছে। মুখ পুড়িয়ে আগেই এমন করে রেখেছে যে চেনবার জো নেই—

পাষাণ কুন্তল-দা, তবু যেন তাঁর স্বর একটু কাঁপল। কিংবা হয়তো আমারই ভুল—ঐ হিমালয় ঝড়-ঝাপটায় কাঁপবার বস্তু নয়। বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন মৃদুকণ্ঠে বললে, বোকা ছেলে! অত সহজে কি কুন্তল সরকারকে ঠেকানো যায়? মিছেই মারা পড়লি।

নিরু এত জ্বালাত, বিদ্রূপ করত—চোখের জল এখন আর তার বাধা মানছে না। বলল, একটা ফুল আগুনে পুড়ে গেল কুন্তল-দা।

কুন্তল-দা বললেন, নূতন সূর্য উঠবেই। তার আগে আনন্দ গেল, আমিও যাব—এইরকম কত চলে যাবে। কাঁদতে গেলে চলে কি বোন?

সূর্য আজ উঠেছে। কুন্তল-দা নেই। পনের বছর আগে নিরুপমার বৃত্তান্তটা গোড়া থেকে বলে নিই, শোনো। নিরুপমার সঙ্গে নিবিড়তম সম্পর্ক কি না—সে আমার বউ। কিন্তু খবরদার ভাই, মল্লিকার কানে কথাটা না যায়। সে জেলে যায় নি, কিন্তু ঘরে বসে যা সয়েছে তা তোমার আমার চেয়ে কম নয়। কী জানি, মল্লিকা কি মনে করে বসবে—আমার সেই ভয়।

নিরুপমা

তখন শ্যামবাজারের এক গলির মধ্যে ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই গলির একটা বিশেষ বাড়ির কাছাকাছি আমাদের দু-একজনের থাকার দরকার। মাপ করো ভাই, আজকের দিনে এর বেশি কিছু বলতে পারব না। মোটের উপর সকাল-সন্ধ্যা খোঁজাখুঁজির বিরাম ছিল না। কিন্তু গলির লোকগুলো অকস্মাৎ যেন বিষম বড়লোক হয়ে উঠেছে, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার গরজ কারও নেই। ঘর পেলাম না, কিন্তু পেয়ে গেলাম নিরুপমাকে।

মেয়েটাকে এক নজর দেখলাম। লম্বা-চওড়া গড়ন। তখন সন্ধ্যাবেলা, মই ঘাড়ে করে মিউনিসিপ্যালিটির লোক গ্যাস জেলে জেলে বেড়াচ্ছিল। বটতলায় সিঁদুর মাখা অনেকগুলি পাথর। তারই সামনে তাদের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা। বাড়ি ঢুকে কোনো দিকে না চেয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

মাথায় এক মতলব এসে গেল। মেয়েটাকে যদি দলে টানতে পারি, ঘর না পেলেও চলবে। পিছু নিলাম। কয়েকটা দিন কেটে গেল। এক দিন কলেজ-ফেরতা সে গটগট করে চলেছে, আমি খুব সন্তর্পণে দূরে দূরে যাচ্ছি, গলিতে ঢুকে সে চোখের আড়াল হয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে আমি মোড় ফিরে যেই ঢুকেছি—দেখি, একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে নিরুপমা দাঁড়িয়ে আছে আমার অপেক্ষায়। একেবারে রণ-রঙ্গিণী মূর্তি—রক্ষার মধ্যে হাতে কিছু নেই.খান দু-তিন মোটা বই ছাড়া।

পিছু নিয়েছ কেন তুমি ?

আমি বললাম, পথ কি কারও একলার ?

বল কি জন্যে ?

ভদ্রলোককে যেভাবে অনুরোধ করতে হয় সেইভাবে বলুন, তবে জবাব দেব।

আপনি ভদ্রলোক ?

কি রকম ফিটফাট জামা-কাপড় পরে আছি—ভদ্রলোক মনে হয় না ? দেখুন না—চেয়ে দেখুন একবার—

নিরুপমা মুখ একেবারে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেকবারই সে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়েছে—দেখা বললে ঠিক হয় না, দৃষ্টি দিয়ে আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। ব্যঙ্গের সুরে সে বলে, বাংলা দেশ কি না—আপনাদের তাই ভদ্রলোক বলে।

সব দেশেই আমরা ভদ্রলোক ! অসহায় মেয়েকে সঙ্গে করে বাড়ি এগিয়ে দিচ্ছি—এ কাজ বীরধর্মের কোঠায় পড়ে, জানেন ?

আমি অসহায় ?

নিশ্চয়। একলা চলেছেন, বিশেষ তো অস্ত্রশস্ত্র দেখছি নে। ধরুন, যদি কেউ আপনার একখানা হাত চেপে ধরে—

মুখ ফেরাল নিরুপমা। বলে, আমি চেঁচিয়ে উঠব। আমাদের পাড়া—এতটুকু বয়স থেকে এখানে মানুষ—

তার আগে যদি মুখ বেঁধে ফেলে। হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার গলায় এই চাদরটার মতো একটা-কিছু দিয়ে মুখ বাঁধা তো শক্ত কিছু নয়।

নিরুপমা দাঁড়িয়ে যায়।

আপনার মতলব কি ?

আমি হেসে বললাম, আর যাই হোক, মুখ বাঁধা কিংবা হাত ধরাধরির জন্য চারটে থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম না।

তাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছি। দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলে, আসবেন ?

না।

ভয় করছে ?

আমি বললাম, ভয়ের নমুনা দেখছেন কিছু ? রণে আর প্রেমে ভয় করলে চলে না।

এবার সে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল। অসাধারণ মেয়ে—এই প্রথম আলাপের টের পেলাম। বলে, ইস্—সাংঘাতিক তো ?

কিন্তু প্রেম নয়।

তবে বুঝি রণ? কার সঙ্গে—আমারই সঙ্গে নাকি?

প্রথম আলাপে না-ই শুনলেন সে কথা। কাল বিকেলে আবার আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

পরদিন দেখা হল। তার পরদিনও। মনে রেখো, সেটা পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, ওখনকার চেয়ে কড়াকড়ি ঢের বেশি ছিল। এক ধরনের কাজ মেয়েদের দিলে ভাল হয়, আমাদের মধ্যে দু-চারটি মেয়ের দরকার, পথে ঘাটে তাই ঐ রকম ওত পেতে থাকতে হত। নিরুর বাড়ি সম্বন্ধে যা শুনলাম, সে একেবারে আশাতীত। দুই ভাই আর বোনটি; আর আছেন বুড়ো মা, তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত কিছু নয়। ছোট ভাই নাবালক, আর বড় হলেন—নাম তো আগেই করেছি, সরোজ পাকড়াশি।

আমাদের সরোজ? কুন্তল-দা বললেন, সরোজের বোন, তাই বল। এমন ইস্পাতের মেয়ে যেখানে-সেখানে পেয়ে যাবে, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

তোমার সরোজকে আমরা দেখি নি তো।

কুন্তল-দা বললেন, দেখবে কি? ক-টা দিনই বা জেলের বাইরে থাকে!

একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, হতভাগাটা বলে কি জান? ছ-টা মাস থাকতে দিক, তুড়ি মেরে দেশ স্বাধীন করব। তা কর্তারা ছ-টা দিনও তাকে বাইরে রেখে সোয়াস্তি পান না।…বেশ হয়েছে, মেয়েটা একমনে এবার কাজে লাগুক।

কিন্তু মোটে আমাদের আমলই দেয় না কুন্তল-দা—

বস্তুত নিরুপমা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বলে, মিথ্যা কথা, আপনারা সব ধাপ্পাবাজ—আমি ও-সব একতিল বিশ্বাস করি নে।

আমি বলি, এমন সব ঘনিষ্ঠ বিশেষণ প্রয়োগ করছ নিরু, এর মধ্যে এতখানি প্রত্যাশা করি নি।

নিরু কালো বড় বড় চোখ দুটো মেলে খানিক চেয়ে থাকে। শেষে বলে, বেশ, নিয়ে আসুন একদিন কুন্তল-দাকে। আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন রইল। তিনি নিজের মুখে বলবেন—

ঘাড় নেড়ে বলি, এখন তা হতে পারে না।

কেন? কলকাতায় নেই? কোথায় তিনি?

সরোজের বোনকে এটাও বোঝাবার দরকার যে, এ সমস্ত জিজ্ঞাসা করতে নেই?

নিরুর উচ্ছ্বাস থেমে যায়। লজ্জিত হয়ে সে চুপ করে।

আমি বললাম, অত সহজে কুন্তল-দাকে পাওয়া যায় না।

কি করতে হয়?

সাধনা। দেখছ না, সরকার বাহাদুর বছরের পর বছর কি অসামান্য সাধনায় লেগে আছেন।

আমি তো সরকারের কেউ নই।

অতএব একদিন দেখা পাবে। তাঁর কাজে লেগে যাও।

নিরু বলল, অন্তত একছত্র হুকুম চাই তাঁর হাতের।...মানে, তাঁকেই মানি, একমাত্র তাঁকে। আপনাদের কাউকে নয়।

বরানগরের সেই একতলাব বাড়িতে তখন একটা তুলোর গুদাম হয়েছে। গুদামের পিছনটায় আধ-অন্ধকারে কুন্তল-দা বইয়ের গাদার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতেন। যে ধুনারীব গুদাম, সে আমাদেরই একজন। সে ঘরে যে মানুষ থাকে, বাইরে থেকে বোঝবাব জো ছিল না। একদিন ক-জনে একসঙ্গে হয়েছিলাম। কুন্তল-দা বললেন, মেয়েটা নেমন্তন্ন করেছে, তা যাই না কেন—একদিন ভালমন্দ খেয়ে আসি।

সবাই প্রবল ভাবে ঘাড নাড়ে; না—না—না—

তিনি হেসে বললেন, হিংসুটের দল তোমরা, আমার ভাল কি দেখতে পার? দাও, তবে একটুকবো কাগজই দাও—

এবং তৎক্ষণাৎ শুরু করলেন, শ্রীচরণাম্বুজেষু—

আমরা হেসে উঠতে কুন্তল-দা কলম তুলে বললেন, কি, হল কি তোমাদের?

ও কি লিখছ? সতেব-আঠার বছরের একরত্তি একটা মেয়ে যে নিরুপমা—

চিঠি নিরুপমার কাছে পেঁাছল। তারপব দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। বলে, দেখুন শঙ্কর-দা, খাতিরটা দেখুন একবার! আমি হলাম শ্রদ্ধাস্পদা। কুন্তল-দার সার্টিফিকেট—অতএব আপনারাও শ্রদ্ধা করবেন। বুঝলেন তো?

আবার বলে, আপনাদেরও উনি এই রকম লেখেন নাকি?

আমি বললাম, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাই নি, তেমন ভাগ্য হবে কোত্থেকে। বিবেকানন্দর চোখ দিয়ে দেশ দেখছেন ওঁরা—অনাত্মীয় মেয়ের ঐ একটি মাত্র মূর্তি ওঁদের কাছে।

মোটের উপর যা চেয়েছিলাম—হল। নিরুকে পাওয়া গেল।...এখন সে বেঁচে নেই। আহা যদি থাকত! তুমি আমি সকলে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছি, এ সমস্ত দেখে কত উৎসাহ হত তার। তার নির্ভীকতা তখনকার দিনে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মাস দুই পরে একদিন আমাদের আস্তানায় সে যেন আকাশ ফুড়ে উদয় হল। অনেক রাত্রি, ছাদের উপর অল্প অল্প জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, কথাবার্তা হচ্ছিল, সব বন্ধ হয়ে গেল। কোথা থেকে কি করে জানল, কে-ই বা দুয়োর খুলে দিল। তারপর দেখি, হিরণ পিছনে রয়েছে।

নিরু জুতো খুলতে খুলতে সকলকে এক নজর দেখল। তারপর কুন্তল-দার পায়ে গিয়ে প্রণাম করল। আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে, কেমন শঙ্কর-দা চিনতে পেরেছি কি-না বলুন—

আমি বললাম, আগে দেখেছিলে ?

নিরু বলে, কক্ষনো নয়, সূর্যকে কি চিনে রাখতে হয় ? হাজার লোকের মধ্যেও ওঁকে বেছে নিতে এক মিনিটও লাগে না।

কুন্তল-দা বললেন, সর্বনাশ, বল কি গো ! ভয় ধরিয়ে দিলে।

নিরু বলে, আপনার ভয় আছে নাকি ?

আমি বলি, ওঁর নেই—আমাদের আছে।...শুনে রাখলে তো ? অতএব ঘর থেকে তোমার বেরুনো চলবে না—এক পা-ও নয়—

কুন্তল-দা বললেন, কেন—বেরুলে হবে কি ?

চিনে ফেলবে। ধরে নিয়ে জেলে আটকাবে।

তোমরাই বা কী এমন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছ ! নিরু, জানিস নে বোন—জীবনে এরা ঘেন্না ধরিয়ে দিল। কোন কাজ করতে দেবে না, কোথাও যেতে দেবে না—এ রকম বেঁচে লাভ কি ?

নিরুপমা কুন্তল-দার পায়ের কাছে বসে পড়ল। আমরা এদিকে রাগে জ্বলছি। কুন্তল-দা না থাকলে সেইখানেই হিরণের টুঁটি চেপে ধরতাম। আমরা এত সাবধান করে মরি, আর হতভাগা মেয়েটাকে এনে জোটাল এই জায়গায়।

চোখ-ইশারায় হিরণকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি—দেখি, কুন্তল-দাও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, হিরণের দোষ কি ?

ও, তুমি বলে দিয়েছিলে ?

কুন্তল-দা রাগতভাবে বলে উঠলেন, না বলে উপায় ছিল ! যত সব বদরাগী মানুষ নিয়ে দল গড়বে, দোষের বেলা হিরণ আর কুন্তল-দা।

নিরুপমার কানে যেতে সে মাথা নিচু করল। আমরা উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠি, ইতিমধ্যে এমন কি ঘটে গিয়েছে যার জন্য তাড়াতাড়ি কুন্তল-দা হিরণকে পাঠালেন। রাত্রিবেলা আমরা সবাই তো আসব—পরামর্শের সবুরটুকুও সইল না !

আবার বসে পড়ে তিনি নিরুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, দুঃখ পাচ্ছ কেন

বোন, তোমার দোষ কি, তুমি কেবল থানা অবধি গিয়েছিলে, আমরা হলে মহানন্দটাকে শেষ করে ফেলতাম।

নিরু জিজ্ঞাসা করে, আপনি মানুষ মারতে পারেন কুন্তল-দা?

কুন্তল-দার যেন কানে ঢুকল না, তিনি বলে চলেছেন।

আমি বলি, এ সব কথা কেন নিরু? ছিঃ—

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, উনি মোটে পারেনই না, আমি বলে দিচ্ছি। এত যার স্নেহ—

কুন্তল-দা বললেন, তুমি পার?

মানুষ পারি না, জানোয়ার পারি। অন্তত পারা উচিত।

একটু চুপ করে থেকে নিরুপমা বলতে লাগল, একদিন এ দেশে জানোয়ারের বাড়াবাড়ি হয়েছিল। মা বোনেরা স্নেহ দিয়ে লালন করেছিল তাদের। স্নেহ না দিয়ে মুখে বিষ তুলে দিলে ঠিক হত। হলে আজকের এ-রকম দিন আসত না। সেই রকম জানোয়ার একটা হচ্ছে আপনাদের মহানন্দ—

কুন্তল-দা বললেন, মহানন্দ তো আমাদের নয়—

আমি বললাম, বিশ্বাস করতে চায় না কুন্তল-দা, আমার সঙ্গে সে কী তর্ক!

মহানন্দের সঙ্গে ইস্কুলে কিছুদিন পড়েছিলাম। সেই থেকে আমাদের দু-একজনের সঙ্গে তার অল্পস্বল্প পরিচয়। মহানন্দ তাই নিয়ে গালগল্প করে বেড়াতো। নিরুদের সঙ্গে তার দূরসম্পর্কের কি রকম একটু আত্মীয়তা ছিল। সেই দিনই সকালবেলা মিরু আমাকে খুব জেরা করছিল—আপনি যে বলেন, কুন্তল-দা এখানে নেই?

ছিলেন না। এসেছেন ক-দিন হল।

মিথ্যে কথা। তিনি বরাবর রয়েছেন। মহানন্দ-কাকা বললেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি, সর্বনাশ—ওর সঙ্গে এ-সব কথা হয় নাকি? বাজে লোক।

নিরুপমা বলে, বাজে লোক হলে কুন্তল-দা নিয়েছেন?

কুন্তল-দা তাকে চেননই না।

বলেন কি! কুন্তল-দা গয়না চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে চিঠি পর্যন্ত রয়েছে—

গায়ে পরবেন বলে?

নিরু বিরক্ত হয়ে বলে, পরবেন কে বলেছে? হয়তো কাজে লাগাবেন বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে—

তালুক নিলাম হচ্ছে বুঝি কুন্তল-দার—মেয়েমানুষের গয়না বন্ধক দেবেন?

কিন্তু টাকার কি গরজ নেই?

আছে। সে সামান্য ব্যাপার। আমরা বন্যাত্রাণ-সমিতি গড়ি নি নিরু, যে তোমার কাছে দয়ার দান চাইতে যাব।

নিরু ক্ষণকাল যেন নিস্পন্দ হয়ে থাকে। তারপর বলে, মহানন্দ-কাকা বলল, কুন্তল-দার সঙ্গে দেখাশোনা করিয়ে দেবে, তাঁর বাড়ি নিয়ে যাবে—

সাবধান নিরুপমা, কুন্তল-দার বাড়ি বলে তোমাকে থানায় নিয়ে তুলবে। খুব সাবধান।

থানায় মহানন্দ যায় নি, নিরু নিজে গিয়েছিল। বোকা মেয়ে!

সেই যে কবে কুন্তল-দার দু-ছত্র লেখা দিয়েছিলাম, তারই সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে। তারপর গয়না-চুরির জন্য রাগের মাথায় ডায়েরি করে এসেছে মহানন্দের নামে।

নিরু বলে, বেশ করেছি। দেশের কথা বলে আর সেই সঙ্গে অত বড় লোকের নাম জড়িয়ে মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়, ওর শাস্তি হবে না?

কুন্তল-দা বললেন, ওর আগে হত তোমারই। টের পেতে যদি ঠিক সময়ে খবরটা না পেতাম—

নিরু আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বলতে লাগলেন, ডায়েরি করে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরলে। এনকোয়ারির সময় মহানন্দ ওদিকে সত্য-মিথ্যা এক রাশ বলে মনের ঝাল ঝেড়েছে। ভাগ্যিস খবর এসে গেল হিরণকে দিয়ে তাই তোমায় গ্রেপ্তার করে এনেছি। বাড়িতে এতক্ষণ তোলপাড় চলছে।

আজ দিন তিনেক কুন্তল-দা একেবারে চৌকাঠ পার হন নি, অথচ খবর ঠিক ঠিক এসে যাচ্ছে। ইদানিং আর আমরা এত আশ্চর্য হই না। তিনি বলতে লাগলেন, গ্রেপ্তার—বুঝলে তো নিরু? হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি—তোমার আর কোথাও যাওয়া হবে না;

নিরু মৃদুকণ্ঠে বলে, সব ভাইয়ের জন্য আমি খাবার করতে বসেছিলাম। আজ ঠাকুর আসে নি কিনা!

ও-সব ভেবো না। তোমার ভাইয়ের খাবারের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তোমার কি বন্দোবস্ত করি বল তো? বড্ড ভাবিয়ে তুললে।

নিরু রইল চিলেকোঠায়, আমরা ক'জন দোতলায়।

পরদিন নিরু জিজ্ঞসা করে, কদ্দিন আটকে রাখবেন কুন্তল-দা?

কুন্তল-দা বললেন, দু-বছর হয়তো বা চিরকাল—

অধীরকণ্ঠে নিরু বলে, সে আমি পারব না। ভাবছেন কেন, কোন চার্জ

তো নেই—আর আমার কাছ থেকে কথা বের করবে, সে মানুষ ভূ-ভারতে জন্মায় নি।

কুন্তল-দা বললেন, তা পারবে না জানি···কিন্তু কোনো দিন যদি শুনি তুমি বিষ খেয়েছ! তোমার মত মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারি নে—কিছুতেই না। তুমি বোঝ না, তোমার দাম অনেক!

আরও দিন দশেক কেটেছে। ইতিমধ্যে কিছুকালের মতো ঐ বাড়ির আস্তানা গুটাবার আবশ্যক হয়ে পড়ল। কুন্তল-দা বলছিলেন, যত মুশকিল তোমাকে নিয়ে বোন। স্ত্রী হয়ে কারও অন্দর মহলে ঢুকে পড দিকি। তা হলে নিরাপদ।

নিরু ঘাড নেড়ে বলে, না।

কেন?

এমন মানুষ কে আছে যাকে স্বামী বলতে শরমে বাধে না?

শোন একবার দাম্ভিক মেয়েটার কথা! আবার কুন্তল-দা তার কথাতেই সায় দিয়ে গেলেন, তা সত্যি। কিন্তু সত্যিকার স্ত্রী হতে যাবে কেন? সাজতে হবে, যেমন যাত্রা-থিয়েটারে হয়ে থাকে—

খিলখিল করে হেসে নিরুপমা বলে, তাই বলুন। তা পারব, খুব পারব। বলেন তো শঙ্কর-দারই স্ত্রী হয়ে ঘোমটা দিয়ে বসি।···দাঁড়ান শঙ্কর-দা, শুনুন—কথাটা শুনে যান।

আঃ নিরু। যে সময়টা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। নিরু হাসতে হাসতে পথ আটকাল, তার পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

সমস্ত দিন বড় খাটুনি গেল। সন্ধ্যার পর ফিরেই শুয়ে পড়েছি। নিঃসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মাথা ধরে জোরে জোরে নাড়া দিচ্ছে।

কে?

বউ, আপনার বউ গো—

প্রথমটা বুঝতে পারি নি, ঘোমটা-টানা কি না! কথাও বলছে ফিসফিস করে নববিবাহিতা লজ্জাবতী বউটির মতো। শেষে চিনলাম। ঘুম এমন এঁটে এসেছে যে চোখ মেলতে পারি নে। বিরক্ত হয়ে বললাম, তা এত রাত্রে কেন?···না নিরু, বড্ড জ্বালাতন কর তুমি। বউ হও, যা হও—কাল দেখা যাবে। এখন যাও, বিরক্ত করো না।

কুন্তল-দার হুকুম, এক্ষুনি—

সত্যি?

শুভস্য শীঘ্রম্‌। নইলে কালই হয়তো শুনবেন দ্বীপান্তরে নিয়ে গেছে। তখন বউ পাবেন কোথায়—বানর খুঁজে বেড়াতে হবে আন্দামানের সাগর বাঁধবার জন্য।

খুঁজতে হবে না, সে তো এই সামনেই। ঘুমন্ত মানুষ বলে করুণা নেই, রাত দুপুরে এসে আঁচড়াতে লেগেছে।

অভিমানের সুরে নিরু বলে, মুখের উপর এ-রকম বললে দুঃখ হয় না বুঝি! সত্যি কি আমি বানরের মতো দেখতে? বলুন?

দেখে বলতে হলে তো চোখ মেলতে হয়। উপায় কি? তা ছাড়া কুন্তল-দার নাম করেছে। চেয়ে দেখি, সে তৈরী। বাইরে অপেক্ষমান কুন্তল-দা। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিলাম! আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। স্তিমিত গ্যাসের আলো। কুন্তল-দা খানিকটা সঙ্গে গিয়ে ফিরে চলে গেলেন। দুজনে নিঃশব্দে চলেছি।

ভাল চাকরি হল আমার! নিরুকে অন্দরবর্তী করে স্বামী-পরিচয়ে আছি, দূর-দূরান্তরে যাবার হুকুম নেই। একদিন কুন্তল-দা এলেন। নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলাম, মানুষের জেল হয়—দু-মাস হোক, ছ-মাস হোক তার একটা মেয়াদ থাকে। আমার মুক্তি কবে হবে বলুন।

হল কত দিন?

রাগ করে বলি, দেখ না হিসাব করে। তিন মাস পুরে গেছে। টবের গাছ আগলে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

আমার ভাব দেখে কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসেন। বলেন, আচ্ছা—থাক আর ক'টা দিন। দেখি আর কাউকে।

কাউকে পাবে না। আমার মতো গাধা কি দুনিয়ায় আর একটা আছে?

যেখানে থাকতাম, সেটা আধা-শহরগোছের একটা জায়গা। সেদিন সন্ধ্যা থেকে বড় ঝড়বৃষ্টি। অনেক রাত্রে দরজার শিকল ঝনঝনিয়ে উঠল। নিরু ডাকছে। কি ব্যাপার? দরজা খুলে দেখি, তার হাতে হেরিকেনের আলো, কাঁখে ঝুড়ি: আমাদের পেছনের বাগানে বিস্তর আম পড়েছে শঙ্কর-দা। চল কুড়িয়ে আনি।

রাগের সীমা রইল না। বললাম, হ্যাঁ—এই সমস্ত করে বেড়াই। কাল থেকে তুমি কোমর বেঁধে আমের আমসি করতে লেগে যাও। আর বল তো গোয়াল বেঁধে দু-চারটে গোরু পুষবার বন্দোবস্ত করি।

তার হাসিমুখ মুহূর্তে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। হেরিকেনের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পায়ের নখে মেজেয় দাগ দিতে দিতে সে

বলে, আমি কি করব বলুন? আমার কি দোষ?

দোষ কারও নয়। চুপ করে শুয়ে থাকগে। কাটা ঘায়ে নুন দিতে এস না, এইটুকু দয়া কর। এ রকম থাকতে তোমার ফুর্তি লাগছে, আমার কান্না পায়।

ঝুড়িটা ধপ করে নামিয়ে রেখে নিরু ফিরে চলল। বলে, আপনি চলে যান কালই—বুঝলেন?

আমি বললাম, তোমার কথায় এখানে আমি আসি নি নিরু, তোমার কথায় যেতেও পারি নে। যাঁর হুকুমের দরকার তাঁকে জানিয়েছি। ছাড়া পেলে এক মিনিটও দেরি করব না।

তা হলে আমিই যাব কাল। আর একটা দিনও নয়। কুন্তল-দা দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেও না।

দরজার সামনে গিয়ে সে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, ফুর্তির কথা বলছিলেন, খুব ফুর্তি দেখছেন! দেখবার চোখ কি আছে আপনার? আমিই কি এ জীবন চেয়েছিলাম? মনের ভুলে একটুখানি হেসে ফেলেছি, মাপ করবেন।

দড়াম করে সে দরজায় হুড়কো এঁটে দিল।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিরুর কথাগুলো বার বার মনে আসছে, তার বিষণ্ণ চেহারাটা যেন চোখে দেখছি। গৃহস্থ-ঘরের ভাবপ্রবণ মেয়ে, লেখাপড়া শিখছিল, তারপর দেশের কাজ করবে বলে সর্বস্ব ছেড়ে চলে এসেছে। এই নির্বান্ধব পুরী তার বুকে পাথর হয়ে চেপে থাকে। সমস্ত দিন আর দশটা বউ-ঝির মতো ঘরের কাজে নানা রকম ফাইফরমাস মুখ বুজে খাটে। নিষুতি রাতে অভিনয়ের খোলসটা একটু খুলতে চেয়েছিল, ছুটোছুটি করে আম কুড়োত, হাসত, আবোল তাবোল বকত খানিকটা···কী এমন অপরাধ যে এত কথা শুনিয়ে দিলাম, বেচারি মুখ চূন করে চলে গেল।

শুয়ে থাকতে পারি নে, নিরুর ঘরের সামনে এসে ডাকাডাকি করলাম। সাড়া নেই। সাড়া পাওয়া যাবে না জানি। ঝুড়ি নিয়ে একলা বেরুলাম। সকালে রাগ পড়ে যাবে, ঝুড়ি-ভরতি আম দেখে খুশি হবে সেই সময়। তখন বাতাস থেমেছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। আমার এক পিশতুত বোন জয়া-দিদির কথা মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় পাঠশালা পালিয়ে তাঁর সঙ্গে ছুটোছুটি করে আম কুড়োতাম। সে-সব দিন কোথায় চলে গেছে! আজ আমি শঙ্কর রায়, দলের ছেলেমেয়েদের অতি শ্রদ্ধেয় শঙ্কর-দা গভীর রাত্রে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, এ দৃশ্য কেউ দেখলে কি রকম ব্যাপার হবে আন্দাজ কর তো!

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। নিরুর সামনে পড়তে সে জিজ্ঞাসা করল। কোথায় ছিলেন রাত্রে ?

কেন ঘরে। এই তো উঠে আসছি।

সে হয়তো শেষ রাতে কখন এসে শুয়েছেন। আমি একবার উঠেছিলাম। দেখি, দুয়োর হাঁ হাঁ করছে।

হাঁ, তা বটে। কিন্তু বেশ ছিলাম হে—অত্যন্ত আরামে···মানে স্প্রিঙের খাটে শুয়েছি তো, যেন গলে যায়—

নিরু শান্তভাবে বলে, কোন্ জায়গায় ?

চটপট মিথ্যে বানিয়ে বলা অভ্যাস করে আয়ত্ত করেছি, কিন্তু নিরুর সামনে কথা আটকে যায়। বললাম, ছিলাম গলির মোড়ের বাড়িটায়। করব কি··· কাপড় ভিজে গেল, ওদের কাছ থেকে একটা শুকনো কাপড় চেয়ে নিয়ে—

বাড়িটা কার, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি।

রাগ করে বলি, কার বাড়ি—কি বৃত্তান্ত, মুখস্থ করে আসি নি। অত সত বলতে পারব না।

নিরু বলে, আমি পারব। ছিলেন রান্নাঘরে। কাপড়ের ট্রাঙ্ক আমার ঘরে কি-না—তাই উনুনে কাঠ দিয়ে আগুন করেছেন, ভিজে কাপড় বসে বসে গায়ে শুকিয়েছেন। আমাকে ডেকে কাপড় চাইলে কি অপমান হত ?

আবার বলে, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হব। আপনি কি যাবেন কলকাতা অবধি ?

আমি বললাম, যাওয়া-যাওয়া করছ, কী এমন বলা হয়েছে শুনি ? মন খারাপ হলে মানুষ কতকি বলে! এই নিয়ে কুন্তল-দার কাছে একশ'খানা করে লাগাবে তো ?

কিচ্ছু বলব না কুন্তল-দাকে। আপনি না যান, একাই চলে যাব। তিলে তিলে আপনাকে মেরে ফেলতে চাই নে—

আমি বললাম, তা বইকি! স্বাধীন হয়ে গেছ, কুন্তল-দাকে বলবে কেন ? ···কিন্তু ঝগড়া পরে কোরো। আমি দাঁড়াতে পারি নে, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। কুইনাইনের বড়ি থাকে তো শিগগির গোটা দুই বের করে দাও, জ্বর আসতে পারে।

কুইনাইনে জ্বর ঠেকাল না। সেই গিয়ে শুয়ে পড়লাম, আর অনেক দিনের খবর জানি নে। অসুখের মধ্যে এমন অসহায় মানুষ! মাসখানেক পরে এক দিন কেউ কোথাও নেই, খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি। লক্ষ্য দেয়াল অবধি—

ঐ দেয়ালে যেখানে বালির জমাট উঠে অনেকটা মানুষের মুখাকৃতি হয়েছে, ঐ জায়গা আমি ছোঁব। ঠিক পারব।···পারছি, হাঁ, হাঁটতে তো পারছি! ও-ঘরে পায়ের শব্দ। রুগ্ন কণ্ঠ উল্লাসে জোরালো হয়ে ওঠে, নিরু দেখ নিরুপমা—

নিরু জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে।

এ কি কাণ্ড আপনার?

হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। নিরু ছুটে এল। আমাদের দলের এক ছোকরা ডাক্তারি পাশ, তাকে এনে রাখা হয়েছিল, সে এল।

একটু পরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। নিরু তখনও আছে। বড় কড়া শাসন তার আজকাল। বার বার মিনতি করে বলি, লক্ষ্মী নিরু, খেতে দাও একটা আম। কাঁচা আম কুড়োতে গিয়ে এই দশা। এখন পেকেছে, টুকটুকে আম ঝুড়ি ঝুড়ি ঘরে রয়েছে, মিষ্টি দেখে বেছেগুছে একটা দাও, কিচ্ছু হবে না।

নিরু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তা বই কি! ডাক্তার কি বলেছে জানেন?

কিচ্ছু বলে নি, তোমার বানানো কথা। আমাকে খেতে না দেবার ষড়যন্ত্র। নিরু তর্ক করে না। বলে, বেশ তাই—

নির্বিকার মুখে সে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে শিকল পড়ল।

দুয়ারে শিকল দিলে যে?

বাইরে থেকে নিরু বলে, এ-ঘরে এত আম তো চট করে সরানো যাবে না, আপনাকে আটকে রাখাই সোজা।

কে তোমাকে মাতব্বরি করতে বলে? তুমি কে? আমার আপনার কেউ নও—

নিরু জবাব দেয়, আমি আপনার কেউ, তা বলেছি কোন দিন?

তুমি শত্রু, আমাকে মেরে ফেলবার মতলব তোমার।

বেশ, তাই। ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করুন তো—আমি বালি চড়িয়ে আসি।

ঝগড়াঝাটির ক্লান্তিতে চোখ বুজে পড়ে আছি। কুন্তলদার গলা শুনতে পেলাম। তিনি আজ এসেছেন বুঝি, ও ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে। কুন্তল-দা বলছেন ঢাকার ব্যাপারে আর দেরি করা চলে না বোন। শঙ্কর কাল অন্নপথ্য করছে, আর কি! দু'টি ছেলেকে আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তারা দেখাশুনো করবে।

না, না—আর কয়েকটা দিন ছুটি দিন আমাকে···এই দিন দশেক ভাত খেয়ে কেমন থাকেন, না দেখে যাই কেমন করে?

মুশকিল, এই ক'দিনের জন্য আবার একজনকে পাঠাব?

তাই করুন দাদা। তারপর আমি গিয়ে পড়ব, সমস্ত ভার মাথায় তুলে নেব—

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি নিরু, সাবধান! তুমি জান না বোন, তোমার কত দাম। তোমায় ছাড়তে পারব না, শঙ্করের খাতিরেও না।

রাগ জল হয়ে গেল। মনে আনন্দের তুফান উঠেছে। সত্যি, অসুখের মধ্যে মন এমন দুর্বল হয়ে যায়। আধঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি যেন অনেক দূরে থেকে মিষ্টি গান ভেসে আসছে। বিশ্বাস কর ভাই, বাড়িয়ে বলছি নে, সেদিন কত কি ভাবতে লাগলাম! যেন পৃথিবী থেকে দুঃখ-দৈন্য চলে গেছে. মানুষ অন্তত শান্তিতে রয়েছে। সাম্রাজ্য নিয়ে হানাহানি—সে যেন অতীত যুগের বিভীষিকা।

শিকল খুলে কুন্তল-দা দেখতে এলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

দেখুন অত্যাচার! একেবারে কয়েদ করে রেখেছে।

সামান্য দু-এক কথা জিজ্ঞেস করে কুন্তল-দা উঠলেন। বড় ব্যস্ত দুটো খেয়ে তখনই চলে যাবেন। বার্লির বাটি হাতে নিরুপমা এল। বললাম নিরু, আমরা চেয়েছি পৃথিবীকে ভাল করে ভোগ করব।

নিরু বলে, বেশ তো, তাই করবেন।

কাছে আসতে হাতে ধরে ফেললাম নিরুপমার।

দেখ, নাগা সন্ন্যাসী আমরা নই, নিবৃত্তির সাধনা আমাদের নয়।

আমার চোখে কি ছিল, এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নিরু সায় দেয়: হুঁ হুঁ—

আমাদের দুজনের বিয়ে হোক।

বেশ।

তাহলে কুন্তল-দা যাবার আগে তাঁকে বলো।

আচ্ছা। বলে নিরু চলে গেল। একটু পরেই ফিরল। হাতে আইশ-ব্যাগ।

কুন্তল-দা আসছেন। ডাক্তারকে খুঁজলাম। তিনি নেই।

ডাক্তার?

নিরু বলে, শুয়ে পড়ুন দিকি। আপনার মাথায় আইস-ব্যাগ বসিয়ে দিই—

কেন?

মাথা ঠাণ্ডা হবে। মাথার ব্যারাম না হলে অমন আবোল-তাবোল কেউ বকে?

কুন্তল-দা আসতে নিরুপমা বলল, এ গাড়িতে যাওয়া হবে কি করে? পরেরটায় যাব। একটু গুছিয়ে নিতে হবে। 'ওঠ' বললে মেয়েমানুষের যাওয়া কি করে চলে?

তুমি যাচ্ছ তা হলে ?

হ্যাঁ, কালই ঢাকায় চলে যাই, তারপর আর যেখানে যেতে বলেন।

আমি কাতরকণ্ঠে বললাম, আর ক'টা দিন থেকে যাও নিরু। আমার রোগ এখনও সারে নি।

নিরু বলে, আমি থাকলে বেড়েই চলবে।

দেখ, যদি মরে যাই ?

বড্ড দুঃখ হবে। আহা গালি দেবার আর ঝগড়া করবার এমন মানুষটাও চলে গেল।

কাল আমি অন্নপথ্য করব। এই একটা দিনও থাকতে পার না ?

না।

যাবার আগে নিরু প্রণাম করতে এল। আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম। সে পায়ের গোড়ায় মাথা রাখল। আমি পা সরিয়ে নিলাম। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি জলের দাগ। নিরুপমা কেঁদেছে। ও মেয়েও কাঁদতে জানে তা হলে !

ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম। গাড়ির মধ্যে নিরু আর কুন্তল-দা সামনাসামনি বসে চলেছেন। তেঁতুলগাছের আড়ালে গাড়ি অদৃশ্য হল আওয়াজ কানে আসে না···

সোমনাথ ও মায়া .

জগৎ দত্তের কথা নিয়ে মহাকাব্য লেখা যায়, কিন্তু লিখছে কে ? লেখার যেদিন সময় হবে সেদিন অতীতের সাক্ষী আমরা যে ক'জন আছি আমাদের শক্তি থাকবে কি ? আমরা বেঁচে থাকব তো ? এখনই স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন দুপুরে কালী সিংহের মহাভারতখানা নামিয়ে নিয়ে বসেছিলাম। এত পড়াশুনো ছিল বাবার, তার মধ্যেও এই বই তিনি নিয়মিত পড়তেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে তাকের উপর তোলা ছিল। পাতা উলটাতে উলটাতে তার মধ্যে পেলাম, পুরনো কয়েক টুকরো খবরের কাগজ—আলপিনে গাঁথা, এখানে সেখানে লাল কালির দাগ দেওয়া। মনে পড়ে গেল, আমিই এই সব টুকরো কেটে রেখে দিয়েছিলাম। কোন্ বিস্মৃত যুগের কথা, সে সব মানুষ নেই, সে পৃথিবী নেই, কাগজ বিশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেছে, পড়াই মুশকিল।

জজ এজলাসে আসিয়া বসিলেন। রায় কি দিবেন পূর্বাহ্নেই অনুমান করা

গিয়াছিল। কিন্তু আসামী জগৎলাল কাঠগোড়ায় চেয়ারের উপর নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় বসিয়া আছে। আলস্যে মাঝে মাঝে তাহার তন্দ্রাবেশ হইতেছে —এইরূপ একটি ভাব।

বহু বাগাড়ম্বরের পর হুকুম জানিতে পারা গেল, ফাঁসি। জগৎ হাসিমুখে জজকে নমস্কার করিল। জজ বলিলেন, আপনি আপিল করতে পারেন। দরকার নেই—বলিয়া জগৎ প্রবল হাস্য করিতে লাগিল।

মল্লিকা এসেছে, আমার কাঁধের উপর ঝুঁকে সে-ও পড়ছিল। বলে উঠল, ধন্য।

তার মুখের দিকে তাকালাম। এই ধরনের কথা শুনলে সচরাচর আমি হেসে উঠে তাকে অপ্রতিভ করি। কিন্তু আজ পারলাম না। মনে পড়ল, আমি আর কুন্তল-দাও সেদিন আদালতের এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। জগতের হাসি দেখে সেই পাথরের মানুষটি পর্যন্ত অস্ফুট স্বরে মল্লিকারই মতো ঐরকম একটা কি বলেছিলেন।

মল্লিকা বলে, কুন্তল-দার দলের ছেলে?

জগতের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাই। দায়ে পড়ে সংক্ষেপ-করা কাহিনীর মধ্যে না-ই বা তাকে আনলাম! বললাম, এর চেয়েও তার বড় পরিচয় আছে। জগতের বাবা হলেন সোমনাথ দত্ত।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে মল্লিকা বলে, বল কি? হাত জোড় করে সে নমস্কার করল।

তুমি তাঁকে দেখেছ নাকি মল্লিকা?

মল্লিকা বলে, না। কিন্তু ভগবানকেও তো দেখি নি।

ভগবান নিয়ে টানা-হেঁচড়া কেন?···সে আমলে লোকে ওঁদের সম্বন্ধে কি বলাবলি করত, জান?

কি?

ভয়ঙ্কর বাঘের দল। হাসতে হাসতে ঐরকম যারা প্রাণ নিয়ে খেলা করতে পারে, তারা কক্ষনো মানুষ নয়।

মল্লিকা বলে, হাসতে হাসতে একদিন যারা এত বড় দেশটার সর্বনাশ করেছিল, তারাও মানুষ ছিল না। ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে।

বারান্দায় গিয়ে বসেছি। উঠোনের উপরে রাস্তা, তার ওদিকে মাঠ···

কাশের সাদা ফুলে ফুলে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। খররৌদ্রে হঠাৎ চোখে ধাঁধা লাগে, মনে হয় সামনে দুস্তর বালু-সমুদ্র।

মল্লিকা এসে পাশে আলসের উপর বসল। বলে, সোমনাথকে দেখেছ তুমি?

কত! প্রথম দেখি, জগতের বিয়ের দিন। বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে আছি, জগৎ বাসরঘর থেকে পালিয়ে এল সেখানে—

নাছোড়বান্দা মল্লিকা, তার তাগিদে স্মৃতির সাগর মন্থন করতে হয়। নিজে আর কতটুকুই বা জানি, মায়ার মুখে যেমন শুনেছি সেই রকম বললাম। মায়া আমার মামাতো বোন, খালিশপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে ওদের বাড়ি। কলেজে ঢুকে গোড়ায় জগতের সঙ্গে হস্টেলের এক ঘরে পাশাপাশি থাকতাম। কুন্তল-দার হুকুমে রাত দুপুরে হস্টেল পালিয়ে কতবার ভৈরব পাড়ি দিয়েছি। একবার ডিঙি ডুবে গেল, সাঁতরে ওপারে উঠে জগতের প্রতীক্ষায় ভোরবেলা অবধি চাঁদাকাঁটার ঝাড়ের পাশে বসে হি-হি করে কেঁপেছিলাম। জগৎ টানের চোটে দু'বাঁক এগিয়ে গিয়ে উঠেছিল। এর থেকে মোটামুটি বুঝতে পারছ, আমাদের বন্ধুত্বটা ছিল কি রকম। আমাদের সঙ্গে সে মায়াদের বাড়ি অনেকবার গিয়েছে। আর এরই প্রায় বছর দুই আগে থেকে সোমনাথ ফেরারি ছিলেন। কাজেই জগতের অভিভাবক সে নিজেই। জুত হয়ে গেল। আমি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলাম।

মল্লিকা মুখ ঘুরিয়ে বলে, তুমি উপলক্ষ। যোগাযোগ নিজেরাই করেছিল ভালবাসার বিয়ে, বুঝতে পারছি!

সে যাই হোক, শুভকর্ম তো নির্বিঘ্নে হল। পাড়াগাঁয়ের বিয়ের ব্যাপারে সাধারণত যত রাত্রি হয়ে থাকে, এখানে হাঙ্গামা চুকেছিল তার অনেক আগে। তার কারণ, মায়ার বাবা কলকাতায় এক জমিদারের বাড়ি চাকরি করতেন, সেখান থেকেই রসুয়ে-বামুন এবং খাটনির লোকজন নিয়ে এসেছিলেন, গাঁয়ের লোকের উপর নির্ভর করেন নি। মাঘ মাসের শেষ, দারুণ শীত পড়েছে, বাড়িসুদ্ধ সবাই লেপের নিচে ঢুকেছে, বিয়েবাড়ি বলে বুঝবার জো নেই।

মায়ার ঘুম আসছিল না। কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর মল্লিকা তা হলে আমাদের বিয়ের দিনটা মনে করে দেখ। দেশসেবক বলে সবাই হৈ-চৈ করে বেদীর উপর বাসায়, কিন্তু ভেবে দেখ ঘরোয়া ব্যাপারে সবাই আমরা এক রকম। তুমি উসখুস করেছিলে; সেন্ট পড়ে চোখ জ্বালা করছে। আমি তখন—

মল্লিকা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। বলে, হচ্ছে ভদ্রলোকের কথা। ওর মধ্যে ঐ সব ছাই-ভস্ম আনছ কেন বলো তো···

তারপর একটু ঘুমের আবিল এসেছে মায়ার। কাপড় টান পড়ায় সে

চমকে উঠল। দেখে, চুপিচুপি গাঁটছড়া খুলে ফেলেছে। দরজা খুলে জগৎ সন্তর্পণে চোরের মতো বেরুল। মায়ার বড় ভয় করে, বাসর ঘর থেকে এ রকম বেরুনো অস্বাভাবিক, এবং অত্যন্ত অলক্ষণের কথা। মায়ার চোখ ফেটে জল আসে আর কি! জগৎ গেছে তো গেছে ফিরবার নামটি নেই। অনেকক্ষণ পরে পায়ের শব্দ পেয়ে মায়া চোখ বুজল, ঠিক যেন বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

ফুলুঙ্গিতে রেড়ির তেলের দীপ জ্বলছিল। মায়া চোখ মিট-মিট করে দেখে। জগৎ শোয় না, একটু ইতস্তত করে, তারপর মায়ার গা ধরে নাড়া দেয়, শোন··· ওঠ তো একটিবার—

কপট ঘুম ভেঙে মায়া বলে, কি?

কিছু খাবার এনে দিতে পার লক্ষ্মীটি?

বিয়ের রাতে এই তাদের কথা। মায়া বলে, কোথায় পাব? সব রয়েছে ভাঁড়ারে চাবি দেওয়া। আর লোকে দেখলেই বা বলবে কি!

জগতের মুখের দিকে চেয়ে সে ফিক করে হেসে উঠল। বলে, খাবারের চেষ্টায় রান্নাঘরে গিয়েছিলে নাকি? যেমন লাজুক, একবার টের পাও। থাল ভরে এত খাবার দিয়েছিল, কিচ্ছু খাও নি বোধ হয়।

জগৎ বলে, ঠাট্টা নয় মায়া, সত্যি বড় দরকার। ভাঁড়ার হোক, যে জায়গা হোক—তুমি না পার, ঘরটা শুধু দেখিয়ে দিয়ে যাও।

তার ভাব দেখে উদ্বিগ্ন মায়া বলে, হয়েছে কি?

বাবা এসেছেন।

কোথায় তিনি?

জগৎ বলে, আশীর্বাদ করবেন বলে এসেছেন। কেউ জানতে না পারে খবরদার!

মায়া বলে, সে জানি। কিন্তু বাইরে কোথায় তাঁকে রেখে এলে এই শীতের মধ্যে? ওঁর কষ্ট হচ্ছে।

ম্লান হেসে জগৎ বলে, লেপ-কাঁথা শাল-দোশালা নিয়ে পুলিস তো দিনরাতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগাল পাচ্ছে না বলেই এত কষ্ট।

অন্ধকারে আতাতলায় দাঁড়িয়েছিলেন সোমনাথ। নিঃশব্দ রাত্রি, কনকনে বাতাস বইছে, আকাশের তারাগুলোও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। অযত্নে অত্যাচারে বয়সের চেয়ে অনেক বুড়ো দেখায় সোমনাথকে। খালি গা, সাজ-পোশাকের মধ্যে একটা তুলোর জামা আর সুতি চাদর।

মায়া গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, আসুন বাবা—

সোমনাথ চমকে উঠলেন। এই রকম ভাবে মায়া চলে আসবে, তিনি প্রত্যাশা করেন নি। বললেন, অভ্যর্থনা করতে এসেছ···বোকা মেয়ে, আর সবাইকে ডেকে তুলছ নাকি?

কাউকে ডাকি নি বাবা। সে বুদ্ধি আছে। ঘরের মধ্যে চলে আসুন, কেউ টের পাবে না।

আমায় ঘরে নিলে বিপদ আছে, জান?

মায়া বললে, ফাঁকি দিলে শুনব না। আঁধারে আপনাকে দেখতে পেলাম না, আলোয় নিয়ে দেখব, প্রাণভরে পায়ের ধুলো নেব বাবা।

হাত ধরে সে সোমনাথকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল। চুপি-চুপি জগৎকে বলে, সত্যি—খাওয়ানোর কি করা যায় বল তো?

জগৎ বলে, তোমাদের ঘর-বাড়ি, তোমরা যদি না পার···আমি হলাম নতুন মানুষ, তার উপর জামাই—

মায়া বলে, আমিও তো এই দিন চার-পাঁচ কনে হয়েই আছি। কোথায় কি রেখে দিয়েছে, আমার সঙ্গে যুক্তি করে তো করে নি, কোথায় এখন খুঁজে বেড়াই?

একটুখানি ভেবে মায়া বলল, এক কাজ করতে পার? শঙ্কর-দাকে তুলে নিয়ে এস। তিনি সমস্ত জানেন, তিনি উপায় করতে পারবেন।

মল্লিকা বলে, তখনই তোমার ডাক পড়ল?

ডাক কি বলছ। দিব্বি আয়েসের ঘুম ঘুমোচ্ছি, জগৎ এসে পিঠের উপর দমাদম ঘুষি চালাতে লাগল। বলে, ওরে হতভাগা, বাবাকে দেখবি তো চলে আয় শিগগির।

মল্লিকা বলে, তারপর?

ভাঁড়ার জগুকাকার হেপাজতে। ভিয়েন-ঘরে চৌকির উপর পড়ে তিনি নাক ডাকাচ্ছিলেন। পৈতেয় বাঁধা চাবির গোছা, সাফাই হাতে সরিয়ে নেওয়া গেল। মিষ্টিমিঠাই প্রায় শেষ, হাঁড়ি তিন-চার মুখে নেকড়া বেঁধে চালির উপর তোলা ফুলশয্যার তত্ত্বের জন্য। তাই থেকে কিছু মায়াকে এনে দিলাম। সযত্নে শ্বশুরের সামনে সে রেকাবি সাজিয়ে দিল।

গল্পে গল্পে জানা গেল, তিন দিন খেজুর-রস আর পুকুরের জল ছাড়া আর কিছু জোটে নি সোমনাথের। কতক্ষণ ধরে কত রকমের কথাবার্তা হল। খালে জোয়ার এল। জেলেদের নৌকা ছাড়বার উদ্যোগ হচ্ছে, তাই সাড়া-শব্দ আসছে। সেই সময় তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মায়া বলল, উঃ, কী কনকনে বাতাস! যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ বললেন, ভারি তো! এর চেয়ে কত ঝড়-বাতাস মাথার উপর দিয়ে গেছে, জান?

কিন্তু কেন যায়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মৃদু হেসে সোমনাথ বলেন, আমার এমনি সব মায়ারানী মা-লক্ষ্মীদের গায়ে যাতে ঝাপটাও কোন দিন না লাগে সেইজন্য।

আমার দিকে তাকিয়ে মায়া বলে, বাইরে কি রকম অন্ধকার, দেখছ শঙ্কর-দা?

সোমনাথ বললেন, সেই তো ভাল মা, আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে দিব্যি চলে যাব, কেউ দেখতে পাবে না।

তিনি চলে গেছেন। তারপর কি হল মায়ার, আর শুতে যায় না, জানালার ধারে বসে রইল সেই বিয়ের কনে। আমি আর জগৎ খাটের উপর বসে আছি, আমাদের বলবার মতো কথা জোগাচ্ছে না। খানিকটা পরে বাইরে চলে এলাম।

পরদিন মায়ার মুশকিলটা একবার বুঝে দেখ মল্লিকা। এই সব ব্যাপারে সমস্ত রাত ঘুম হয় নি—তার উপর মশার উৎপাত, মুখখানা রাঙা করে দিয়েছে। বেচারা যেখানে বসে, সেইখানেই চোখ বুজে ঝিমিয়ে পড়ে। মায়ার মা অর্থাৎ আমার মাসীমা পর্যন্ত মুখ টিপে হেসেছিলেন, আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কিছুই তো খুলে বলা চলে না।

মল্লিকা কিন্তু আমার এসব কথা শুনছিল না, সে খবরের কাগজের একটি টুকরো নিয়ে পড়তে শুরু করেছে:

'গতকল্য জগৎলাল দত্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, হুকুমের পরও তাহার দেহের ওজন বাড়িতেছিল। ফাঁসির পূর্বরাত্রেও সে নাকি অকাতরে ঘুমাইয়াছিল। সকালবেলা জেলের কর্মচারী তাহাকে ডাকিতে গিয়া দেখেন সে তখনো নিদ্রাচ্ছন্ন। অনেক ডাকাডাকির পর সে লজ্জিত স্বরে কহিল, সময় হইয়া গিয়াছে বুঝি? আমার একটু গীতা পড়িয়া লইবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না। আচ্ছা চলুন—

তাড়াতাড়ি সে গেঞ্জি গায়ে দিল। চশমাটি মুছিয়া সে চোখে দিল, তারপর হাসিতে হাসিতে চলিল, যেন নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছে।

অপরাহ্নে জেলের ফটকে বিপুল জনতা হইল। জগৎলালের দূর সম্পর্কের

এক খুড়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে উহা শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। চিতাভস্মের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ঐ রাত্রে নাকি বহু গৃহে অরন্ধন-ব্রত পালিত হইয়াছিল।

জগৎলালের বৃদ্ধ পিতা ও স্ত্রী এখন কাশীধামে আছেন। কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা কলিকাতায় আসেন নাই।

মল্লিকা মন্তব্য করে, বাজে কথা। বয়ে গেছে ওদের খবর দিতে।

আমি নিজেও মায়ার নামে তার করেছিলাম মল্লিকা, যদি দেখাটা হয়। সমস্ত চুকে-বুকে গেল, কেউ এল না। তারপর পেলাম মায়ার এক চিঠি, আমাকে বিশেষ করে যেতে লিখেছে। গিয়ে দেখি, আর এক তাজ্জব।

মল্লিকা বলে, কি?

মায়ার সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ি, হাত-ভরা সোনার চুড়ি ঝিকমিক করছে।

বল কি!

সত্যি কথা।

অস্ফুট স্বরে মল্লিকা বলল, বেহায়া—

কে বেহায়া? মায়া?

মল্লিকা রাগতভাবে বলল, অমন স্বামী—শেষ দেখা দেখতে হল না। তার উপর ঐরকমভাবে অন্তত তোমার সামনে আসতে একটু লজ্জা পাওয়া উচিত্ ছিল।

শুধু মল্লিকা নয়, সবাই তোমরা ঐ এক কথাই বলবে। কি বল ভাই? আচ্ছা, শোন শেষ অবধি।

বাঙালিটোলায় মায়াদের বাসা। গলির গলি, তস্য গলি! টাঙাওয়ালারও ঘণ্টা তিনেক লাগল খুঁজে বের করতে। বেলা তখন ন'টা এই রকম হবে। আমায় দেখে সোমনাথ অবাক হয়ে গেলেন। আমিও দেখে চিনতে পারি নে। লোহার শরীর ছিল, শুকিয়ে কঞ্চির মতো হয়ে গেছেন। তামাক খাচ্ছেন আর খকখক করে কাশছেন

হবে না? ঐ তো একমাত্র ছেলে!

আমায় যে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছে, সে কথা মায়া সোমনাথকে জানায় নি। বললাম, আপনার নাকি ভয়ানক অসুখ কাকাবাবু?

সোমনাথ বললেন, তাই লিখেছে বুঝি। বুড়ো ছেলের মা কি-না, অল্পেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু তাকে দেখছি নে যে!

সোমনাথ বললেন, সিংহিদের মেয়েকে সেলাই শেখাতে গেছে। এসে তারপর রান্নাবান্না করবে।

গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, ভাল হয়েছে বাবা, এই ফাঁকে দুটো কথা বলে নিই তোমাকে। আমি বউমাকে কিছু জানতে দিই নি। জানতে পারলে, একেবারে মরে যাবে। সে জানে, জগতের তিন বছরের জেল হয়েছে। তুমি টেলিগ্রাম করেছিলে, আমি তা দিই নি, গাপ করে ফেলেছি।

মল্লিকা সোয়াস্তি পেল। বলে, তাই বল! নইলে জেনে শুনে মেয়েমানুষ ঐ রকম অবস্থায় সেজে-গুজে থাকতে পারে ?

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে সোমনাথ বলে উঠলেন। তারপর ?···শেষ হয়ে গেছে, সে তো জানি। বল দিকি একটু সেই সব কথা। ভাল করে একটা নিশ্বাস ফেলবার সাহস হয় না বাবা, পাছে ধরে ফেলে। যে রকম চালাক মেয়ে বউমা। সিংহিদের মেয়েটার সঙ্গে চলে গেছেন, বল তো এই ফাঁকে।

আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি আর কথা বলতে পারি না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি। সোমনাথ বলেন, কাঁদছ শঙ্কর ? ছিঃ! শোন তবে। আমার বড়দাদার দুই ছেলে, অমল আর কমল। বেকার অবস্থায় তিন বছর ঘুরে অমলের শেষে যক্ষ্মা হল, নিমতলার ঘাটে এখন শান্তি পেয়েছে। আর কমলও মরেছে; লেখাপড়া শিখেছিল কিন্তু ভাত জোটাতে না পেরে গাঁজা-গুলি খেয়ে বেঁচে আছে কোনখানে। আমার জগৎ তো এদের চেয়ে ভাল গেছে।

পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, এই নরম মাটির দেশে আপনার জগতের মতো ছেলে জন্মাল কি করে, তাই ভাবি কাকাবাবু।

সোমনাথ এই সময় ইসারা করতে লাগলেন, যেন আনন্দের আতিশয্যেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। সোমনাথের সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কাহিনী শুনেছো তোমরা, আমি নিজের চোখে এই একটা দেখলাম। মায়া ফিরে এসেছে। সোমনাথ বলতে লাগলেন, আমার কী এমন অসুখ বউমা শঙ্করকে এতটা পথ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলে। অবিশ্যি, একটা সুবিধা হল, জগতের সব খবর ওর নিজের মুখে শোনা যাবে। সেই সব কথাই ও আরম্ভ করেছিল।

মায়ার মুখ মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। বল্লে, কি কথা? কথাবার্তা থাকগে এখন।

আমি বললাম, শান্তিতে আছে সে।

সোমনাথ বলে দিলেন, আর তিন বছর জেল হবার সে খবরটা শুনিয়ে দাও।

মুখস্থ কথার মতো বললাম, রায় বেরিয়েছে—তিন বছরের জেল।

আবার সোমনাথ হেসে উঠলেন: বুঝলে বউমা মোটে তিন বছর। ও তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

মায়াও হাসতে লাগল। বলে, তা ঠিক। তিন বছর আর ক'টা দিন। আপনি অমন কত তিন বছর তো আন্দামানে ছিলেন। তা হলে দেখুন বাবা, আমি গোড়া থেকে বলছি মামলা নিয়ে এতো যে হৈ-চৈ হল—

সোমনাথ বললেন, পর্বতের মূষিক-প্রসব। জজ একবর্ণও বিশ্বাস করল না। রায়ে কি বলেছে শঙ্কর? সেই যে তুমি বলতে যাচ্ছিলে? শঙ্কর খাঁটি খবর রাখে, বউমা।

মায়া বলে, তা তো বটেই। এক দলের ওঁরা। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কতকটা হুকুমের ভাবে বলে, রায়ের কথা পরে হবে দাদা। এতদূর থেকে এলে, আগে কলতলায় চল, গায়ে যে এক ইঞ্চি ধুলো জড়িয়ে গেছে।

কোথায় ধুলো? এসেছি কি এখন? হাত-পা ধুয়ে এসে বসেছি।

মায়া রাগ করে ওঠে। তুমি বড্ড তর্ক কর শঙ্কর-দা। ধুলো রয়েছে, নয়তো কি মিছে কথা বলছি? মাথার চুল অবধি ধুলোয় রাঙা হয়ে গেছে। এস—

কলতলা সামনে, কিন্তু আমাকে মায়া বারান্দা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। বললাম, তোমার শ্বশুর একেবারে অথর্ব হয়ে গেছেন দেখছি, চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না বুঝি?

ভাগ্যিস!

তার মানে?

এ রকম না হলে বাঁচতে পারতাম না। তারপর মায়া অন্য কথা পাড়ল। বলে, কি রকম করে এলে শঙ্কর-দা? উড়ে এলে নাকি?

দিব্যি টাঙায় চড়ে। সিংহিদের বাড়ি না গেলে জানতে পারতে, এক মাইল দূর থেকেও ঝড়ঝড় আওয়াজ পেতে।

মায়া বলে, তুমি আসছ—তোমার চিঠি পেয়েছি, বয়ে গেছে আমার সিংহিদের ওখানে যেতে। বাবাকে ঐ রকম বুঝিয়েছিলাম। সিংহিদের মেয়েটার সঙ্গে তাদের মোটর নিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে এই এতক্ষণ হা-পিত্যেশ বসে—

আমি যে কাশী স্টেশনে নেমে চলে এসেছি।

শেষকালে আমারও তাই মনে হল। তোমার কিন্তু খুব বুদ্ধি শঙ্কর-দা।

কেন?

তোমায় সামাল করে দেব বলে ছুটোছুটি করে স্টেশনে গিয়েছিলাম। কী ভয় যে হয়েছিল তোমাদের মুখোমুখি দেখে, তুমি কিন্তু আন্দাজে বুঝে নিয়েছ।

মায়ার গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। বলতে লাগল, আমি একটা খবরের কাগজ বাড়িতে আনতে দিই নে শঙ্কর-দা, এই গয়না আর শাড়ির বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। হু হু করে বুকের মধ্যে, তবু হাসিমুখে মিথ্যে কথা বলে যাই। বাবা চিরটা কাল কত নির্যাতন সয়েছেন জান তো! যে গিয়েছে সে আর ফিরবে না। কিন্তু খবর শুনলে বাবা কাটা-কবুতরের মতো চোখের সামনে ছটফট করে মারা যাবেন।

রান্নাঘরে বসে চা খাচ্ছি, মায়া রুটি সেঁকছে। বলে, খবরদার শঙ্কর-দা, বাবা যেন ঘুণাক্ষরে কিছু না জানতে পারেন।

না, তা পারবেন না।

তুমি বেশি দিন থেকো না শঙ্কর-দা, কখন হয়তো কথায় কথায় বলে ফেলবে। দু-একদিনের মধ্যে চলে যাও—

যাব। কিন্তু চিঠি লিখে আসলেই বা কেন!

মায়া বলল, সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে চল সারনাথেই যাই। নতুন একটা মন্দির হয়েছে।

আমি বললাম, হাঁ, দেখবার জিনিস বটে! কিন্তু আজকে থাক, আজ বড় ক্লান্ত।

চোখের কোনে দু-ফোঁটা জল জমেছিল, বাঁ-হাতে মুছে ফেলে মায়া বলল, দেখতে নয়, মন্দিরের চাতালটা বড় ঠাণ্ডা। ঐখানে বসে বসে তোমার কাছ থেকে সব শুনব। না কেঁদে কেঁদে আমি যে মরে যাচ্ছি দাদা। তোমায় এইজন্য চিঠি লিখে আনিয়েছি।

বিকেলবেলা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা রওনা হবার তোড়-জোড় করছি, গোলমাল বাধালেন সোমনাথ। বললেন, ভাল হয়েছে। এই গাড়িতে আমি ঘুরে আসি। মন্দির তো উড়ে পালাচ্ছে না বউমা, আর একদিন যেও।

আপনি বেরুবেন?

সোমনাথ বললেন, এক বাঙালি প্রফেসার পাঁচটার সময় চায়ে ডেকেছে, আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনবে বলে। অনেকবার এসে ধরাপাড়া করে গেছে।

মায়ার দিকে একনজর চেয়ে আমি বললাম, তা হলে এই গাড়িতে আপনি চলে যান। আমরা রাস্তা থেকে আর একটা ডেকে নেব।

সোমনাথ হেসে বললেন, তবেই হয়েছে! যা চোরের উপদ্রব, বাড়ি দেখবে

কে ? আর তোমাকেও তো চাই শঙ্কর,—বুড়ো হয়েছি, নিজের উপর কি ভরসা আছে।

বোঝ ব্যাপারটা, সোমনাথের মুখে এই কথা! তাই তো কামনা করি, আর বুড়ো হবার আগেই যেন আমরা মরে যাই। মায়া বিশেষ আপত্তি করল না। তাই হোক শঙ্কর-দা। আমি থাকি বাড়িতে—

শহর ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসে সোমনাথ আমার হাত ধরে নামলেন। বললেন, এবার বল দিকি আমার খোকার কথা—

মুখ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

বললাম, পাঁচটা বাজে যে! প্রফেসার অপেক্ষা করছেন।

ও সব মিথ্যে কথা। খোকার কথা শুনব বলে এসেছি।

বুড়োর বিশীর্ণ গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। স্বদেশি-যুগের সর্বত্যাগী নেতা—তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে ফেরে, তিনি করলেন কি—সেই ধূলিমলিন পথের ধারে আমগাছের শিকড়ের উপর বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। আর কেউ দেখে নি, দেখলাম কেবল আমি।

ফিরবার পথে তিনি বারম্বার সাবধান করে দিলেন বড্ড চালাক মেয়ে আমার বৌমা, খবরদার! সে বেটি বুঝতে পারে নি তো কিছু ?

ঘাড় নেড়ে জবাব দিই, না।

বাড়ি আসতে মায়া জিজ্ঞেস করে, কি রকম মজলিস হল বাবা ?

উৎফুল্ল কণ্ঠে সোমনাথ বললেন, আমি ভেবেছিলাম, এমনি দু-চার জন। মস্ত বড় ব্যাপার—ঘর ভরে গিয়েছিল। তোমার একা একা খুব কষ্ট হয়েছে—না মা ?

মায়া হেসে বলে, একা থাকতে আমার বয়ে গেছে। সিংহি-বাড়ির মেয়েরা এসেছিল—খুব তাস আর কড়াই ভাজা চলল। এই একটু আগে তারা চলে গেছে।

বারান্দায় নিয়ে এসে আমায় চুপি-চুপি বলে, অভিনয়ের এই খোলসগুলো ছেড়ে একটুখানি বেঁচেছিলাম দাদা। কিন্তু যে রকম গল্প করা বাতিক তোমার —কিছু বলে ফেল নি তো ?

—জবাব দিই, না কিচ্ছু না।

সে রাত্রেই কাশী ছেড়ে এলাম।

কুন্তল-দার মৃত্যু

বরানগরের ছাতটিতে যথারীতি আমরা গিয়ে জুটেছিলাম। আস্তিন গুটিয়ে

মাদুরের উপর সশব্দে এক কিল মেরে কুন্তল-দা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিলেন, আর তিন বৎসরে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

এক কোণে মা হাসিমুখে চেয়েছিলেন। কুন্তল-দার মা, আমাদের সকলের মা। মায়ের কোলের কাছটিতে সুরমা। হঠাৎ সুরমা সোজা হয়ে বসে এসরাজে ঝনঝন আঙুল চালাতে শুরু করে। কুন্তল-দা তাড়া দিয়ে ওঠেন, থাম—

মা বললেন, তার চেয়ে তোরাই চেঁচামিচি থামা। আমার মায়ের হাতের বাজনা শুনেছিস কোন দিন?

এটা কি বাজনার সময়?

মা বললেন, কেন নয় শুনি?

কুন্তল-দা বলেন, ঘরে আগুন লেগেছে, সব জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে—

সুরমা খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, ঘরে নয়—গোয়ালে। আওয়াজ আমাদের উপরতলা অবধি গেছে।

হিরণ হাতমুখ নেড়ে আপত্তি জানায়। বলে, গোয়াল মানে? আমরা তবে কি—শোন কুন্তল, উনি আমাদের গরু বলেছেন।

সুরমা বলল, সত্যি সত্যি আমার বুকের মধ্যে কাঁপছিল! না জানি কি ভয়ানক ব্যাপার! একদম ছুটে এসেছি।

অর্থাৎ তুমি একটা ভয়ানক মিথ্যুক। ছুটে এসেছ, এসরাজ হাতে নিয়ে তো?

সুরমা তর্কে হারবার মেয়ে নয়।

এই এসরাজই খাড়া করলে লাঠি হতে পারে।

ব্যঙ্গের সুরে কুন্তল-দা বলেন, তা ঠিক। কিন্তু করবে কে?

তোমরা?

রাগে মুখ লাল করে সুরমা বলে, পারি কি-না পরখ করে দেখেছেন।

করছি, কাছে এস।

তারপর বলা নেই কওয়া নেই, একটা আলপিন তুলে নিয়ে কুন্তল-দা তার সুন্দর শুভ্র আঙুলে ফুটিয়ে দিলেন। মা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, করিস কি, ওরে ডাকাত ছেলে? দেখ দেখি কাণ্ডটা—

কুন্তল-দা বললেন, সামান্য একটা আলপিন, মা। বোমা নয়, মেসিনগান নয়। ইঃ, রক্ত বেরিয়ে গেল দেখছি!

কোথায় রক্ত? সুরমার বিরক্ত মুখ এতক্ষণে স্বচ্ছ হাসিতে ভরে গেছে। কুন্তলদার এরকম পাগলামি আমরা আগেও দেখেছি। এমন গম্ভীর মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে একটি শিশু যেন তাঁর মধ্যে খেলা করে বেড়ায়। সুরমা বলে, রক্ত কোথায় মা গো? রক্ত নয়, মধু।

আচ্ছা, দাও তো মধুর কৌটা কপালে পরিয়ে।

মা রাগ করে ওঠেন, বাহাদুরি কত! তিলক পরে সব জয়যাত্রায় বেরুবি নাকি?

সুরমার টিপ্পনীও সঙ্গে সঙ্গে। গোছাখানেক চুল কেটে দিতে হবে না কুন্তল-দা? মহাবীরদের ধনুকের ছিলা হবে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এ চলবে না কুন্তল-দা। যাই বল, তোমার এ তিলক-টিলক একেবারে সেকেলে।

এতে আমাদের তো কিছু নয় শঙ্কর, এ কেবল ওরই জন্যে। কুন্তল-দার স্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলেন কৌটা পরে কেউ বাঘ-সিংহ হয় না—সে তোমরা জান, সবাই জানে। কিন্তু যে হাতে কৌটা পরিয়ে দেবে সে হাতে এসরাজ ধরতে ওর লজ্জা করবে।

সুরমা জ্বলে উঠল। গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদ কিছু থাকবে না, দেশের মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, এই আপনাদের সাধনা। দেশটাকে মরুভূমি বানাতে চান?

কুন্তল-দা বলেন, আমরা চাই ঐশ্বর্যবান দেশ। সকলে ভাল খাবে, ভাল পরবে। আর তার জন্য পরকাল অবধি অপেক্ষা করতেও বলি নে, মোটে এই তিনটে বছর। আমরা যা বলি, সেই মতো কাজ কর তো সকলে—

সন্ধ্যার পর সুরমা আবার এসেছে। ঘরে কুন্তল-দা। এ সব পরে সুরমার মুখে শুনেছি; তার মুখে শোনা কাহিনী আমি নিজের মতো করে বলে যাচ্ছি। শেষের মাসখানেক ছাড়া মাঝের ব্যাপারে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

মেঝের উপর ছড়ানো ছিল কুন্তল-দার কাপড়-জামা টুকিটাকি জিনিস-পত্রের বাণ্ডিল। একটা টিনের বাক্সে তিনি সমস্তগুলো ভরতি করার চেষ্টায় ছিলেন। সুরমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

এসরাজ ফেলে দিয়েছি—

ওঃ! বলে কুন্তল-দা আবার নিজের কাজে লেগে গেলেন।

সুরমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক দেখে। শেষে বলল, সুচের ছেঁদায় হাতী ঢুকবে না, গায়ের জোর যতই থাক। সরুন।

কুন্তল-দা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আবার সাবধান করে দেন, সমস্ত দরকারি; কিছু যেন বাদ পড়ে না—

সমস্ত? এটা? এটাও? স্তূপের ভিতর থেকে বেরুতে লাগল ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথা-ভাঙা ফাউন্টেন পেন মায় একটা পাখার বাঁট পর্যন্ত।

এ সব-এর মধ্যে এল কি করে ?

এমনি এসে জোটে। সংসারে সব অকেজো কি বাদ দিয়ে চলে যায় ? একটুখানি স্তব্ধ হয়ে সুরমা কুন্তল-দার জবাবের প্রত্যাশা করল। তারপর মুখ তুলে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু আপনি পারেন। আপনার পথে আপনার সঙ্গে ছুটতে গিয়ে যারা পেরে উঠল না, ধুলোর মধ্যে তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলতে আপনার এতটুকুও বাধে না। আপনি তো মানুষ নন।

কুন্তল-দা বলেন, আমি জানোয়ার ?

না পাথর—

তারপর সুরমা প্রশ্ন করে, ভোর, চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

কুন্তল-দা উত্তর দেন না।

সুরমা অধীরভাবে বলতে লাগল, তার মানে—বলবেন না, আমায় বিশ্বাস করে তা বলতে পারেন না! বেশ। ফিরবেন কতদিনে, সেটা বলতে আপত্তি আছে ?

সুরমার উত্তেজনায় কুন্তল-দা মৃদু-মৃদু হাসতে থাকেন। বলেন, আমি তা জানি নাকি ?

আপনি কিছু জানেন না! একটা কথা কেবল চূড়ান্ত করে জেনে রেখেছেন, তিন বছরে দেশ স্বাধীন হবে। আপনার হিসাবে ভুল হয় না!

মাইনে দিয়ে কলেজে পড়েছি, ভুল হলেই হল ? অকস্মাৎ কুন্তল-দার কণ্ঠ অতি মধুর ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। বললেন, কেন আমাদের কথা এত ভাব সুরমা ? ক'টিই বা ছেলে, হয়তো কয়েক হাজার—

সুরমা বলে, কেন ভাবব না ? এই তো, এই মাটিরই মানুষ,—অথচ দেশের পরে অত ভালবাসা কোথা থেকে আসে ? কোথায় পায় এমন মনের জোর ? এদের এক একজন যে এক একটা জাতের নতুন ইতিহাস গড়ে তুলতে পারে! একটু চুপ করে থেকে নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, অথচ ক'জনই বা এদের জানে।

কুন্তল-দা গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, না-ই বা জানল। কিন্তু এদের অত ভালবাসা আজকে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। বোন, মনের চেহারা যে দেখা যায় না—তা হলে দেখতে শান্ত সুস্থ লোক একটাও আজ এত বড় দেশের মধ্যে নেই।

কেউ নেই ?

না। নতুন সূর্য উঠছে, মানুষ চোখ বুজে থাকতে পারে কতক্ষণ?

দু'জন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সুরমা সহসা আনত হয়ে কুন্তল-দার পায়ে প্রণাম করতে যায়। কুন্তল-দা সভয়ে পিছিয়ে গেলেন।

এই দেখ মুশকিল। পাথর বলে গালি দিলে, এবার পাথরের দেবতা বানাতে চাও বুঝি! না—না—না—

তারপর কতদিন গেল, কুন্তল-দার পাত্তা নেই। ইতিমধ্যে সুরমা দু-দুটো পাশ করেছে, একটায় স্কলারশিপও পেয়েছে। বাগবাজারের দিকে এখন নতুন বাড়ি হয়েছে, তারা সেখানে থাকে। মায়ের সঙ্গে তাই ইদানীং বড় একটা দেখা হয় না, তিনি সেই বালি-খসা পুরানো বাড়িতেই থাকেন। ছেলে নেই, কিন্তু মুখে সেই রকম হাসিটি আছে। পরের ছেলে আমরা অনেকে গিয়ে মায়ের ভালবাসা ভাগ করে নিই।

এরই মধ্যে একবার সুরমার মাসিমারা বড় মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় এলেন। মেসোমশায় সাব-রেজিস্ট্রার, কিছুকাল আগে ঢাকার দিকে গাঁয়ে বদলি হয়েছেন। এদের পাড়াতেই বাসা তাঁদের।

সকালবেলা সুরমা এবং মাসিমার মেজ মেয়ে আভা এক সঙ্গে গল্পগুজব করছে; জুতোর ভয়ানক রকম আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখে, এক গোরাসৈন্য ঘরে ঢুকছে। দালানটা আগাগোড়া মার্চ করে এসে সে এক লম্বা মিলিটারি সেলাম দিল।

আভা চেয়ে দেখে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, রাঙাদি ভাই, ভয় পেয়েছিস? বাঘ নয়—বাঘের মাসি, মিউ মিউ করে। আমাদের বিনয়-দা।

ছেলেটির কথা ইতিপূর্বেও হয়েছে তাদের মধ্যে। সে হস্টেলে থাকে, এবার এম. এ. দেবে, আভাদের পারিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আভার মাকে মা বলে ডাকে।

বিনয় অপ্রতিভ হয়ে গেছে। সে ভুল করেছিল; ভেবেছিল, আভা আর তার দিদি হাসি। একটা-কিছু বলে সে পালাবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু আভা ছাড়ে না।

সেলাম দিলে বিনয়-দা, তা সাহেব যে মুখ ফিরিয়ে রইল!

বিনয় বলে, কোথায় সাহেব?

মোটে দেখতেও পাও নি?

সুরমার মুখ লাল হল। এই রকম একটা শলাপরামর্শ চলেছে, সে আন্দাজে বুঝতে পেরেছে। সুরমার বাপ ছেলেটিকে বড্ড পছন্দ করেছেন। কিন্তু এখন এই বিনয়ের সামনে আভাটার কিছু করবার জো নেই কি-না, সে তাই খুব

মজা পেয়ে গেছে। বলে, দেখ তো চারিদিকে খুঁজে, শাড়িটাড়ি জড়িয়ে সাহেব ছদ্মবেশে আছেন কি-না!

বিনয় বলল, সাহেব-টাহেব মানি নে। আমি কারো গোলাম নই।

আভা বলে, এখন না থাক, বাঙালির ছেলে যখন,—হতে তো হবেই। খামোখা মনিব চটিয়ে রেখো না। আর সে তুমি নিজেই বেশ জান! নইলে সেলামের রিহার্সাল দিয়ে রেখেছ কার জন্যে শুনি?

বিনয় চটে যায়। বলে, কাচ আর হীরের তফাৎ বুঝতে বুদ্ধি লাগে বুঝলে? ওকে সাহেব-সেলাম বলে না—আমাদের রেজিমেণ্টে সব চেয়ে নমস্য কেউ এলে—

হাসির চোটে আভা কথা শেষ করতে দিল না। বলে, ঠিক, ঠিক—এ রকম নমস্য আর কে তোমার আছে? কিন্তু এই যাত্রা-দলের পোষাকটা খুলে ফেলে এবার ভদ্রলোক হয়ে এস দিকি!

বিনয় বলে, য়ুনিভার্সিটি ট্রেনিং-কোরের পোশাক—যাত্রার পোশাক বললে প্যাচে পড়বে, জেল হয়ে যেতে পারে। ভোরবেলা ময়দানে যেতে হয়েছিল; এই ফিরছি, রীতিমত প্যারেড হল—

আভা বলে, বাঁশের বন্দুক নিয়ে?

বিনয় রাগ করে বেরিয়ে গেল।

আভার হাসি আরও উচ্ছ্বসিত হয়। বলে, কেমন মানুষ বল রাঙা-দি? একটুতে রেগে যায়—রাগাতে মজা খুব। কিন্তু বুদ্ধি আছে—

এরই পাশাপাশি আজ কুন্তল-দাকে মনে পড়ে। কত ধৈর্য, কত সাহস—কিন্তু রাগাতে একটা মিনিটও লাগে না, তখন মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষটি। হেমন্তের এই স্নিগ্ধ সকালবেলায় হয়তো কোন দূর-দুর্গম গ্রামপ্রান্তে—কোন্ জেলায় জঙ্গলে পাহাড়ের ধারে এখন তাঁরা কি ভাবছেন? কবে উঠবে আকাশে তাঁদের অনেক প্রতীক্ষার নতুন সূর্য, ঘরের ছেলে সব আবার ঘরে আসবেন।

আভারা রইল প্রায় মাস তিনেক। যাবার ক'দিন আগে থেকে সে সুরমাকে বড় ধরে বসল, চল্ না ভাই—রাঙাদি, দিন কতক থেকে আসবি। বড়-দিদি বরের সঙ্গে ছুটল, কার সঙ্গে যে ঝগড়া করব!

আবার তাদের সেই জায়গাটারও অতি চমকপ্রদ বর্ণনা দিতে শুরু করল। ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়েছে প্রকাণ্ড এক খাল। তারই কিনারে ওদের বাসা। জোয়ারের সময় জানালার নিচে জল ছল-ছল করে। ছাত থেকে দেখা যায়,

অনেক দূরে কালো মেঘনা—নৌকা দেখা যায় না, যেন সারবন্দি হাজার হাজার পাল মেঘনার উপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলেছে।

এমনি আরও কত কি! সুরমা চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু বাবার মত পাওয়া যায় না। মা-হারা মেয়েকে তিনি কাছছাড়া হতে দেন না।

কিন্তু বছর দেড়েক পরে সেই বাবাই সদয় হয়ে উঠলেন। বললেন, চল—হরিলাল বার বার লিখছেন যখন, ঘুরেই আসা যাক একবার। আর ঐ রকম খোলা-হাওয়ায় আমার শরীরের উপকার হবে।

সুরমা বলে, শরীরের ভাবনায় তো তোমার ঘুম নেই, বাবা। আসল কথাটা কি? আপদ-বিদায়ের আবার নতুন ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝি?

বাবা বললেন, তা-ই যদি হয় সে-ও তো শরীরের জন্য। বয়স কম হল না. যদি হঠাৎ আজকে চোখ বুজি—

বুঝেছি। আমি তোমার ভার-বোঝা, কাঁধ থেকে না নামিয়ে শান্তি নেই। যেখানে হোক—

বাবা রীতিমত চটে ওঠেন, যেখানে হোক মানে? বিনয় কি যে-সে ছেলে? হাজারে অমন একটা মেলে না। হরিলাল লিখেছেন, তার বাপ-মাও ওখানে। যোগাযোগটা দেখ একবার।

তারপর পাশে বসিয়ে ছোট খুকুটির মতো সুরমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। বললেন, বুঝে দেখ মা. আমার মনেও তো সাধ-বাসনা আছে! তোর মা চলে গেলেন…বাড়ি সেই থেকে অন্ধকার। চুনের কলি ফেরাই নি, দরকারের বেশি একটা আলো জ্বালাই নি কোন দিন।

সুরমার বড় ব্যথার জায়গাটিতে আঘাত পড়ল! বাপের খুশিমুখ দেখার জন্য সে পারে না, এমন কাজ নেই।

ঢাকা থেকে মোটরলঞ্চে ওরা গিয়ে পৌছল। প্রকাণ্ড এক বট-গাছের নিচে ঘাট। লঞ্চের আওয়াজ পেয়ে সবাই ছুটেছে, আভাও এসেছে—সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সুরমা কাছে গিয়ে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। বাসা ঠিক খালের উপর না হলেও কাছাকাছি বটে। এদিকে সেদিকে সেকালের ভাঙাচোরা অট্টালিকা—পাতলা ইটের টুকরো স্তূপাকার হয়ে আছে।

আভার কানে কানে সুরমা বলে, তোদের সোনাগাঁয়ে সোনা নেই, কেবল ঢিল-পাটকেল।

আভা বলে, সোনা কি রাস্তায় ফেলে রাখবার জিনিস?

অনেক দূরে সাদা রঙের একতলা খানকয়েক বাড়ি, সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, সোনা ঐখানে মজুত আছে রাঙা-দি—

ঐটে বাসা ওদের ?

ওটা হল থানা, পিছনে কোয়ার্টার। সোনা পুলিশের হেফাজতে আছে—নিশ্চিন্তে থাকবে ভাই।

তোর বিনয়-দা পুলিশ হয়েছেন ?—সুরমা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

আভা বলে, নতুন বলেই গাঁয়ে আসতে হয়েছে। বাবা বলেছিলেন ওঁর যা বিদ্যেবুদ্ধি—একটু পাকা হলে সদরের মাথা হয়ে উঠবেন, ভাবনার কিছু থাকবে না।

ম্লান হেসে সুরমা বলে, যা বলেছিস আভা! দেশের এ কি হয়েছে আজকাল, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাবনা আর কিছুতেই ঘোচে না। ছেলে নিয়ে বাপের দুশ্চিন্তা …স্ত্রী নিয়ে স্বামীর দুশ্চিন্তা—কে কখন কি করে বসে। তবে হাঁ পুলিশ হলে নিশ্চিন্ত। সেগুনকাঠে ঘুন ধরার জো নেই।

বিকালে এরা খালের ধারে বেড়াত। বেড়াবার মতোই জায়গা। পাকা রাস্তা খালের ধারে ধারে চলে গিয়েছে সেই মেঘনা অবধি। বর্ষার খরস্রোত সুতীব্র ব্রহ্মপুত্রের দিকে একখানা নদী চলেছে—কিনারের শরবন থর-থর করে কাঁপে। ওপারে দিগন্ত-বিসারী ধান আর পাটক্ষেত! যতদূর নজর চলে—সতেজ সবুজ শ্রী।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে তারা অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ভয়ের অবশ্য কারণ নেই, সঙ্গে রামচরণ আছে—পুরানো চাকর, গায়ে বল-শক্তিও খুব। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখে, তেঁতুলতলার জঙ্গলের ধারে বিনয় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে—

আভা আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে ?

কপালে হাত দিয়ে বিনয় বলে, অদৃষ্ট! কি করব বল—খোঁজে খোঁজে আসতে হয়।

সুরমা বলে, কিন্তু মন বলে যে বস্তুটা আছে বিনয়বাবু, তাঁকে তেড়ে ধরতে গেলে বিগড়ে পালায়।

বিনয় জিভ কাটল। সর্বনাশ! আপনার পিছু নিয়েছি, তাই ভাবছেন তা হলে এটির কি দরকার ছিল, বলুন তো ?

কাপড়ের নিচে কোমরে রিভলবার বাঁধা ছিল, সন্তর্পণে খুলে দেখাল। তারপর দুঃখিত স্বরে বলতে লাগল, পুলিশে কাজ নিয়েছি—তাই বোধহয় এবার

এসে অবধি মন ভারি করে আছেন। পুলিশ না হয়ে পাটের মহাজন হলে খুব খুশি হতেন। তবুও আমরা দোষীর সাজা দিই, তাদের মতো নীরিহ নির্দোষ চাষীদের রক্ত শুষে মারি নে—

সুরমা হেসে বলে, না—পাটের মহাজনের উপরও আমার অচলা ভক্তি নেই। কিন্তু এখানে কাউকে তাড়া করে ফিরছেন?

একটু ইতস্তত করে বিনয় বলে, এক-আধটি নয়, আস্ত-একটা দল। আর তারা চোর ছ্যাঁচোড়ও নয়—

স্বদেশি ডাকাত?

বিনয় বলে, ডাকাতির কোন খবর পাওয়া যায় নি, মিথ্যে বদনাম দেব কেন। তবে স্বদেশি বটে—জ্বলন্ত আগুন।

আগ্রহের সুরে সুরমা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ধরা পড়লে তাদের কি ফাঁসি হবে?

বিনয় বলে, আপনি কি ভাবেন বলুন তো? ফাঁসি কি অত সোজা? কোন চার্জ নেই তাদের বিরুদ্ধে।

তবে?

ঐ যে বললাম, ওরা আগুন। কখন খাণ্ডব-দাহন হয়, উপরওয়ালার হুকুমে তাই চোখে-চোখে রাখবার নিয়ম।

এরই দিন পাঁচ-সাত পরে একেবারে এক অসম্ভব কাণ্ড। বিনয়ের মা ভাবী পুত্রবধূকে ভাল করে দেখবেন বুঝি, আভা আর সুরমাকে বাসায় নিমন্ত্রণ করেছেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে খানিকটা রাত হল। এরা সব ফিরে আসছে। আঁধারের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করল, থানাটা কোন দিকে?

রামচরণ সকলের আগে। নিরুৎসুক কণ্ঠে সে জবাব দিল, ডান হাতি চলে যাও বাপু।

আকাশ-ভরা মেঘ, গাঢ় আঁধার। লোকটা হঠাৎ কাশতে শুরু করল। সে কি কাশি, যেন হাপরের আওয়াজ হচ্ছে, পাঁজরার হাড়গুলো এইবার বাঁধন খুলে ছড়িয়ে পড়বে। সুরমার হাতে টর্চ, এক একবার টিপে পথ দেখে নিচ্ছিল—আলো সে লোকটার মুখের উপর ফেলল। এক মুহূর্ত, তারপর আর একবার। বিদ্যুতাহতের মতো সে থমকে দাঁড়াল। আবার আলো ফেলল সেদিকে—

আভা বলে, দাঁড়ালি কেন রাঙা-দি?

লোকটির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুরমা ডাকল, আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা পৌঁছে দেব—

উৎকট কাশির ফাঁকে কোন রকমে লোকটা বলে, আপনারা তো বাঁয়ে ফিরছেন—

দরকার হলে ডাইনেও যাওয়া যাবে। কিন্তু এই ঘুরঘুট্টি আঁধারে আপনি সমস্ত রাত ডাইনে ছুটোছুটি করলেও থানায় পৌঁছবেন মনে করেন ?

সুরমার ব্যগ্রতায় অবাক হয়ে আভা এসে তার হাত ধরল। সুরমা ফিসফিস করে বলে, কুন্তল-দা—

তাদের মধ্যে অনেক গল্প হয়েছে কুন্তল-দার সম্বন্ধে। কুন্তল-দার সঙ্গে চেনা পরিচয় আছে—সমবয়সীর মধ্যে এ একটা কত বড় গর্ব! আভা পিছনে তাকাল। অতি মন্থর পায়ে ছায়ামূর্তিটি আসছে। হঠাৎ কুন্তল-দা বলে ওঠেন, যাচ্ছি বটে, আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে।

সুরমা বলে, থানায় পোলাও কালিয়া সাজিয়ে নিয়ে আছে বুঝি ?

কুন্তল-দা জবাব দেন, তা বলে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করবে না, তা-ও জেনে রাখবেন।

বাড়ি এসে দেখে সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এই রাতে পথের আপদ জুটিয়ে আনায় রামচরণ খুব বিরক্ত হয়েছে। তিক্ত কণ্ঠে বলল যাও ঠাকরুনরা, ঘরে গিয়ে দুয়োর দাওগে। লাটসাহেবকে থানায় তুলে দিয়ে আসি।

আভা বলে, না—বৈঠকখানার পাশের ঘরটা খুলে দে। আর পা ধোয়ার জল নিয়ে আয়।

কুন্তল-দা সুরমাকে চেনেন নি। অন্ধকার রাত্রিবেলা, অনেকদিন দেখা নেই। তা ছাড়া, মানুষটার কাছে তুমি আমি সকলে একেবারে স্রোতের মতো, যতক্ষণ সামনে আছি দেখছেন, আড়াল হলে আর কেউ নই।

আশ্চর্য হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কার বাড়ি এটা ? আপনাদের মতলব কি, এখানে আপনি আটকে রাখতে চান নাকি ?

সুরমা বলে, রাত্রিটা তো বটে ! খিদে পেয়েছে তা কিছু খেয়ে জিরোতে জিরোতেই তো সকাল হবে। অত ভয় কিসের ? কি এমন সোনা-রূপো গায়ে পরে আছেন—

আভার কানে কানে বলে, গায়ে নয়—মনের মধ্যে ওঁর কত সোনা—সোনার পাহাড় রে আভা ! পথের ধুলোয় সত্যি সত্যি এখানে সোনা কুড়িয়ে পেলাম।

দু বোন ছুটোছুটি করে খাবারের যোগাড়ে গেল। কি আর থাকবে এমন সময়—খই আর একটুখানি দুধ। কাঁধের উপর একখানা কোঁচান ধুতি এবং দু-হাতে দুটো বাটি নিয়ে আভা বলে, রাঙা-দি, তুই ভাই জলের গেলাস নিয়ে আয়। দেরি করিস নে—

সুরমার তবু একটু দেরী হল। চোখ-মুখ মুছে শান্ত হয়ে সে ঘরে ঢুকল। বলে, খাওয়া হল, এবার শুয়ে পড়ুন—বিছানা হয়ে গেছে। তারপর তাঁর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমায় কি একেবারে চিনতে পারলেন না, কুন্তল-দা?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুখানি চেয়ে কুন্তল-দার মুখে হাসি ফুটল। সুরমা বলতে লাগল, ঐ গোঁফ-দাড়ি আর উস্কো-খুস্কো পাগলের মত চেহারা, আমি তবু এক নজরে চিনে নিয়েছি।

কুন্তল-দা বললেন, গলা শুনে আমারও চেনা-চেনা লাগছিল হে। তখন তোমার চোখে আলো, আমার চোখে অন্ধকার। তা ছাড়া এই রকম জায়গায় এই অবস্থায়···কথাটা বোঝ একবার—চলে এসেছি, সে-ও তো কম দিন হল না।

কতদিন? বলুন তো হিসেব করে। এত দুঃখের মধ্যেও সুরমার কণ্ঠে কৌতুকের রেশ বেজে ওঠে। বলে, আপনার তিন বছরের আর কত বাকী কুন্তল-দা?

কুন্তল-দা খাড়া হয়ে বসলেন, বিশীর্ণ মুখের উপরে কোটরাগত চক্ষু দুটি জলজল করে ওঠে। বলেন, তিন না হয় তিরিশ হবে! তাতে কি আসে যায়। আমি মিথ্যা কথা বলছি মনে কর? ঘর-বাড়ি আপন জন ছেড়ে মিথ্যার পিছনে পথে পথে ঘুরছি, আমি বোকা?

সুরমা তাঁর পাশে গিয়ে পিঠের নিচে বালিশ গুঁজে দিল। কপালে মাথায় অতি ধীরে ধীরে সে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, ঘাট মানছি দাদা, আপনার বুদ্ধির জোড়া নেই। এবার লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন দিকি।

আভা বলে, কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করে জেলে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার চেষ্টায় ইস্তফা তা হলে?

আমি যাচ্ছি, সবাই যাবে না। জেলে কটা লোক ধরে? জেলের পাঁচিলে কি মত আটকায়—কোন দেশে কেউ পেরেছে?

আভা তর্ক করে, সত্যি সত্যি যদি এত ভরসা, তবে আপনিই বা যেতে চান কেন শুনি?

ইচ্ছে করে বুঝি! কুন্তল-দার কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হল। বললেন, এতদিনে এত কষ্টের পর একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি, অমনি তোমরা নানা কথা বলবে। দেখ তো, এ শরীরে কি কাজ করা যায়?

রাগ করে গায়ের শতছিন্ন জামাটি খুলে ফেললেন। শীর্ণ দেহ বললে কিছুই বলা হয় না, বীভৎস চেহারা। করুণাকে ছাপিয়ে ঘৃণাই যেন মনের মধ্যে মাথা

তুলতে চায়। কুন্তল-দা বলেন, দেখ তো চেয়ে, টর্চ আছে—ফেলে দেখ। আমি কি ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ছি?

আভা তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল। বলে, দাদা আপনি আমায় চেনেন না। কিন্তু আমি জানি, ফাঁকি আপনি দিতে পারেন না, আপনার মধ্যে একতিল ফাঁকি নেই। আপনি কত বড়—

এ কথায় কুন্তল-দার রাগ থাকে না, হেসে ফেলে বললেন, তা বুঝেছি। এর মধ্যে ও-সমস্ত হয়ে গেছে? সুরমাকে দেখিয়ে বলেন, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করো না ভাই, আমার বড্ড বদনাম রটায়, আমাদের কথা রাতদিন ভাবে।

সুরমা বলে, আপনার যে ভোলবার নন, ভুলি কেমন করে? না ভেবে উপায় কি বলুন? আপনার হয়তো মনে নেই দাদা, আপনি বলেছিলেন, এখানে এই মাটির ধুলোয় ছোট-বড সকলের মধ্যে সুখের বন্যা আসবে, কারও আর দুঃখ থাকবে না। ঘরের ছেলে সব আবার ঘরে আসবে। আমি যে প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে দিন গুনছি।

আবেগে তার কণ্ঠ বুজে আসে। কুন্তল-দা স্তব্ধ নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, সেদিন আসবেই বোন, তার কোন ভুল নেই। একটু হয়তো দেরী হয়ে গেল। আমি দেখব না—কিন্তু তোমরা দেখবে। এই কথাটা নিশ্চিন্ত জেনে রেখো তোমার এই দাদারাই দেশের মধ্যে শেষ দুখীর দল।

রবিবার। সকালবেলা—খুব সকালে সুরমার বাপ আর মেসো বেড়াতে বেরিয়েছেন। ছুটির দিনে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া হয়, কর্তা নিজে কেনা-কাটা করেন, জেলেপাড়া ঘুরে সওদা করে বাড়ি ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে।

দুই বোন ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে দেখে, কুন্তল-দা হাত পা ধুয়ে বারান্দায় এসে বসেছেন। বললেন, খানিকটা চুন আনতে পার ভাই, গা গতর আর আস্ত নেই, খুঁচে খেয়েছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুরমা প্রশ্ন করল কে?

আমারই প্রজাবর্গ, যাদের অধিকারে ভাগ বসিয়েছিলাম। এই আমরা যেমন খোঁচাখুঁচি করি সরকার বাহাদুরকে, এই রকম আর কি! বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বলতে লাগলেন, ঐ সব পাটের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছ ওরই মধ্যে আমার রাজাসন পড়েছিল—একেবারে মেঘনা অবধি একেশ্বর রাজ্য। দিনে বিশ পঁচিশটা জোঁক ছাড়াতে হত, এ ছাড়া আর কোন অসুবিধা ছিল না। তোফা ছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট দেখ—আকাশের দেবতা বাদী হয়ে কিছুতেই টিঁকতে দিল না।

কুন্তল-দার ভঙ্গি দেখে এরাও হেসে ফেলে। সেই পাটের ক্ষেতের গল্প শুরু হল। দুটি বিমুগ্ধ শ্রোতার সামনে কতকাল পরে তিনি প্রাণ খুলে গল্প করছেন, এ যেন আয়ুর প্রান্তে-এসে-পড়া অবসাদগ্রস্ত রোগশীর্ণ আমাদের কুন্তল-দা নন, আর কেউ—

খালের ওপারে এই পাটক্ষেতে যতদূর তাকাও, ক্ষেতের পর ক্ষেত চলেছে। সতেজ পাটচারা জায়গায় জায়গায় একটা কেন দুটো আড়াইটে মানুষকেও ছাড়িয়ে যায়। তারই মধ্যে যেখানে খুশি ঢুকে পড়ে, খানিকটা পাট ভেঙে শুয়ে বসে দিব্যি সারাটা দিন কাটিয়ে দাও। তার পর রাত হলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড—খালে জল রয়েছে, স্বচ্ছন্দে স্নান করতে পার। তালতলায় এ সময়টা দু-একটা পাকা তাল পাওয়া যায়, কপালে থাকলে গ্রামের মধ্যে কারও হেঁসেলে উৎকৃষ্টতর জিনিসও কিছু মিলতে পারে। এর উপর কুন্তল-দার আবার বাবুয়ানা আছে, রাতে রাতে নাবিকেল পাতা কুড়িয়ে দিব্যি এক গদি তৈরী করে ফেলেছেন। ছিল তো চমৎকার, কিন্তু শেষাশেষি বর্ষা বড্ড চেপে পড়ল, নারিকেল পাতা পচে ডাঁটাগুলি কেবল রইল, ক্ষেতের উপর একহাত জল! জ্বর মাস ছয়েক ধরেই চলছিল। শেষে মোটে ছাড়ে না, কাশতে গেলে দলা-দলা রক্ত বেরোয়। এই সব নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে তবেই তিনি থানায় চেপে পড়বার ফিকির বের করেছেন।

কথার মাঝখানে সগর্বে কুন্তল-দা জিজ্ঞাসা করলেন, আনারস খেয়ে থাক তোমরা? বুকে থাবা মেরে বলেন, আমি—আমি খাই—

আভা বলে, এটা তো আনারসের সময় নয়। কলকাতায় মেলে তা, বলে এখানে কি—

হ্যাঁ এখানেও। বদরগঞ্জের হাট তো শনিবারে—গেল শনির আগের শনিতে আনারস খেয়েছি। একটা নয়, একজোড়া—এখনও ঢেকুর উঠছে।

সুরমা বলে, আনারসের লোভে হাটে ঢুকে পড়েছিলেন নাকি?

না হে, লোকে এসে ভেট দিয়ে গেল কিন্তু হাটে ঢোকাই ভাল ছিল দেখছি। আদর করে চাই কি গাড়ি-পালকিতে তুলে আমায় থানা পৌঁছে দিত। তোমাদের খোশামোদ করতে হত না। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলেন, তোমরা উদ্যোগ করছ না। এ ভাল কথা নয়। আমাকে রাখায় বিপদ আছে জান?

সুরমা বলে, রামোঃ, সে বুঝি জানি নে? থানা এই এক্ষুনি এখানে এসে হাজির হবে, দেখবেন। কুন্তল-দার কপালে হাত রেখে বলে, এইবার কিন্তু জ্বরটা একেবারে ছেড়ে গেছে।

কুন্তল-দা বলেন, কিন্তু মায়া ছাড়তে পারবে না, আবার আসবে। সত্যি

সুরমা, আজ কি ভাল লাগছে, কি বলব! তা বলে মরাটাকে আর কেয়ার করি নে। লোকে তো মরে ভূত হয়, আমি জ্যান্ত থাকতেই খুব প্রাকটিস করে নিয়েছি। মরে গেলে কোন রকম অসুবিধা হবে না। তোমাদের চলাফেরা দিনের বেলা, আমি বেড়াতাম রাতের অন্ধকারে। বল, ভূতের সগোত্র হলাম কি-না? আনারস দিয়েছিল তারা ভূতকে, মানুষে চাইলে মানুষ কি সহজে দেয়?

আনারসের কথা বলতে গিয়ে কুন্তল-দা হেসে খুন। কি অন্ধকার তখন! কৃষ্ণপক্ষের রাত, এমনি দিনে তো মজা! কুন্তল-দা পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর ধীর পায়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন···তারপর শ্মশানঘাটের কাছে এলেন। রাস্তায় খানিকটা দূরে চরের কিনারায় শ্মশান। একটা মড়া পুড়ছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাস্তার পাশে উলটে রাখা এক পুরানো নৌকা মেরামতের জন্যে রয়েছে। শ্মশানবৈরাগ্যের মতো একটা কিছু হল বোধ হয়—কুন্তল-দা ঐ নৌকার উপর চুপচাপ বসে মড়া পোড়ানো দেখতে লাগলেন। মানুষজন কেউ নেই এ-দিকটায়, শ্মশানের আমগাছতলায় অনেকে তামাক খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে, সে-সব অল্প অল্প কানে আসছে। হাটুরে লোকও সব চলে গেছে; একটি দল কেবল কি জন্য পিছিয়ে পড়েছিল, তারাই হন-হন করে যাচ্ছিল। চিতা দেখে একজন বলে, ও মুচিপাড়ার আমদানি; পাড়াটা সাফ হয়ে গেল গো! ওলাবিবি রোজ তিন-চারটে করে নিচ্ছেন!

আর একজন বলে, গুনে দেখ্‌তো রে—মানুষ আমাদের ভিতর যেন কম হয়ে যাচ্ছে।

যেন বাড়ে না, সেইটে ভাল করে নজর রাখিস। মাঝে মাঝে ওরাই আবার পেছু নেন কি-না।

তারপর খুব একটা উদ্বিগ্ন স্বর। সত্যি, মিলছে না তো! মানুষ এগার জন। তিনবার গোনা হল।

তাই তো, তাই তো! বেশ খানিকটা গোলমাল উঠল। শেষে একজন বলল, বোকারা নিজেকে বাদ দিয়ে সব গুনছিস যে!

কিন্তু তা সত্ত্বেও রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। কুন্তল-দা অন্ধকারে না দেখেও শব্দ-সাড়ায় টের পাচ্ছেন, এ-ওর পাশ কাটিয়ে আগে যেতে চাচ্ছে, শ্মশানের এইখানটায় কেউ পিছনে থাকবে না। কুন্তল-দার ছেলেমানুষি চাড়া দিয়ে উঠল, তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে খুব। নাকিসুরে বলেন, এই আমায় কিছু দিয়ে যাঁ। আমি খাঁব।

আর যায় কোথায়, তুমুল চিৎকার!···কে কার ঘাড়ে পড়ে, কাঁধের

ধামা-ঝুড়ি কতকগুলো ঠিকরে পড়ল। শ্মশানে মড়া পোড়াচ্ছিল, সেই লোকগুলো 'কি' 'কি'—বলতে বলতে এই দিকে ছুটল।

নাঃ, থাকতে দিল না আর। নৌকা থেকে লাফিয়ে কুন্তল-দা দৌড় দিলেন। পায়ে ঠেকল আনারস, অকালের ফল, কে আশা করে কিনেছিল। সেদিন পাটক্ষেতের ভিতর নারিকেল পাতার গদিতে বসে সোমারোহে আনারস ভোজ চলল।

বিনয় এসে বলে, আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? রামচরণ বলল, কি নাকি বড্ড জরুরী ব্যাপার।

সুরমা বলে, এই আমার দাদা। আলাপ করিয়ে দেব।

বিনয় হাসিমুখে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়।

সুরমা বলে,—না—সেই যে অতি-নমস্তের জন্য আপনাদের একরকম মিলিটারি-স্যালুট আছে—আমার দাদা কি সাধারণ মানুষ?

কুন্তল-দা রাগ করে ওঠেন, আবার?

বিনয় চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে। কুন্তল-দা বলেন, বিশ্বাস করবেন না—ও-সব নিন্দুকের কথা, সামান্য মানুষ ছাড়া আর কি। আমি কুন্তল সরকার, ধরা দেবার জন্য ছটফট করে বেড়াচ্ছি।

বিনয় বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে। তারপর হেসে বলে, তাই যদি হয়—ভাগ্যে আমার পদোন্নতি আছে দেখছি।

আভা থাকতে পারে না, বিনয়ের কানে বলে, খুব—খু-উ-ব! বেশ হিসেব করে সমঝে চল দিকি, রাঙা-দির খোপাসুদ্ধ মাথাটা গড়াতে গড়াতে তোমার শ্রীপদযুগলের গিয়ে পড়বে।

বিনয় বলতে লাগল, কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না। কুন্তল-দা—আপনার এ রকম সুবুদ্ধি—অনুতাপ নাকি?

অনুতাপ? রুগ্ন অশক্ত কুন্তল-দার চোখ জ্বলে ওঠে। বলেন, পাপ করলে অনুতাপ আসে, পাপ তো করিনি।

প্রবল কাশি এসে কথা আটকে যায়। সুরমা ছুটে এসে বাতাস করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে কাশি থামল, তখন তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

সুরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, বিনয়বাবু, দাদা আমার বিশ্রাম নিতে চান। কাল তো আপনি কলকাতা যাচ্ছেন, ওঁকে নিয়ে যান। তাহলে নির্বিঘ্নে যেতে পারেন। এ আপনি সহজে পারবেন।

বিনয় সভয়ে বলে, বাপরে!

পারেন না?

বিনয় বলে, পারি, কিন্তু উচিত হবে না। আর ইনি নিজেই যখন জেলে যেতে প্রস্তুত—

সুরমা রাগ করে বলে, কিন্তু আমরা তো নই।

রাগ দেখে কুন্তল-দা হাসতে লাগলেন। শান্তকণ্ঠে বলেন, এই দেখ বোন, মিছেমিছি ঝগড়া বাধাচ্ছ! একটা-দুটো কুন্তলের জন্য ব্যস্ত হবার দিন কি আছে? বীরপূজা ততদিন চলে, যখন এক-একটা মানুষকে আলাদা করে বেদির উপর তোলা যায়। এ রকম কুন্তল সরকার এখন ঘরে ঘরে। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

বিনয়ের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, অনেক ভেবেচিন্তে এই মতলব করা গেছে বিনয়বাবু। অকেজো হয়ে গেছি, এবার সরকার বাহাদুরের ঘাড়ে চেপে পড়াই ভালো। খেয়েদেয়ে ফুর্তি করে দিন কটা দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

সুরমার রাগ বেড়ে যায়। জেলখানা পিঁজরাপোল নাকি?

কুন্তল-দা বলেন, ঠিক তাই। যে গরু লাঙ্গল বয় না, কোন দিনই বইতে পারবে না, তাকে পিঁজরাপোলে দিতে হয়। এই রোগা দেহটা নিয়ে আমি অপরের কাঁধে চেপে থাকি কোন্ লজ্জায় বল তো বোন?

সুরমা বলল, বিনয়বাবু আপনার উপরওয়ালারা গোটা মানুষটিকে চাচ্ছেন—শুধু ঐ হাড় কখানা নিশ্চয় নয়। তা ছাড়া, আপনি তো বলেছেন, এঁদের উপর চার্জ কিছু নেই।

তা বটে! বিনয় চুপ করে ভাবতে লাগল। শেষে বলে, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।

সুরমা বলে, আপনিও বুঝে দেখুন। বরানগরে ওঁর মা রয়েছেন। আমরাও ফিরে যাচ্ছি, আর কদ্দিন থাকব এখানে! আরও ভাই-বন্ধুরা আছেন। কুন্তল-দার জন্য না হলেও, উনিও এক মায়ের এক ছেলে—মায়ের কথা ভাবতে হবে তো!

বিনয় বলল, তাই ঠিক রইল। আপনি যখন বলছেন।

বিনয় চলে গেলে কুন্তল-দা বললেন, শেষ পর্যন্ত ঘরেই পাঠালে?…এখনও জ্বর এল না; আজ খাসা লাগছে। আজকাল এসরাজ বাজিয়ে থাক সুরমা?

কেন বাজাব না? আপনার ভয়ে নাকি। দিন-রাতই বাজাই।

কুন্তল-দা আপন মনে হাসতে লাগলেন। বলেন, সুরমা, একদিন তোমার আঙুলে আলপিন ফুটিয়েছিলাম। কি পাগলই ছিলাম তখন! সে সমস্ত ভুলে গেছ, না?

হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলেছি বৈ-কি! একি আপনারা যে, কাঁটার দাগ চিরজীবনে মিলায় না?

সুরমার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল, সে মুখ ফেরাল।

কুন্তল-দা আবার জিজ্ঞাসা করেন, বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

কেন যাবে না শুনি? আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির নই।

আভা বলল, হয়নি এখনও, হবে। সাতাশে অগ্রহায়ণ—ঐ বিনয় দাদার সঙ্গে। পাকাপাকি হয়ে যায়নি অবিশ্যি।

কুন্তল-দা ভয়ানক খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, বেশ, বেশ। আমাকে নেমন্তন্ন করো কিন্তু। কলকাতায় হবে নিশ্চয়। সন্দেশ, রসগোল্লা, চপ, কাটলেট—কতদিন খাই নি ওসব।

সুরমা সামলাতে পারল না, ছুটে পালায়।

সেই পুরানো ঘর, পুরানো তক্তাপোশ, গলির ধারে পুরানো জানলাটি। আমরা সবাই আবার জুটেছি। হিরণ, আকবর আলি, নবীন—সকলে আসে। সুরমাও রোজ অন্তত একটিবার এসে দেখে যায়।

সকালবেলা কেউ নেই, একলা আমি মাথার কাছে বসে বাতাস করছিলাম। কুন্তল-দা বাইরের দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন। মৃদু পায়ে এসে ঘরে ঢুকল সুরমা।

এসো বোন, এসো…মানুষ না দেখলে ভাল লাগে না। কোথায় যাব, মানুষ সেখানে আছে কি না আছে, তাই ভাবি। উঁহু, বিছানার উপর নয়, চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।

সুরমা নতমুখে, আমি যে নেমন্তন্ন করতে এলাম।

তা বটে…সাতাশে এসে পড়েছে। আমার ক্যালেণ্ডারের পাতাটা ছেঁড়া হয়নি। প্রজাপতি মার্কা চিঠি আরও দুটো এসেছে। ঐ সাদা বাড়িটায় মেরাপ বাঁধছে, জানলায় বসে দেখি।

হাসিমুখে সুরমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ বোন, তোমরা যেন দল বেঁধে ষড়যন্ত্র করেছ—সাতাশের পর কুমার-কুমারী কেউ আর থাকবে না?

সুরমা বলে, আপনাকে যেতে হবে কিন্তু।

আমি! ডাক্তারে কি বলে শোন নি! বিয়ে-বাড়ি, আত্মীয়-কুটুম্বরা আসবেন, তার মধ্যে তো যাওয়া চলে না। আমি এখান থেকেই আশীর্বাদ করব।

সুরমা বলে, না—বোনের কাছে ভাই যাবেই, আত্মীয় কুটুম্বের অপছন্দ হলে

তাঁরা আসবেন না। আমি সাবধান করে নিয়ে যাব, খুব যত্নে রাখব। দুদিন আগে যেতে হবে আপনাকে।

কুন্তল-দা বললেন, তোমার এসরাজ সেই অবধি পড়ে রয়েছে সুরমা। ধুলোবালি জমে গেছে, নিয়ে যাও। কেন বাজাবে না—কি হয়েছে? বিশেষ এই আমোদের সময়।

ধরা গলায় সুরমা বলে, নিয়ে যাব দাদা, লোক পাঠিয়ে দেব।

তাই দিও। আমার উপর রাগ করে আছ সেই থেকে? আরে, আমি একটা পাগল।

সে যাবার পরে আরও কতক্ষণ এসেন্সের মাদক সৌরভে ঘরের বাতাস মন্থর রইল। মা এসে বললেন, এমন চুপচাপ শুয়ে আছিস কেন বাবা? একটু ঘোরাফেরা করা তো ভাল।

কুন্তল-দা বললেন, ঘুরতে ভাল লাগে না মা।

আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, শঙ্কর, সেই আগেকার মতো ওকে টেনেটুনে চিলব ছাতে নিয়ে বসো না কেন? রাতদিন পড়ে থাকে। দেখে দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

কুন্তল-দা বললেন, অভ্যাস করে নাও মা। ছাতে বসে শলা-পরামর্শ কতকাল ধরে তো হল, এবার বন্ধ হয়ে গেল, ঠেকাতে পারলে না—তুমি না, আমার আর আর ছেলেরা না, ডাক্তারেও নয়।

মা চেয়েছেন তাঁর দিকে, আমিও দেখছি। মুখখানা কী পাংশু দেখাচ্ছে …স্থির প্রভাহীন চোখ দুটি কোন দুর্নিরীক্ষের দিকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

যেন আমাদের কুন্তল-দা চেয়ে দেখছেন, জীবনের অপরূপ বৈচিত্র্য। কত আশা কত আনন্দ মঞ্জরীত ফুলের মতো ধরণীর মাটিতে ঝরে পড়ছে। কত রৌদ্রালোক, মেঘমেদুর আকাশের কত স্বপ্ন মানুষের চোখে! মৃত্যু-পথিক শীতল তুহিনাচ্ছন্ন পথ থেকে ডান হাত তুলে আগামী দিনের সুখী ধরিত্রীকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

সুরমা বিয়েয় নিয়ে যাবে কি, তার দিন তিনেক আগে থেকে কুন্তল-দা একেবারে সংজ্ঞাহীন। ডাক্তার, মা আর আমরা দিনরাত পালা করে কাছে আছি। সন্ধ্যার দিকে একবার কুন্তল-দার জ্ঞান হল। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আছ তোমরা?

সবাই।

সুরমা এসরাজ নিয়ে এসেছে?

কে জবাব দেবে? আজকে বিয়ের দিন, তার কাছে কি খবর পাঠানো যায়? আমার ছ্যাঁৎ করে মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগেকার সেই বিকেলবেলার কথা। আমরা আটজন ছিলাম—আজও সবাই আছে, এসরাজও আছে, সুরমা নেই। কুন্তল-দা চীৎকার করে উঠলেন, সুরমা, আর ইউ দেয়ার? স্পিক।

ঝনঝন এসরাজ বেজে ওঠে। তীরগতিতে আঙুল চালাচ্ছি। আর কখনো বাজাই নি, অনভ্যস্ত আঙুল ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন, তবু বাজাতে হবে। শক্ত শক্ত অনেক কাজ করেছি জীবনে, কিন্তু আজকের এই বাজানো কঠিনতম কর্তব্য। সুরের ঝঙ্কারে ঘর ভরে উঠল। মৃত্যু-পথযাত্রীর বিশীর্ণ মুখে হাসি ফুটে উঠল।

গো অন, গো অন, সুরমা—

শান্ত মুখে মা গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন, সকলে নিঃশব্দে ফাইফরমাশ খাটছে। তারপর গম্ভীর গলায় ডাক্তার বলে উঠলেন, স্টপ—

বাজনা থামালাম।

ডাক্তার বললেন, আর কাজ নেই, আর শুনবেন না ইনি।

তিনি ও ঘরে সাবান নিয়ে হাত ধুতে গেলেন। এসরাজটা খাপে ভরে ধীরে ধীরে কুন্তল-দার মাথার কাছে রাখলাম। ঘরে ম্লানায়মান আলোয় অকস্মাৎ মনে হল, শুধু সুরমাই নয়—আনন্দকিশোর, নিরুপমা, জগৎ দত্ত, হিরণ, রানী—সবাই আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আমরা দলশুদ্ধ এসেছি।

মল্লিকা

মল্লিকার কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি।

স্বদেশী আমলে আমি ছেলেমানুষ, ইস্কুলে পড়ি। বাবা চাকরি ছেড়ে তো ক্ষেপে উঠলেন। সে গল্প গোড়ায় বলেছি। নিশান উড়িয়ে দল বেঁধে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে সভা করতে যেতেন, বক্তৃতা করতেন। বাড়ির কাজকর্ম সব দেখত যদু, জাতে নমঃশূদ্র, আসল কর্তা যেন সে-ই।

একদিন খুব সকালে বাবা আমাকে ডেকে তুললেন। যদু ও বাড়ির আরও অনেকে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। হলদে রঙের এক-এক টুকরো সুতো নিয়ে তিনি সকলের হাতে বেঁধে দিলেন। বললেন, আমার হাতেও তোমরা কেউ বেঁধে দাও। যদু তুমিই দাও। কলমের খোঁচায় ওরা দেশের মাটি ভাগ করেছে, তা বলে মানুষ আমরা কি পৃথক হয়ে যাব?

সারা সকালটা ধরে কোলাকুলি চলে। যদু কিন্তু মোটের উপর খুশি নয়। সে বলে, দেখ বাবু, চাকরি ছেড়ে এই সব তো করে বেড়াচ্ছ, উদিকে

ছিটেফোঁটা যা আছে—আদায়পত্তোর কিছু হচ্ছে না, বিষয় আশয় চুলোয় যাবে কিন্তু। এই সব হাঙ্গামার দরকার কি শুনি ?

বাবা বললেন দরকার নেই ? আচ্ছা বাপু, তো ছাঁচতলায় বেড়া দিয়ে কেউ কেউ যদি দুটো ভাগ করে বলে, এ-দিকটায় তুই থাকবি, ও-দিকটায় মানী থাকবে—চুপ করে থাকতে পারিস ? আমরা ঝগড়া-ঝাটি করি ভাব করি নিজেরা করব—তুমি বাপু কে হে, বাইরে থেকে মাতব্বরি করছ ?

এর অনেক দিন পরে আর কিছু বড় হয়ে বাবার বক্তৃতা শুনেছি। তার এক একটা কথা আজও যেন গান হয়ে কানে বাজে। মানুষের বিজয়-ঘোষণা ···আঘাত-অপমানের মধ্যে মাথা উঁচু করে বেড়ানোর সঙ্কল্প···এমনি ধরনের সব কথা।

তারপর মল্লিকা এল। ষোল-সতের বছরের অজানা-অচেনা মেয়ে—সর্বাঙ্গ রূপ ভরা আর একমুখ হাসি···সে হাসি কারণে অকারণে ঝরনার জলের মতো ঝড়ে পড়ে। নতুন মেয়ে পেয়ে বাবারও বাইরের ঘোরাঘুরি খানিকটা কমে এল।

একবার রাখিবন্ধনের দিন সকাল সকাল স্নান করে আমরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছি।

কই বাবা, রাখি বাঁধবে না ?

বাবা হেসে বললেন, মনে মনে সব বাঁধন পড়েছে—টুকরো দেশ তাই জোড় লেগে গেছে। বাইরের রাখির আর দরকার নেই। একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, ম্যাকলিন সাহেব কুন্তলের কথা শুনে বলেছিল, ফুলের মত নরম দেহ, কিন্তু ভিতরটা যেন ইস্পাত—এই সব ছোকরা এ-দেশে এল কি করে, রায় ? আমি জবাব দিলাম, সাহেব, রয়াল-বেঙ্গল-টাইগারের দেশ এটা—জগতে এদের জুড়ি নেই।

আনন্দে গৌরবে বাবার গৌর মুখখানি জলজল করতে লাগল।

তারপর তিনি গত হলেন। আইন পড়ার নাম করে তখন কলকাতায় আছি। কিন্তু সে ডাহা মিথ্যা। কলেজমুখোই হই নে। মল্লিকার সম্বন্ধে যে নেশা লাগে নি এমন নয়। স্বদেশী করি বলে কি মানুষ নই ? শনিবারে প্রায়ই বাড়ি আসি। আরও সুবিধা হ'ল, আমার উপর একটু বিশেষ কাজের ভার পড়ল, কাজটা আমাদেরই ঐ অঞ্চলে।

আমার ধরন-ধারণ যত্নর ভাল লাগে না। সে কটমট করে তাকায়। কৈফিয়ৎ হিসাবে বলি, যত্ন ভাই, একা একা তুই কদিকে সামলাবি ? আমার তো একটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তাই আসা যাওয়া করছি।

কাটখোট্টা যদু এ-সব কথায় ভোলে না, ঘাড় নেড়ে সোজা জবাব দেয়, না ভাইধন, আমার সুখে কাজ নেই। এ-রকম ইস্কুল-পালাপালি করো না আর; মানুষ হয়ে এসে একেবারে আমায় ছুটি দিও।

কিন্তু আসা বন্ধ করবার জো নেই যখন, যথাসম্ভব তাকে পাশ কাটিয়ে বেড়াই।

একবার সোমবারের দিন সকালবেলা ঠিক ফেরবার মুখে মেঘ করল, ঝড়-জল হওয়া অসম্ভব ছিল না। স্টেশন প্রায় মাইল চারেক পথ—ও রকম অবস্থায় কাপড়চোপড় ভিজে গেলে কলেজে যাওয়া চুলোয় যাক—বড় রকম একটা অসুখ-বিসুখও হতে পারত। কিন্তু যদু এসব বুঝবে না। দুপুরে খাওয়ার সময়টা মুখোমুখি পড়ে গেলাম। যদু বলে, এবারে পুরোপুরি ইস্তফা দিয়ে এলে ভাইধন? তা ভাল—নিজের কাজকর্ম নিজে দেখ গে, আমি সরে পড়ি।

অপরাধীর ভাবে বলি, আচ্ছা, এ অবস্থায় যাই কি করে বুঝে দেখ—

যদু বলে, ও, চিড়িয়াখানায় খাঁচা ভেঙে বাঘ বেরিয়েছে—

বেরিয়ে তার দুটো এসে গাঁয়ে ঢুকছে। তুই সেই সকাল থেকে তক্কে তক্কে আছিস, আর ওদিকে ঘরের মধ্যে আর এক নম্বর তিনি ওৎ পেতে রয়েছেন।

যদুর মুখ হাসিতে ভরে যায়। তবেই দেখ ভাইধন, আমার একরত্তি ঐ বউঠাকরুনের—খালি বিদ্যে নয়, বুদ্ধিও কত! বুকের উপর থাবা দিয়ে সগর্বে বলে, আমি—এই আমি খুঁজে পেতে এনেছিলাম, ঠাকুর আমার মান রেখেছেন।

তোর আর তোর বউঠাকরুনের জ্বালায় আমি দেশান্তরী হয়ে যাব, মোটে বাড়ি আসব না।

যদু ভয় পায় না, মহানন্দে বলে, সেই তো! বাপের বেটা হও ভাইধন। কর্তাই বা ক-দিন বাড়ি থাকতেন! কত বিদ্যে শিখেছিলেন, শেষকালে তাই তো মানুষ কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে এসে কথা শোনাবার জন্য ধরে নিয়ে যেত। হুঁ-হুঁ—বাড়ি থাকলে তোমাকে সেরেস্তায় বসতে হবে, হাটবাজার করতে হবে—

এই সময় এক কাণ্ড হয়ে গেল। যদুর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। দিন দশেক ভুগে সবে ভাত খেয়েছে। ফসল কাটার সময়, নিতান্ত না দেখলে নয়—মাঠের দিকে যাচ্ছিল সেইসব তদারক করতে। থানার উপর দিয়ে রাস্তা। দেখে, গোকুল মোড়ল আর তার ভাইপো শুকনো মুখে বসে আছে; সামনে চেয়ারের উপর দারোগাবাবু। একটা কথা কাটাকাটি চলছিল। গোকুল সম্পর্কে তার পিসতুত ভাইরাভাই—ভাব-সাবও আছে। হাত নেড়ে গোকুল তাকে ডাকল। যদু বারান্দায় উঠে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, সকালবেলা পীঠস্থানে—কি হয়েছে রে?

গোকুল বলে, কাল রাত্রে আমার সর্বস্ব চুরি গেছে। দক্ষিণের ঘরে সিঁদ কেটেছে, আবার রান্নাঘরেরও হাত-দেড়েক বেড়া খসিয়ে ফেলেচে—পিতল-কাঁসা ঘরে এক টুকরো নেই। আজকে কলার পাতায় ভাত খেতে হবে।

দারোগা ঘাড় নেড়ে বললেন, যা-ই বল মোড়লের পো, হিসেব করে দেখলাম পাঁচটা টাকার কম কিছুতেই হয় না। এখন না পার, বরঞ্চ দুপুরের ইদিকে জমা দিয়ে যেও—নির্ভাবনায় যাও, সন্ধ্যা নাগাদ আমরা গিয়ে হাজির হব।

গোকুলের চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো হল। হুজুর, বিশ্বাস করছেন না—কি আর বলি! ঘরের একটা তামার পয়সা অবধি রেখে যায় নি।

যদুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, এই এজাহার দিতে এসে বড্ড মুশকিলে পড়লাম! দারোগাবাবু নিজে না গেলে কিছুতে হবে না, অথচ কোথায় তার পালকি-ভাড়া, কোথায় কনেস্টেবলের বারবরদারি—এত টাকা এখন পাই কোথায়?

বাবার সঙ্গে যদু ঝগড়া করত, তবু তাঁরই ভাতে মানুষ। কে জানত তলে তলে তাঁর বিদ্যা সে আয়ত্ত করেছে! যদুর মুখ কালো হয়ে উঠল, উগ্রকণ্ঠে বলে, কেন, তোমার গরু-বাছুর নেই গোকুল?

দারোগার দিকে তাকিয়ে বলে, সে তো ঠিক কথা! চোরেরা এত সমস্ত নিয়ে গেল, আর হুজুরের বেলায় ফক্কিকার! উনি না গেলে হবে কি করে? গরু বন্ধক দিয়ে রাহা-খরচের যোগাড় করগে—

দারোগা আগুন হয়ে উঠলেন। তুমি কে হে ফাজলামি করতে এসেছ? বেরোও—এই মহাদেব সিং, নিকাল দেও উসকো—

যদু উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, আমরাই যাচ্ছি। সোজা সদরে চলে যাব, সে পথ চিনি। চল ভাই, বন্দেমাতরম্—

দারোগা হাঁকলেন, সদরে আমরা পাঠাব। তোদের চিনে যেতে হবে না। পাকড়ো—

দুপুরের পর গোকুল এসে চুপি চুপি মল্লিকাকে বলে গেল, যদুকে নিদারুণ মার মেরেছে, মেরে এখন অতুল ডাক্তারের উঠানে দেবদারু গাছে বেঁধে রেখেছে।

অতুল ডাক্তারের বাড়ি থানার লাগোয়া। ডাক্তারের সঙ্গে দারোগার গলায় গলায় ভাব এবং কু-লোকে রটনা করে, ভালবাসাটা নিতান্ত নিষ্কামও নয়। মল্লিকা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায়। পাড়ার দু-চার জনের চেষ্টায় সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হল। মল্লিকা চাদরে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে থানায় চলল, সঙ্গে যদুর মেয়ে মানী আর এক জ্ঞাতি-ভাসুরের ছেলে। আসামীকে তখন গারদঘরে রাখা হয়েছে। পিছনে উত্তরের রোয়াকে মল্লিকারা বসল।

হাতকড়ি লাগানো যদুর চেহারা দেখে মল্লিকার চোখে জল আসে।

এ কি করে বসলে মোড়ল-দা?

স্বর্গীয় কর্তার কথাগুলোই যদু মুখস্থের মতো বলে যায়।

কেন, অন্যায়টা কিসের? বন্দেমাতরম্ বলেছি, মাকে ডেকেছি—ছেলের মুখ চেপে ধরে মাকে ডাকতে দেবে না, এ আমরা মানব কেন?

দফাদার করালীচরণ এই গ্রামের বাসিন্দা, আমাদের সদর-পুকুরের ধারে বাড়ি। তাকে ডাকিয়ে এনে মল্লিকা বলে, মোড়ল-দাদাকে এবার ছেড়ে দাও। সবে জ্বর থেকে উঠেছে, দুর্বল শরীর—তার উপর দুপুরে কিছু খায় নি—

করালী বলে, দেমাক করে খায় নি। চিঁড়ে দেওয়া হল, তা ছড়িয়ে ফেলল। বুঝে দেখ তো মা. থানার পরে এসে হল্লা করে—ওর সাহসটা কি! বড়বাবু ওকে সদরে চালান দেবেন। দিন কতক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মল্লিকা আশ্চর্য হয়ে বলে, বন্দেমাতরমের জন্য জেল?

করালী হেসে ওঠে।

কি জানি, কি জন্যে! তুমি মা, ঘরে যাও—ওকে ছাড়া হবে না।

যদুও বলে, ঘরে যাও বউঠাকরুন। এরা কি সহজে ছাড়বার লোক? দুপুরে কতকগুলো সাক্ষি এনে কি-সব তালিম দিচ্ছিল—একটু একটু কানে গেল। আমি নাকি ভয়ানক ভয়ানক কাজ করেছি। তুমি ভাইধনকে চিঠি লিখে দিও। মাস পাঁচ-ছয় পরেই আসছি—ভাবনা নেই। মল্লিকা চোখ মুছে বলে, সদর তো দশ-বারো ক্রোশ পথ। মোড়ল-দাদু এই রোগা শরীরে যাবে কিসে?

করালী হাসতে লাগল। বলে, আসামীর জন্যে কি পক্ষিরাজের বন্দোবস্ত হবে? এই—জোছনা উঠলে রওনা হবে, সঙ্গে চার-পাঁচ জন কনস্টেবল থাকবে, পৌঁছুতে দুপুরও লাগবে না। দারোগাবাবু সকাল বেলা পালকিতে রওনা হবেন, বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

মল্লিকা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমার মোড়ল-দাদুও পালকিতে যাবে।

করলী দাঁত বের করে হাসে। বলে, ষোল বেহারার?

তা দূরের পথ—বেহারা কিছু বেশী চাই বই কি।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে করালী হাসির জের টানতে সাহস পায় না। বলে, আচ্ছা মা দারোগাবাবুকে বলিগে—

হ্যাঁ বলোগে। রোগা মানুষকে বার কোশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলে হাড়

ক'খানাও আস্ত থাকবে না। সে হবে না। তুমি বল পালকির খরচা আমরাই দেব।

রাত্রিবেলা থানা থেকে খবর এল, পালকির সম্বন্ধে দারোগাবাবুর আপত্তি নেই, সকালেই রওনা হয়ে যাবে। তবে বারোটা বেহারার দরুন চব্বিশ টাকা এক্ষুণি পাঠিয়ে দেওয়া চাই।

পাড়াগাঁয়ে যখন-তখন অত টাকা মেলে না। মল্লিকা হাতের একগাছা বালা খুলে যদুর মেয়ের হাতে দিল। বলে, পোদ্দারের দোকানে ছুটে যা মানী, বন্ধক দিয়ে, বিক্রী করে, যে ভাবে হোক—টাকা নিয়ে আয়।

বালা হাতে মানী ইতস্তত করে। মল্লিকা তাড়া দিয়ে ওঠে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি, মানুষের চেয়ে কি গয়না বড ?

তা অবশ্য নয় এবং বালা নিয়ে মানী চলেও গেল। তবু মল্লিকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুস্থির হতে পারে না। এই বালা তার শাশুড়ী হাতে পরতেন, সেকেলে জিনিস। শাশুডীকে সে চোখে দেখে নি—তিনি চিতায় উঠলে কর্তা খুলে রেখেছিলেন, মল্লিকা এলে তাকে পরিয়ে দেন। আবার সে যেদিন চিতায় উঠবে, হয়তো আর একজন সজল চোখে খুলে রেখে দিত। কিন্তু সে তো হল না—

আমার কাছে মল্লিকা চিঠি লিখল। সব কথাই খুলে লিখেছিল। তিন দিনের দিন বাড়ি এসে পৌছলাম।

হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে মল্লিকা বলে, দেখ তুমি রাগ করবে। ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসলাম, সব লিখেছি—সেইটে কেবল লিখি নি।

কি ?

মল্লিকা বাঁ-হাতখানা উঁচু করে দেখাল।

হাসিমুখে বলি, গয়নার শোক লেগেছে ?

অশ্রুজড়িত স্বরে মল্লিকা বলে, এ যে আমার হীরে-মাণিক-কোহিনুরের চেয়ে বেশি ! তুমি তো জান···আচ্ছা, অন্যায় হয় নি আমার ?

নিশ্চয়, এক-শ বার—

মল্লিকা এতটুকু হয়ে যায়, বলে, বাবা বেঁচে থাকলে কত দুঃখ করতেন তিনি।

বাবার কথা উঠলে গর্বে বুক ভরে যায়। স্বাধীনতা আমরা অনেক কাল হারিয়েছি, কিন্তু মনে মনে আজও মরি নি—সে কেবল ঐ নমস্যেরা প্রাণের আগুন পুরুষ থেকে পুরুষান্তর জালিয়ে যাচ্ছেন বলে। বললাম, বাবা যা মানুষ —হয়তো বলতেন, বউমা, এ তুমি কি করেছ !—মানুষের হাতে হলদে রাখি

পরিয়ে বেড়াতাম, তুমি যে একটা হাতের বালা খুলে এক সঙ্গে হাজার মানুষের মনের উপরে রাখি পরিয়ে দিলে।

মল্লিকা লজ্জিত হয় একটু। বলে, এই দেখ তোমার কানেও গেছে তা হলে। সত্যি, এই অঞ্চল জুড়ে আমি মা হয়ে বসেছি।

তাই তো বলছি, ঘোরতর অন্যায়। আমি বেচারা কিছু খবর রাখি নে, কলকাতায় বসে পেনাল কোড মুখস্থ করে মরি। এখন পথ চলতে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ঐ মল্লিকা-মায়ের স্বামী যাচ্ছে। এতে ইজ্জত থাকে?

মল্লিকা ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে। বেশ হয়েছে—এতকাল তোমরা মাথায় চড়ে থাকতে, এখন থেকে আমার নামে তোমার পরিচয়।

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, ইজ্জত আমি বজায় রাখবই।

কি করবে?

একলা তোমায় দেমাক করতে দেব বুঝি! আমিও পাশে পাশে থাকব। হাজার মানুষের মধ্যেই এখন থেকে আমার কাজ।

আদর করে তাকে কাছে টেনে আনলাম। বলি, বাবার ঐ ছবির সামনে যেমন ছোট্ট এতটুকু তুমি এই আমার বুকের মধ্যে রয়েছ, তেমনি থাকবে রোজ —চিরকাল—বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া অবধি। লোকে বললে—নীলকান্ত রায়ের ছেলে ঐ শঙ্কর, রায়-বাড়ির বউ ঐ মল্লিকা···কেমন? বাবার কাজ—এখানকার সকল মানুষের কাজ আর আমি একা নই—দু-জনে মিলে করব আমরা।

মল্লিকা তদ্গত চোখের ছবির দিকে চেয়ে থাকে, তার পর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে আসে। দেখ কাণ্ড, মেয়েরা এত অল্পে অভিভূত হয়ে পড়ে।

তাকে ধরে ফেললাম।

রাগে রাগে থানায় গিয়ে উঠি। দারোগাকে বললাম, আপনি নতুন এসেছেন, জানেন না। যদু মোড়ল আমার বাড়ি থাকে, ওর বাপও আমাদের কাজ করত—

দারোগা আপ্যায়ন করে বসালেন। বলেন, এসে পড়েছেন—বেশ হয়েছে মশাই। আমাদেরই বা গণ্ডগোলের গরজ কি? তবে এ-ও বলি, ছাইভস্ম কেস—এতদূর কি গড়াত? কথায় বলে স্ত্রী-বুদ্ধি···তাঁরা পালকি-বেহারার টাকা যোগাতে পারলেন, কিন্তু কনস্টেবলগুলোর দরুন কিছু ধরে দিলে তখনই যে খতম হয়ে যেত। ওর আধা খরচও লাগত না মশাই।

ব্যাপারটা কি বলুন তো?

দারোগা বললেন, পিঁপড়েগুলোর পাখনা উঠেছে, দেখেন নি! থানায় এসে চেঁচিয়ে গেল। সরকারী অফিস—সরকার এ-সব শায়েস্তা করতে জানে, করবেও। কিন্তু ছোটলোকে এই রকম বাড় বাড়লে ভদ্রলোকেরা টিঁকবেন কি করে, ভাবুন তো! আরে মশাই নিচু হয়ে না-ই যদি থাকবে তো ভগবানকে বলে-কয়ে আমার আপনার মতো বামুন হয়ে জন্মাল না কেন?

বললাম, আপনার কাছে ভাগবত-ভাষ্য শুনতে আসি নি দারোগাবাবু। নীলকান্ত রায়ের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। আপনাদের নেকনজর তো ছিলই, তার উপর খাওয়া-ছোঁয়ার বাচবিচার নেই বলে সমাজেও তিনি পাঁচ বছর একঘরে হয়েছিলেন। আমি তাঁর ছেলে—যদু চাকর নয়, আমার বড় ভাই।

তা না হলে এই রকম কাঁধে চড়ে বসে! আপনারা দেশটা ডোবাবেন।

রূঢ়কণ্ঠে বলি, আজ্ঞে না, আপনারাই। শুধু দেশ নয়, বৃটিশ সরকারের সেবা করছেন, তাদেরও। সোজা কথায় বলি, পান-টান খাওয়ার সিকি পয়সা প্রত্যাশা করবেন না—মিথ্যে মামলা তুলে নিন।

দারোগা চটে উঠলেন। মিথ্যে কি রকম? ডাক্তারবাবুর গাছ থেকে চুরি করে নারকেল পাড়ে নি?

না। তার কারণ অতুল ডাক্তারের নারকেলগাছই নেই।

আছে না আছে, সে বিচার কোর্ট করবে।

তা করবে। আপাতত আমিও কিছু করে যাই। দারোগার গলায় ছিল কম্ফর্টার জড়ানো, রাগের মাথায় কম্ফর্টার ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে তারপর ছেড়ে দিয়ে এলাম। মাছি মেরে লাভটা কি।

তারপর হুলুস্থূল কাণ্ড। যদু ছাড়া পেল, কিন্তু স্বদেশি ব্যাপারে বাবার সুনাম এবং তার সঙ্গে এই ঘটনা যোগ হয়ে নানা দফায় সেবার আমার মোট দেড় বছর জেল হয়ে গেল। সে-আমলের খবরের কাগজে এ-সব কথা উঠেছিল, একটা কাগজে এক মল্লিকার নামেই দেড় কলম লেখা বেরুল—'মল্লিকা-কুসুমের মতো যিনি স্নিগ্ধ সৌরভে গৃহকোণ আমোদিত করিতেন, হতভাগ্য সন্তানবর্গের কল্যাণকল্পে তিনি আজ স্বদেশ-গগনে সবিতৃরূপ সমুদিত হইয়াছে, এইবার নব-প্রভাতের অভ্যুদয় হইতে চলিল'…ইত্যাদি। মোটের উপর সমস্ত মিলে ব্যাপার এমন গড়াল, যে বেহারারা যদুর পালকি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা একদিন এসে পাই-পয়সা অবধি ভাড়া ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সকলের যুক্তি-পরামর্শে বালা বিক্রির টাকায় রায়বাড়ির মণ্ডপে একটা নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হয়। কুন্তল-দার ছাতে যেমন আমরা আড্ডা জমাতাম কতকটা তাই আর কি!

চাষীরা সন্ধ্যার পর বই-সেলেট নিয়ে আসে। মল্লিকা এইসব নিয়ে যেন পাগল হয়ে উঠল। ছোট ছেলেমেয়েদের সে নিজে পড়ায়।

জেল থেকে বেরুবার দিন ছেলেরা যথারীতি ফুলের মালা নিয়ে ফটকে বসে আছে, ভিড় ঠেলে মল্লিকা আর যদু এগোবার ভরসা পায় না। দুটো দিন যে বাড়িতে স্থির হয়ে থাকব, তার ফুরসৎ দেয় না তারা ; এখানে সমিতি, ওখানে বৈঠক—নিশ্বাস ফেলতে পারি নে।···আবার পুলিশে ধরে, যথারীতি মামলা-মোকদ্দমার পর জেল। শেষাশেষি আর কোর্টের দরকার হয় না, সোজা ডিটেনশন ক্যাম্পে চালান হয়ে যাই। কুন্তল-দার দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এখন আর এ কথা গোপন ছিল না।

তখন বীরভূমের এক গ্রামে থাকতে দিয়েছিল। পুলিশ দুবেলা এসে তদারক করে যেত। গ্রামের লোক দস্তুরমতো হিংসা করত আমাকে। কাজকর্ম নেই, খাওয়া দাওয়া তোফা চলছে, সব সময় ধোপদুরস্ত কাপড়। মাঝে মাঝে বাজারে যাই সওদা করতে। মাছওয়ালাকে দর জিজ্ঞাসা করলে সে যদি বলে বারো আনা, ঝনাৎ করে পুরো টাকাটা ফেলে দিয়ে মাছ তুলে নিই। সে অবাক হয়ে থাকে।

একদিন লোকটা চুপিচুপি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করলে এই রকম বন্দীবাবু হওয়া যায়—বলুন তো বাবু ? অনেকখানি বিদ্যে শিখতে হয়—না ?

বাড়ির চিঠি আসে মাঝে মাঝে। মল্লিকা নিজের কথা কিছু লেখে না—তা ছাড়া সকল খবরই দেয়। মানীর বিয়ে হয়ে গেছে, জামাইটি লেখাপড়াও জানে একটু আধটু, সে-ই এখন যদুর বাড়িতে এসে আছে, চাষ-বাস দেখে। যদুকে খুব তারা টানাটানি করছে, তাকে আর আমাদের বাড়ি থাকতে দেবে না···

একদিন মল্লিকার চোখ ফেটে সত্যি সত্যি জল এসেছিল। মানীই পরে বলছে এ কথা।

আচ্ছা তোর বাবাকে যে নিয়ে যাবি মানী, এই পুরীর মধ্যে একা একা আমি থাকব কি করে ?

মানী বলে, বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, আর কত খাটবেন বলো।

তোর বাবাকে বুঝি বড্ড খাটাই ?

মানী সমস্ত জানে, তার লজ্জা হয়। বলে, না খুড়িমা, তেমন কথা কে বলেছে ? আসলে হল, বাবা এখানে থাকলে নানান কথা উঠে, সমাজে মাথা নীচু হয়ে যায়। তাই তোমাদের জামাই বলেছে, সমাজের সকলকে ছেড়ে দিয়ে তিনটে মানুষ আলাদা থাকা যায় না তো !

জামাই সঙ্গে ছিল। তার সুর এরকম মোলায়েম নয়। বলে, কোথায় মানুষ? আমরা তো তোমাদের কাছে কুকুরের সামিল। আমাদের ঘরে ঢুকতে দাও?

ম্লান হাসি হেসে মল্লিকা বলে. দিই কি না, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ দিকি অমূল্য।

মানী সামলে নেবার ভাবে তাড়াতাড়ি বলল, তোমরা দাও, কিন্তু সবাই দেয় না কি-না—সেই কথাই বলছে খুড়িমা।

দিন-কাল বদলে যাচ্ছে, যারা দেয় না তারাও দেবে।

অমূল্য আগুন হয়ে ওঠে, দয়া? দয়া চাই নে, আমরা আলাদা থাকব। কোম্পানি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, দালান-কোঠা চাকরি-বাকরি সব বখরা হয়ে যাবে···খাসা হয়েছে—

কিন্তু তাতে ভালবাসা হবে না, তফাতটাই শুধু বাড়বে। একটা নিশ্বাস ফেলে মল্লিকা বলে, এদের অনেক দোষ আছে মানি, তবু এদেরই মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে মানুষের অপমান প্রাণ দিয়ে বুঝেছে। এই বাড়িরই একটা লোক সব ছেড়েছুড়ে আজও ভেসে বেড়াচ্ছে···হ্যাঁ রে মানী, আজকাল তোর খুড়োমশায়কে একেবারে ভুলে গেছিস, না?

মানী লজ্জিত হয়ে সরে যায়। অমূল্য তখন চলল শ্বশুরের কাছে। মণ্ডপের সামনেটায় একটা নিড়ানি নিয়ে যদু ঘাস তুলছিল। সেখানে আর একদফা বচসা হল। অনেকক্ষণ পরে রান্নাবান্না হয়ে গেলে মল্লিকা গিয়ে দেখল, যদু ঘাসের উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

মল্লিকা বলে, আর কেন মোড়ল দাদু? আমরা উঁচু জাত—ওদের যে ঘেন্না করি! কেউ আর ইস্কুলে পড়তে আসবে না, ঘাস তুলে পথঘাট যতই সাফ করে রাখ না কেন—

যদু বলে, তাই তো বউঠাকরুন, নতুন কথা শুনি—তোমরা আর আমরা একেবারে পর, কোন সম্পর্ক নেই—

থাকবে কি করে? কোম্পানি দাগ কেটে মার্কা মেরে দিয়েছে যে। এদিক-ওদিক হবার জো আছে?

সেইদিন মল্লিকা এক চিঠি লেখে আমাকে। যা কখনো হয় নি—দু-শ মাইল দূর থেকে কান্না শুনতে পেলাম। চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন কান্না। লিখেছে, অবস্থা ভাল নয়, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বদেশী আমলের কথা শুনেছি, কিন্তু এমন দুর্দিন আর কখনো আসে নি। আমার এদিকে ক্ষেত-খামার খাঁ খাঁ করছে, ভয়ানক অজন্মা, লোকে এবার খেতে পাবে না···

যদুকে শেষ পর্যন্ত একরকম জোর-জবরদস্তি করেই নমঃশূদ্র-পাড়ায় নিয়ে গেল। মল্লিকা একা থাকে। এক-একদিন যদু সন্ধ্যার পর গা ঢাকা দিয়ে আসে, বেশিক্ষণ থাকতে ভরসা পায় না, খবরাখবর নিয়ে সরে পড়ে।

মাস ছয়েক পরে একদিন যদু ঘরের মধ্যে এসে চেপে বসল. বলে, ইঃ আমরা কুটুম্বেরা! ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই। বুঝলে বউঠাকরুন, দুপুরে আজ লবডঙ্কা হয়েছে।

মল্লিকা শিউরে ওঠে, সে কি?

তিক্তকণ্ঠে যদু বলে, জুটবে কোথা থেকে? তের বিঘের বড় বন্দটা পতিত রয়েছে। তার কি চেষ্টা আছে? নবাবপুত্তুর তেড়ি কেটে লম্বা লম্বা বুলি আউড়ে বেড়াবে, সন্ধ্যার পর জুটবে গিয়ে অশ্বিনীনাথের গাঁজার আড্ডায়। গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলে, আবার শুনি রাত্তিরে এদিক ওদিক বেরুচ্ছে। পয়সার খাঁকতি, নেশার টান। শেষকালে জেলে-টেলে না যায়, তা হলে মানীর কষ্টের পার থাকবে না।

মল্লিকা বলে, এই আমার মতো?

যদু নাকি উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলেছিল, হঃ তোমার মতো! তুমি তো ভাগ্যধরী বউঠাকরুণ, ঐ হারামজাদার কথার মধ্যে তুমি আমার ভাইধনকে টেনে আনলে?

ভাতের থালা সামনে আসতে যদু গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পোরে। কেবল যে দুপুরে খায় নি, সে রকম মনে হয় না। হয়তো আরও কত বেলা—কত দিন, তার ঠিক কি! মল্লিকার মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল, রাত্রে খুব জ্বর এল। জ্বর এইরকম প্রায়ই হয়। ভাবনায় ভাবনায় কিছুতেই ঘুম আসে না। আলো জেলে তখন আমাকে চিঠি লেখে, আর থাকতে পারি নে, তুমি চলে এসো—

এই সময়টা নতুন ভারত-শাসন আইন পাশ হল, স্বাধীনতার পথে নাকি বড একটা লম্ফ দিলাম! বড়লোকের বাড়ির আয়েশি কর্তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। খবরের কাগজে কলমের পর কলম তাঁদের অলৌকিক ত্যাগের বিবরণ বেরুতে লাগল। পুলকে রোমাঞ্চিত হতে হয়,—ডজন ডজন এরকম অবিসম্বাদী দেশনেতা রয়েছেন, ভাবনা কি আমাদের? তাঁদের ভোট যোগাড় করতে আমাদের মতো জেলফেরত ছন্নছাড়ার দল কোমর বেঁধে লেগে গেল।

এই উপলক্ষে আমরা কয়েকজন আচম্বিতে ছাড়া পেয়ে গেলাম। আমাদের লাভ এইটুকু। প্রথম যে ট্রেন পাওয়া গেল, তাতে উঠে বসলাম।

সন্ধ্যার পর বড় কনকনে শীত—বাতাসের যেন দাঁত হয়েছে, গ্রামের কুকুরটা

অবধি এরই মধ্যে খেজুর রস জ্বাল-দেওয়া উনানের ধারে গুটি-সুটি হয়ে শুয়েছে। এমনি সময়ে স্বল্পালোকিত স্টেশনে নেমে আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি।

কোথায় যাবেন বাবু?

আমাদের গ্রামের নাম করলাম। বিছানার মোট ও সুটকেসটা দেখিয়ে বলি, বোঝা ভারী হবে না।

উঁহু ভারী কেন হবে? শোলার আঁটি। চার আনা লাগবে—ষোলটি পয়সা, আধলা কম নয়।

টিকিটবাবু আলো হাতে সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

নতুন লোক দেখেছে, ঠগ-বেটারা অমনি ছুরি শানাচ্ছে। বলি, ষোলটি পয়সা কখনো দেখেছিস্ এক জায়গায়? আপনি ব্যস্ত হবেন না, এগিয়ে দেখুন, কতজনে হা-পিত্যেশ করে আছে। চার পয়সা কি বড় জোর ছ-পয়সা।

লোকটা বলে, পাক্কা দু-ক্রোশ পথ, খাল পেরুতে হবে, মোটে ছ-পয়সা?

তাইতো সবাই যাচ্ছে।

তবে আমিও যাব।

বোঝা মাথায় নিয়ে দ্রুতপদে চলল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা সুড়িপথে নামলাম। খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে, মাঠ গাছপালা ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গলগুলো অনেকদিন পরে চোখে অপরূপ ঠেকছে।

তোমার নামটা ভাই?

তা-ও-ছ পয়সার মধ্যে?

চুপ করে যাই। মনে মনে ভাবি, ঐ তো রোগা চেহারার মানুষ, দুটো বোঝা বয়ে খুব কষ্ট হয়েছে, মেজাজ তাই বিগড়ে গেছে। সহানুভূতির সুরে বললাম, এই ইয়ে···সুটকেসটা বরং আমার হাতে দাও দিকি।

বিরক্ত মুখে লোকটা বলে, তা হলে পয়সা তিনটে কম দেবে তো? পথ ছেড়ে এবার আমবাগানে ঢুকে পড়ল।

ওদিকে কেন রে?

লোকটি বলে, এইখানে দাঁড়াও বাবু, জল খেয়ে আসি একটু।

এত শীতে জল?

সে রুখে উঠল। জলও খাওয়া যাবে না? বাগানের দিকটায় জল, কতক্ষণ লাগবে!

মনে পড়ল, একটা খালের মতো আছে বটে এদিকে। চৈত্র মাসে একদম শুকিয়ে যায়, বর্ষায় হিঞ্চে-কলমি নিয়ে জেগে ওঠে, জলের চেয়ে শেওলাই বেশী। ছেলেবেলায় এইখানে দু-চার বার পুঁটিমাছ ধরতে এসেছি।

দাঁড়ালাম। আবার ভাবি দাঁড়িয়েই বা কি হবে! লোকটার গতিক স্থবিধে লাগছে না। বাগানের মধ্যে খানিকটা গিয়ে একটা উঁচু জমি, সেখান থেকে বেশ দেখা গেল। চেঁচিয়ে ডাক দিলাম, জল খাবি—তা খালের মাঝখানে কি করিস?

আজ্ঞে, ঘাটের জল ঘোলা।

কোমর-জল হয়ে গেছে, এখনও এগুচ্ছিস?

জবাব না দিয়ে লোকটা ক্ষিপ্রবেগে শেওলা ছিঁড়ে পথ করতে লাগল। আমি বন-জঙ্গল ভেঙে সোজা খালের কিনারে ছুটলাম। ততক্ষণ সে ওপারে উঠে দৌড় দিয়েছে।

হেসে উঠি। পারবি নে বাপু, সাত বছর আটকা ছিলাম, তা পায়ে বাত ধরেছে ভাবিস নে। আচ্ছা, যত জোরে পারিস ছোট, আমিও ছুটছি।

নতুন করে আর শেওলা ছিঁড়তে হল না, চক্ষের পলকে খাল পার হয়ে প্রায় রশি দুই গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরলাম।

স্থটকেশ ফেলে লোকটা কোমর থেকে বার করল এক ছুরি। ধস্তাধস্তি চলল খানিকটা। হেসে বললাম, ও ছুরিতে মাছ কোটা যায়, মানুষ কাটা যায় না, বুঝলি? হাত ধরে মুচড়ে দিতে ছুরি পড়ে গেল, লোকটা আর্তনাদ করে উঠল।

গ্রামের ধারে এসে পড়েছি। চেঁচামেচিতে লোক জুটে গেল।

কি হয়েছে? কি হয়েছে?

লোকটা অসঙ্কোচের বলে, মেরে ফেলেছে ভাই রে, হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। তেষ্টার জল খেতে দেয় না। যেই বলেছি গোপালদার ঐ বাড়ি হয়ে একটুখানি ঘুরে যাই—

বোঝা গেল, তার বাড়ি এই গ্রামেই। ছোকরাদের মধ্যে তিন-চার জন বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। বলে, ঐ রকম! ভদ্দোরলোক কি না, আমাদের ওরা জানোয়ার ভাবে। পড়ে পড়ে তুই মার খেলি, জবাবটা কি আমাদের জন্য মুলতুবি রেখেছিস?

ব্যাপার তুমুল হত নিঃসন্দেহে! কিন্তু ওরই মধ্যে আধবুড়ো একজনকে চেনাচেনা ঠেকল। চৈতন্য মোড়ল না? কুশখালি এসে পড়েছি যে, বুঝতে পারি নি।

চৈতন্য মোড়ল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। গোঁফ-দাড়িতে ভরা আমার মুখ চিনেও চিনতে পারে না।

আমি রায়-কর্তার ছেলে গো—শঙ্কর।

চৈতন্য বলে, সর্বনাশ! এদ্দিন পরে এলে? সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, মেরে থাকে মেরেছে, বেশ করেছে। ইনি মারলে দোষ হয় না, সম্পর্কে তোর খুড়শ্বশুর।

চৈতন্য পরিচয় করিয়ে দেয়, এ হল তোমাদেরই যদু মড়লের জামাই। ওরে অমূল্য, পেন্নাম কর্—

অমূল্য গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময়ে এসে পড়লেন জমিদারি কাছারির নায়েব, সঙ্গে চারজন বরকন্দাজ। তিনিও এই ট্রেনে নেমেছেন। বরাবর রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন, হৈ-চৈ শুনে কি ব্যাপার জানতে এসেছেন।

কী হে? একেবারে থেমে গেলে সব! এই যে অমূল্যচন্দোরও রয়েছেন দেখছি।

যারা বেশি বীরত্ব দেখাচ্ছিল তাদের আর পাত্তা নেই, কোন্ দিকে সরে পড়েছে, যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। নজরে পড়ে গিয়ে অমূল্য ঘাড় নীচু করে রইল।

আমার দিকে চেয়ে নায়েব বললেন, জামা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে! খুলুন দেখি, এঃ মশায়—

পিঠে এক জায়গায় লম্বালম্বি চিরে গেছে। সে দিকে এতক্ষণ কারও নজর পড়ে নি। একজন বরকন্দাজ ছুরিখানা কুড়িয়ে নিল।

নায়েব বোমার মতো ফেটে পড়লেন। ব্রহ্মরক্ত পাত করেছিস, ভিটেয় ঘুঘু চরাব। শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত তো হবেই ভালো করে, কাল গিয়ে ফৌজদারি চড়াব। কালাপানি ঘুরিয়ে আনব, তবে আমার নাম মন্মথ শিকদার, হ্যাঁ—

আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলেন, চলে আসুন মশায়। আমি আছি, কোনো শালার উড়বার জো নাই। দায়ঝক্কি সমস্ত আমার। চৈতন্য মোড়ল বাবুর জিনিস দুটো তোমার জিম্মায় রইল, পৌঁছে দিও! কাছারি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আগে তো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হোক।

রাস্তায় এসে মন্মথ মনের উল্লাস চাপতে পারেন না, হাসতে হাসতে বলেন, একটুখানি নোনছা ছাল উঠে গেছে মশায়। ডাক্তার লাগবে না হাতী! তবে সাক্ষী হিসেবে ডাক্তার একটা চাই বটে—ডবল ফী ধরে দিলেই হয়ে যাবে, বন্দোবস্ত আছে।

চুপচাপ কয়েক পা গিয়ে আবার শুরু করলেন, ঐ অমূল্য বেটা হল পালের গোদা। আরে বাপু মাতব্বর হবি ভাল কথা—গুছিয়ে চলতে পারলে দু-দশ টাকা আসেও। কিন্তু ঘর থেকে কিছু আগাম বের করতে হয়। সব ব্যবসায়

ঐ এক রীতি। তোর হল উঁাড়ে মা ভবানি, মুটেগিরি করবি—শুধু বামুন-কায়েতদের মুণ্ডপাত করে বেড়ালে কি শেষরক্ষে হবে ?

জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে বুঝি ঐ-সমস্ত খুব আন্দোলন হচ্ছে।

নায়েব বললেন, হবে না ? না দেবার কথা বড় মিষ্টি কি না ! সব শেয়ালের এক রা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বামুন-কায়েত ওসব কিছু নয়, নায়েব মশায়। ওদের রাগ আসলে চড়া খাজনা আর জুলুমের উপর। সেইটেই এখন জাত-বেজাতের কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নায়েব প্রতিবাদ করে উঠলেন, সেই আহ্লাদে থাকুন মশায়। একবার আনাচ-কানাচ থেকে শুনে আসবেন দিকি ওদের কথা।

এত সব ওরা তো তলিয়ে বোঝে না !

বুঝুক না বুঝুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। আমরা কি ছেড়ে কথা কইব ? আর তা-ও বলি, ধর্ম আছেন। নইলে দেখুন না কেন, দেওয়ানিতে আঠার মাসে বছর, আজ এক মাস ছুটোছুটি করে সময় বের করতে পারছি নে, কোত্থেকে পথের মানুষ আপনি এসে এই কাণ্ড। এর নাম ফৌজদারি মামলা, একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা। সকালবেলা টক করে থানার একখানি এজাহার ঝেড়ে দিয়ে সেকেণ্ড ট্রেনে সদরে সোজা মোক্তারের বাড়ি···কি মশাই, আবার এত রাত্রে বাড়ি যাবেন কি করতে ? কাছারিতে দুটো শাক-ভাত খেয়ে ভোরবেলা বরঞ্চ এই পথে অমনি—

সোজাই চললাম আমি। ব্যস্ত হয়ে নায়েব ডাকছেন, তা হলে সকালবেলা আসছেন তো ? না, আবার লোক পাঠাতে হবে ?

আমি মামলা করব না।

তার মানে ?

ফিরে দাঁড়িয়ে বলি, ভেবে দেখলাম নায়েব মশায়, দোষ আমারই। পেটে ভাত নেই, শীতের রাত্রে চার মাইল মোট বয়ে আনছে—মজুরি ছ-পয়সা। এতে মেজাজ খারাপ হলে দোষ দেব কার ? আমি যদি বলতাম, চার আনাই পাবি বাপ, সেইটে ন্যায্য—আর তার উপর যদি এ সব হত—

নায়েব শেষ করতে দেন না, গর্জন করে ওঠেন, তা বুঝেছি, আপনারা ঘরের ঢেঁকি সব কুমীর হয়ে উঠেছেন, তাই এই সব হাঙ্গামা।

হাঙ্গামা-হুজুত না হলেই বা আপনাদের দু-পয়সা আসে কিসে ? হাতবাক্স কোলে করে নেহাৎ একেবারে দুর্গানাম লিখতে কি কাছারি এসে বসেছেন ? বলুন সত্যি কি না ?

চাঁদের আলোয় উঠানে বাদামতলায় এসে দাঁড়াই।

দুয়োর খোল, ও যদু—

এই উঠানে কত সন্ধ্যায় কত ছুটাছুটি করেছি, মা তখন বেঁচে। বাদামতলার এইখানটায় বিয়ের পর মল্লিকার পালকি এনে নামিয়েছিল। আজ যেন নতুন অতিথি, সবাই অবিশ্বাস করছে। এতকাল পরে ফিরে এসে মনে হচ্ছে, গ্রামের চেনা মানুষেরা বদলে গেছে, একেবারে নতুন পৃথিবী।

যদুভাই, শুনতে পাচ্ছ না ? আমি—আমি—

মল্লিকার জ্বর। লেপের নিচে এক রকম বেহুঁশ হয়েছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। ঠাণ্ডার ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ···মিটমিটে প্রদীপ···ভাচাচোরা দেয়ালের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরশুলা উড়ছে··· বিশীর্ণ ভয়াবহ মুখ মল্লিকার। জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত পথ অতিক্রম করে যেন কালো গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। হাত বাড়িয়ে দিলাম মল্লিকার দিকে। জীবন এসে কি মৃত্যুকে আদর করে ডাকল ?

কেমন আছ ?

ভাল, খুব ভাল ! এই কদিন একটু জ্বর হয়েছে।

কদিন না' ক'বছর বল।

হোকগে। ম্যালেরিয়া জ্বর—ঐ রকম ভোগায়। মল্লিকা উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে বসে পড়ে। কী-ই বা বয়স তার, তবু চুলে পাক ধরেছে, কুঞ্চন-রেখা পড়েছে সুকোমল মুখটির উপর। সেই ছিপছিপে হাসিমুখ মেয়েটি, চোখে-মুখে চঞ্চলতা—এখন কথা বলে কত আস্তে, হাঁটতে পারে না—কষ্ট হয়। বলল, মোড়ল-দাদু একা-একা কি যে করছে ! আগে একটা খবর দিলে না, বেশ লোক ?

বললাম, বড্ড মনে-প্রাণে চেয়েছিলে কি না, তাই হঠাৎ ছেড়ে দিল। চিঠিখানা পেয়ে অবধি এমন হয়েছিল মল্লিকা, খবর দেবার দেরি সইল না— ছুটে এসেছি।

এত দয়া—এমন শত্রুতা আর কার আছে বল। বলে মল্লিকা প্রগল্‌ভা হাসি হাসল।

যদু দেখা দিল। কুলোয় করে চিঁড়ে-পাটালি আর জামবাটি-ভরা দুধ এনেছে। সে থমকে দাঁড়ায়—রক্তের দাগ কেন ?

মল্লিকা বলে, দেখি—এদিকে ফেরো তো !

হেসে উড়িয়ে দিই, দেখবার কি আছে ? কাঁটায় ছড়ে গেছে, গরম জামায় চুপসে গিয়ে ঐ রকম দেখাচ্ছে।

আহা-হা, তাহলে আগে একটু আইডিন—

উঁহু, সকলের আগে এইটি। যদুর হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিয়েই খেতে বসলাম। তারপর ইচ্ছে করে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই।

আচ্ছা—আমি যখন ডাকছি, গলা শুনে কি ভাবলে মল্লিকা?

মল্লিকা বলে, অনভ্যাস হয়ে গেছে, ঠিক ধরতে পারি নি। ভয় হল, চোর-টোর বুঝি!

চোর এসে হাঁকাহাঁকি করে গেরস্ত জাগাচ্ছে—বুদ্ধি আছে দেখছি।

হেসে উঠলাম। তারপর বলি, চোর না হই, দাগি তো বটে! বাড়ি এলাম, কিন্তু কদিনই বা থাকব!

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে গেল।—যদি বলি, যেতে দেব না আর—বাড়ি থেকে বেরুতেই দেব না?

এমন তো বল নি কোন দিন—

মল্লিকা বলে, তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, একটা কথাও কি গুছিয়ে বলতে পারতাম ছাই!···সত্যি, আমি ঠিক করেছি, তোমাকে আর বাইরে বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না।

তবে ঘরেই থাকব।

হ্যাঁ, নতুন ভাবনা আজ মনে মনে, ঘরে থাকা এমন কাজ আমাদের। কার্তিক কামার, এরফান ঘরামি, বুধো শেখ, আমাদের ঐ অমূল্য, চৈতন্য মোড়ল—কেউ বাদ নেই, সকলকে নিয়ে আমাদের ঘর।

খাওয়া শেষ হল। হাত ধুয়ে হাসতে হাসতে খাটের উপর এসে বসি।

মল্লিকা ঠিক বিশ্বাস করে নি।—সত্যি বলছ গ্রামে থাকবে? তা হলে তোমার দেশের কাজ?

এই গ্রামও কি দেশ নয়? এরা সকলে, তুমি—দেশের মানুষ নও, বলো।

মল্লিকা সহজভাবে নিল কথাটাকে। বলে, তা সত্যি! ধর, তুমি তো জীবনটা এক রকম এই পথেই দিলে। আরও মানুষ রয়েছে, তারা যাক না।

ঠিক কথা। তবে যায় না যে!

হয়তো ভাবে, মিছে আত্মবলি দেওয়া। এ-জাতের কি কিছু হবে? কদিন থাকো, দেখবে অবস্থা। দেশের ছেলেমেয়ে এতকাল এত দুঃখ স্বীকার করে কি করতে চেয়েছিল, সব চুরমার হয়ে গেছে।

মল্লিকার গলা ভারী হয়ে এল, সে এক দিকে মুখ ফেরাল। আমিও সহসা জবাব দিতে পারি নে। শেষে বললাম, পথের বাধা তো আসবেই মল্লিকা।

'তেই মনে হয়, সূর্য উঠল বলে। যোগী-ঋষিরা শব-সাধনা
ডাকিনীর উপদ্রবটা বেশি হয়। গল্প শোন নি?
; ব্যথাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। আবার বলি, মল্লিকা,
বল, রোগা দেহ; আমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। সংসারের
.ড়িয়েছি—শ্মশানের উপর এবার ঘর বাঁধা হল না। কিন্তু ফুল
এশুস্তাবী, আমাদের এত কষ্ট বিফলে যাবে না।

না হতে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে লাগল। খিল খুলে
মানী, অমূল্য, চৈতন মোড়ল এবং আরও দু-তিনজন এসেছে। এরাই
মারবে বলে শাসিয়ে বেড়ায়, কুশখালির দিকে যাবার উপায় নেই,
মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পর্যন্ত পর হয়ে গেছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড—সেই
জামাই পরম ভক্তিমান হয়ে সকলের আগে-ভাগে ঢিপ করে যদুকে প্রণাম করল,
পা আর ছাড়তেই চায় না।

চৈতন্য বলে, লজ্জায় আসতে চাচ্ছিল না। আমি বলি, ভয় রায়কর্তার
ছেলেকে নিয়ে তো নয় এর মধ্যে শিকদার ঢুকে পড়েছে। আস্ত কালিঠাকুর—
ডাহা মিথ্যের উপর চুনকাম করে। এবারে এমন জুত পেয়ে গেছে, শুধু অমূল্য
কি—পাড়াটা সুদ্ধ চষে ফেলবে।

যদু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কি হয়েছে? কি করেছে অমূল্য?

খুড়োমশায় বলেন নি কিছু? মানী কেঁদেই ফেলল। বুঝলে চৈতন-দা,
এ-ও ঐ শিকদারের বুদ্ধি। বাবার কানে গেলে একটা খাতির-উপরোধের
ব্যাপার হবে, একদম তাই চেপে গিয়েছেন। বেরিয়ে গেছেন নাকি?

যদু বলে, চেঁচাস নে, ওরা ঘুমুচ্ছে ঐ ঘরে। বউঠাকরুনের রাতে ঘুম হয় না,
এখন বোধ হয় একটু চোখ বুজেছে।

কিন্তু কেউ আমরা ঘুমিয়ে নেই। শুনেছি।

চৈতন নিশ্বাস ফেলে বলে, তবু রক্ষে। রওনা হবার আগে আসা গেছে।
আর তোকেও বলি অমূল্য, পই-পই করে বারণ করেছি—গায়ে-গতরে খাট্, অধর্ম
কাজগুলো ছেড়ে দে—বিশেষ করে নায়েব যখন আদা জল খেয়ে লেগেছে—

কথায় কথার যদু সব শুনল। হঠাৎ একসঙ্গে সকলে চুপ করে যায়, নিঃশব্দে
আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি তাদের মধ্যে।

রুষ্ট কণ্ঠে যদু বলে, এমন মিথ্যুক হয়েছে ভাইধন, ছুরির খোচা খেয়ে স্বচ্ছন্দে
বলল কাঁটায় ছড়ে গেছে?

কাঁটা নয় কি মানুষ? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবার বন্দোবস্ত হয়েছে।
সমঝে চলো। শেষ পর্যন্ত কিন্তু উভয়কেই আস্তাকুঁড়ে যেতে হবে।

হো-হো করে হেসে উঠি

যদু আরও জ্বলে উঠে। হেসো না, আমার গায়ে জল-বিছুটি মা হারামজাদা শেষকালে খুনে হয়ে দাঁড়াল! যা ইচ্ছে করুক গে শিকদার, তুমি থানায় চলে যাও ভাইধন। কিসের জামাই? জামাই বলে খাতির করো না।

জামাই না হোক, আমার দেশের মানুষ তো—খাতির আমাকে করতেই হবে। বলতে বলতে দুইহাতে যদুকে তুলে ধরলাম। ছেড়ে ফেলুক সে মনের গ্লানি। বলি, বড় ভাইয়ের মতো আমায় মানুষ করলি যদু-ভাই, বাবার কাছে এতটুকু বয়স থেকে আছিস—তুই আজ ঐ কথা বললি? তোর বউঠাকুরুন আঁটার ঘরে একা একা ধুঁকছে, আমরাও কয়েদখানায় জীবনটা কেটে গেল—এ-সব শুধু কি নিজের জন্য, বামুন-কায়েতের জন্য, এই মোড়লদের জন্য নয়? যাদের চিনি নে কোন দিন দেখব না—তারাও বড় হবে, মানুষ হবে, জীবন দিয়ে কি আমরা এই চাই নি? বল যদু ভাই, বল—আমি মিথ্যে বলছি কি না?

বুড়ো যদু আজকের নয়—বলতে গিয়ে হাহাকার করে উঠে।

কে ভাবে এ-সব ভাইধন? একদল কেবল আর এক দলকে উস্কিয়ে দিচ্ছে বই তো নয়! কোথাকার ভটচাজ্জিরা নতুন পাঁতি দিয়েছে—এখন থেকে তুমি আমার কেউ নও, আমি তোমার কেউ হলাম না। আজ যদি কর্তা থাকতেন!

আমরা তো আছি, মোড়ল, দাদু। তাকিয়ে দেখে সবাই শিউরে উঠল। মল্লিকা উঠে এসেছে, পা টলছে, কালিমাখা কোটরাগত দুটি চোখে যেন আলো ফুটছে। সামনের বেঞ্চির কোণে ধপ করে সে বসে পড়ল। বলতে লাগল, সেবার মাটি ভাগ করেছিল, এবার মানুষ ভাগ করছে। সেবারে সহ্য করি নি, এবারেও করব না। বসো তোমরা, মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে। নিমু ময়রার দোকানে একটিবার যেতে পারবে মোড়ল-দাদু?

খানিক পরে আবার মল্লিকা বেরিয়ে এল, হাতে হলদে সুতো! বলে, আমার শ্বশুর এ-সব তুলে রেখে গিয়েছিলেন। এসো তোমরা, পরতে হবে। এস···তুমি···তুমি···

অমূল্য কেবল মুখ ভারী করে থাকে। বলে, আমার হাতখানা মুচড়ে একবারে ভেঙে দিয়েছে, এই হাতে পরব রাখী?

আমি বললাম, কি করি—শুধু হাতখানাই হাতের মাথায় পেলাম যে! মনের নাগাল পাই নে, নইলে বিষ-ভরা মনটাই মুচড়ে ভেঙে দিতাম।

মানুষের মন ছাপিয়ে বিষ উপচে পড়ছে আজ চারিদিকে। কাল-

প্রহর গুণছি, সামনে নির্মল প্রসন্ন প্রভাত। সমস্ত গ্লানি ঘুচে যাবে

পথখালির চাষীদের মধ্যে আজকাল আমার খুব যাতায়াত। তাই নিয়ে জনে নানা টিপ্পনী কাটে।

দারোগা বলে, এবার শায়েস্তা হয়ে এসেছেন শঙ্করবাবু। চুলে পাক ধরেছে কি-না, কত দিন? তা ভালো, পথটা নির্ঝঞ্ঝাট—

রাজ্যেশ্বর নামে গ্রামে একজন তালুকদার আছেন, সম্পর্কে তিনি আমার খুড়ো। হঠাৎ কেন জানি না বড় সদয় হলেন আমার উপর। একদিন তিনি ডেকে বললেন, কলকাতায় গিয়ে একটা কিছু বাগিয়ে বসো দিকি বাবাজীবন, তবে বলব বাহাদুর। সাহেবদের বল, একটা ভাল চাকরি দিন স্যার, নইলে আবার ডবল করে স্বদেশিতে লেগে যাব কিন্তু। এতখানি বয়স ধরে দেখছি, কত লোক গুছিয়ে নিল এই সব করে। তুমিই বা কেন ছাড়বে?

আর ঐ নায়েব মন্মথ শিকদার বলেন, চাষীপাড়ায় ঘুরে ঘুরে আমরা জমিদারের খাজনা তাগিদ দিই, কলাটা মূলোটা আদায় করি! আপনি যে অহরহ ঘুরেছেন মশাই? আপনাদের ভারতমাতার স্বাধীনতাও আদায় হবে কি ঐ পাড়া থেকে?

হ্যাঁ ভাই, আসল ঘাঁটি ধরেছি। সত্যিকার স্বাধীনতাই আনব আমরা গ্রামে শহরে—সকলের মধ্যে। মিথ্যে ভয় থেকে স্বাধীনতা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বাধীনতা, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা, রাজ্যেশ্বর কোম্পানিকে এসেম্বলিতে পাঠিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে কড়া কড়া বক্তৃতা করানো, আর তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের জন্য ভালো ভালো কতকগুলো চাকরি বাগানোর স্বাধীনতা নয়।

শোন, শোন, আমার সেই স্বাধীন সুখী ভাবী ধরিত্রীর স্বপ্ন। মানুষে মানুষে বিরোধ নিঃশেষ হয়েছে, শোষক-শোষিত হাত মিলিয়েছে, জনে জনের মুখে হাসি, চারিদিকের পঙ্গু উঠে বসেছে—ঐ দেখ। প্রাণে তাদের আশার বিদ্যুৎ।

গোরু ও মানুষ ছিল প্রায় এক ধরনের; প্রহার-পীড়নে মাথা তুলতে না— নিঃশব্দে সয়ে যেত, অসহ্য হলে মুখ থুবড়ে পড়ত। জীবনের উন্মাদনা জেগেছে সেই সব মানুষের মধ্যে, মুখ, তুলে উল্লাসে তারা ঐশ্বর্যবতী ধরণীর দিকে চাইছে।

মল্লিকা তর্ক তোলে, এই ধর আমাদের যদু, টাকায় তো সে কামনা করে না। দরিদ্র জীবনই তার কাছে ভালো—

তাল তো অনেকেরই কাছে। দারিদ্র্যের গর্ব নিে

পারে।

মল্লিকা বলে, কিন্তু অমূল্যর পাশাপাশি তাকে দেখ। কং

ছাতুর জীবনে!

জীবন নয়, ওটা মৃত্যু। মৃত্যুর মতো শান্তি কি কিছু আছে!

কিন্তু সবাই ভোগের প্রত্যাশী হলে জগতের হানাহানি কি বেড়ে ১

না মল্লিকা, না। ধরণী কৃপণ নয়, অনন্ত তার সম্পদ। মানুষের প্র

মতো খাবার আছে, সকলের থাকবার জায়গাও আছে,—নেই কেবল মানু

লোভের জায়গা।

যেন বাতাসে শোনা যাচ্ছে, দিন আসছে ঐ। সব সমান···আলো-হাওয়া, পৃথিবীর বুকের রসে সিঞ্চিত শস্য-সম্পদ, গোপন, মণিকোঠায় রেখে-দেওয়া কয়লা-ইস্পাত একলা কারো নয়। মেরে মেরে একের হাত চোস্ত হয়ে গেছে, আর একজনেরও মার না খেলে পিঠ উসখুস করে—এ অবিচারের শেষ হয়ে এল। বিরোধ অপ্রীতি দূর হয়ে যাবে। শান্তি আসবে, শ্রী ফিরবে। বিবাদের মধ্যে কত অন্যায় করেছি! রক্তপাত হয়েছে, আপন-পর কত লোকের চোখের জল ঝরেছে! নতুন দিনে কারও এসব মনে থাকবে না। প্রভাতের আলোয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলে যাব ভাই—

সমাপ্ত